শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষুদিরাম
বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'—বইখানি প্রথমে উচ্চ-মাধ্যমিক .বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে পরিকল্পিত হয়; দুই-একটি অধ্যায় লেখা হইবার পরে দেখা গেল যে, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে ইতিহাস দি বা থাকে, সাহিত্যরসকে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়। সাহিত্যের অন্তরে যুগে যুগে যে ভাব-ভাবনা ক্রিয়াশীল, তাহাদিগকে হয়ত পারম্পর্য-সূত্রে গাঁথিয়া, পরিবর্তন-ক্রমের সহিত অন্বিত করিয়া ইতিহাস-ধারার অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-কৃতির সহিত প্রত্যক্ষসম্পর্কবর্জিত হইলে এই ইতিহাস-বিন্যাস-প্রয়াস একটা নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতাবোধেরই সৃষ্টি করিবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। এইজন্যই গ্রন্থখানি প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ করিতে পারিলাম না। প্রথম খণ্ড কোনমতে সারিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে আসিয়া আমার বিবেক-বুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধ সাফ জবাব দিয়া বসিল। আধুনিক যুগে আসিয়া গ্রন্থখানি কাজে কাজেই আর লপাঠ্য পুস্তক থাকিল না, অপেক্ষাকৃত পরিণত সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থের র্যায়ে পড়িয়া গেল। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে পরিকল্পনা ও মানের standard) দিক দিয়া একটা অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। আগামী সংস্করণে এই টিসংশোধনের ইচ্ছা রহিল। আপাতত এই অপূর্ণতার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের মা প্রার্থনা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কোন সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক আদর্শ-লম্বনে লেখা হয় না। ইহা হয় তথ্যপঞ্জীসংকলন নয়ত সমাজচেতনা-প্রসূত াদর্শের রেখাঙ্কনের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে সাহিত্যের আনুষঙ্গিক য ও তত্ত্বই প্রধান হইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যরসাস্বাদন গৌণ হইয়া পড়ে। হয়ত ৌলিকতাহীন, প্রথাবদ্ধ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কবির বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীচেতনার র্গ্রাসী প্রভাবে প্রায় অবলুপ্তই থাকে; সাধারণ লক্ষণ ও প্রথানুবর্তন ব্যক্তি-াতন্ত্র্যকে আবৃত করিয়াই রাখে। তথাপি মনে হয় যে, এখন সাহিত্যের তিহাস নূতন প্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কার করিয়া, নূতন নূতন গ্রন্থের পরিচয় দিয়া, হিত্যসৃষ্টির পিছনকার তত্ত্বসম্ভারের সন্ধান দিয়া পথিকৃতের কাজ করিয়াছেন, হাদের ঋণ পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্বের

যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়া নূতন ভাবে আলোচনার সূচনা করা বিধেয়। হয়ত একের চেষ্টায় এই সুবৃহৎ কাজ সম্পন্ন হইবার নহে—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় এই দুরূহ কার্য-সম্পাদনে বহু পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। এইরূপ একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিকল্পনা-রচনা অদূর ভবিষ্যতের একটি অবশ্যকর্তব্য কার্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। আমার বইখানি এই নূতন রীতি-প্রতিষ্ঠার একটা অক্ষম, অসম্পূর্ণ প্রয়াস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থরচনায় যাহাদের কাছ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে স্নেহাস্পদ শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী ও ডাঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বাংলা সাহিত্যেব একটি পূর্ণতর ইতিহাস লিখিবাব ইচ্ছা আছে। জানি না এই ইচ্ছা কার্যে পবিণত হইবে কিনা। যদি আমার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন না-ও হয়, তবে যাঁহারা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুবাগ উভয়েবই অধিকারী তাঁহাদিগকে এই ভারগ্রহণেব সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের উন্নতিসাধনের জন্য অধ্যাপকমণ্ডলী ও সাহিত্যানুরাগী সকলের নিকটই প্রার্থনা করিতেছি। এই নির্দেশ অনুসরণে হয়ত বর্তমান সংস্করণের ত্রুটি-অপূর্ণতা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে।

৩১, সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা ২৯
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৯৫৯

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্যযুগ

বিষয় পৃষ্ঠা

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ

১

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে "অ-নাস," "খর্ব" ও কৃষ্ণকায় জাতি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ আবও দক্ষিণে সঞ্চরণ করিতে কবিতে ভাবতেব পূর্বভাগ হইতে সুদূব অস্ট্রেলিয়া পযন্ত অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারই নাম হয় অস্ট্রিক জাতি। ইহাবই ভারতস্থিত শাখার নাম কোল বা মুণ্ডা। ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে আবার ইহাব নাম প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য জাতি। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে ভারতের পূর্বদিকের প্রদেশগুলিতে প্রাচীন আর্যভাষার অনুপ্রবেশের পূর্বে এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর নানা উপভাষা প্রচলিত ছিল। এখনকাব বাঙলাদেশ তখন যে-সকল অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, সেই অঞ্চলগুলি সেই নামের উপভাষাব প্রচলন-ক্ষেত্র ছিল। এই আঞ্চলিক নামগুলি ছিল—"রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ" ও "ডবাক" ইত্যাদি। আর্যগণ ইহাদেব "দাস, দস্যু, নিষাদ" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে আবার ইহাদের "ব্রাত্য" ও "ব্রাত্যক্ষত্রিয়" আখ্যাও হইয়াছিল।

প্রাগার্য উপাদান

১। বাংলা ভাষা নবীন ভারতীয় আর্য-ভাষা হইলেও ইহার শতকরা চুয়াল্লিশটি শব্দ এই কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে নব্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্ব-শাখায়, বিশেষভাবে বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়ায় প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য উপাদান প্রচুর। চলিত-বাংলায় বধির বুঝাইতে "কালা," একচক্ষু বুঝাইতে "কানা," অলস বুঝাইতে "কুঁড়ে," বাক্‌শক্তিরহিত বুঝাইতে "হাবা", "বোবা," ("গুঙ্গা"), খঞ্জ বুঝাইতে "খোঁড়া" (লেঙড়া), 'পর্যুসিত' বুঝাইতে "বাসি" প্রভৃতি শব্দ অতি পরিচিত। ইহাদের প্রতিশব্দ বা প্রতিরূপও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবিষ্ট উপজাতীয় বিভিন্ন উপভাষায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। বাঙালীর

প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, সমাজ-ও সংস্কৃতি-বাচক বহু শব্দই মূলতঃ এই ভাষাগোষ্ঠীব। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কিছু শব্দ, ধাতু ও প্রত্যয়াদির উল্লেখ করা যাইতেছে—

[ক] বিশেষ্য শব্দ—তম্‌+বল>তাম্বুল, কলা, কদলী, ডাব, বাঁশ, জঙ্গল, জাঙ্গাল, জাং, ডাগব, ডাক, ডানা, ডাল, চাল, গণ্ডা, বুড়ি, টাকা, ডোবা, খোকা, খুকী, টাট, ঠোঙা, ঝুড়ি, ঝাঁকা,, ঝুল, ঝুলি, আড়া, আড়ি, মাল ইত্যাদি।

[খ] ধাতু—√টল্‌, √ডুব্‌, √পার্‌, √শুদ্‌>শুধ্‌, √টান্‌, √কাঁড়া, √ঝুল্‌, √ডাক, √টেক>টেঁক √টিক-টিঁক, √ঠেল ইত্যাদি।

[গ] প্রত্যয়[১]—উপসর্গ[২]—"নে"—নেতড়া, নেকড়া, নেকড়ে; "নি"—নিশুম্ভ, নিকষা; "আই—আঈ"—আইমা, বড়াই—বঢাঈ,—"আড—আড়া"—আড়বাঁশী, আড়ক্ষেপা ইত্যাদি।

[ঘ] প্রত্যয়—অনুসর্গ[৩]—"টী—টি"—বধূটী>বউটী—বউড়ী, হাবাটি—হাউড়ী, দুহিতাটী>ঝী-আড়ী, শশ্রূটী<শ্বাশুড়ী—শাউড়ী, পিচ্ছোড়িকা>পিচ্ছোড়ী> পিঁচুটি, "চী—চি"—বেঙাচি, শাকৃচী, কচি, কঞ্চি, 'কুরূচি>গুলচী, "অরু—আরু" —গোরু, শজারু, সাঁতারু, সরু, বোমারু, "অড়া—আড়া"—হাবড়া, সোমড়া, নেতড়া: "অড—আড়"—ভাঙ্গড, খাদাড়, বাদাড়; "অব—অবা"—তোমবা, আমবা, "অক্‌—ওক"—দিব্বোক, রুদ্রোক, কুস্তক, তোহ্মাক, আহ্মাক>তোমাকে, আমাকে, "অল—আল"—দঙ্গল, জঙ্গল, বঙ্গাল ইত্যাদি।

[ঙ] শব্দের ও বাক্যেব মাত্রা—"টা—টি"—ঘটিটা, বাটিটা, "না"—"বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।" (কুমুদরঞ্জন), "খন"—যাব'খন, দেব'খন ইত্যাদি।

কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর শাখাগোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী মন্‌-খেব ভাষা-গোষ্ঠীব কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় রহিয়া গিয়াছে। কম্বল-এব কম্‌, তম্‌লুক্‌-এর তম্‌ অংশ; লুঙ্গি, তাবৈ, আনুই ইত্যাদি শব্দ।

২। বাংলা ভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি "দার্জিলিঙ্‌, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ভোট, চটী, লামা" ইত্যাদি।

১ নূতন শব্দ গঠনের জন্য মূল শব্দের প্রতি যে-সমস্ত Particles বা খণ্ড শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে ব্যাপক অর্থে **প্রত্যয়** বলা হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত যাহা যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক-গঠনের সহায়তা করে তাহাই **প্রত্যয়**। পাণিনির মতে প্রত্যয় পঞ্চবিধ, সুতরাং তাহার পঞ্চবিধ উপযোগিতা আছে।

২-৩ Pater Schmidt কর্তৃক ব্যবহৃত Prefix ও Postfix-এর অনুবাদ-রূপে যথাক্রমে 'উপসর্গ' ও 'অনুসর্গ' ব্যবহার করা হইয়াছে।

৩। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়-উপাদান খুব অল্প নহে। সংস্কৃতের মধ্য দিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দ্রাবিড়-বর্গের কয়েকটি ভাষার শব্দসমূহ বাংলা ভাষায় আসিয়া গিয়াছে। "মীন, নীব, মলয়, নারায়ণ, নারিকেল" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত হইয়া বাংলায় আসিয়াছে; আর, "উলু, কড়বা, পিলে, মোট, মুটিয়া" প্রভৃতি শব্দ প্রত্যক্ষ-ভাবে বাংলায় আসিয়া গিয়াছে। স্থানীয় নামের শেষে যে "জোল" (নাড়াজোল), "গুডি" (ময়নাগুড়ি), "ভিটা" (বালুভিটা > বাল হিটা > বালুটে), "কুণ্ড—কুণ্ডা" (সীতাকুণ্ড, মানকুণ্ড) প্রভৃতি দেখা যায়, সেগুলিও দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোষ্ঠীর।

২

আর্য-প্রভাবের তিনটি ধারা : (১) প্রথম খ্রীঃ পূঃ ১০ম—৯ম শতক

৪। এইরূপ কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠী, দ্রাবিডীয় ও তিব্বত-ব্রহ্মণ-গোষ্ঠীর সহিত বিমিশ্র অবস্থায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম—৯ম শতকে আর্য দিগ্বিজয়-কারী ও উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের দ্বারা আর্য-ভাষা প্রথম বাংলা দেশে আসে। মহাভারতের সভাপর্বে (৩০শ অধ্যায়) ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়কার আর্যভাষার (উদীচ্যার) প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ পাই, "সুন্দরবন" (< সুমুন্দ্‌বন < সমুন্দরবন < সমুদ্রবন), "তমলুক" (< তমোলুক, তমুলুক < তমলক্ক < তমলপ্প < তমলগু < তাম্বলিত্ত < তাম্রলিপ্ত), "পুণ্ড্র—পৌণ্ড্র-বর্ধন", "বঙ্গ," "একচাকা" (< একচক্রা) ইত্যাদি শব্দ। ইহাদের মধ্যে যে "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় উহা অঞ্চল বা প্রদেশ-বাচক। ঐতরেয় আরণ্যকেও প্রজা-অর্থে "বঙ্গা"[১] শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "বগধ" শব্দ কালক্রমে "মগধ" হইয়াছিল। এইরূপ ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ প্রাগ্‌দ্রাবিড়-প্রাগার্য উপভাষায় অন্তঃস্থ বা অর্ধোচ্চারিত ম, ব (M, W)-এর অস্তিত্ব, অর্থাৎ ম ও ব-এর পার্থক্য ছিল অস্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক যুগে—এতদ্দেশের আদিম উপনিবেশ-স্থাপনকারী অস্ট্রিক জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতির নাম ছিল "ম্যাঅঙ্"। আর্যভাষায় উক্ত "ম্যাঅঙ্" শব্দটি "বঙ্গ" রূপ লইয়াছিল। "বঙ্গ" শব্দ প্রদেশ- বা- অঞ্চল-বাচক ছিল এবং প্রজা বা জন বুঝাইতে "বঙ্গাঃ" শব্দ

১ "ইমাঃ প্রজাঃতিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ"—ঐতরেয় আরণ্যক—২-১-১-৫।

ব্যবহৃত হইত। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল পর্যন্ত "বঙ্গ" শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। মুসলমান-রাজত্বকালে—আল+হ্ = আলহ্ প্রত্যয়-যোগে "বঙ্গালা"<"বঙ্গালহ্" ও আল+ঈ=আলী প্রত্যয়-যোগে 'বঙ্গালী" শব্দ দেশ ও জাতি বুঝাইতে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে।[২] আধুনিক "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী" শব্দ উহাদের বিস্তারিত রূপ। আর, বাঙলা, বাংলা, বাঙালী" আবার "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী" শব্দের হ্রস্বরূপ।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ—পঞ্চম শতকে বাঙলায় আর্যভাষার দ্বিতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। এই দ্বিতীয় প্রবাহ মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ—পঞ্চম শতকে পূর্ব ভারতে যে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত বা আর্য-মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। আয়রঙ্গসুত্ত হইতে জানা যায় যে মহাবীর জিন রাঢ়-স্মহ্নে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রব্রজ্যা ও ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ এদেশে আসেন ও থাকেন। ফলে এতদ্দেশে কালক্রমে জৈনধর্ম ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। "বর্ধমানপুরী, রাঢ়াপুরী, সুব্ভভূমি, বজ্জভূমি" প্রভৃতি জৈনদের স্মৃতিচিহ্ন। বাংলা ভাষায়—স্খলিত হ-ধ্বনি (এথা—হেথা, ওথা—হোথা), শতকিয়ায় ও অন্যত্র (বাহাল্লিশ>বেয়াল্লিশ, বাহান্ন, বাহাত্তর ইত্যাদি); স্খলিত ব-ধ্বনি ও স্খলিত য়-ধ্বনি (খা+আ-খাওয়া, যা+অ=যায়) অর্ধ-মাগধীয় প্রভাবের নিদর্শন। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ল-স্থানে ড় (পয়লা—পয়ড়া, নকুল—নকুড়, অর্গল—আগড়, কুল্যবাপ—কুড়বা), র-স্থানে ল (রাঢ়—লাঢ়—"অহো দুচ্চরলাঢ়ম্—", (আয়রঙ্গসুত্ত) রণ্ডা—লণ্ডা, রেখ—লেখ), শ ও ষ-স্থানে স, ক্ষ-স্থানে কৃখ>খ্খ, ন-স্থানে ণ (কোষ—কোস, শৃগাল—সিগাল—সিয়াল, বক্ষ—বক্খ, বখ্খ ফেন—ফেণ—ফেণা ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। বাংলা নেঙটো—নেঙটা (<নেঙন্ট< নেঙণ্ঠ<নেগ্গণ্ঠ<নিগ্গণ্ঠ<নিগ্রন্থ), গোমড়া (<গম্মড়া<গম্বড়া<গম্বরা< দিগম্বর), গম্ভীর (<গম্বীর<গম্বর<দিগম্বর), ডেক্রা (<ডেগরা<ডেগ্গর< ডিগর্গর<ডিগ্গর্ম্বর<দিগম্বর), ছন্ন (যথা—পাগলছন্ন, মতিচ্ছন্ন), খনা (খঅনআ<খবনই<ক্ষপণক) প্রভৃতি শব্দ জৈনদের অর্ধ-মাগধীরই স্মৃতি। বাঙলার নাথধর্মে কৃচ্ছ্রকায়সাধনের স্থান প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্মেরই দান। "নাথ" শব্দটিও "নিগ্গণ্ঠ নাতপুত্ত" বা "নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃক-পুত্রে"রই স্মৃতি।

(২) দ্বিতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৫ম শতক

২ সংকীর্ণ বা অব্যাপক অর্থে "বঙ্গল—বঙ্গাল" শব্দ কিছু পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাঙলায় আর্য-ভাষার তৃতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। ইহাই আর্য-ভাষার শেষ প্রবাহ। এই প্রবাহকে মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। সম্ভবতঃ ইহা রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে এতদ্দেশে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) তৃতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৩য়—২য় শতক

৫। অতঃপর এই দুই প্রাকৃতের এক মিশ্ররূপ, যাহাতে কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ও তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর শব্দ প্রচুর ছিল, তাহাই প্রচলিত হয়। অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের সহিত মাগধী প্রাকৃতের সৌসাদৃশ্য যেমন যথেষ্ট ছিল, তেমনি বৈসাদৃশ্যও কিছু-কিছু ছিল। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে ষ ও স-স্থানে শ-এর ব্যবহার, ড-স্থানে ল-এর, ণ স্থানে ন-এর ও কর্তৃকারকের প্রথমায় এ-বিভক্তির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। বাঙলায় এই সম্মিলিত বা মিশ্রপ্রাকৃতের পাথুরে প্রমাণ বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় শিলালিপি। ইহার পাঠ :—

(৪) বিমিশ্র প্রাকৃত, খ্রীঃ পূঃ ৩য়—২য় হইতে খ্রীঃ অঃ ৪র্থ শতক ও খ্রীঃ অঃ ৪র্থ—৮ম শতক

"—নেন সবগীয়ান গলদনস দুমদিন
মহামাতে সুলখিতে পুডনগলতে এতং
নিবহিপয়িসতি। সবগীয়ানং চ দিনে তথা
ধানিয়ং। নিবহিসতি দংগাতিয়ায়িকে দেবাতিয়ায়িকসি।
সুঅতিয়ায়িকসি পি গংডকেহি ধানিয়িকেহি
এস কোঠাগালে কোসং ভরণীয়ে।"[১]

এই বিমিশ্র প্রাকৃতের প্রচলনের প্রথম পর্বকাল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ বা তৃতীয় পর্বের স্থিতিকাল। অপভ্রংশ পর্বে ব্যাকরণের চরম বিপর্যয় ও শব্দের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটে। ফলে অক্ষর-প্রকরণে স্বেচ্ছাচারিতার বন্যা বহিয়া যায়। শব্দমধ্যে ও শব্দশেষে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপে স্বরধ্বনির প্রাদুর্ভাব, খ, ঘ, ছ,

(৫) অপভ্রংশ (খ্রীঃ ৮ম—১২শ

১ এতদ্দ্বারা সমস্ত বঙ্গবাসীর করগ্রহণকারী দুমদিন মহামাত্য সুরক্ষিত পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা নির্বাহ করিবেন। উহাদিগকে সেখানে ধান্য দেওয়া হইল। আর্থিক অভাব ইহা দ্বারা দূর হইবে। সচ্ছল হইলে এই কোষাগারের কোষ পুনরায় ধান্য ও অর্থের দ্বারা যেন পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ—মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির হ্-এর পরিণাম, বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ধ্বনিগুলির একাকারত্ব ও (তাড়িত) ড়, ঢ-ধ্বনির বিকাশ অপভ্রংশ-পর্বের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ভাষামধ্যে এই একাকারত্ব বা নৈরাজ্যের প্রতি-রোধকল্পে দেশের সুধী সাহিত্যিকগণ প্রাকৃতের ২য় ও ১ম স্তরের ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অপভ্রংশ-স্তরের "সুঅ"-কে "সুজ্জ" ও "সুজ্জ"-রূপে লিখিতে থাকেন। আবার সংস্কৃত-প্রাকৃতজ্ঞগণ অর্থাৎ উভয়-ভাষা-ব্যবহারকারী পণ্ডিতেরা "সুজ্জ-কে" "সুর্জ্জ"-রূপে উচ্চারণ করিতে ও "সূর্য" লিখিতে শুরু করেন। ফলে নবীন অক্ষর-প্রকরণ ও উচ্চারণ-পদ্ধতি সৃষ্ট হইল। ভাষা সংস্থিতিমূলক হওয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষমূলক হইয়া দাঁড়াইল। ক্রিয়াব বিভিন্ন ভাব ও কাল বুঝাইতে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগে মূল ক্রিয়ারূপ যাহা গঠিত হইতে লাগিল তাহা বিস্তারিত হইল (Periphrastic)। অবশ্য, কাল ও ভাব-রূপ সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি, হয় এক হইয়া গেল, নয়ত লুপ্ত হইয়া গিয়া নূতন চিহ্ন বা শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি এক হইয়া গেল। এইভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার পূর্ব-শাখার উত্থান ঘটিল। প্রকৃতপক্ষে যে-দুইটি উপশাখায় উপবিভক্ত হইয়া এই পূর্ব-শাখা প্রকাশ পাইল সে-দুইটি উপশাখা যথাক্রমে—(১) বিহারী ও (২) বঙ্গীয়। বিহারী উপশাখায় তিনটি উপভাষাগত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল, ফলে, যে-তিনটি উপভাষা ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল তাহাদের পরিচয় হইল ব্রজপুবী বা ব্রজপুরীয়, যাহা পরবর্তী কালে ভোজপুরী বা ভোজপুরিয়ায় পরিণত হয়, মাগধী, যাহা পরে মগহীতে পরিণত হয়, এবং মৈথিলী। বঙ্গীয় উপশাখাও অনুরূপভাবে তিনটি ভাষার লক্ষণ-সমেত প্রকাশ পাইল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যে এই তিনটি ভাষা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের প্রথমটির পরিচয় অহমীয়া বা অচমীয়া, দ্বিতীয়টির পরিচয় ওড়িয়া ও তৃতীয়টির আখ্যা হয় গৌড়ী। পরবর্তী কালে অহমীয়া বা অচমীয়া অসমীয়াতে পরিণত হয় এবং গৌড়ী বাংলায় পবিবর্তিত হয়।

(৬) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে পূর্ব-ভাষার উদ্ভব (খ্রীঃ ১২শ—১৪শ শতক)

৩

বাংলা ভাষার আদিযুগ লিখিত-প্রমাণ-অনুযায়ী ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নিহিত। এই যুগের প্রথম দিকের প্রমাণ ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী কর্তৃক অমরকোষের "টীকাসর্বস্ব" নামক টীকায় উদ্ধৃত কিঞ্চিদধিক তিনশত প্রাচীন বাংলা শব্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি, যথা—অম্বাড>আমড়া, কানাজুঞি<কেন্নু, কিঞ্চোহি>কেঁচো, খস্থ>খোস, খড়কি>খিড়কি, খলি<খইল, খোল; চবডি<চটি, থোট>ঠোঁট, ভাঞ্চি>হাঁচি, পিচ্ছোড়ি>পিঁচুটি, পিম্পড়ী> পিঁপিড়া, বাদিয়া>বেদে, হেণ্ট>হেঁট, বেঙ্গ>বেঙ, বহেড়ী—

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিশিষ্ট লক্ষণ—আদিযুগ

বহডী>বয়ড়া (কৃঃ-কীঃ—বহড়া), চাতিপন্ন>ছাতিম (কৃঃ-কীঃ—ছাতীঅন, ছাঞিঅঁণ), ডহুআ—ডহু>ডা'ক (পাখী) (কৃঃ-কীঃ—ডৌহাকু), নেবালী—নেআরী—নবমালিকা (কৃঃ-কীঃ—নেআলী) ইত্যাদি। এই যুগের শেষদিকের লিখিত প্রমাণ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ইহার ভাষা যেমন একদিকে অসমীয়া ও ওড়িয়ার নিকটবর্তী, তেমনি আবার ভাষাগত পুরাতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রাচীন বাংলার সর্ববিধ লক্ষণযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য স্খলিত হ-ধ্বনি, স্খলিত য়-ধ্বনি ও স্খলিত ব-ধ্বনি (যথা, তেঁহে, তেঁহো, চিআয়িলী, হয়িলী, আইসে, ইত্যাদি), ক-প্রবণতা, ট-প্রবণতা, আ-প্রবণতা, অনুনাসিক-প্রবণতা (যথা—করিবে—করিবেক, পাশক, তাক, তাহাক, তাহাকো, ডৌহাকু, নদীকের, লক্ষকেব, বাটত, ঘাটিয়াল, নান্দ, আঙ্গ, আঞ্চল আতিশয়, দহেঁ, হৈর্তে, তথাঁ, দেখিআঁ ইত্যাদি), ল স্থানে ন (নিব, নিবারেঁ), র ও ড-স্থানে ল (লাচ্ছ, লাঙ্গট), বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণস্বরূপ গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের লোপ ইত্যাদি। বাংলা বাক্যের মাত্রা, "না" "খন", শব্দ-শেষের (মাত্রা) ক; পার্ ধাতু, ডাক্ ধাতু, কাঢ় ধাতু, এড়্ ধাতু, শুধ্ ধাতু, ডুব্ ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। আবার কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দও, যথা, নারাঙ্গ, কামান, মজুর, আফার, বন্দী, গুলাল ইত্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া কাব্যখানি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তুর্কী-আক্রমণের কালের সহিত কাব্যখানির রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ হইতে একশত বৎসরের মধ্যেই, নতুবা, আরবী-ফারসী শব্দ আরও অধিক পাওয়া যাইত। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ওড়িয়ার মত স্বরান্ত উচ্চারণের পরিচয় ও লিঙ্গানুসারী বাক্য-গঠনের উদ্দেশ পাওয়া যায় ("মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে", "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ")। এ ছাড়া কাব্যের ভাষায়—আনুরূপ্য, বিপর্যয়, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, সমাক্ষর-লোপ

(গোআল, রাখোআল, পরকার, বেআকুল, পরচার, তিরী, পত্রাইল) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনও দেখা যায়।*

৪

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগ। এই যুগের প্রথম দিকের সাহিত্যিক নিদর্শন গুণরাজখান বা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরামমঙ্গল পাঁচালী, বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসাবিজয় প্রভৃতি। মধ্যকার সাহিত্যিক নিদর্শন ব্রজবুলী সাহিত্য, চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রভৃতি। শেষদিকের সাহিত্যিক নিদর্শন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি।

মধ্য-যুগ

এই যুগে বাঙলার স্বরান্ত উচ্চারণ স্থলে-স্থলে উঠিয়া গেল, ফলে হসন্ত উচ্চারণ আসিয়া গেল। আদিযুগের অল্প-স্বল্প সন্ধিরূপ বজায় রহিল ও লিঙ্গানুসারী বাক্য-গ্রন্থন-রীতি শ্লথ হইয়া পড়িল। আদিযুগে, একাবলী ছন্দের পাশাপাশি দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, মিশ্র ও অমিশ্র পয়ার ছন্দের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। মধ্য-যুগে বিবিধ পয়ারের পাশাপাশি ব্রজবুলীর মাত্রা-মূলক ছন্দ প্রবেশ করিল। ধ্বনি-পরিবর্তন বলিতে র-স্থানে অ ও অ-স্থানে র-(রাম—আম ; উপকথা—রূপকথা) ধ্বনি দেখা দিল। সাধারণতঃ শব্দের প্রথমাক্ষরে স্বরাঘাত পড়ার রীতি দেখা দিল। স্বরাগম (গোগণ্ড— অপোগণ্ড, স্পর্ধা—আস্পর্ধা, স্ত্রী—ইস্ত্রিরী), প্রগত ও পরাগত সমীভবন (লিপ্তক>লিত্তঅ>লেতা>নেতা, মৌক্তিক>মোত্তিঅ>মোতী), আদিস্বরলোপ (অরিষ্ট—রিষ্টি, উপানহ—পানই), স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (বিশোয়াস, পতিআই), বিপর্যয় (মুকুট—মটুক), স্বরসংগতি (দেখিয়া—দেখে), অপিনিহিতি বা অপিনিধান (দেখিয়া—দেইখ্যা), আনুরূপ্য (ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী, সাপিনী, প্রেতিনী), ধ্বনি-সাঙ্কর্য বা সঙ্করধ্বনি (আগা-গোড়া, ছেলে-পিলে) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তন দেখা দিল।

বিশিষ্ট লক্ষণ

* চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকে নিছক প্রাচীন বাঙলার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা দুষ্কর। ইহার ভাষা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিমিশ্র। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙলা শব্দ যেমন আছে, তেমনি আধুনিক বাঙলা প্রয়োগও কিছু-কিছু পাওয়া যায়। কৃষ্ণাচার্যেরও সরোজবজ্রের দোহাকোষের ভাষার সহিত ইহার ভাষার সামঞ্জস্য প্রমাণ করা কঠিন। বরং চর্যাপদের অপভ্রংশের রূপ আরও পরবর্তী-কালীন। এইরূপ নানাপ্রকারের বিতর্কের বিষয় বলিয়াই উহাকে প্রাচীন বাঙলার নিশ্চিত প্রমাণ বা নিদর্শন বলিয়া ধরা যায় না।

বহুস্থলে যুক্ত-ব্যঞ্জন একক-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হইল (আহ্মি>আমি, তুহ্মে>তুমি. কাহ্ন>কান, জেহ্ন>যেন, চিহ্ন>চেন, চিন ইত্যাদি)। শব্দ মধ্যের ও শব্দান্তের যুগ্মব্যঞ্জনে ম-ধ্বনি থাকিলে তাহা অনুনাসিক ঁ(চন্দ্রবিন্দু)তে পরিণত হইল ; যথা, বাগ্মী>বাগ্‌গী,ঁ লক্ষ্মী>লক্‌খীঁ, লক্ষ্মণ>লক্‌খঁন ইত্যাদি।

মধ্যযুগে বাঙলার উপভাষা ছিল সম্ভবতঃ চারটি, যথা : (১) রাঢ়ী, (২) মধ্যা, (৩) বরেন্দ্রী ও (৪) বঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে আবাব রাঢী, মধ্যা ও বঙ্গালীতেই অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

এই যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতদ্দেশে ব্রজবুলী সাহিত্যের চর্চা। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুব সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্য লইয়া জোর মাতামাতি চলিয়াছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বগামী পদকর্তাদের অনুসরণে ব্রজবুলীতে পদ বচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বগামীদের মধ্যে নরহরি সরকাব, নরহরি চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ দাস, শেখব দাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সার্থকনামা পদকর্তা। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্রজবুলী চিরদিন অটুট-অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। ইহার প্রকৃতি বাংলাব দিকে অবনমিত হইয়া বাংলা-বিমিশ্র হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচুর বাংলা-প্রয়োগ ভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, ব্রজবুলী বাংলায় সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হইয়াই সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল।

বাংলায় ব্রজবুলী সাহিত্য

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, বিদ্যাপতি ঠাকুর, উমাপতি মিশ্র প্রভৃতির ব্রজবুলীর ভিত্তি ছিল কিন্তু ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষার উপর অবহট্টের চটক। বিদ্যাপতি ঠাকুরের শেষদিকের পদাবলীতে মৈথিলীর ঈষৎ মিশ্রণ অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন—"গমায়ঁলুঁ"-স্থানে—"গোঙায়লুঁ"—ইত্যাদি), কিন্তু তাহাই বড় কথা নহে। আর, তাঁহার গোড়ার দিকের রচনা "পুরুষ-পরীক্ষা", "কীর্তিলতা", "কীর্তিপতাকা"-য় অবহট্ট-খচিত যে উপভাষার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লিঙ্গানুসারী বাক্যগঠন ও লিঙ্গপ্রভাবিত ক্রিয়ারূপ দেখিলে তাহাকে পূর্বীহিন্দী-প্রভাবিত ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষা বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে যে-সকল বাঙালী ছাত্র মিথিলায় স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্র শিখিতে যাইতেন তাঁহারা মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলায় বহিয়া লইয়া আসেন এবং বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া দেন। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাপতির পদাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে

এবং লোক-মুখে পদাবলীর অংশ-বিশেষ যেমন বিকৃত হইয়া পড়ে, তেমনি ভাষার আখ্যাটিও বিকৃতি লাভ করে—অর্থাৎ "ব্রজপুরী"-র "পুরী"-অংশটি "বুলী" হইয়া দাঁড়ায় (পু—বু, রী=লী)।*

৫

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ শুরু হইয়াছে। এই যুগের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্যরচনার সহিত বাংলা সাহিত্যে নব ভাব-ধারার উন্মেষ। আরবী-ফারসী ভাষার দীর্ঘকালীন সংস্পর্শের ফলে বাংলা ভাষায় "স্" ও "জ্" (Z)-ধ্বনি (গাছ) সুতলা, বাজে) দেখা দেয়। আবার, ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রভাবে তালব্য "আ" ও "অ্যা" (a)-ধ্বনি বাংলায় দেখা দেয় (রাম, কাল, খেলা, একা)। সর্বত্র অনুনাসিক ধ্বনির প্রভাব প্রচণ্ড হইয়া ওঠে (হাসি—হাঁসি, প্রাচীর—পাঁচীল, ইট—ইঁট, কাচ—কাঁচ, পুথী—পুঁথি ইত্যাদি)। শব্দমধ্যের ও শব্দশেষের মহাপ্রাণধ্বনি সন্নিকৃষ্ট অল্পপ্রাণধ্বনিতে সাধারণভাবে পরিবর্তিত হইতেছে (বাঘ—বাগ, গাধা—গাদা, বহা—বআ, সহ—সও ইত্যাদি)। এ-যুগে প্রচুরভাবে বিচিত্র সঙ্কর-শব্দ প্রচলিত হইয়াছে (হেডপণ্ডিত, রাজা-উজীর, পুলিসসাহেব ইত্যাদি)। এ ছাড়া, আধুনিক বাংলায় প্রচুর জোড়কলম শব্দ (Portmantau) যথা মিনতি=মিনৎ+বিজ্ঞপ্তি ; শব্দমিশ্রণ [Contamination] যথা—আনারস =আনা+রস<আনানস ; লোকনিরুক্তি (Folk-etymology) যথা—উর্ণনাভ<উর্ণবাভ ; মনোরথ<মনোহর্থ ; বিষমচ্ছেদ (metathesis) যথা—সধবা ; যুগ্মপ্রয়োগ (Collocation) যথা—আগাগোড়া, বনবাদাড়, পথঘাট ; দ্বিরুক্ত শব্দ (Doublets) যথা—পাক (ফের), পাক (রান্না) ; চিনি (শর্করা), চিনি (জানি) ; পর-সংগঠন (Back-formation) যথা—গুনগুনানি ; সংক্ষেপিত শব্দ (Clipped words) যথা, অগ্নিবাস (Omnibus)>বাস (Bus) ইত্যাদি পাওয়া যায়। আবার পূর্বী ও বাংলা উপভাষায় অপিনিহিত স্বরধ্বনি অভিশ্রুত (Umlaut)-রূপে উচ্চারিত হইতেছে, যথা, রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখ্যা, লক্ষ>লৈখ্খ>লোখ্খ>লোখ্খো ইত্যাদি। এদিকে প্রান্তিক, রাঢ়ী ও মধ্যায় সমানুপাতে স্বর-

আধুনিক যুগ—
নূতন শব্দ-গঠন ও
বিদেশীয় প্রভাব

* অন্তিম বা নির্বিশেষ বিচারে যে-কোন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যযুগ বা মধ্যপর্ব প্রমাণিত হয় না। বাক্যগঠন-পদ্ধতির দিক দিয়া কেবলমাত্র দুইটি যুগ বা পর্ব দেখা যায়, যেমন একটি প্রাচীন ও অন্যটি নবীন। সুতরাং প্রাচীন ও নবীন যুগ বিভাগই বিজ্ঞানসম্মত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত প্রাচীনযুগ এবং পঞ্চদশ শতক হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নবীন যুগ।

সংগতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, দেখিয়া>দেখে, মাছুয়া>মেছুয়া> মেছো ইত্যাদি। সমাক্ষরলোপও (Haplology) কিছু কিছু দেখা যায় , যেমন, বানি<বানানি।

৬

বাংলা ভাষার শব্দাবলী সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত, যেমন, (১) দেশী বা দেশজ, (২) তৎসম বা সংস্কৃত, (৩) তদ্ভব বা প্রাকৃত ও (৪) বিদেশী। বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর শব্দ বাঙলায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে (ক) আরবী-পার্শী-তুর্কী (খ) ইংরাজী-ফরাসী-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ ভাষা প্রধান এবং (গ) চীনা, জাপানী, মালয়ী, গ্রীক প্রভৃতি অপ্রধান। দেশী বা দেশজ বলিতে প্রাগ্-দ্রাবিড় প্রাগার্য গোষ্ঠী, দ্রাবিড় এবং তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠী বুঝায়।

বাংলা শব্দের শ্রেণী-বিভাগ

দেশী বা দেশজ শব্দের উল্লেখও উদাহরণ আড়, আই ইত্যাদি।[১] তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ লিখিত বা সাধু বাঙলায় মৌখিক অপেক্ষা অনেক বেশী। "তৎসম" শব্দ প্রাকৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া নবীন-ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার দিক হইতে "সংস্কৃত" বলাই সমীচীন বোধ করি। এইরূপ শব্দ যেমন, চন্দ্র, কৃষ্ণ, ইত্যাদি, সমভিব্যাহারে, যৎপরোনাস্তি, এবংবিধ, নচেৎ, নতুবা, কিন্তু, যদ্যপি, অপিচ। "তদ্ভব" বা প্রাকৃত শব্দও বাংলাভাষায় প্রচুর প্রচলিত আছে যেমন, মোতি (মোত্তিঅ<মৌক্তিক), শেয (<শয্যা), বেজ (<বেজ্জ<বৈদ্য), নেকা বা ন্যাকা (<নেআকা< নেআক<নায়ক), শেয়ানা (<শেযান<শ্যেন)। এইরূপ শব্দগুলিকে তদ্ভব অপেক্ষা প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ বলাই সঙ্গত বোধ হয়। তথাকথিত অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ যেগুলি বাংলায় ব্যবহৃত হয় প্রকৃতপক্ষে সে সবগুলিই প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ।

তৎসম ও তদ্ভব শব্দ

বাংলাভাষায় বিদেশী শব্দগুলিকে এককথায় ঋণাত্মক শব্দ বলাই উচিত। মধ্যযুগে আরবী, পার্শী, তুর্কী, তাতারী প্রভৃতি ভাষার নানা ভাব-ও-দ্রব্য-বোধক শব্দ, যেমন,—জমি, কুর্তা, উজবেক্, কাঁচি, কাগজ বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। প্রাচীনযুগে গ্রীক ঋণাত্মক শব্দ, যেমন,—কোণ, সুড়ঙ্গ ও প্রাচীন ইরানীয় কায়েথ (<কষয়থিয়), ঠাকুর (<টক্কর, টাকর), মুচী (<মোচঅ< মোচক), পুঁথি (<পোত্থ<পোস্ত), বন্দী (<বান্দা) বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। আধুনিক যুগে ইউরোপের নানাজাতি বাণিজ্য-ব্যপদেশে

বিদেশী শব্দ

১ ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভারতে আসায় তাহাদেব বিভিন্ন ভাষার নানা শব্দ গ্রহণ করিয়া বাংলাভাষা ধরিয়া রাখিয়াছে,—যেমন,—কোট (<কোর্ট), লাট (<লর্ড), গারদ (<গার্ড), (পাঁউ -রুটি) <পাঁও, তিজেল (হাঁড়ি) <তেজেল, চাবি (<চাভে), মিস্ত্রী (<মেস্‌ত্রে), আলমারি (<আল্-মিরা+আর্মারিও,) চেয়ার, টেবিল (<টেব্ল্), বোর্ড, রিবন, টাইম ইত্যাদি। চীনা, জাপানী ও মালয়ী শব্দও মধ্যযুগে বাংলাভাষায় কিছু-কিছু আসিয়া গিয়াছে, যেমন,—চিনি, লুচি প্রভৃতি চীনা শব্দ; হারাকিরি, মিকাডো, রিকসা, ফুজিয়ামা, কিমোনো প্রভৃতি জাপানী শব্দ; গুদাম, ঘণ্টা, ওবাঙউটান, গণ্ডার প্রভৃতি মালয়ী শব্দ। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের উপভাষার শব্দ—ব্যুমেরাং ও টোটেম, আমেরিকাব আদিম অধিবাসীদের ভাষাব শব্দ—লামা, আলপাকা, মোহক্ ইত্যাদি। জগতের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন উপজাতির ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাব ও উপভাষার এত শব্দ বাংলাভাষায় আসিয়া যুক্ত হইয়াছে যে তাহাদের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান প্রস্তুত কবা রীতিমত গবেষণার বিষয়বস্তু।

৭

বাংলা উপভাষা

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আধুনিক বাংলাব অন্যূন ছয়টি উপভাষা উল্লেখযোগ্য। শব্দবিশেষের উচ্চারণগত পার্থক্য ও ভিন্ন শব্দেব প্রয়োগ, বিভিন্ন শিষ্ট প্রয়োগ, বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবচনের প্রচলন ও ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির দিক হইতে পার্থক্যই উপভাষার লক্ষণ। বাংলার উপভাষা বলিতে (১) মেদিনীপুরেব কথ্যভাষা (২) বাঁকুড়া ও বীরভূমের কথ্যভাষা, (৩) নবদ্বীপ-শান্তিপুরের কথ্যভাষা, (৪) হাওড়া-হুগলীর কথ্যভাষা (৫) কলিকাতার কথ্যভাষা বা জেলা ২৪-পবগনার কথ্যভাষা এবং (৬) মালদহ-দিনাজপুরের কথ্যভাষাই বুঝায়। পূর্ববঙ্গের উপভাষার সংখ্যা আরও অধিক, যথা,—যশোহর-খুলনার কথ্যভাষা, ঢাকা-বিক্রমপুবের কথ্যভাষা, বরিশাল-বাখরগঞ্জের কথ্যভাষা, ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার কথ্যভাষা, চট্টগ্রামের কথ্যভাষা, শ্রীহট্ট অঞ্চলের কথ্যভাষা, মৈয়মনসিংহ অঞ্চলের ও উত্তর বঙ্গের কথ্যভাষা পূর্বোক্ত ছয়টি উপভাষার সহিত যুক্ত হইয়া অন্যূন চৌদ্দটিতে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ রচনাবলী

১

নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত চর্যাপদকে বাংলাকাব্যমহাদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই মনে হয়। এই জাতীয় রচনার ভাবধারা ও কাব্যাদর্শের মূল বাংলার জাতীয় জীবনে কোথায় ছিল তাহা আমাদের নিকট ধারাবাহিকতা-সূত্রে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। সমকালীন যে জীবন-ইতিহাস, ভাষাবিবর্তন ও সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রতিবেশে ইহাদের উদ্ভব তাহার নিদর্শনগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়া অনিশ্চিত অনুমানকে আশ্রয় করিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যধারার উদ্ভব ও দিক্-পরিবর্তনের মর্মরহস্য অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবেন যে চর্যাপদের মত বহুশতাব্দী-প্রসারিত, পরিণত মনন ও মার্জিত প্রকাশরীতিতে বিশিষ্ট ও ধর্মমতবাদের ঐতিহ্যবাহী রচনা স্বয়ম্ভূ হইতে পারে না। ইহার পিছনে একটি সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাস, জনমনের একটা বহু-অনুশীলিত জীবনদর্শন সক্রিয় ছিল। তুর্কীবিজয়ের পর ইহার ধারা যে অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইহার পূর্বে ও পরে, মঙ্গলকাব্য ও রাধাকৃষ্ণকাহিনীর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আবির্ভাব পর্যন্ত, বাঙালী মনের নানা সৃষ্টি-প্রচেষ্টা, বাঙালী ভাবনার নানা আবর্তন, বহু একগোষ্ঠীভুক্ত উপভাষার দ্বিধাজড়িত চর্চার মধ্য দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভাষার অন্বেষণ ও সমস্ত উত্তরাপথ-ব্যাপ্ত সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ যে বাংলা-সাহিত্যের গতিপথকে চিহ্নিত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন মিলিবে। এই নানাশাখাবিভক্ত প্রয়াসের যথাসম্ভব পরিচয় লইলে একদিকে প্রাক্-চর্যাপদীয় যুগের, অন্যদিকে চর্যাপদ হইতে বড়ু চণ্ডীদাস পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী দৃশ্যতঃ বন্ধ্যা অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে নব-প্রস্তুতির অঙ্কুরোদ্গম পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে।

নূতন তত্ত্ব-সন্ধানের গুরুত্ব

২

(ক)—সংস্কৃত

বাঙ্‌লা দেশে সংস্কৃত যে আদি সাহিত্যিক ভাষা ছিল না, তাহার বহু পূর্বে-যে জনসাধারণের কথিত, সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যমর্যাদাসম্পন্ন ছিল ও

চিরস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন মহাস্থানগড় লিপিতে বর্তমান। ইহার সম্ভাব্য কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই প্রাচীন যুগে সংস্কৃতের মহিমা বাঙালী সাহিত্য-চেতনায় ও চর্চায় কোন রেখাপাত করে নাই—দেববাষার বিজয়রথ তখনও পূর্বভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই। প্রাকৃতের সার্বভৌমত্ব তখনও ভারতের সমস্ত অঞ্চলে, যৎসামান্য প্রাদেশিক রূপভেদ সত্ত্বেও, সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক সত্য।

প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা-প্রাকৃত

তাহার প্রায় সাত শতাব্দী পরেই সংস্কৃতের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বাঁকুড়া শুশুনিয়া, ও গুপ্তরাজবংশের সমকালীন লিপিগুলিতে, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে সংস্কৃতেরই প্রয়োগ। বিশেষতঃ ভাস্করবর্মার শাসনখানি রাজ-প্রশস্তিমূলক ও 'কাদম্বরী'-সুলভ অলঙ্কারবহুল, দীর্ঘবাক্যবিন্যাসবদ্ধ রীতিতে রচিত।

তাহার পরবর্তী পাল ও সেনরাজাগণের শাসনগুলিতে সংস্কৃত কাব্যপ্লাবনের অনুপ্রবেশ। ইহাদের উদ্দেশ্য কতক রাজপ্রশস্তি, কতক ইতিহাসবিবৃতি, কতক দেবস্তুতিমূলক হইলেও ইহাদের মধ্যে বাঙালী কবির কবিত্ব-স্রোত অজস্রধারায় প্রবাহিত। বাঙালী যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত রচনারীতিতে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছে ও এই নবার্জিত ধ্বনিবহুল, ও শব্দ ও অর্থালঙ্কারের সার্থক প্রযোগে চমৎকৃতি-উদ্দীপক ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই নিজ অন্তঃসঞ্চিত ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের মুক্তিসাধনায় ব্রতী হইয়াছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ

ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে কৃষ্ণলীলা ও কয়েকটিতে শিবমাহাত্ম্যের সমম্রম উল্লেখ প্রমাণ করে যে বাঙালী কবিরা শুধু সংস্কৃত কাব্যসৌন্দর্যে নয়, হিন্দুধর্মানুগত পুরাণ-চেতনায় ক্রমপ্রাবীণ্যের নিদর্শন দেখাইতেছে। এখানে আমরা একটি আদিতে অনার্য জাতির আর্যসংস্কৃতিতে প্রথম দীক্ষার সূচনা দেখিতেছি। এখানেই বাঙালী কবিরা ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা কাব্যের—বৈষ্ণব, শাক্ত কবিতা ও বিষয়ের নূতনত্ব সত্ত্বেও, মঙ্গলকাব্যের—উপাদান ও মানসিকতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। এখানেই নিজ অন্তরে ভবিষ্যৎ ভক্তিরসসিক্ত কবিতার বীজ বপন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ও কালপ্রবাহবিধ্বস্ত সাহিত্যকৃতির শূন্যতার উপর সেতু-রচনার মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্বসূচনারূপে ভোজবর্মের শাসনে ব্রজলীলার উল্লেখসূচক এই শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য।

জয়দেবপূর্ব কৃষ্ণকথা

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকার:
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধার:।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতার:
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভার:॥

এখানে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপের মিশ্রণ দেখা যায়, এবং চৈতন্যধর্মের কৃষ্ণের পূর্ণাবতারত্ব এখনও অস্বীকৃত রহিয়াছে। অবশ্য যদিও কৃষ্ণের উল্লেখ সময়ের দিক দিয়া অগ্রগামী, তথাপি মনে হয় যে শিবের প্রতি ভক্তিই বাঙালীর অন্তরে আরও গভীরতর ও উচ্চতর কাব্যপ্রেরণার উদ্দীপক। বাধাহীন কৃষ্ণ বাঙালীর অন্তরাকাশে সদ্য উদয়োন্মুখ; শিব কিন্তু মধ্যগগনারোহী সূর্যের মত পূর্ণপ্রদীপ্ত ও ভাস্বর। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে যখন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা বৈদিক ধর্ম ও উপনিষদ্-দর্শনের নিন্দায় মুখর ও পুরাণচেতনার আভাসমাত্র তাঁহাদের ভাবপরিমণ্ডলে অনুপস্থিত, তখন রাজসভার কবিগোষ্ঠী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পুরাণসংস্কৃতির গভীরে আকণ্ঠ নিমগ্ন। বাংলা সাহিত্য এখনও এককেন্দ্রিক, কিন্তু বাঙালী মানসিকতা বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও হিন্দু ভক্তিবাদের মধ্যে স্পষ্টতঃ দ্বিধাবিভক্ত।

শিলালিপি ও রাজপ্রশস্তি

শিলালিপি ও তাম্রশাসন সাহিত্যপর্যায়ভুক্ত নয় ও উহাদের উপলক্ষ্য কবিপ্রেরণার পরিবর্তে ধর্ম ও রাজনীতিসংশ্লিষ্ট অভিপ্রায়। তথাপি উহাদের অতিসংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও ভাবচমৎকৃতি উৎপাদনের লক্ষ্য সুপরিস্ফুট। উহাদের মাধ্যমে তৎকালীন যুগপরিচয় ও কাব্যচিন্তারও নিদর্শন প্রচুর। রাজপ্রশস্তি ও মন্ত্রিসংবর্ধনার অনিবার্য অতিরঞ্জনপ্রবণতার মধ্য দিয়াও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও চরিত্র-উদ্ঘাটনের পরিচয় মিলে।

খণ্ডকাব্যের প্রসার

প্রশস্তিকবিতা ক্রমশঃ শিলা ও শাসনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া খণ্ডকাব্যের উদারতর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রয়োজনের চিহ্ন গৌণ হইয়া কবিমনোভাবের স্বাধীন ও পল্লবিত প্রসারই প্রাধান্য লাভ করিল। বিশেষ প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সাধারণ মহিমাকীর্তনই কাব্যসৌন্দর্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকট হইয়া উঠিল। শ্রীবাচস্পতি কবিকৃত মহামন্ত্রী-ভবদেব-ভট্টপ্রশস্তি হয়ত তৎখনিত সরোবরে স্নানার্থিনী রাঢ়সীমন্তিনীগণের যে মুখসৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছে তাহা আতিশয্যবিড়ম্বিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ একই শ্লোকে রাঢ়সীমান্তের যে জলহীন ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূসংস্থানের উল্লেখ আছে তাহা একটি খাঁটি ভৌগোলিক তথ্যের পরিচয়বহ।

৩

এইবার সংস্কৃত কাব্যচর্চার মাধ্যমে মাতৃভাষাপ্রয়োগবঞ্চিত বাঙালী কবি-মানসের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। অভিনন্দের 'রামচরিত' কাব্য বাঙালী কবির রচনা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে দেবীমহিমার সহায়তায় রামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধজয়বর্ণনাব মধ্যে বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের ভক্তিরসার্দ্র চিত্ত-প্রবণতার পূর্বাভাস আবিষ্কার করা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যটি কিন্তু নিঃসংশয়ে বাঙালী কবির রচনা ও উহার শ্লোকগুলির আদ্যোপান্ত শ্লিষ্টপ্রয়োগ সেই যুগের কবিমানসে রাজপ্রশস্তি ও দেবভক্তিনিবেদনের যুগ্ম প্রেরণার নিপুণ সমন্বয়েব চমৎকার দৃষ্টান্ত। কবি এই উপায়ে শুধু যে স্বর্গমর্ত্য দুইদিকই বজায় রাখিয়াছেন তাহা নহে; রাজমহিমার প্রতি অর্ঘ্যসমর্পণের চিরপ্রথাগত পূজাবিধির মধ্যে নবজাত পুরাণচেতনার ভক্তিনির্মাল্য যে কেমন কবিয়া মিশিয়াছে তাহার ইতিহাসটিও ইহার মধ্যে সঙ্কেতিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যেব উদ্বোধন-শ্লোকেও কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনায় একই গুণবাচক শব্দাবলীর দ্ব্যর্থক আরোপও সমকালীন জনচিত্তে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মেব সমন্বয়াকাঙ্ক্ষা সূচিত কবে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত

কিন্তু সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ভিতর দিয়াই বাঙালীর কাব্যকৌতূহল ও জীবনরসনিষ্ঠতার আশ্চর্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত ভাবধারাই ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা কাব্যের উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রকীর্ণ কবিতার দুইটি সুবৃহৎ সঙ্কলনগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়া দশম হইতে দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী পূর্বভারতীয় কবিগোষ্ঠীর কাব্যচর্চা ও মানসরুচির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাব্যের দিক দিয়া অগ্রবর্তী সঙ্কলনটির নাম 'সুভাষিতরত্নকোশ' (পূর্বনাম 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়')। এই সঙ্কলনের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মাবলম্বী বহু বাঙালী কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বাঙলাদেশ ও সমাজব্যবস্থার সহিত আরও নিবিড়-সম্পর্কান্বিত। সঙ্কলয়িতা শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস লক্ষ্মণ সেনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন ও শ্রীধর নিজেও মাণ্ডলিক শাসনকর্তারূপে সেন-শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সঙ্কলনসমাপ্তির তারিখ ১২০৭ খৃষ্টাব্দ—অর্থাৎ তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পরেই। মনে হয় সে সময় লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপ হইতে পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করিয়া শেষোক্ত স্থানে রাজ্য চালাইতেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক

সদুক্তিকর্ণামৃত

কারণেই এই অতর্কিত বিপৎপাতের কোন ছায়া সঙ্কলিত শ্লোকগুলির উপর নিক্ষিপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর শ্লোকসমূহের শ্রেণীবিভাগ প্রণালী পর্যালোচনা করিলে সমকালীন কবিগোষ্ঠীর বিষয়বৈচিত্র্য ও কাব্যভাবনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ মোট ৪৭৬টি শ্লোক নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে।

অমর প্রবাহ— ৯৫
শৃঙ্গার প্রবাহ—১৭৯
চাটু প্রবাহ— ৫৪
অপদেশ প্রবাহ—৭২
উচ্চাবচ প্রবাহ—৭৬

অমর প্রবাহে নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর, বিশেষতঃ হরগৌরী ও কৃষ্ণবিষয়ক বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলিতে প্রমাণ হয় যে আর্যসংস্কৃতিতে নবপ্রবিষ্ট প্রত্যন্তপ্রদেশ বাঙলা কত অল্পকালের মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীমণ্ডলকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে ও উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিজ কবিকল্পনা ও অন্তরের ভক্তিধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষা ও ঐ দীক্ষায় দ্রুত সিদ্ধিই এই গ্রন্থে বাঙালী মানসিকতার নবপরিচয় বহন করিয়াছে। ইহাতে নারায়ণের দশাবতারপ্রশস্তিজ্ঞাপন ও রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার কলাচাতুরিবর্ণনা জয়দেবের ভারতবিখ্যাত গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রেরণা যোগাইয়াছে এ অনুমান সঙ্গতভাবেই করা যায়। এই প্রকীর্ণ শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতবর্ণিত ঐশী মহিমা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার গোপীনাগর ও রাধাবল্লভ রূপটিই নানা সংক্ষিপ্ত চটুল ইঙ্গিতের সাহায্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সেনবংশের রাজসভায় বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন প্রভৃতি রাজবংশীয় কবিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাধাকৃষ্ণপ্রেমের একটি রসোচ্ছল, প্রাকৃত কেলিবিলাস ও অধ্যাত্মভক্তিদ্যোতনার মিশ্রণগঠিত ভাবাবহ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে রচিত হইতেছে তাহা আমরা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই। গীতগোবিন্দকে একটি রত্ন-প্রবালদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করিলে কোন্ শঙ্খচুর্ণের কণাসমবায়ে ইহা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এই শ্লোকগুলি পড়িলে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাসংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠী—উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন—এই প্রেমারতির উপচার যোগাইয়াছেন, এই পূজার্চনায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়াছেন

অমর প্রবাহ

ও পুষ্পার্ঘ্যের অঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে জয়দেবকে এই রাধা-আরাধনায় প্রধান পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া নিজদিগকে পূজামণ্ডপসজ্জার গৌণ আয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। সখীপরিচর্যায় লালিত বৃন্দাবনলীলার ন্যায়, বাঙলা কাব্যে মিলিত বহু কবির সাধনার ফলস্বরূপ এই প্রেমকাহিনীর গীতসুষমাময় রূপান্তরটি এক আশ্চর্য প্রতিবেশ-দাক্ষিণ্যে, অন্তর-বাহিরের এক অপূর্ব সহযোগিতায়, বসন্তের পূর্ণবিকশিত পুষ্পেব মত বাঙালী মনের নবরসপুষ্ট তরুশাখায় সৌন্দর্যস্বপ্নবৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যে পুরাণমহিমা হইতে প্রাকৃত জীবনরসধারার পথে সঞ্চারিত হইয়াছে, প্রকীর্ণ শ্লোকের মধ্যবর্তিতা তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া মনে হয়। পংক্তিচতুষ্টয়সীমিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে যে ঐশী-বিভূতির চূর্ণরশ্মিটুকু ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভক্তি ও কৌতুকরস এক যৌগিক ভাবসত্তায় সমন্বিত হইয়াছে। ইহাদেব মধ্যে ভক্তির সুপ্রাচীন বৃক্ষকাণ্ডের উপর কৌতুকের কচি পাতা উদ্‌গত হইয়া সূর্যকিরণের আনন্দকে ও বসন্তবায়ুর ক্রীডা-শীলতাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। বিশেষণব্যূহের মধ্যে ঘনবিন্যস্ত পৌরাণিক ভাবগাম্ভীর্য চটুল কটাক্ষময় উপসংহারের প্রাকৃতবস-উদ্দীপনে ভক্তির উপর মানবিক আবেগের জয় ঘোষণা করিয়াছে। সংস্কৃত ধ্বনিপ্রবাহের মেঘমন্দ্রের উপর লঘু-চারিণী বিদ্যুৎরেখা একটি স্মিতহাস্যের প্রসাদদ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে। ভগবান হরির কীর্তি যতই অভ্রভেদী হউক না কেন, এই শ্লোকরচয়িতারা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ব্রজবধূর প্রগল্‌ভতার নিকট নিরুত্তর, তাহার সৌন্দর্য-আবর্ষণের নিকট অসহায় ও তাহার প্রণয়চাতুর্যের নিকট লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িয়াছেন। শ্লোকের উপর শ্লোক স্তূপীকৃত করিয়া তাঁহারা সর্ববিজয়ী ভগবানের এই গোপীবশ্যতার চিত্রটি গাঢবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এই লঘু, প্রেমবিহ্বল রূপের উল্লেখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেখানে সম্ভ্রমই মূল সুর। দশম-একাদশ শতকের প্রকীর্ণ শ্লোকের কবিগণ সম্ভ্রমের এই অখণ্ড স্বর্ণমুদ্রাটি ভাঙাইয়া ইঁহাকে বিবিধ লৌকিক প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য খুচরা রেজ্‌কিতে পরিণত করিয়াছেন ও প্রাকৃত জনসমাজে এই স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিয়া মধ্যবিত্তের জীবনব্যাপারেও মূল্যবান ধাতুর বহুল প্রচার ঘটাইয়াছেন। ইঁহাদের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সম্পর্ক সমাজচেতনায় এক নূতন তাৎপর্যে প্রতিভাত হইল। ইঁহাদিগকে বিদ্যাপতির অব্যবহিত অগ্রজ ও চৈতন্য-প্রেমধর্মের সুদূর সঙ্কেতবহরূপে অভিহিত করা যায়

প্রকীর্ণ কবিতায় রাধা-কৃষ্ণপ্রেম

আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ত ইহাদের কল্পনাবিকীর্ণ ভাবকণিকাসমূহের সঞ্চয়নলব্ধ তিলোত্তমাকাব্যপ্রতিমা।

শৃঙ্গারপ্রবাহের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্লোকগুলি প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের কাব্যসৌন্দর্য ও ভাবচটুলতার রোমন্থন-প্রক্রিয়ার দ্বারা কবিমনে উহার অধ্যাত্ম নির্যাসটুকুর প্রতি সচেতনতা জাগাইতে সহায়তা করিয়াছে। এইরূপে ইহারা রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার লৌকিক ভাবাশ্রয়ের পটভূমিকাটি রচনা করিয়াছে। কৃষ্ণকথার সহিত আলঙ্কারিক প্রণয়কলাপ্রশস্তির সংযোগে প্রেম উহার দৈহিক স্থূলত্ব পরিহার করিয়া এক সূক্ষ্মতর দ্যোতনায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'যঃ কৌমারহর': শ্লোকটির উল্লেখ করা যায়। এই শ্লোকটি এক অসতী নারীর বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থনবিষয়ক হইয়াও প্রতিবেশমাধুর্যের প্রভাবে ও সূক্ষ্ম অতৃপ্তির প্রেরণায় শ্রীরাধিকার সহিত অবস্থা-সাম্যের যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেই ইহা বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডলে উন্নীত হইয়াছে।

শৃঙ্গারপ্রবাহ

মামুলি কবিকল্পনাসৃষ্ট ও অভিজাতসমাজসমর্থিত প্রণয়কাহিনীর আবহাওয়ায় রাধাকৃষ্ণের দিব্যপ্রেমের দৃষ্টান্ত যে কোন মনোভাব লইয়া উপস্থাপিত হউক না কেন, তাহার অনিবার্য ফল হইবে প্রেমধারণার ক্রমবিশুদ্ধিসাধন। যে অভক্ত সেও ক্রমশঃ ভক্ত হইবে, যে ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ সে প্রেমের মহনীয় দিকের প্রতি সচেতন হইবে, যে কবি রাজরুচিতৃপ্তির জন্য কেলিবিলাসবর্ণনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারও কাব্যসরস্বতীর বীণায় উদারতর সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। মর্ত্যসৌন্দর্যপিপাসার স্থূল বৃন্তে দিব্য প্রণয়েব সুরভিকুসুম বিকশিত হইবে। রাধাকৃষ্ণপ্রণয়ের মধ্যে যে তত্ত্বগভীরতা, যে আকাঙ্ক্ষাব আকূতি ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের যে ভোগবিহ্বলতা ও অলৌকিক এষণার নিগূঢ় সহমর্মিতা নিহিত, তাহা সমস্ত লৌকিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যানুভবের সূক্ষ্ম পথে কবি-আত্মার মূল বোধিকেন্দ্রে সংক্রামিত হইবেই হইবে। এই সত্যটি আমরা সে যুগের বাস্তব কাব্যজগতে প্রত্যক্ষ করি। তাই লক্ষ্মণ সেনের বিলাসমগ্ন, কামকলাচর্চাসক্ত রাজসভায় স্বয়ং রাজা হইতে রাজকবিগোষ্ঠী সকলেই কৃষ্ণলীলায় রসবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন ও ভোগসুখপ্রশস্তির মধ্যে তাঁহাদের কণ্ঠে দিব্য উপলব্ধির সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। জয়দেবের কণ্ঠে ত বিলাসকলাকুতূহল ও হরিকথাসরসতা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে মিথিলা রাজসভায় কবি বিদ্যাপতিরও অনুরূপ গোত্রান্তর ঘটিয়াছে। তাঁহার মানসবৃত্তি প্রাকৃতসমাজে প্রস্ফুটিত ফুলের মধুপান করিতে করিতে কখন এক অলৌকিক

প্রেমধারণার ক্রমশুদ্ধিসাধন

লীলাসমুদ্রের গভীরে আত্মবিস্মৃত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এও সেই গ্রাম্য লাম্পট্যের কাহিনী, সেই পল্লীরুচির ইতর ভোগাসক্তি রাধাবিরহের অতল-গভীর লবণ-সমুদ্রের অভিষেকে অভিশাপমুক্ত আত্মার ন্যায় কোন্ এক অচিন্তনীয় দেবলোকের নীলিমায় উধাও হইয়াছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এই বহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য শুধু বিষয়-ব্যাপ্তিতে নয়, আত্মিক বিশুদ্ধিতেও সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

পুরাণকাহিনীর রসানুগত প্রয়োগ ও কৃষ্ণকথার তত্ত্ব হইতে লীলায় রূপান্তর-সাধন ছাড়াও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'—এ বাঙালী কবিমানসের কাব্যপরিধিবিস্তারেব আরও প্রমাণ মিলে। চাটুপ্রবাহে রাজবর্গের প্রতিটি গুণের প্রশস্তি, যুদ্ধবর্ণনা ও ক্ষাত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্বানুকীর্তন, দান, ক্ষমা প্রভৃতি মহৎ বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ প্রভৃতি বিষয়ে রাজচরিত্রমহিমার বিভিন্ন দিকের সহিত কবিগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহাদের কবিতার জীবননিষ্ঠতার নিদর্শন। এই পর্যায়ের শ্লোকগুলিতে অতিরঞ্জন-প্রবণতার সহিত বস্তুগত জ্ঞানের একটি সুষ্ঠু সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। অপদেশপ্রবাহে দেব, জ্যোতিষ্ক, নানা জাতীয় জীবজন্তু, বৃক্ষ-পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। এই পর্যায়ে পূর্বপ্রসিদ্ধির অনুসরণই প্রধান, তথাপি মাঝে মধ্যে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণেরও যে চিহ্ন নাই তাহা নয়। সর্বশেষে উচ্চাবচ প্রবাহে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনের শস্যপ্রাচুর্যসমৃদ্ধ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য, দরিদ্র স্ত্রীর আক্ষেপ ও দরিদ্রগৃহের জীর্ণাবস্থার বাস্তব বর্ণনা পাই। অবশ্য সংস্কৃত দেবভাষার ধ্বনিবহুল, বিশেষণ-ভারাক্রান্ত রাজৈশ্বর্যের মধ্যে দীনের তুচ্ছতা যেন ভাষাবিলাসের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য ক্বচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। শার্দূলবিক্রীড়িত মন্থরগতি ছন্দে শফরী-লম্ফনকথা বিবৃত হইতে দেখা যায়। এই দিক দিয়া সংস্কৃতের কাব্যাদর্শ বাংলার পক্ষে অহিতকরই হইয়াছে—বিষয়ের বাস্তবানুস্মৃতি বর্ণনারীতির অতিস্ফীতিতে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংস্কৃত কবিতার সহিত ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের শব্দ ও ছন্দোবিন্যাসের তুলনা করিলেই নবাগত ভাষাগুলির অধিকতর বিষয়োপযোগিতা সহজেই বুঝা যাইবে। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলা ভাষা সর্বতোভাবে সংস্কৃতরীতি-প্রভাবিত না হইয়া উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাষারূপগুলির প্রত্যক্ষতা ও ভাবানুগামিতার বাগ্‌বিন্যাসছন্দকেই মুখ্যভাবে অনুবর্তন করিয়াছে। কাব্যে বাঙালীর মানসক্রিয়া নিজ অন্তর-উৎসারিত সহজ প্রকাশভঙ্গীর প্রতি উন্মুখতা

জীবননিষ্ঠার নিদর্শন

দেখাইয়াছে। বরং উনবিংশ শতকে গদ্যের কৃত্রিম প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য বাঙালী লেখক সংস্কৃত ও পারসির স্বধর্মবিরোধী শব্দযোজনারীতিকেই প্রথম প্রথম আশ্রয় কবিয়াছে। সংস্কৃত প্রকীর্ণকাবতাসংগ্রহধৃত কবিতাগুলির অধিকাংশই প্রাক্‌মুসলমান ও চর্যাপদের সমকালীন যুগের রচনা। ইহাদের সাহায্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবপ্রসূত দুইটি সমান্তরাল ভাবধাবায় যুগপৎ প্রবাহ অনুমান করা যায়। কিন্তু তুর্কীবিজয়েব অভিঘাত-প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্যে একেবাবে নিঃস্তব্ধ। উমাপতি ধবের একটি শ্লোকে ম্লেচ্ছরাজপ্রশস্তিতে এই নীববতা একবাবেব জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে হয়, কিন্তু ইহা যদি তুর্কবিজেতার স্তুতি হয়, তবে শ্রীধরদাস ইহা তাঁহার সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করিবেন কেন?

অন্যান্য সংস্কৃত রচনার মধ্যে গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' আদিরসাত্মক খণ্ডকবিতার সমষ্টি। ইহাতে কবি যে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ভাষারীতির মধ্যে তির্যকব্যঞ্জনাগুণেব পার্থক্যসম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাহা স্বল্পাক্ষর অর্থগূঢ়তায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

> বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
> নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলং ॥

প্রাকৃতেব রস সংস্কৃতে প্রকাশচেষ্টা যেন যমুনার নিম্নপ্রবাহিনী জলকে আকাশে ওঠানোব মত অসাধ্যসাধন। অভিজাত ও লৌকিক ভাষার এই বিভেদজ্ঞানই বাংলার নিজস্ব রীতি-উদ্ভাবনের মূল প্রেরণা যোগাইযাছে। বারাঙ্গনার বঙ্কিমচরণক্ষেপের যে লাস্যভঙ্গী তাহাও কবি নিপুণ বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন :—

আর্য সপ্তশতী

> ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারং।
> ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি ॥

সাধারণতঃ আদিরসপ্রিয় সংস্কৃত কবিগোষ্ঠী অসতী রমণীর রূপবর্ণনায় যেখানে বিহ্বলচিত্ত হইয়া নীতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান, গোবর্ধন সেই রূপবিলাসিনীকে সরাসরি ডাকিনী-অপবাদে কলঙ্কিত করিয়া ও গ্রাম্যশাসনবিধিতে দণ্ডনীয়রূপে দেখাইয়া তাহাকে সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে সমাজলাঞ্ছনার কঠোর ভূমিতলে অবতরণ করাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে জয়দেবের প্রশংসাবাণীর—শৃঙ্গাররসের সৎ ও প্রমেয় রচনায় গোবর্ধন তুলনারহিত এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। কবির উদ্দেশ্য যে সৎ অথবা নীতিসমর্থিত ও তাঁহার বর্ণনা যে আতিশয্যহীন এই শ্লোকটিই তাহার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ধোয়ীর 'পবনদূত' দূতকাব্যরূপে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর সার্থক অনুসরণ ও 'গীতগোবিন্দ'-এর পরে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠালাভে ধন্য। কালিদাসের যক্ষবর্ণিত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত যাত্রাপথ—সৌন্দর্যপরিচয় এই কাব্যে দাক্ষিণাত্য হইতে নবদ্বীপ-ভ্রমণের মধ্যবর্তী ভূভাগের প্রাকৃতিক আকর্ষণের বৃত্তান্তে অনুকৃত হইয়াছে। পরবর্তী কবির বাস্তব চেতনা যে বহু শতাব্দীর ব্যবধানে তীক্ষ্ণতর হইয়াছে ও তাঁহার কল্পলোককল্পনায় ভারতের ভৌগোলিক সত্তা যে আরও সত্যতররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের সহিত তুলনায় বাঙালী কবির ভাবপরিবেশ এতটা সার্বভৌমতাৎপর্যমণ্ডিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার কল্পনার রথ মাটির আরও কাছাকাছি আসিয়াছে। সুহ্মদেশের গঙ্গাজলবিধৌত স্নিগ্ধতা ও উহার ব্রাহ্মণগৃহিণীদের শশিকলানিভ কোমল তালীপত্ররচিত কর্ণাভরণ বাস্তব সত্যের সার্থকতর পরিচয় বহন করে—উজ্জয়িনী-সৌন্দর্য ও দশার্ন গ্রামের শ্যামশ্রীর মত সম্পূর্ণভাবে কাব্যরমণীয়তার আদর্শানুসারী নয়। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণমহিলাদের বিশেষ উল্লেখ তাহাদের দারিদ্র্য ও সুকুমার রুচি উভয়েরই ইঙ্গিত দেয়। ব্রাহ্মণীদের যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না—শ্রেষ্ঠীপত্নীদের যত রত্নাভরণ পরিবার তাহাদের সঙ্গতি নাই। সুতরাং কচি তালপাতা দিয়া তাহারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে বাধ্য হয়। আর একটি শ্লোকে বাঙালীর সৌন্দর্যসাধনারত, সৎসঙ্গ-উৎসুক, রাজদরবারে স্বীকৃতিকামী ও ভক্তিপ্রবণ জীবনাদর্শের ছবিটি—তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধক সত্য শিব ও সুন্দরের আরাধনায় উৎসর্গিত জীবনচর্যার অভীপ্সাটি—গভীর আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে।

পবনদূত ও গীতগোবিন্দ

লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী আদিরসের লীলাক্ষেত্র, কবিকল্পনার কল্পলোক, এখানে নীতির প্রশ্ন হয়ত অবান্তর। কিন্তু প্রেমবর্ণনায় যেখানে অশালীন আতিশয্য বা স্থূল রুচির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে কল্পলোকসৃষ্টিতেও বাস্তব জগৎ হইতে উপাদান-সংগ্রহ অনিবার্য, যেখানে প্রাচীন প্রথা ঘটমান জীবনের আশ্রয়ে নব মূর্তিতে প্রতিভাত হয়, সেখানে রুচি-শিথিলতার নিদর্শনগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। বিশেষতঃ যেখানে অচিরকাল মধ্যে ইতিহাসের অভিশাপ আকস্মিক বজ্রপাতের মত বাঙলার ভাগ্যাকাশকে বিদীর্ণ করিয়াছে, সেখানে বিলাসকলা ও প্রমোদ-ব্যসনের আতিশয্য-আড়ম্বরের মধ্যে আসন্ন বিপদের পূর্বসঙ্কেত আবিষ্কার করা অস্বাভাবিক নয়। হয়ত লক্ষ্ণৌ-এর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের

লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর রুচিশিথিলতা

ব্যসনাসক্তি তাঁহার পূর্বপুরুষের ধারারই অনুসরণ, কিন্তু যখন রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছে তখন এই প্রবণতাকে শোচনীয় পরিণতির সহিত কার্যকরণসম্পর্কিত করিয়া দেখা অনেকটা অনিবার্যই মনে হয়। হয়ত কালস্রোতে ক্ষয়িতমূল বাঙলার রাষ্ট্রবনস্পতি বহুদিন হইতেই পতনোন্মুখ ছিল, কিন্তু যে ঝড় উহার পতনের অব্যবহিত কারণ তাহার অভ্যাগম সম্পর্কে আবহতত্ত্বের সন্ধান লইতেই হয়।

৪

(খ)—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট সাহিত্য

কিন্তু উদীয়মান, নব প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, নব মনোভূমিতে রসান্বেষী বাংলা ভাষার নিকটতর সম্পর্ক হইল প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট ভাষায় লিখিত কাব্য-গোষ্ঠীর সহিত, অতীতাশ্রয়ী, প্রথাবন্ধনজর্জর, নূতন যুগমানসের পরোক্ষবার্তাবহ সংস্কৃতের সহিত নয়। যখন প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির উদ্গাতাগণ সংস্কৃতের ভিতর দিয়া পুরাণচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন বাস্তব জীবনের রসধারা এই সমস্ত লৌকিক ভাষার মাধ্যমে জনচিত্তে প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে কাব্যের উপাদানে রূপান্তরিত করিতেছিল। অবশ্য সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ক্ষীণ প্রণালী বাহিয়া এই জীবন-কৌতূহলের কিছুটা সাহিত্যে সংক্রামিত হইতেছিল। তথাপি সংস্কৃতের গৌরব যে অতীতচারী ও উহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নয়, এই প্রতীতি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতা ছাড়া সকলেই প্রায় উপলব্ধি করিয়াছিল। বৌদ্ধসাধকেরা ধর্মপ্রচার ও তত্ত্বব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও নবোদ্ভিন্ন বাংলাভাষার আশ্রয় লইতেছিল। কৃষ্ণকথা, ভাগবতধর্ম ও বর্ণসঙ্কর দেবদেবীপ্রশস্তি ক্রমশঃ বাংলার মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া যাঁহারা সংস্কৃতে লিখিতেন তাঁহারাও এই দেবভাষার মধ্যে কতটা যথার্থ কাব্যপ্রেরণা লাভ ও ভাবোল্লাস অনুভব করিতেন তাহাও সন্দেহস্থল। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ-এ সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে উদ্বেলিত ভক্তি ও সৌন্দর্যমিশ্র আবেগের মুক্তি দিবার জন্য শব্দগ্রন্থন, ছন্দো-হিল্লোল ও সঙ্গীতময়তার অন্তঃস্পন্দ সবই জনমানসের ভাবপ্লাবিত অপভ্রংশের নৃত্যচঞ্চল গতিসুষমা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্কৃষ্ণ, বহির্গৌর দ্বৈতরূপের ন্যায় জয়দেবের কাব্যের বাহিরে সংস্কৃতের সম্ভ্রান্ত আবরণ, ভিতরে প্রাকৃত আবেগের দুরন্ত কল্লোল। বাঙালী কবিমন আর দেবভাষার সংবৃত

বাঙালী অন্তরের প্রাকৃতপ্রবাহ

মহিমায়, ভাগবতের শ্লোকগাম্ভীর্যরচিত দুর্ভেদ্য অন্তরালবর্তিতায় সন্তুষ্ট নয়, তাহা মেঘদর্শনোৎফুল্ল ময়ূরের মত শতবর্ণ কলাপবিস্তারে ও অভিরাম নটনভঙ্গীতে নিজ অধীরমুখর আত্মাকে প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। গীতগোবিন্দ যেন সংস্কৃত লিপিতে উৎকীর্ণ দেবভাষারই অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত সমাধি—তাজমহল রচনা করিয়াছে। উহার পরেও অবশ্য—চৈতন্যযুগে নবোৎসারিত ভাবানুভূতির প্রেরণায়—সংস্কৃত সাহিত্যের সাময়িক পুনর্জন্ম হইয়াছে; চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলার যুগপৎ প্রবাহে বাঙালী চিত্তে যে ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ার জাগিয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ধারায় ক্ষণমুক্তি লাভ করিয়াছে। ভাবেব তুঙ্গতা ভাষামহিমাকে স্বভাবতঃই পুনরামন্ত্রণ জানাইয়াছে। তথাপি চৈতন্যলীলাকীর্তনে সংস্কৃতের অংশ গৌণ; পার্বত্য নির্ঝরিণী যেমন সমতলপ্রবাহিনী নদীকে পুষ্ট কবিয়া তাহাতেই মিশাইয়া যায়, তেমনি সংস্কৃত রচনাগুলি বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও মহাজন পদাবলীর আবির্ভাব সম্ভব করিয়াই নিজ-স্বতন্ত্র মর্যাদা বিসর্জন দিয়াছে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নবযুগের প্রতীক অর্জুনের নিকট দিব্যাস্ত্র সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নেপথ্যচারী হইয়াছে।

এই লৌকিক ভাষাসমূহে কবিতার মধ্যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের প্রাকৃত রূপটি তির্যক-কটাক্ষসংবর্ধিত হইয়া জনচেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। হালের 'গাথাসপ্তশতী' কালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী! ইহার রচনাকালের শেষ সীমা প্রথম শতাব্দী খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত হইলে ইহা বাংলা ভাষা উদ্ভবের বহুপূর্ববর্তী রচনা। ইহার দুইটি শ্লোকে (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গোপসমাজের স্থূল পরিবেশে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কৃষ্ণ মুখমারুতের দ্বারা 'রাহিআএঁ' চক্ষে প্রবিষ্ট গোক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা অপসারণ করিয়া অন্যান্য গোপীগণের ঈর্ষ্যা উৎপাদন করিতেছে। দ্বিতীয়টিতে যশোদার চক্ষে কৃষ্ণের অনতিক্রান্তবালস্বভাবে অধিষ্ঠান কটাক্ষে কৃষ্ণমুখপ্রেক্ষিণী গোপীগণের গোপন হাস্য উদ্রেক কবিয়াছে। অর্থাৎ

গাথাসপ্তশতী

কৃষ্ণ যে আর ননীচোরা দামোদর নাই, সে যে গোপীদের সহিত প্রেমচর্চানিপুণ হইয়াছে যশোদার এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা গোপীদের হাসির খোরাক যোগাইতেছে। এই দুইটি পদের মধ্যে কোন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা নাই। ইহারা প্রাকৃত আকর্ষণেরই পরিচয় দিতেছে। এই দুইটি শ্লোক প্রমাণ করে যে ভাগবত রচনার বহু পূর্বে কৃষ্ণের লৌকিক নাগরালির নায়করূপে খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হয়ত কৃষ্ণলীলার এই

জনসমাজপ্রচলিত লৌকিক বৃত্তান্তটিই তাঁহার ঐশী মহিমাপ্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী। গঙ্গাদাসের 'চন্দোমঞ্জরী' হইতে উৎকলিত বহুপরবর্তী আর একটি অবহট্ট-রচিত শ্লোকে (ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৯-এ উদ্ধৃত)

রাঈ দোহড়ী পরণ সুনি হসিউ কণ্‌হ গোআল।
বৃন্দাবনঘনকুঞ্জঘর চলিউ কমণ রসাল॥

কবিতাটি একেবারে আমাদিগকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাবপরিমণ্ডলে সোজা পৌঁছাইয়া দেয়। প্রথমতঃ বাধা কর্তৃক ছড়ার আবৃত্তি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রবাদবাক্য-প্রাচুর্যের প্রয়োগরীতিটির পূর্বাভাস। দ্বিতীয়তঃ 'কণ্‌হ গোআল' কৃষ্ণের সমস্ত দেবমহিমা অস্বীকার করিয়া তাঁহাব গ্রামতরুণসুলভ অমার্জিত প্রকৃতিটির পরিচয় বহন করে। কৃষ্ণের হাসিটিও তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞতার নিদর্শন। 'কমণ রসাল' বাক্যাংশটি তাঁহার সুলভ আত্মতৃপ্তিসূচক রসবিহ্বল পদক্ষেপের ইঙ্গিতদ্যোতক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বাভাস

ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ধার শিলালিপিতে অবহট্টের মাধ্যমে সর্বভারতীয় পবিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সৌন্দর্যরুচির একটি কৌতুককর তুলনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতীয় ঐক্য শুধু ধর্মব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল না, রূপপ্রতিযোগিতা-বিষয়েও বিভিন্ন প্রদেশের একটি মিলনক্ষেত্র ছিল। এখানে প্রত্যেক প্রদেশের সুন্দবীনারীসংগ্রাহক আপন আপন রাজ্যের নারী-সৌন্দর্যেব শ্রেষ্ঠতা সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়া ও অন্যান্য রাজ্যের রুচির প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ করিয়া বাস্তবরসস্ফুরণের এক অপূর্ব পরিচয় দিয়াছে। প্রায় সমকালীন ইংরাজ কবি চসারের তীর্থযাত্রীদের বর্ণনার মত এই পরিকল্পনাটিও ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসাধনকলা ও রূপাদর্শের পার্থক্যের ও মেজাজ-বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। কেশর৲নার বিভিন্ন ছাঁদ, অলঙ্কারসজ্জার রীতিবিভেদ ও কাব্যোচ্ছ্বাসের আপেক্ষিক পরিমাণ লইয়া ইহাদের আকর্ষণ-তারতম্য নির্ধারিত হইয়াছে। অঙ্গসৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা বিশেষ নাই, তবে উপমাসাহায্যে কবির মানস উত্তেজনার পরোক্ষ প্রকাশ অনুমান করা যায়। কোন সুন্দরীর ওষ্ঠাধরপ্রান্ত জুঁই ফুলের ন্যায়; কাহারও বা স্তনদ্বয়ের রক্তিম উচ্চতা; টাক্কযুবতীর দোরঙা কাচলি যেন সন্ধ্যার সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলন, আর ঘাগরা ও ওড়না কর্ণাটসুন্দরীর কাছাকোঁচা-দেওয়া পরিচ্ছদকে লজ্জা দেয়। বঙ্গকিশোরীর টেঁড়িকাটা কেশবিন্যাস, খোঁপার উপর অলঙ্কার যেন রাহুগ্রস্ত রবি-ছবি, কর্ণভূষণ তাড়িপাত, রোমাবলী-

সংসক্ত সূতার হার যেন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ন্যায় বর্ণবৈপরীত্যে শোভমান; পরিধান-বস্ত্র কিন্তু শ্বেতবর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বাঙালী মেয়ের রুচিবৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। ইহার পর মালবজাতীয় রূপবণিক্ গৌড়ীয় ব্যবসায়ীকে যে ব্যঙ্গ করিয়াছে তাহাতে কি বাঙালী সম্বন্ধে অন্যপ্রদেশবাসীর ধারণার যথার্থ প্রতিফলন হইয়াছে? গৌড়ীয়ের কোপন স্বভাবের জন্য সকলেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জন করে। এই উদ্ধৃতিতে মধ্যযুগপ্রারম্ভের কয়েকটি বিচিত্র রূপচিত্র, ভারতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে রীতি-আচার-সংস্কৃতির ঐক্যটি বর্ণাঢ্য রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই পদগুলি পড়িয়া মনে হয় যে প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভবের পূর্বে সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত-অপভ্রংশের আশ্রয়ে আমরা পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার পথে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম, প্রাদেশিক সাহিত্যচর্চার ফলে সেই সার্বজনীন বোধগম্যতা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছি। বিশেষতঃ প্রাকৃতের মাধ্যমে আমাদের মনে যে বস্তুরসের স্ফুরণ হইয়াছিল কৃত্রিম আদর্শ অনুসরণের ফলে আমাদের উচ্চচিন্তা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অতিলালনের জন্য তাহার সহজ প্রবাহ যে অনেকটা অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য।

প্রাকৃতে বস্তুরস-স্ফুরণ-নিদর্শন

অবহট্টে লেখা দোহাকোষগুলি চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক ও প্রায় একই কবিগোষ্ঠীরচিত। ভাষার দিক দিয়া ইহা চর্যাপদের ভাষার কিঞ্চিৎ পূর্বরূপ ও বাংলাপূর্বাভাসরিক্ত। কিন্তু উহার রচনাভঙ্গী ও সাধনাতত্ত্ব অভিন্ন। সুতরাং উহাদের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুভঙ্করীর আর্যা ও ডাকের বচনে অবহট্টের কিছু কিছু চিহ্ন ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষিত হইয়াছে। কিছু প্রহেলিকা-রচনায় ও অর্থহীন বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও সংস্কৃত, অবহট্ট ও বাংলার কৌতুককর সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোটকথা, কবিরা যে ভাষানৈরাজ্যের যুগে বাস করিতেন ও বাগ্‌বিশৃঙ্খলার যদৃচ্ছ বিন্যাস হইতে তাঁহারা যে কৌতুকরস আহরণ করিতেন তাহাও এই যুগের রচনায় অনুভূত হয়।

অবহট্ট

৫

'প্রাকৃতপৈঙ্গল'—এর সঙ্কলনকাল চতুর্দশ শতকের কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা মুসলমান-বিজয়ের পরের সঙ্কলন; কিন্তু উহাতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ববর্তী রচনাই সংগৃহীত আছে। কালের দিক হইতে ও যুগোচিত কবি-প্রেরণার নিদর্শনরূপে ইহা 'সুভাষিতরত্নকোশ' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে কিছুটা

কম মূল্যবান। কিন্তু ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দোরীতিমুক্ত নবোদ্ভিন্ন বাংলা কোন্ নূতন জীবনক্ষেত্র লইতে রস আকর্ষণ করিতে উন্মুখ ছিল ও কেমন করিয়া উহার সংস্কৃত-অনুকৃতিশ্লথ, প্রথাজীর্ণ ধমনীর মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যের কৌতূহল, ভাবানুগামী ভাষারীতির নমনীয়তা ও বিপুল ছন্দোল্লাস নবরক্তধারার ন্যায় সঞ্চারিত হইতেছিল। পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যের পুরাণানুবর্তিতা, উহায় সংস্কৃত-আধিপত্যের পুনঃস্বীকৃতি ও ধর্মাদর্শনিয়ন্ত্রিত জীবনবিমুখতা উহার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃতের সহিত অন্তরঙ্গ যোগ উহার সর্বভারতীয় সম্পর্কটি স্ফুটতর করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কিয়ৎ পরিমাণে অবদমিত করিয়াছে। যদি প্রাকৃতের রসধারাটি বাংলায় অক্ষুণ্ণ থাকিত, তবে বাংলা কবির প্রত্যক্ষদৃষ্টি স্মৃতিকল্পনার ছায়াপাতে স্তিমিত হইত না, মঙ্গলকাব্য পুরাণের অনুকরণে নিজ অনুভূতিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিত না বা বৈষ্ণব পদাবলীতে বৃন্দাবনলীলার ভাবাসঙ্গস্নিগ্ধতায় বাঙলার নিসর্গদৃশ্যের বাস্তব প্রখরতা গোধূলিম্লান বা কল্পলোকভাস্বর হইত না। তাহা হইলে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বরগুপ্ত ব্যতিক্রম না হইয়া নিয়মই হইতেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্বর্গেমর্তে শুধু ভাবের মিলন না হইয়া রূপেরও সমীকরণ সাধিত হইত। সাহিত্যে সরসতা কেবল আদিরসসম্পর্কিত কষ্টকল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকিত না; জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর-বিকীর্ণ হইত, শুধু আনুবীক্ষণিক দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিত না। বাহির হইতে সৌন্দর্যবোধ-আহরণের ফলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাও তুচ্ছ নয়। এই মিশ্র সংস্কৃতির কৃপায় আমরা সাহিত্যসম্রাট ও কবিসার্বভৌমকে পাইয়াছি, কিন্তু এই মুষ্টিমেয়-সংখ্যক কোটিপতি পাওয়ার জন্য আমাদের অসংখ্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সহজ শ্রী ও সচ্ছলতা বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের গুরুত্ব

এইবার 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর কবিতাগুলির একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রেম ও প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতাই ইহাদের মধ্যে প্রধান। প্রেমকবিতাগুলি সংস্কৃত আদর্শে কল্পিত, কিন্তু উহাদের শব্দবিন্যাসে ও ছন্দপ্রবাহে সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর, সমাসসন্ধিব্যূহবদ্ধ দীর্ঘবাক্যযোজনার পরিবর্তে পাই বর্ণনার সৌকুমার্য ও সূক্ষ্ম আকৃতির সঙ্গীততরঙ্গিত প্রকাশ। প্রকৃতিবর্ণনার আবির্ভাব প্রায় প্রেমের অনুষঙ্গরূপে, কিন্তু তাহাতেও গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্তের ঋতু-আবেদনের

সহিত অন্তরানুভূতির স্পন্দনটি একটি অপূর্ব রাসায়নিক সংযোগে মিশিয়াছে ও দুইএ মিলিয়া একটি যৌগিক ভাবাবহসত্তা সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের রচনাবৈশিষ্ট্য

এই কবিতাগুলি যে বিদ্যাপতির পদাবলীর পূর্বসূচনা ও প্রত্যক্ষ প্রেরণাদাতা তাহা আমরা সহজেই অনুভব করি। ইহাদের মধ্যে জয়দেবের শব্দৈশ্বর্য ও সঙ্গীতঝঙ্কারমুখরতা বা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রত্যক্ষ-দর্শনের আলঙ্কারিকরীতিপ্রভাবিত উদ্বর্তিত শিল্প-রূপ নাই। সহজ অনুভব ও সাবলীল প্রকাশ ইহাদের মধ্যে একটি অনায়াসসিদ্ধ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই সুর শোনা যায়। কিন্তু অধ্যাত্মব্যঞ্জনার চাপা সুর ও ভক্তিরসের সর্বব্যাপ্ত গাঢ়তার জন্য এই ধ্বনির মধ্যে এক নিগূঢ়তর অনুরণন ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করিয়া অনির্দেশ্য রহস্যবোধের আকুলতা জাগায়।

কৃষ্ণকথা সম্বন্ধেও বাঙালীর জ্ঞান ও অনুরাগ যে বাড়িতেছে তাহারও নিদর্শন সঙ্কলন-গ্রন্থটিতে মিলিবে। কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের যে অপৌরাণিক কাহিনী তাহাও যে আদিরসমিশ্র ভক্তিরসের লৌকিক কল্পনা-উদ্ভাবিত হইয়া রাধাকৃষ্ণলীলার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা আমরা এখানে জানিতে পারি। সম্ভবতঃ প্রাকৃতরুচি-কল্পিত এই আখ্যানটি এই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকা-কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণকথার অভিজাত সংস্করণ উন্নত ভাবাদর্শের সহিত নৃত্যগীতসমন্বিত চটুল-তরল প্রণয়মুগ্ধতায় সংমিশ্রিত হইয়া 'গীতগোবিন্দ'-এ এক পল্লবিত কাব্যরূপ ও নাট্যসঙ্কেতময় ঘটনাবিস্তারের পরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানে প্রাকৃত রসাকুলতা কাব্যমহিমার গুণে মর্যাদার তুঙ্গ শৃঙ্গে আরূঢ় হইয়াছে ও এক লঘু আসক্তির গীতিউচ্ছ্বাসময় কাহিনী সর্বভারতীয় শাশ্বত ভক্তি ও সৌন্দর্যের স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছে। আর প্রাকৃত কাহিনীটি স্থূল রুচি ও ভোগলালসার কলঙ্কচিহ্ন সর্বাঙ্গে বহন করিয়াও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে নায়িকার বিরহবেদনার মর্মভেদী তীব্রতায় এক বিশুদ্ধতর সত্তায় উদ্বর্তিত হইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলে কৃষ্ণকথা

চৈতন্যপূর্ব যুগে এই দুইখানি কাব্য রাধাকৃষ্ণসম্পর্কের দুইটি ধারার উন্নততম প্রকাশরূপে প্রতিযোগী গৌরবে অধিষ্ঠিত। তাহার পর চৈতন্য-প্রভাবের ফলে যখন এই প্রেম-কাহিনীর অধ্যাত্মীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন প্রাকৃত ধারার মলিন-প্রবাহ ভাগবতী চেতনার দিব্য জ্যোতিঃসমুদ্রে বিলীন হইয়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গল-এর কৃষ্ণবন্দনার মধ্যে-শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপের মধ্যে কবিচেতনায় কোন তারতম্যবোধ লক্ষিত হয় না—শক্তির দুর্ধর্ষতা ও প্রেমের

স্নিগ্ধতা উভয় উপাদানই তাঁহার অলৌকিক বিভূতির মধ্যে তুল্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবানের চাণুর-বধের দ্বারা নিজকুলের কীর্তিপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার ভ্রমরবরের ন্যায় রাধামুখমধুপান একই লীলাসূত্রে গ্রথিত। এই ঐশ্বর্যমাধুর্যের সমন্বয়ে ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দসঙ্গীতের তরঙ্গিত গতিতে জয়দেবের সহিত সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। তবে কবি জয়দেবের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার উপাদান নাই।

ঐশ্বর্য-মাধুর্যের সমন্বয়

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতায় শান্ত, পরিতৃপ্ত গৃহজীবনের যে কয়েকটি চিত্র পাওয়া যায়, তাহা প্রাক্-তুর্কী-বিজয় যুগের সন্তোষ-সচ্ছলতাময়, নিরুদ্বেগ, নীতি-সংযত গার্হস্থ্য পরিবেশেরই সঙ্কেত বহন করে। যে সমাজের আশ্রয়ে এইরূপ জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইয়াছে তাহার উপর দিয়া কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসকারী ঝটিকা যে বহিয়া যায় নাই, এ' বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়। বহু শতাব্দীর জীবনচর্যার নিয়মিত ছন্দ, পুরুষপরম্পরা-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুনিশ্চিত প্রত্যয়বোধ এই পংক্তিগুলির মধ্যে গতির মসৃণতা ও শান্তরসের স্থিরতা সঞ্চার করিয়াছে। এখানে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সমস্ত অশান্ত বিক্ষোভ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জীবনরসের পরিহাসস্নিগ্ধ উপভোগও এখানে মানস-শান্তির পরোক্ষ প্রমাণরূপে অনুপস্থিত নয়।

প্রাক্-তুর্কী যুগের নিদর্শন

এই রচনাগুলিকে যদি মুখ্যতঃ চর্যাপদের সমকালীন বা অল্প পরবর্তীরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীর ভারসাম্যবিপর্যয়ের কোন লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইবে। তাহা হইলে চর্যাপদ ও বিদ্যাপতি-বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে ব্যবধানকালে বাঙলার কবিমানস কিরূপ সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল তাহার ইতিহাস অনুমানগ্রাহ্যও হইবে না। মুসলমান-অভিভবের অব্যবহিত পরে যে রাজনৈতিক উৎপীড়ন ও সাংস্কৃতিক উন্মূলন বাঙালী জাতিকে দিশাহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল সেই বিরাট শূন্যতাবোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতি কি নূতন আশ্রয় খুঁজিয়াছিল তাহা আমরা জানি না। অবশ্য ইহার পরবর্তী যুগের ইতিহাস পুরাণের অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্যের নবধর্মরচনার প্রয়াসের মধ্যে নিজ স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম বিপর্যয়-যুগের কোন নিশ্চিত উপকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে কি না সন্দেহ। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ ও বিহারজয়ের প্রায় দুইশত বৎসরের পর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে।

রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি

দাবানলবেষ্টিত আরণ্য পশু-পক্ষীর ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতের প্রথম বিহ্বল, বিমূঢ় ক্ষণে ত্রস্তভীত বাঙালী পলায়নে আত্মরক্ষা খুঁজিয়াছে—তাহার পুঁথিপত্র ও ধর্ম-আচার লইয়া সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইয়াছে। তাহার এই আপৎকালীন আশ্রয়স্থলের মধ্যে নেপালের হিন্দুরাজদরবারই তাহাকে প্রধানতঃ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছে এবং সেই নেপালদরবার হইতেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার ন্যস্ত সাহিত্য-সম্পদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশে হিমালয়পাদদেশের দুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রাচীনতম বাংলা পুঁথির অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারই বিপদের গুরুত্ব ও ভীতির দূরপ্রসারী পরিধির পরিমাণ। হিমালয়শীর্ষে সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল-প্রাপ্তির ন্যায়ই সমতল। নদীমাতৃক বাঙলার মানস ফসলের নেপালপার্বত্যঅঞ্চলে সংরক্ষণ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজগত ভূমিকম্প-আলোড়নের প্রচণ্ডতার পরিচয়বাহী।

যুদ্ধাদি বর্ণনার চিত্র

অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের কিছু উল্লেখ ও বর্ণনাত্মক শ্লোক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ট-সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ লক্ষ্মণ সেনের দিগ্বিজয়-প্রশস্তি, 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এ সভাসদ কবি কর্তৃক কোন কোন রাজার প্রতিবেশী রাজবর্গের উপর জয়ঘোষণা ও এই বিরোধী-রাজাদের দুর্দশা-উপভোগ, ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অবহট্ট রচিত মিথিলাধিপতির শত্রুপরাজয়-সংবর্ধনাসূচক দুইটি পদ—এগুলি যেন প্রেম ও দেবস্তুতির একাধিপত্যের মধ্যে জীবনের কঠোরতর সংঘর্ষের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ, শ্যামশ্রীমণ্ডিত উপবনভূমি ও ঊর্ধ্বস্থিত আকাশনীলিমার উপকণ্ঠে রুক্ষ মরুর ঈষৎ দ্যোতনা। তবে এ যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনাও প্রথানিয়ন্ত্রিত, ছাঁচে ঢালা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উত্তাপহীন অলঙ্কারমুখরতায় রণক্ষেত্রের বিভীষিকাসঞ্চারের কৃত্রিম প্রয়াস। তুর্কী-উপপ্লবের যথার্থ নিদারুণ প্রতিক্রিয়া কেবল বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'—'কীর্তিপতাকা'য় কাব্যরূপ পাইয়াছে। উহাদের মধ্যেই আমরা জাতিবৈরের উৎকট প্রকাশ, সংস্কৃতির মর্মমূলে আঘাতের প্রচণ্ডতা, উহার সুদূরপ্রসারী সমাজবিপর্যয় ও মানস উদ্‌ভ্রান্তির কতকটা যথার্থ ধারণা করিতে পারি। এই অবস্থা কাটাইয়াই বাংলা সাহিত্য, জীবনবোধ ও ধর্মসংস্কৃতিকে ছিন্ন সূত্রগুলির, আবশ্যকীয় পরিমার্জনার সহিত, পুনঃসংযোজনা করিতে হইয়াছে। সূতামেরামতের ও নবসূত্রসংযোগের সময় উচ্চতর সাহিত্যবয়নশিল্প হয়ত সাময়িক-ভাবে বন্ধ ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

চর্যাপদ

('চর্যাপদাবলী' বা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'আশ্চর্য চর্যাচয়' বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন অথবা বাংলাভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ববর্তীরূপ, অপভ্রংশের উদাহরণরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাদের রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের অন্তর্বর্তী কালে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই চর্যাগুলিতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজযান নামে এক বিশেষ তান্ত্রিক যোগসাধনার কথা বিবৃত হইয়াছে। এই মতবাদের সারাংশ হইল যে, চিত্তের সহিত বিষয়-সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ও সমস্ত ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া উহাকে, 'শূন্যতা'-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই শূন্যতা-বোধের সহিত সমদর্শিতা-হেতু করুণার সংযোগ হইলে চিত্ত নির্বাণ লাভ করে ও নির্বাণের মধ্য দিয়া এক মহাসুখের গভীরতায় বিলীন হয়। মোটামুটি হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তবে ইহার পারিভাষিক শব্দগুলি – শূন্যতা, করুণা, মহাসুখ—প্রভৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। এই উপাদান ও অনুভূতিগুলি হিন্দু দর্শনেও আছে, তবে বৌদ্ধ দর্শনে ইহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও ইহাদিগকে একটা বিশেষ সম্পর্ক-সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সাধনার প্রতি, বেদ ও উপনিষদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করা হইলেও, উহারা যে প্রকৃত সিদ্ধির নির্দেশ দিতে পারে না। এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইলেও, হিন্দু সাধন-প্রক্রিয়ার সহিত ইহাদের ধর্মমতের কোন মৌলিক প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। চর্যাপদে গুরুবাদের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে, এবং ভগবান ও তাঁহার প্রতি ভক্তির কোন উল্লেখ নাই। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও মহানন্দ-অনুভব যে প্রকৃত সিদ্ধির একমাত্র উপায়—এই সিদ্ধান্তই পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।)

বাংলা ভাষার আদিম রূপ : সহজবাদের কাব্য-প্রয়োগ

এই চর্যাপদগুলির দার্শনিক মতবাদ ইহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা নয়; ইহাদের ধর্মমত যেরূপ সার্থক উপমা ও রূপক প্রয়োগে এবং সঙ্কেতময় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেই ইহাদের কাব্য-মূল্য নিহিত। অন্যূন তেইশ জন পদকর্তা প্রায় পঞ্চাশটি পদ রচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্ত্বের অনুভূতির মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য দেখা যায়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে,

বাংলা ভাষার আদিম যুগে এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজযান সমাজমধ্যে এত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল যে, দুই শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্থান ও কালের বহু কবি ইহাকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ঐক্যবদ্ধ সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মনে হয় যেন উহাদের রচনার যুগে বাঙলার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অভিজাত সমাজে প্রচলিত থাকিলেও এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহার আলোচনা হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়াযানই সর্বপ্রথম দেশীয় ভাষাতে জনচিত্তের নিকট আবেদন জানায়। ইহাতে যে-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সাধনার গোপনতত্ত্ব অনেকটা হেঁয়ালির রীতিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে 'সন্ধ্যাভাষা' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ভাষা-প্রয়োগের উদ্দেশ্য অদীক্ষিত লোকের নিকট যাহাতে ইহার গূঢ় অর্থ উদ্ঘাটিত না হয়; এবং পরবর্তী যুগের সহজিয়া-তত্ত্বে অভিজ্ঞ টীকাকার ও চর্যাগুলির তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে সাহায্য না পাইলে উহাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা আধুনিক যুগে প্রায় অসম্ভবই হইত। তথাপি মনে হয় যে, উপমা ও সন্ধ্যাভাষার দ্বারা এই তত্ত্বের উপর আলোকপাত করা ও উহাকে সাধারণ জীবনযাত্রা ও নরনারীর প্রেমের রূপকে ব্যাখ্যা করিয়া রসিক পাঠকচিত্তের নিকট বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলাও চর্যাকারদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। চর্যাপদসমূহ ধাঁধার আকারে লেখা হইলেও উহার মধ্যেই উহাদের অর্থবোধের গোপন সঙ্কেত নিহিত আছে।

সন্ধ্যাভাষা

এই পদগুলিতে উপমা ও তত্ত্বালোচনার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে সমাজ-জীবনের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই যুগের জীবনযাত্রার কিছুটা ধারণা করা যায়। চর্যাকারগণ তান্ত্রিক রীতি-অনুযায়ী নিজেদের নামকরণ করিয়াছেন; যথা,—কাহ্নুপাদ, কুক্কুরীপাদ, ডোম্বীপাদ, শবরপাদ ইত্যাদি। তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ নীচ, অন্ত্যজজাতীয় সমাজ হইতেই উপমার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুঁড়ি, ব্যাধ বা শবর, ডোম জাতি ছাড়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরাই নির্বাণ-আনন্দ ও ধর্ম-সাধনার রূপক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য, ইহাদের একটা করিয়া অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, —যেমন অস্পৃশ্যা ডোম্বী ইন্দ্রিয়াতীত মহাসুখেরই প্রতীক। তথাপি চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব-আলোচনায় হিন্দুসমাজের নীচ-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের রূপক-প্রয়োগে ইহাই অনুমান করা যায় যে, এই ধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা হারাইয়া প্রকৃত জনসাধারণের

নিম্নস্তর সমাজের পরিচয় ও প্রাধান্য

মধ্যেই প্রচলিত ছিল—হিন্দু সমাজে যাহাদের আসন যত নীচে, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মে তাহাদেরই মর্যাদা তত বেশী। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ চর্যাকারদের নিকট একেবারেই অগ্রাহ্য, উহার বদ্ধমূল সংস্কারকে আঘাত করিয়াই ইঁহারা নিজ ধর্মমতের পার্থক্য ঘোষণা করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সংকলনে সংগৃহীত পদগুলি সম্ভবতঃ পাল-রাজত্বের শেষের দিকে ও সেনবংশের প্রতিষ্ঠার কালে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিতে পারে। অবশ্য, এই জাতীয় কবিতার ধারা হয়ত আরও দুই শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, অন্যথা ইহাদের ভাবগত ঐক্য ও বহুল বিস্তৃতি সম্ভব হইত না।

শব্দ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য

ইহাদের শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। বহুপ্রচলিত শব্দসমূহের উপর বিশিষ্ট রূপক-অর্থ আরোপিত হইয়া সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ রূপে দেখানো হইয়াছে। 'কুম্ভীর' 'কুম্ভকযোগ' অর্থে, 'শাশুড়ী-বধূ' 'সাধারণ শ্বাসক্রিয়া ও 'নৈরাত্মা'-অর্থে, 'ননন্দ', 'শালী' 'ইন্দ্রিয়বোধ ও ইহার রোধ'-অর্থে, 'মন্ত্রী ও ঠাকুর' দাবা খেলার মন্ত্রী ও রাজা, 'প্রজ্ঞা ও বিষয়ানুরত বোধিচিত্ত'-অর্থে, 'সোনা ও রূপা' 'শূন্যতা ও রূপানুভূতি'-অর্থে, 'মুসা বা মূষিক' 'চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ'-অর্থে, 'বেঙ্গ বা ব্যাং' 'অবয়বহীন শূন্যতা'-অর্থে, 'বলদ ও গাই' 'রূপজগতের স্রষ্টা মন ও নৈরাত্মা'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এ ছাড়া বঙ্গ ও বঙ্গাল শব্দকে এক অদ্ভুত ও কৌতূহল-পূর্ণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গে জায়া নিলেসি' (৩৯ নং পদ), 'অদঅ বঙ্গালে ক্লেশে লুড়িউ' ও 'আজ্জ ভুসু বঙ্গালী ভইলী, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী'—এই বাক্যগুলিতে বঙ্গালের কোন বিশেষ ভৌগোলিক অর্থ আছে কি না তাহা অনিশ্চিত, তবে বঙ্গালের রূপক-অর্থ যে অদ্বয়-জ্ঞান, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের অভেদ সম্বন্ধে সহজ প্রতীতি, ইহা টীকাকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙলা দেশ এই অভেদ-সাধনার লীলাভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল ও সাধক-জীবনের উন্নততম পরিণতির সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে এইরূপ ধারণাই আমাদের জন্মে। সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ চণ্ডালীকে নিজ পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত জগতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া যে বাঙালী হইয়াছেন অর্থাৎ সাধনমার্গের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন—এই প্রশংসাসূচক উক্তিই লেখকের উদ্দেশ্য। চর্যাপদ বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম রচনা কিনা, অথবা সিদ্ধাচার্যেরা সকলেই বাঙালী ছিলেন কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ করা হইয়াছে। এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় বাঙলা দেশের প্রতি একটি সম্মানজনক আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

চর্যাপদের মধ্যে অনেক প্রবচন-জাতীয় সংক্ষিপ্ত, শাণিত ও মানব-অভিজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি মেলে। এইগুলি ষোল আনা বাঙালী-জীবন-সম্পর্কিত কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। না গেলেও বাঙালী-জীবনমাত্রার মোটামুটি ইঙ্গিত যে ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

চর্যাপদে প্রযুক্ত প্রবচন

'নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক' (৩২নং পদ) প্রবচনে লঙ্কা যে দূরবর্তী স্থানের প্রতীক তাহা বোঝা যায়, এবং সত্য মানুষের অন্তরেই বাস করে, উহাকে খুঁজিতে দূর-দূরান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' (৬নং পদ) বাক্যটির মধ্যে অতীত মৃগয়া-যুগের একটি জীবনসত্য প্রতিফলিত—হরিণ নিরীহ প্রাণী হইয়াও কেবল নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য সমস্ত জগতের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামায়' (৩৩ নং পদ) উক্তিতে সাধনার দ্বারা যে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র জীবন আবার যে নিজ উৎসে ফিরিয়া বিশ্বজীবনে লীন হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত মিলে। 'বলদ বিআঅল গবিয়া বাঁঝে' (৩৩নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম-সত্য যে প্রাকৃতিক সত্যের বিপরীত তাহা একটি আপাতত অসম্ভব উক্তির মধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে; অবশ্য এখানে 'বলদ' ও 'গাভী' রূপক-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'বর সুণ গোহালী কি মো দুট্ঠ বলন্দে' (৩৯নং পদ) 'দুষ্ট বলদ হইতে বরং শূন্য গোয়াল ভাল' কৃষিনির্ভর জীবনের এই অভিজ্ঞতাজাত সত্য এক গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব নির্দেশ করিতেছে। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর' (৪২ নং পদ) উক্তিতে ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়ে সমগ্র জীবন-স্রোতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, বহিঃ-প্রকৃতির দৃষ্টান্তে এই সত্যের সমর্থন করা হইয়াছে। 'দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ণ দেখই' (৪২নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম সত্য যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত তাহা বোঝান হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চর্যাকারগণ সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেও বহির্জীবনের মূলসত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন ও জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যগুলিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা তৎকালীন সমাজের যে-একটি আংশিক ছবি প্রত্যক্ষ করি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তখন বাংলা দেশের ভৌগোলিক পরিধি পরবর্তী যুগের দেশসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত ছিল, সুতরাং

উড়িষ্যা, আসাম ও মগধ-অঞ্চলের কোন কোন সমাজদৃশ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। পদ্মার খালে নৌকা বাহার চিত্র হয়ত নদীমাতৃক বাঙলা দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু উঁচু পর্বত ও পর্বতের গায়ে নিবিড় জঙ্গল আসাম অঞ্চলেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি বৃহত্তর বঙ্গেরই একটা জীবনযাত্রার ছবি চর্যাপদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছের তেঁতুল ফল বাঙলার অতি প্রিয় খাদ্য; শাশুড়ীর ঘুমাইয়া যাওয়া ও বধূর জাগিয়া থাকা হয়ত বাঙালী পরিবার ছাড়াও অন্যত্র দ্রষ্টব্য। শুঁড়িনীর চিকন কাপড়ে মদ বাঁধা, মোহতরুকে ফাড়িয়া পাটি জোড়া, সাঁকোর সাহায্যে খরবেগ নদী পার হওয়া, মৃগয়ার জন্য হরিণ খোঁজা ও উহাকে বাণে বিদ্ধ করা, নৌকা বাহিবার পূর্বে উহার খুঁটি উপড়ানো ও কাছি খুলিয়া দেওয়া, ও নৌকার খোলের জল সিঁচিয়া ফেলা, মদমত্ত হস্তীর মদজল বর্ষণ করিয়া নলিনী-বনে প্রবেশ, ডোমনীর বাঁশের তাঁত ও চুপড়ি তৈয়ার করা, তূলা ধুনিয়া উহার আঁশকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করা, বটুয়া ও করণ্ডকের মধ্যে বড়ি লুকাইয়া রাখার অভ্যাস, শবর-শবরীর বন্যফল খাইয়া মাতামাতি—ইত্যাদি বাঙালী জীবনের অনেক সুপরিচিত বৃত্তি, প্রথা ও আমোদের কথা এই কবিতাগুলিতে আমরা খুঁজিয়া পাই। তাহা ব্যতীত দাবা খেলা, তারের বাদ্যযন্ত্রের সুর বাজান, বিবাহের বাদ্যভাণ্ড ও উৎসব, এমন কি নৃত্যগীত-নাটকাভিনয়, অভিনয়সজ্জার পোশাক-পরিচ্ছদের পেটিকা ও বুদ্ধনাটক বা বুদ্ধলীলা-সম্পর্কীয় নাট্যগীতির প্রচলন সম্বন্ধেও উল্লেখ আমরা ইহাদের মধ্যে আবিষ্কার করি। চর্যাপদ-বর্ণিত সমাজ যে ব্যবসায়, খেলাধূলা ও ললিতকলার চর্চার দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন চর্যাপদ হইতে সহজেই আহরণ করা যায়।

চর্যাপদে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর পরিচয়

[সর্বশেষে চর্যাপদগুলির কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। এগুলি যদিও আদিম যুগের রচনা, তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মার্জিত কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি সূক্ষ্ম সাধনতত্ত্ব-আলোচনায় এই কবি-গোষ্ঠী যে তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ মন ও সার্থক উপমা-প্রয়োগের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করার নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহা উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন। তাঁহারা যদিও পাণ্ডিত্যহীন, সহজ-অনুভূতি-নির্ভর যোগী-রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ও নিম্নস্তরের সামাজিক শ্রেণীর সহিত মেলামেশায় অভ্যস্ত এইরূপ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যে হিন্দুদর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও নিজ মত-প্রতিষ্ঠায় সুনিপুণ ছিলেন

চর্যাপদের কাব্যোৎকর্ষ

তাহা তাঁহাদের রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহাদের রচনারীতি এত অর্থগূঢ় ও সংক্ষিপ্ত যে, তাঁহাদের যুক্তিধারা অনুসরণ করাই দুরূহ। নিজ সাধনাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা এতই মর্মজ্ঞ, তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা-কল্পনা ইহারই অনুভূতিতে এতই তন্ময় যে, নানা বিচিত্র উপমা ও যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদের গভীর উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্মবোধ শুধু যুক্তিতর্কের ব্যাপার নহে; ইহা আবেগ ও কবি-কল্পনার স্তরেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের অনুভূতির কথা বলিতে বলিতে আবেগে আত্মহারা হইয়া যান; তত্ত্ববিচার আবেগময়তা ও সংগীতধর্মিতায় পরিণত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বের কাব্যে রূপান্তরই ইহাদের বিশেষ গৌরব। আমরা বৌদ্ধতত্ত্ব অস্বীকার করিয়াছি, কিন্তু চর্যাকারদের কবিত্বশক্তি, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদেব অসীম আগ্রহ ও তন্ময়তাপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসময় বাচনভঙ্গী এই তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাকে আমাদের চির-আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে। চর্যাপদের ভাব, ভাষা ও কল্পনাশক্তির নিদর্শনরূপে পরিশিষ্টে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পটভূমি

১

তুর্কী-আক্রমণে বাঙালী-জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়

তুর্কী-আক্রমণ ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কিরূপ বিপর্যয় ঘটে, তাহার যথার্থ তথ্যমূলক বিবরণ দেওয়া কঠিন। বৈদেশিক অধিকারেব প্রভাবে অন্যান্য জাতির জীবনে যে অধঃপতন ও অবসাদ আসে, বাঙলার ক্ষেত্রেও সেই সুপরিচিত ইতিহাসসম্মত পরিবর্তন সাধিত হয়, ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক। তবে বাঙলা দেশের ইতিহাসে দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার জন্য হয়তো ফলের কিছু তারতম্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রথম, বিজেতা তুর্কী জাতিব ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা; আর দ্বিতীয়, বাঙালী জাতির রাজনৈতিক চেতনাব অভাব ও কূর্মবৃত্তি। এই দুইটি কারণকে অনুধাবন করিলে মনে হইবে যে, তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা বাঙলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে গুরুতর আঘাত হানিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বিজিত দেশে যে-ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বাঙলাতেও সেই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ-বিহারের মধ্যে একটা ব্যাপক ধ্বংস-অভিযান চলিয়াছিল এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ হয় তুর্কী-বিজয়ের পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্য-রচনার আর কোন নিদর্শন মিলে না। মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই অন্তর্বর্তী কালের সমস্ত বাংলা রচনাও এই বিনাশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। সেইজন্য চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ।

তুর্কী-আমলে সংস্কৃত-অনুশীলন

তবে কিন্তু এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয় নাই—অভিধান, স্মৃতি, পুবাণ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় ও ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’, ‘গাথাসপ্তশতী’ প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ড-কবিতার সংকলনগ্রন্থ ও জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’-এর অনুসরণে রচিত সংস্কৃত কাব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, বাঙালীর কবি-প্রতিভা বাংলা ভাষার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেও কাব্যানুশীলন পরিত্যাগ করে নাই।

এই যুগে বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংরক্ষণ এই সন্দেহ জাগায় যে, হয়তো এই ধ্বংসের জন্য বিদেশী আক্রমণকারীকেই একমাত্র দায়ী করা ঠিক হইবে না। মনে হয়, যেন বহির্বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এক অন্তর্বিপ্লবও চলিয়াছিল ও হিন্দু ও বৌদ্ধের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্মম উচ্ছেদ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বাঙলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। প্রায় দুই শতাব্দীর নীরবতার পর যখন বাংলা সাহিত্যের পুনরাবির্ভাব ঘটিল, তখন দেখা গেল যে, ইহাতে পৌরাণিক চেতনা ও সংস্কৃত প্রভাবের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে ও বৌদ্ধভাব-প্রভাবিত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশে লেখা সাহিত্য চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই সংস্কৃত-প্রভাবিত নূতন ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ-প্রতিযোগিতা

বাঙালী হিন্দু জাতি মুসলমান-বিজয়ের ফলে কতখানি বিপর্যস্ত হইয়াছিল ও আত্মরক্ষার উদ্যমে কিরূপ আত্মবিশুদ্ধি ও প্রতিরোধ-শক্তির প্রেরণা পাইয়াছিল, তাহাও ঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সহজ নহে। হিন্দুর রাজনৈতিক চেতনা যে অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, তাহা তুর্কী-বিজয়ের দ্রুত অগ্রগতি ও সহজসাধ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতা অপেক্ষা ধর্মের প্রতি হিন্দুর আগ্রহ অনেক বেশী ছিল ; সুতরাং সে যে রাজনৈতিক প্রতিরোধ অপেক্ষা সমাজ-সংরক্ষণের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুসলমানকে ঠেকানোর ব্যাপারে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল না, কিন্তু নিজের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি যাহাতে যুগোচিত শক্তি অর্জন করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে, সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ ও অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল। সুতরাং এই যুগে স্মৃতির নূতন নূতন বিধান রচিত হইয়া সমস্ত আচার-আচরণের শিথিলতা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে—সমাজ-বিধি-উল্লঙ্ঘনের শাস্তি আরও কঠোর হইয়াছে। আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের অনুদার সংকীর্ণতা সম্বন্ধে যে-অভিযোগ করা হয়, তাহার মূল নিহিত আছে সুদূর অতীতে অপর ধর্মের অভিভব হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তাহা ছাড়া, এই যুগে পৌরাণিক ধর্ম ও ভক্তিবাদের প্রভাব জনচিত্তে দৃঢ়তর করিবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে। বিবিধ দেবদেবী, বিশেষত দুর্গাপূজার প্রবর্তনের দ্বারা জাতীয় চিত্তে ধর্মের প্রতি প্রবল

এই যুগের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারে হিন্দুর আত্মরক্ষার নানা প্রচেষ্টা

অনুরাগ জাগানো হইয়াছে। এমন কি মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি অনার্য দেব-দেবীকেও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ও তাহাদের উপর সুপরিচিত হিন্দু দেবতার গুণ আরোপ করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকেও উচ্চবর্ণের সহিত সমসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য অনার্য দেবতার হিন্দু-দেবমণ্ডলীতে এই উন্নয়নেরই ইতিহাস। ইহার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিরোধ নহে, সমাজ ও ধর্ম-সংগঠনের প্রয়াসই পরিস্ফুট। সুতরাং হিন্দুসমাজের উপর মুসলমান-বিজয়ের প্রভাব প্রধানতঃ পৌরাণিক চেতনার উন্মেষ ও সমাজ-সংহতির দৃঢ়ীকরণ এই দুই দিকে লক্ষিত হয়।

২

ভাষার প্রাচীনত্বের দিক দিয়া চর্যাপদের পরেই বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে পরিচিত কাব্যের নাম করা যাইতে পারে। এই কাব্যের রচনাকাল ঠিক জানা যায় নাই। হয়তো কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (যদি কবির আত্মজীবনমূলক অংশটি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়) ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু কৃত্তিবাস ও মালাধরের রচনা এত জনপ্রিয় ছিল এবং পরবর্তী কবি ও নকলকারকদের হাতে ইহাদের ভাবে ও ভাষায় এত রূপান্তর-সাধন হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া আর কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ও ভাষার আধুনিকত্ব ইহাদের মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, ইহাদের ভাষাগত আদিম রূপ ও রচনাকালোচিত ভাববৈশিষ্ট্যের আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী ও তাহার কাছাকাছি সময়ে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল, তাহা এক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এই অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে—এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে অবশ্য, কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে ইহার ভাষাতে পশ্চিম রাঢ়ের আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা যে প্রাচীনত্বেরই নিদর্শন, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনার কাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস অমার্জিত-রুচি পল্লী-অঞ্চলের কবি হইলেও তিনি যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তাহার প্রমাণ আছে। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার যে-

কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন স্থলে পৌরাণিক আদর্শ হইতে বিভিন্ন। তাঁহার রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতাররূপে বর্ণিত হইলেও উহাদের প্রেমকাহিনী গোড়ার দিকে কোন উন্নত ভাবাদর্শ অনুসরণ না করিয়া গ্রামবাসী তরুণ-তরুণীর স্থূল, রুচিবিগর্হিত লালসার চিত্র রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ আইহন-পত্নী, একাদশবর্ষীয়া বালিকা রাধার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণয়িনীরূপে প্রার্থনা করিয়াছে ও রাধার দৃঢ় অসম্মতি সত্ত্বেও ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। বড়াইবুড়ী কৃষ্ণের দূতীরূপে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও উভয়ের মিলনেব নানা উপলক্ষ্য ঘটাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রণয়লীলায় নিজের অসীম ক্ষমতা ও ঐশী শক্তি সম্বন্ধে আস্ফালন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নায়ক ইন্দ্রজাল-প্রয়োগে নায়িকাকে সম্মোহিত কবিযা তাহাকে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়াছে। এই ঘটনার পরে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নায়ক-নায়িকার উপর হইতে চিত্ত সংহরণ করিয়া যোগসাধনায় রত হইয়াছে ও নায়িকার উন্মুখ প্রেম ও ব্যাকুল আত্মনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নায়িকা বহু বিলম্বে প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করিয়া নায়কের জন্য বিলাপ ও আক্ষেপে সময় কাটাইয়াছে। পুঁথি এইখানেই আকস্মিকভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণপ্রেমের এই কাহিনী পুরাণ-প্রচলিত ও পরবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলীতে কীর্তিত কাহিনী হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহাতে শেষের দিক ছাড়া অন্য কোথায়ও অধ্যাত্ম-রূপক ও উন্নত ভাবাদর্শের বিশেষ কোন লক্ষণ নাই। কবি এইরূপ আখ্যান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা জানা নাই। সম্ভবতঃ কোন কোন পল্লী-অঞ্চলে অমার্জিত-রুচি প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের এইরূপ একটি গ্রাম্যতাদুষ্ট কাহিনী প্রচলিত ছিল এবং বড়ু চণ্ডীদাস ইহাকেই নিজ কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস নিজে যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর ভাবানুবাদ হইতে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। পুরাণবর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মহিমা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। তথাপি কেন যে তিনি ভাগবত ও পুরাণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া কুরুচিপূর্ণ গ্রাম্য আখ্যান গ্রহণ করিলেন, তাহার কারণ দুর্বোধ্য।

পৌরাণিক ও গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সহিত পার্থক্য

তাঁহার রাধাকৃষ্ণ কেহই আদর্শপদবাচ্য নহে। তাঁহার কৃষ্ণ রূপমোহে অন্ধ, নীতি ও সংযমের শাসন মানে না, নিজ অলৌকিক শক্তি ও ভগবত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে দারুণ অভিমানী—রাধা তাহার দূতীকে অপমান করিয়াছিল ও তাহাকে দিয়া ভার বহাইয়াছিল, ইহা সে মুহূর্তের জন্যও ভোলে না। সে রাধাকে বশীভূত করিয়া তাহার পর তাহার নির্মম প্রত্যাখ্যানের দ্বারা তাহার পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে; প্রেমিকের কোমল, আত্মভোলা মনোভাব তাহার একেবারেই নাই। রাধা প্রথম দিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার মত, প্রেম-নিবেদন বুঝিবার মত অনুভূতি তাহার নাই—কৃষ্ণের নিকট আত্মদান করিয়াও সে খুঁটিনাটি লইয়া তাহার সহিত কলহ করে ও তাহাকে অপদস্থ করিবার ফিকির খোঁজে। তাহার প্রথম দিকের যে-পরিচয় আমাদের মনে প্রধান হইয়া উঠে, তাহা এক কলহপরায়ণা, কথাকাটাকাটিতে পটু, একগুঁয়ে গ্রাম্য নারীর। শেষের দিকে অবশ্য প্রেমের অনুভূতি ও বিরহের অন্তর্দাহে তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে—সে বিরহসন্তপ্তা, প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে পরিণত হইয়াছে। রাধা-চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্রাঙ্কনের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও কৃষ্ণ

কিন্তু এই স্থূল, শালীনতাহীন কাহিনীর মধ্যে যে-কবিত্বশক্তি ও জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তীক্ষ্ণ চটুল সংলাপের দ্বারা নাটকীয় রসসৃষ্টি করিতেও কবি সুনিপুণ। নবজাত বাংলা ভাষা এই কবির হাতে যে কিরূপ সাবলীল ও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় কাব্যের প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই পরিস্ফুট। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিরহের বেদনা ও অন্যান্য মনোভাবের বিচিত্র প্রকাশ গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের হেতু। বিষয়ের স্থূলতা ও রুচির গ্রাম্যতা সত্ত্বেও লেখকের কল্পনাশক্তি ও গভীর জীবনবোধ ইহাতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। একদিকে কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সরস চিত্র কবির রচনায় সার্থকভাবে মিলিয়াছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ বহু প্রবাদ-বাক্য রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে সাধারণের নিকট উপভোগ্য করিয়াছে। নারদ ও বড়াই-এর বার্ধক্যজনিত দেহ-বিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গীর সরস বর্ণনায় কবি কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র-পরিকল্পনায় সর্বত্র সংগতিরক্ষা হইয়াছে ও ইহাতে কবির মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ

কাব্যটিতে উপমা ও অলংকারের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ-কৌশলও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপবর্ণনায়, উহাদের প্রণয়মুগ্ধতার প্রকাশে, উভয়েব মনোভঙ্গীর ও ইচ্ছাবিরোধের রূপায়ণে যে অজস্র উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণ সাদৃশ্যবোধ ও কল্পনার সার্থক সঞ্চরণশক্তি আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই উপমাসমূহ প্রাচীন সংস্কৃত-কাব্যভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত, রূপবর্ণনাব প্রথাসিদ্ধ অলংকার-কৌশল এখানে অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার কলহ, মনের ও মেজাজেব উত্তাপ, দৃঢ় অসম্মতি ও পরিণামে প্রেমের আত্মনিবেদন ও আর্তি-প্রকাশে কবি তাঁহার মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা হইতে, বা জনসমাজে প্রচলিত প্রবচন ও বাগ্‌ধারা হইতে নূতন নূতন উপমা চয়ন করিয়া তাঁহার কাব্য-কৃতির অসামান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বাংলার প্রাকৃত সমাজ উহাব স্থূল রুচি, প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা ও রস-আস্বাদনের নূতন আগ্রহ ও তৎপবতা লইয়া কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। জীবন-সম্ভোগেব এই নবরীতি, জীবন-প্রতিবেশ হইতে রস-আহরণের এই সদ্যোলব্ধ প্রবণতা অচিরজাত বাংলা কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যেব একটা উপরিভাগ হইতে উন্নীত করিয়া স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ কবির প্রতিভাস্পর্শে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, স্থূলরুচিমিশ্রিত কাব্য অভিজাত-কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ ও শিল্পোৎকর্ষেব পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা

ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়াও কবি কম কৃতিত্বের অধিকারী নহেন। কাব্য-খানিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়াও অনেক নূতন ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়—এই ছন্দোবৈচিত্র্য বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে আরও পরিণত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। চর্যাপদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অধিকতর সংস্কৃতানুসারী—মনে হয় পঞ্চদশ শতকে বাংলা ভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আবার সংস্কৃতের আদর্শে ফিরিয়া আসিয়াছে। জনসমাজে পৌরাণিক চেতনা বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষাও সংস্কৃত শব্দচয়ন ও প্রয়োগরীতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম পদ, সংস্কৃত-বহির্ভূত আঞ্চলিক লৌকিক নানা শব্দ ও বাগ্‌ধারা (idiom), সংলাপরীতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ইহার প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তার লক্ষণগুলিও এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে ও লেখকের মৌলিকতার পরিচয় দিতেছে। 'চর্যাপদ'-এ বাঙালীর বিশিষ্ট জাতিলক্ষণ সব সময় ধরা পড়ে না

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দ

—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কিন্তু বাঙালীর মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়, বাঙালীর ভাবচেতনা ও জীবনরসবোধের ইহা প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ।)

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কাহিনীতে বড়ু চণ্ডীদাস কতকগুলি নূতন আখ্যান যোগ করিয়াছেন—নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড এই দুই লীলার প্রথম প্রবর্তক তিনিই। প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। চৈতন্যভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের টীকায় ইহাদের স্রষ্টা যে চণ্ডীদাস তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেমলীলা যতই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিল, ততই নানা নূতন আখ্যান যোগ করিয়া ইহার বৈচিত্র্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল ও জনগণের জীবনযাত্রার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টা হইল। সে-যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শুল্ক দেওয়া ও নদী পার হইতে নাবিককে মজুরি দেওয়া লোকের জীবনযাত্রার একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; এবং এই অতিপরিচিত প্রথাগুলিও ক্রমশঃ রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার অঙ্গীভূত হইল। অবশ্য, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এই শুল্ক-আদায়ের উৎপীড়নমূলক দিকটাই দেখানো হইয়াছে—ইহার কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তখনও আরোপিত হয় নাই। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে ইহাদিগকে সূক্ষ্মতর রূপক-অর্থ-মণ্ডিত করা হইয়াছে। ভগবানের নিকট ভক্ত তাহার সর্বস্ব নিবেদন করিলেই ভবের হাটে তাহার বেচা-কেনা সার্থক হইবে ও সংসারসমুদ্র সে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। বড়ুর ইঙ্গিত পরবর্তী যুগে পূর্ণতর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নূতন আখ্যান ও আধ্যাত্মিকতা

বিদ্যাপতি

[১৩৮০—১৪৬০ খ্রীঃ অঃ]

৩

বিদ্যাপতি মিথিলা-রাজসভার কবি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা, রাজমহিষী ও মন্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার পদাবলীর ভণিতায় সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজাদের শাসনকাল হইতে বিদ্যাপতির জীবনকালের একটা নিশ্চিত ধারণা করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতিব জীবন ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এইরূপ অনুমান নির্ভরযোগ্য।

বিদ্যাপতির কাল

বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ লেখা মৈথিলী ও অবহট্ট বা অপভ্রংশ-মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায়। ব্রজবুলি কোন প্রাদেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা ছিল না—ইহা রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুর-রস-প্রকাশোপযোগী, পদের লালিত্য ও ধ্বনির ঝঙ্কার-বিশিষ্ট, কবি-সৃষ্ট কাব্য-ভাষা। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতিই এই ভাষার আদি স্রষ্টা। বৈষ্ণব ভাবধারা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা উড়িষ্যা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং বাঙলা দেশে বৈষ্ণবপদ-রচনায় ইহা বাংলা ভাষাব সহিত প্রায় সমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ব্রজবুলি

সে-যুগে মিথিলা ও বঙ্গদেশ একই সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের দ্বারা ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক-সাহিত্যিক-গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি পদাবলী-সাহিত্যের আদি-রচয়িতা-রূপে বাংলা কাব্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কান্বিত; বাংলার প্রধানতম ভাবধারার উৎসরূপে তিনি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল প্রেরণার আধার। তিনি নিজ দেশ হইতে বাংলা দেশেই অধিকতর আদৃত এবং সাধক কবি ও মহাজন পদকর্তা-রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। সুতরাং জয়দেব যেমন সংস্কৃত গীতগোবিন্দ লিখিয়াও বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য, সেইরূপ বিদ্যাপতিও মৈথিলী, অপভ্রংশ (অবহট্ট) ও ব্রজবুলিতে কাব্য রচনা করিয়াও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্য ও বিদ্যাপতি

কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু বৈষ্ণবপদ রচনাই করেন নাই—তাঁহার রুচি ও মনীষা এত বিচিত্র ও বহুমুখী ছিল যে, উহা পঞ্চদশ শতকের লেখকের পক্ষে বিস্ময়কর।

তিনি কেবল কবি ছিলেন না, একটি বিদগ্ধ ও অনুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুইখানি ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহমূলক কাব্য, স্মৃতি ও পুরাণ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, শিব, দুর্গা ও গঙ্গা-স্তুতিবিষয়ক কিছু গ্রন্থ ও 'পুরুষপরীক্ষা' নামে আখ্যানগ্রন্থ অপভ্রংশ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর মধ্যে হরগৌরী, কালী, গঙ্গা প্রভৃতি শাক্ত দেবদেবীর স্তুতিমূলক পদও আছে। তিনি যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী রাধাকৃষ্ণ-উপাসক ছিলেন, তাহাও মনে হয় না—তিনি বৈষ্ণবশাক্তনির্বিশেষে বহু দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন। তাহা ছাড়া, রাজসভার সহিত দীর্ঘকাল নিবিড় সংস্রব ও রাজকার্য-পরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি ছিল, তাহাও তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট। তিনি বহুভাষাবিদ্ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন,—এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। মোট কথা, বিদ্যাপতি সে-যুগের পক্ষে যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ও নানাবিষয়ক পাণ্ডিত্য-সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন ও সাধারণ ভাবসর্বস্ব কবি হইতে জীবনের সকল দিকের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

বিদ্যাপতির বহুমুখী প্রতিভা ও রচনা-বৈচিত্র্য

৪

তথাপি বৈষ্ণব পদকর্তা-রূপেই বিদ্যাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি বৈষ্ণব ভাব-সাধনার স্বর্ণসূত্রেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁহার পদে তিনি যে-বিভিন্ন রসের প্রবর্তন করিলেন ও ভক্তি ও রূপমুগ্ধতার সুর যোজনা করিলেন, চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে তিনি পরিণতির নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা করিলেন ও ইহারই মধ্যে অধ্যাত্ম-তাৎপর্য আরোপ করিলেন। তাঁহারই পদের অনুসরণে পরবর্তী কবি ও আলঙ্কারিকেরা এই প্রেমকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, মাথুর-বিরহ ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্যস্ত করিয়া ইহাকে একটি সুনির্দিষ্ট রসপরিণতি দিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কেবল মিলন ও বিরহ ছাড়া আর কোন রসের নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং তাঁহার কাব্য মুখ্যতঃ আখ্যায়িকা-কাব্য বলিয়া পদের আঙ্গিকও সেখানে স্থিরীকৃত হয় নাই। বিদ্যাপতিই প্রথম এক-একটি ভাবের উচ্ছ্বাসকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে গাঢ়বদ্ধ

বৈষ্ণব পদাবলী ও বিদ্যাপতি

রূপ দিয়া ও শেষে ভণিতার মধ্যে কবির নিজ মন্তব্য যোগ করিয়া পদের অবয়বটি নির্মাণ করিলেন।

চণ্ডীদাস যেমন রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে গ্রাম্য ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি দিয়া দৈবী লীলাকে মানবিক রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাপতিও তেমনি ইহার সহিত উচ্চতর জীবনচর্চার, রাজসভার বিদগ্ধ রস ও রুচির সংস্পর্শ ঘটাইয়া ইহার রমণীয়তা ও মানবিক আবেদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করিলেন। তিনি রাধাকে ভাবমুগ্ধা কিশোরীরূপে আঁকিয়া ও তাহার অন্তরে বয়ঃসন্ধিসুলভ প্রেমের উন্মেষ দেখাইয়া তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধার সখীমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া ও তাহাদিগকে নায়ক-নায়িকাব মিলনে ও প্রেমেব দৌত্যে নিয়োগ করিয়া ইহাব চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ হাস্যপরিহাসপ্রীতিপূর্ণ যৌবনাবেশের আবহাওয়া রচনা করিয়াছেন। মান-অভিমানের সুষ্ঠু কল্পনার দ্বারা তিনি প্রেমের বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তা বাড়াইয়াছেন, ইহার কুটিল গতি, রহস্যময় প্রকৃতিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশেষতঃ অভিসার-পরিকল্পনা বিদ্যাপতির মৌলিকতার একটি অপূর্ব নিদর্শন। অবশ্য, চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের মধ্যে অভিসারের প্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল; কেনা-বেচার লৌকিক প্রয়োজনের অন্তরালে নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠাই লুকানো আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি এই ছলনার পরদা সরাইয়া সোজাসুজি নায়িকার সমস্ত বাঁধভাঙা, উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসই দেখাইয়াছেন। আর এই অভিসারকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি দুর্গম পথের সমস্ত বাধা, বর্ষার দুর্যোগময়ী প্রকৃতি, বজ্র ও বিদ্যুতের হানাহানি, বনপথের আঁধারে মগ্ন পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন ও ইহাতে সাধনের দুরূহতার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বিদ্যাপতির মৌলিক ভাবকল্পনা

বিরহপর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি উদার আত্মবিসর্জন ও গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার নূতন সুর লাগাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিরহ-বর্ণনা একটা আলঙ্কারিক প্রথার মতই ব্যবহৃত হইয়াছে—উহাতে নায়িকার অন্তরবেদনা খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এমন কি কালিদাসের 'মেঘদূত'-এও আমরা রমণীয় চিত্রপরম্পরা যতটা পাই, ততটা অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ পাই না। বড়ু চণ্ডীদাসে রাধার বিরহবেদনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই; কিন্তু উহাতে নায়িকার চিত্তবিশুদ্ধি বা দেহাতীত আকর্ষণের বিশেষ পরিচয় মিলে না। বিদ্যাপতির পদে আলঙ্কারিক প্রথার সঙ্গে ক্ষমাস্নিগ্ধ, আত্মসংযমপূত মনোভাবের মিলন দেখা যায়। বিশেষতঃ মাথুর-

বিদ্যাপতির বিরহ ও ভাব-সম্মিলনের পদ

বিরহের পদগুলিতে আর্তির যে করুণ রস, প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দৈব ও কর্মফলকে দায়ী করার যে প্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উদারতা ও মাধুর্য উহাদের ভাবোৎকর্ষের কারণ। ভাবসম্মিলনের পদগুলিও বিদ্যাপতির উন্নত ভাবকল্পনার পরিচয়। তিনি কোনও পুরাণ অনুসরণ না করিয়া কেবল নিজ কবিমনের সহজ অনুভূতির জন্য রাধাকৃষ্ণের বিরহের পর পুনর্মিলন ঘটাইয়াছেন; এই পদগুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না; চৈতন্যপূর্ববর্তী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুভূতিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা যে-রসমাধুর্য ও ধর্মসাধনারূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৈতন্যধর্মতত্ত্ব না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্তের সংস্কারের বলেই বহুপদে বৈষ্ণবধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছেন।

বিদ্যাপতির প্রেমের আদর্শ ও ক্রম-বিকাশ

অবশ্য বিদ্যাপতির সব পদই এই উচ্চ ভাবের স্তরে পৌঁছে নাই। তিনি রাজ-সভার কবি ছিলেন ও রাজা ও রাজসভাসদ্‌বর্গের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচনা করিতেন। তাঁহার অনেক পদে রাজসভার যে-প্রেমে সৌন্দর্যবিলাসের আদর্শ প্রচলিত ছিল ও যাহাতে কুরুচির স্পর্শ ছিল, সেই দরবারী প্রেমেরই ছবি আঁকা হইয়াছে। তাঁহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত, দেহসৌন্দর্যপিয়াসী নায়ক; তাঁহার রাধা কখনও আদর্শ ভক্ত, কখনও বা প্রণয়তত্ত্বে অভিজ্ঞা, সুচতুরা নায়িকা, যিনি নায়ককে গোঁয়ার বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। তাঁহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের তন্ময়তা ফোটে নাই, রাজানুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি শোনা যায়। তিনি এমন কি রাজা শিবসিংহকে একাদশ অবতাররূপে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে ভগবত্তার মর্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন—কোনও ভক্ত বৈষ্ণব কবি আরাধ্যদেবতার এরূপ মর্যাদা-হানি কখনই করিতেন না। সময় সময় তাঁহার পদে তাঁহার সংসারজ্ঞান, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্য ও কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিতের নিদর্শন মিলে। মিথিলার গ্রাম্যজীবনযাত্রা, স্থূল হাস্যপরিহাস, সামাজিক রীতিনীতির ছাপও তাঁহার রচনাকে চিহ্নিত করিয়াছে। মোটকথা, বিদ্যাপতি গোড়া হইতেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন না; তিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ধারা-অনুসরণে লৌকিক প্রেমের কবিতা লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহার মধ্যে ভক্তির ও ভাবুকতার সুর মিশাইলেন ও দিব্য প্রেমের চেতনা তাঁহার অন্তরে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইল। তাঁহার পদে এই ভাবপরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঊর্ধ্বে যে একটি সার্বভৌম ধর্মচেতনা আছে, তাহারই মহিমান্বিত প্রকাশ। এই পদগুলিতে তিনি ভগবানকে কোন পৌরাণিক দেবদেবীরূপে কল্পনা করেন নাই, তাঁহার নিখিলবিশ্বব্যাপী রূপটিই অনুভব করিয়াছেন ও কোন সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া সোজাসুজি বিশুদ্ধ ভক্তির আবেগে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সেইরূপ দুই-একটি পদে সমস্ত খণ্ড-সৌন্দর্যের পিছনে, সমস্ত আংশিক প্রেমের অন্তরালে যে অনুভূতির অতীত, অখণ্ড প্রেমসৌন্দর্যের একটি আদর্শ বিরাজমান, তাহার চিরসীমাহীন সত্য রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই দুইজাতীয় পদের উদাহরণ ইহার পর দেওয়া হইতেছে। ইহারা প্রমাণ করে যে, বিদ্যাপতি শুধু মিথিলার রাজসভার কবি নহেন, শুধু বৈষ্ণব ভক্ত কবি নহেন; তিনি স্থানকালের গণ্ডি ছাড়াইয়া, যে-সার্বভৌম অনুভূতির উচ্চশিখরে সর্বদেশের সর্বকালের কয়েকটি মহাকবি আসীন, সেখানেই স্থান পাইবার অধিকারী।

বিদ্যাপতির সার্বভৌম ধর্মচেতনা

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত সহস্রাধিক পদের মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁহার খাঁটি রচনা, তাহার নির্ধারণ খুব দুরূহ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পদসমূহ বাংলা দেশে অতিশয় প্রচলিত থাকায় ও গায়কমুখে ও সংগ্রাহকদের হাতে তাঁহার ভাষার অনবরত পরিবর্তন ঘটিতে থাকায় এগুলি ক্রমশঃ বাঙালী কবিদের রচিত ব্রজবুলি পদের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার পদের বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধার-চেষ্টাও প্রায়ই কৃত্রিম-আদর্শ-প্রণোদিত ও আতিশয্যদুষ্ট হইয়াছে। এ ছাড়া চৈতন্যোত্তর অনেক কবির পদ—শ্রীখণ্ডের বাঙালী বিদ্যাপতি-অভিধেয় কবিরঞ্জন, রায়শেখর, চম্পতি রায়, রায় বসন্ত প্রভৃতির রচনাও বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া সমস্যার জটিলতা বাড়াইয়াছে। কতকগুলি মানদণ্ডের প্রয়োগে বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীর স্বরূপনির্ণয় সম্ভব: (১) রাজসভার প্রভাব-যুক্ত প্রণয়কলা-চাতুরীর পদসমূহ, (২) চৈতন্য-প্রভাবহীন প্রাকৃত প্রেমের চিহ্নাঙ্কিত রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পদগুলি; (৩) মিথিলার গ্রাম্য জীবনযাত্রার ইঙ্গিত ও উল্লেখবাহী পদাবলী, (৪) মৈথিল ও অবহট্ট ভাষার নিদর্শনবহুল পদগুলি ও (৫) সার্বভৌম ধর্মবোধের ঊর্ধ্বলোকচারী স্তোত্রকল্প রচনাসমূহ বিদ্যাপতির অকৃত্রিম রচনারূপে গৃহীত হইতে পারে।

বিদ্যাপতির খাঁটি পদবিচার

বিদ্যাপতি বহুশতাব্দীব্যাপী বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের মূল উৎস। জয়দেব যে-শৃঙ্গাররস-প্রধান রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার ভাবস্রোত সমস্ত পূর্বভারতের জনমানসে

পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি তাহাকেই স্বল্পাক্ষর পদের পরিমিত রমণীয় আধারে ধরিয়া রাখিয়া, লৌকিক জীবনের বিচিত্র রসের সহিত যুক্ত করিয়া, অন্তর-লোকের বহুমুখী দ্বন্দ্বসংঘাতে বেগবান করিয়া একটি নাটকীয় ভাবঘন পরিণতিতে সংহত করিলেন। প্রাকৃত রসের মধ্যে ধর্মসাধনার ব্যঞ্জনা মিশাইয়া, প্রণয়ক্ষোভের মধ্যে ভক্তির আকুতি ফুটাইয়া, রূপাকুলতার মধ্যে রূপাতীতের অতীন্দ্রিয় আবেদন ধ্বনিত করিয়া তিনি বাংলা কাব্যের একটা প্রধান বিবর্তনধারার প্রথম সূচনা করিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের দিব্যভাবমগ্ন অলৌকিক জীবনলীলার দর্শন-বঞ্চিত হইয়াও এবং বৈষ্ণব তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের স্থির আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে কেবল নিজ প্রতিভা ও কাব্যানুভূতির সাহায্যে বৈষ্ণব কাব্যের আদি স্রষ্টারূপে পরিচিত হইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অসামান্য ক্রান্তদর্শিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পূর্বানুমান চৈতন্যজীবনীতে ও চৈতন্যোত্তর কবিসংঘের রচনাতেই যেন আশ্চর্য বস্তুরূপের যাথার্থতা লাভ করিয়াছে। মানবমনের একটি ভক্তিরসসিঞ্চিত সুকুমার ঔৎসুক্যের বীজ বিদ্যাপতির মনোভূমিতে উপ্ত হইয়া এক অপার্থিব লীলাদ্যোতনার পুষ্প-পল্লবতায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রান্তদর্শী কবি বিদ্যাপতি

পঞ্চম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

১

তত্ত্বকবিতা ও গীতিমিশ্র আখ্যানকাব্যের পর বাংলা সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্য-কীর্তনমূলক ও বাস্তবসমাজচিত্রভিত্তিক কাহিনীকাব্যের যুগ আসিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনী-কাব্য, পাঁচালী-কাব্য হইতেছে মঙ্গলকাব্য।[১] মঙ্গলকাব্যও পালা হিসাবে গান করা হইত। তবে, ইহাতে সুর হইতে কাহিনীর প্রাধান্য বেশী। এখন আমরা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পাঠ করিয়া উহার ভাব-প্রেরণাটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি।

মঙ্গলকাব্যের আদি-ভাব-প্রেরণা

মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে কল্যাণ। যে কাব্যের কাহিনী শ্রবণ করিলে সর্ববিধ অকল্যাণনাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গললাভ হয়, তাহাকেই মোটামুটি মঙ্গলকাব্য বলা হয়।[১] 'মঙ্গল' শব্দটিকে 'বিজয়'-অর্থেও গ্রহণ করা হয়। সেই অর্থে লইলে এক এক ধারার মঙ্গলকাব্য এক একটি বহিরাগত দেবতার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও বিরুদ্ধ মতবাদ অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ পূজাপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা-অর্জনের বিজয়বার্তা ঘোষিত করে। এই মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয় এক-একটি দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তন। এই দেবতাদের মধ্যে আবার স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য বেশী। মনসা ও চণ্ডী-ই মঙ্গলকাব্যের প্রধান স্ত্রীদেবতা। ধর্মঠাকুর পুরুষদেবতা। শিবঠাকুরকেও ব্যাপকার্থে মঙ্গলকাব্যের বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী

মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মোটামুটি এইজাতীয় রচনা চারিটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশে বন্দনা। এই অংশে নানা দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। এই বন্দনা একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে শুধু যে ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবী বন্দনাই হইত তাহা নহে, হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উপাস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ

দ্বিতীয় অংশ—গ্রন্থ-রচনার কারণ-বর্ণনা। ইহার মধ্যে কবির আত্মপরিচয় থাকিত। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই যে স্বপ্নাদেশে বা দৈবনির্দেশে রচিত হইয়াছে—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশ—দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ-স্থাপনই ইহার মূলকথা। এই অংশে শিবের সম্বন্ধ ও প্রাধান্য লক্ষণীয়।

চতুর্থ অংশ—নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা। দেবতার পূজা-প্রচারের জন্য কোন কোন দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা, দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ নীলাম্বর ও মায়া ; মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দর উষা-অনিরুদ্ধ।

এই নরখণ্ড-বর্ণনার মধ্যে আরও কয়েকটি আঙ্গিক আছে। মুখ্যতঃ নায়িকাদের বারমাসের সুখদুঃখের কাহিনীর বর্ণনামূলক 'বারমাস্যা'-অংশ এই আঙ্গিকের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত 'চৌতিশা' অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক-নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরযোগে ইষ্টের স্তুতি, নায়িকার সজ্জা ও রন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব তুর্কী-আক্রমণের সহিত সম্পর্কান্বিত বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। সুতরাং এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের সহিত ইহার কোন কার্যকারণগত যোগাযোগ আছে কিনা তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক রূপের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাঙলা দেশে তুর্কী-আক্রমণ হইল হিন্দু সেন-রাজত্বের সময়ে, দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে। কেন সেন রাজারা এই লঘু আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেন না, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। রাজশক্তির পশ্চাতে জনসমর্থন না থাকিলে, অন্ততঃ রাজশক্তির সহিত প্রজাসাধারণের একটা মৈত্রী-সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা কদাচ শক্তিশালী হইতে পারে না। মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজারা মাত্র স্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত বাঙালী-সাধারণ বৈদেশিক আক্রমণের সময় হয় রাজবিরোধী কিংবা উদাসীন ছিল। ক্ষমতাচ্যুত বৌদ্ধেরা হয়ত আক্রমণকারীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মনে হয়, হয়ত তাহারা অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

বাঙলা মূলতঃ অনার্য-অধ্যুষিত দেশ এবং বাঙালী জাতি মিশ্র জাতি। উন্নততর আর্যধর্ম ও সভ্যতার হাজার বৎসরের প্রচণ্ড চাপে বাঙালী আর্য-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্লাবন মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হইবার পর সমগ্র ভারতে যখন আবার বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তখনও উচ্চবর্ণের বাঙালী ব্যতীত সাধারণ বাঙালীর মধ্যে আর্যধর্মের উন্নত আদর্শবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার হয় নাই। তাহারা নিজেদের লৌকিক দেবতার সহিত পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণ

ঘটাইয়া নূতন ধর্মের ও নূতন দেবতার সৃষ্টি করিয়া খিড়কি দরজা দিয়া আর্যধর্মে প্রবেশ করিল। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা বাঙলার মাটিতে সৃষ্ট এই নূতন দেবতা। এই লৌকিক দেবতা-ব্যূহে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্য-সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। বৈদিক ধর্মে স্ত্রীদেবতার আসন একান্তভাবেই গৌণ। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবতা নারীরূপা এবং তন্ত্রের পুণ্যভূমি হইতেছে বাঙলা দেশ। কাজেই এইখানে নারী-দেবতার প্রাধান্য যদিও অনার্য উৎস হইতে আসিয়া থাকে, তথাপি আর্যধর্মনির্দিষ্ট তন্ত্রসাধনার প্রভাবেই উহা জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হইয়াছে। পরে বৈদিক, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, হিন্দু-তান্ত্রিকও পৌরাণিক ভাবাদর্শের মিশ্রণে এবং বাঙালীর নিজের সমাজ ও পরিবার-জীবনের নারী-প্রাধান্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই নারীদেবতারা সমগ্র বাঙালী জাতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন।

মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্যের তাৎপর্য

কিন্তু এই পরিণতি তুর্কী-আক্রমণের পূর্বে আসে নাই। ইহার আগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের পূর্বাগত প্রথানুসারে পথে-প্রান্তরে, গাছে-পাথরে এই লৌকিক দেবদেবীর পূজা করিত, তৈল সিন্দুর-পান দিয়া উলুধ্বনি করিয়া তাহাদের প্রসাদ ভিক্ষা করিত। এই লৌকিক দেবতারা একাধারে ভয়ংকর ও ভক্তবৎসল ছিলেন। প্রসন্ন হইলে একদিকে যেমন ইঁহারা ভক্তের জন্য যে-কোন কঠিন কাজ করিয়া দিতেন, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ হইলে চরম সর্বনাশ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। মনসা, চণ্ডী এবং খানিকটা ধর্মঠাকুর—এই তিনটি প্রধান গণদেবতার মধ্যে এই বিশিষ্টতা অধিকভাবে পরিস্ফুট।

আর একটা বিষয় লক্ষণীয়। এইসব মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা প্রধানতঃ বণিক সম্প্রদায় ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চশ্রেণীর প্রাধান্য এই সময়ে অপেক্ষাকৃত গৌণ। প্রাচীনকালে, বৌদ্ধ রাজাদের আমলে বাঙালী সওদাগর সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গার বহর লইয়া বিভিন্ন পট্টনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাঁহাদের এই সাড়ম্বর দুঃসাহসিক অভিযান লইয়া কিছু কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই সব কাহিনীই হয়ত কোন কোন মঙ্গলকাব্যের মূল আখ্যায়িকার অস্থিকংকালরূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। ইহা দ্বারাও অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি মূলতঃ বাঙালীর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের উপাদানে রচিত।

মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নশ্রেণীর প্রাধান্য

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিধর্মী রাজশক্তির চাপে বাঙালী উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে ঘুচিতে লাগিল। ভক্তি-

বাদের মূল কথাই হইল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ও দৈবানুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। উচ্চবর্ণের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা যতই পরিস্ফুট হইল, দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য যতই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মধ্যে দেবতার নিকট এই আত্মসমর্পণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার উপর রাজনৈতিক জীবনে পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আরও ঘনীভূত করিল। এই পরিস্থিতিতে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরাও লৌকিক দেবদেবীর দৈবী শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য গড়িয়া উঠিল। দেবতার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপরই মানুষের শুভাশুভ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নির্ভর করে; পুরুষকার নহে, দৈবই সর্বশক্তির আধার—এই বিশ্বাস উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও প্রসারিত হইল। তখনই শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর কবিগণ চিরাগত মূল আখ্যায়িকার খড়-কুটার কাঠামোর উপরে শাস্ত্র-পুরাণের মাটির প্রলেপ দিয়া, বৈদিক-তান্ত্রিক কল্পনার রঙ ফলাইয়া যে-মঙ্গলমূর্তি রচনা করিলেন—তাহাই বাঙলার নিজস্ব কাহিনীকাব্য মঙ্গলকাব্যরূপে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বাঙালীর চিত্তবিনোদন করিয়াছে।

মঙ্গলকাব্য সৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর আগ্রহ

২

বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য বাঙালীর ভক্তিময় মানসিকতার ত্রিবিধ প্রকাশ। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী-মনের ভক্তিতে রূপান্তরিত মধুর প্রেমকল্পনা উহার ঊর্ধ্বাভিসারী জীবনসাধনার প্রেরণারূপে উহাকে এক অপরূপ ভাব-মুগ্ধতার স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। শাক্ত পদাবলীতে দুর্যোগময় বাস্তব জীবনের ঘনঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায়, মাতৃরূপে পরিকল্পিত দৈবী শক্তির করুণা ও অভয়বাণী একান্তনির্ভর ভক্তহৃদয়ে বার-বার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত এই উভয়বিধ পদাবলীতেই একাগ্র ভক্তিসাধনার ফলরূপেই অন্তরে এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের স্থির দীপশিখা ভাস্বর হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ভোগলিপ্সা ও সুখমসৃণ জীবনচর্যা কোন কোন নূতন দেবতার আশ্রয়ে যে-কুণ্ঠিত, সুবিধাবাদমূলক তৃপ্তি খুঁজিয়াছে, সেই সাংসারিকতার খাদ-মিশানো দেবানুগ্রহযাচ্ঞাই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রূপ পাইয়াছে।

বাঙালীর ভক্তিময় মানসিকতা

মানুষের সহিত দেবতার নূতন সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসের এই তিনটি ধারার মধ্যে

কালক্রমের দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যই সর্বাগ্রবর্তী। (যে-তিনটি নূতন দেব-দেবী—ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডী—প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্যে পূজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তাঁহারা অনার্য-কল্পনা-প্রসূত ও অ-হিন্দু-উৎস-সম্ভূত মনে হয়। ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিলেও তিনি স্পষ্টতঃ হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মের আদিদেবতা ও তাঁহার পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। মনসা দেবী ধূলিশায়ী সরীসৃপ হইতে অর্বাচীন যুগের ভয়মিশ্রা ভক্তির তাগিদে দেবমণ্ডলীতে সদ্য-উন্নীত। তাহার হিংস্রতা, অকারণ-উদ্দীপ্ত আক্রমণ-স্পৃহা ও বাসস্থানের রহস্যময় গোপনতা মানুষের কল্পনাকে এরূপ নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়াছে যে, সে আমাদের চোখের সামনেই প্রাণিজীবন হইতে দেব-মর্যাদায় আরূঢ় হইয়াছে। মনসামঙ্গল হইতেই মঙ্গলকাব্যের দেবকল্পনার আদিম প্রেরণাটি আমরা অনুধাবন করিতে পারি। আদিম যুগের বর্বর মানুষের প্রতিবেশ সম্বন্ধে অনির্দেশ্য ভীতিবোধ, জাতিচিহ্নরূপে (Totem) নাগের যে বিশেষ মর্যাদা ও কোন কোন পুরাণে উহাদের দেবতার নিকটাত্মীয়রূপে পরিচিতি—অতীত মানবগোষ্ঠীর এই সমস্ত অস্পষ্ট স্মৃতি ও সংস্কার মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ। পৌরাণিক মনসা ও মঙ্গলকাব্যের মনসার বংশপরিচয় এক হইলেও উহাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। মঙ্গলকাব্যে পুরাণের অনুস্মৃতি নাই, আছে লোক-জীবনের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর ও লোক-আখ্যায়িকা-ভিত্তিক নব পুরাণ-মহিমার সৃষ্টি।)

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর উদ্ভব-রহস্য

(চণ্ডীর উদ্ভবরহস্য আরও জটিল ও মিশ্র-প্রকৃতির। মঙ্গলকাব্যের সমালোচকেরা উহার জন্য অনার্য-কল্পনা ও আর্যশাস্ত্র উভয়বিধ জন্মসূত্রই নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই উভয়জাতীয় নির্দেশের মধ্যেই কিছুটা যাথার্থ্য আছে। মাতৃশক্তির আরাধনা আর্যেতর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে হয়ত প্রথম প্রচলিত ছিল। কিন্তু বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন আর্যধর্ম-গ্রন্থও অতি পুরাকালেই এই বিশ্বব্যাপিনী মাতৃচেতনার স্ফুরণটি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। মাতৃকল্পনার সমীকরণ-শক্তির নিকট আর্য ও অনার্য-জীবনদর্শনের ভেদটি সহজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং চণ্ডীদেবী যখন মঙ্গল-কাব্যে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই ভাবধারারই সমন্বয় লক্ষিত হয়।) মাতৃ-মহিমানুভূতির সার্বভৌমত্ব, মাতৃসত্তার দেবীরূপে সহজ প্রতিষ্ঠা, মাতৃকরুণার একই প্রকারের অহেতুক অজস্রতা এই সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে নিবিড়তর করিয়াছে। তথাপি চণ্ডীদেবীর অনার্য-উদ্ভব তাঁহার পূজার শাস্ত্রনিরপেক্ষ সরল রীতি ও

চণ্ডীর উদ্ভব-রহস্য

তাঁহার কৃপার খামখেয়ালী আতিশয্য প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। জাতিতে হীন, বৃত্তিতে হেয় ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধর্মের লৌকিক-অনুষ্ঠানবর্জিত ব্যাধ-সম্প্রদায়েব মধ্যে তাঁহার পূজার প্রবর্তন, চণ্ডীর স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ-গ্রহণ ও কালকেতুর দাম্পত্যজীবনে বিপর্যয় ঘটাইবার স্থূলরুচি কৌতুকপ্রয়াস—এ-সবই দেবীর অনার্য উদ্ভবের পরিপোষক প্রমাণ। (কালকেতুর অবোধ বিস্ময়ে স্ফীত দুইটি চোখে, তাহার শর-সন্ধানোদ্যত বাহুযুগের স্তম্ভিত অসাড়তায়, তাহার দারিদ্র্য-ও-অজ্ঞান-সংকুচিত বিমূঢ় বোধশক্তিতে, তাহার আকস্মিক সম্পদ ও ততোধিক আকস্মিক বিপৎপাতের অস্থির আবর্তনে ও স্বপ্নসুলভ অনিশ্চয়তায় যে-দেবীর মহিমা অস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত, তিনি নিশ্চয়ই চণ্ডী—তন্ত্রশাস্ত্রে অভিনন্দিতা, সূক্ষ্ম দার্শনিকমননোদ্ভবা, যোড়শোপচারে সম্পূজিতা ও বিদগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর দ্বাবা বিশ্বের মূলশক্তি-রূপে স্তূয়মানা মহামায়া নহেন। হয়ত মঙ্গলকাব্যে মাতৃতত্ত্বের এই প্রাকৃতজনোচিত রূপান্তরে একটি গূঢ় ভক্তিরহস্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মা কেবল অসংশয় ভক্তির দ্বাবাই লভ্যা। তিনি সর্বসাধারণের বন্দিতা, কেবল অভিজাতবংশীয় ও শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ের উপচারবহুল পূজাবিধির দ্বারা অনুভবগম্যা নহেন।)

বিভিন্ন ধারাব মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তিকালের যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে উহা মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। পঞ্চদশ শতকের পূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট-লেখক-বচিত পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের দর্শন মিলে না। কিন্তু এই শতকে বচিত বিবিধ মঙ্গলকাব্যধারার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে আখ্যান-ভাগের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে বাঙলা দেশের সুদূর-প্রান্তবাসী বিভিন্ন আঞ্চলিক কবিব লেখা মঙ্গলকাব্যের বহিরবয়ব ও উপাদান-বিন্যাসরীতি অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং (অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে ইহাদের অঙ্কুররূপের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে বিস্তীর্ণ স্থান ও কাল-ব্যবধানে রচিত এই কাব্যগুলির এরূপ আশ্চর্য ঘটনা-সাম্য ও গঠনগত ঐক্যের কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করা যায় না। অনুমান করা যায় যে, ত্রয়োদশ শতকে অর্থাৎ মুসলমান-অধিকারের সমকালে বা অব্যবহিত পরে ইহাদের প্রথম খসড়াটি কবিচিত্তে দানা বাঁধিয়াছিল। ইহাদের আদিম রূপটি সম্ভবতঃ পাঁচালী-জাতীয় ও ক্ষুদ্র আখ্যানকেন্দ্রিক ছিল। পরে অন্যান্য আখ্যানের সংযোগে ও পুরাণের অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবদেবী-বন্দনা, শিবপার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের প্রক্ষেপে ও লৌকিক জীবনের অনিশ্চিয়তা-উদ্ভূত, ভয়ভক্তিমিশ্র ভাবোচ্ছ্বাসের অন্তর্ভুক্তিতে

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি-কাল

ইহারা অর্বাচীন পুরাণের বিরাট অবয়ব ও যুগোচিত দেবতত্ত্ব-প্রতিপাদক কোষ-গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিটি ধারার আদি-কবির রচনা কেবল জনশ্রুতিতেই রক্ষিত আছে। গ্রন্থ হিসাবে ইহারা বিলুপ্ত। মনসা-মঙ্গলের আদিকবি কানা হরি দত্ত, চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত ও ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূর ভট্ট নামসর্বস্ব হইয়া তাঁহাদের পরবর্তীদের উল্লেখে বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত রচনাগুলি পরবর্তী কবিদের বৃহত্তর ও অধিকতর সুবিন্যস্ত কাব্যে নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চিহ্নহীনভাবে মিশাইয়া দিয়াছে।

৩

মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে সমাজমন

এখন এই মঙ্গলকাব্যসমূহের পিছনে সমাজমনের কিরূপ পরিচয় ও কবিমানসের কিরূপ প্রেরণা সক্রিয় ছিল, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন্ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাঙালীর এই নূতন ধরনের দেব-পরিকল্পনা, দেবতার সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের এই নূতন আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিল, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা বিচার্য। যাঁহারা মঙ্গলকাব্য-বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, মঙ্গলকাব্যগুলি মুসলমান-আক্রমণে পর্যুদস্ত হিন্দুসমাজের আত্ম-রক্ষামূলক ঐক্য-সাধনার নিদর্শন। তৎকালীন জনসাধারণ যেন বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য ও অনার্য-গোষ্ঠীসমূহের নিবিড়তর সংহতি ছাড়া আততায়ী বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিরোধ-সংগঠনের উপায়ান্তর নাই। এই রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রেরণাতেই মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের মুখে এইরূপ সংশ্লেষাত্মক মিলনের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। দেবশক্তির নিকট এই অসহায় আত্মসমর্পণ, অনার্য-সমাজ হইতে গৃহীত নূতন দেবমণ্ডলীর নিকট নতিস্বীকার, চিত্তের প্রবল বিমুখতা ও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অসমর্থন সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য পীড়নের নিকট পরাজয়বরণ—সবই মুসলমান-বিজয়ের ফলে জাতির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, যে হীনম্মন্যতাবোধ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহারই অনিবার্য প্রকাশ। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পরাভব একদিকে যেমন অসাধ্য-সাধনক্ষম দেবতার আশ্রয়গ্রহণে ও অনুগ্রহভিক্ষায় প্রণোদিত করিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে দৃঢ়তর সমাজ ও ধর্ম-সংহতির প্রতিও প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই উভয়বিধ মনোভঙ্গীর মধ্যে যে একটা স্ব-বিরোধ বর্তমান, তাহা থিওরি-আবিষ্ট সমালোচক-গোষ্ঠীর দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রচেতনাহীন, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে নৈরাশ্যগ্রস্ত ও দিশাহারা বাঙালী যে রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন সংশ্লেষ-

প্রতিষ্ঠার উপযোগী মনোবল ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিবে, ইহা অনেকটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়। তাহা ছাড়া, সমগ্র মঙ্গলকাব্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে উহার মধ্যে নবজাত রাষ্ট্রচেতনা ও তদনুযায়ী সংগঠন-ঔৎসুক্যের ক্ষীণতম নিদর্শনও চোখে পড়ে না। এক মনসার কোপে কাজীর দুর্দশার হাস্যকর চিত্র ও লেখকদের এই দুরবস্থার উপভোগে আহত জাত্যভিমানের কিছুটা উপশম ছাড়া কোথাও পরাধীনতার গ্লানির বা স্বাজাত্যবোধের কোন ইঙ্গিতই লক্ষ্যগোচর হয় না। সময়ের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ স্বীকার করিলেও, মুসলমান-বিজয়ের প্রতিক্রিয়া যে এত শীঘ্র সাহিত্যে সঞ্চারিত হইবে, তাহা সম্ভব মনে হয় না। বিশেষতঃ, নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত সেনবংশ আরও এক শতাব্দী ধরিয়া পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজার ক্ষীয়মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন—এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাব্যসমূহের রাষ্ট্রচেতনা-সম্ভবত্বে সন্দেহ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

ধর্মাদর্শের অধোগামিতার কারণ

ইহার সহিত সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্নও এই উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক। দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এইরূপ নিম্নগামী কেন হইল, এই হঠাৎ-উদ্ভিন্ন দেবসমাজ মানুষের নিম্নতম প্রবৃত্তির অনুকরণে সমাজে নিজেদের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কেন এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিলেন, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী দেবগোষ্ঠী—বিশেষতঃ শিবঠাকুর—কেনই বা ভক্তের মনোরাজ্য হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন, ধর্মজীবনের এই পরিবর্তন-ছন্দটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব কি না, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। মধ্যযুগে দেব-মানবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যে কেবল রূপক-কল্পনা বা মানস সম্মোহের মরীচিকামাত্র ছিল না, পরন্তু নিঃসংশয় বাস্তব সত্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল, তাহা বর্তমান কালের যুক্তিবাদ-প্রভাবমুক্ত হইয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। মধ্যযুগের কাব্যে স্বপ্ন-প্রত্যাদেশের বারংবার উল্লেখ, দেব-দেবীর সশরীরে ভক্তসমক্ষে আবির্ভাব ও ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পূরণ, ভক্তের বিপদে তাঁহাদের কল্যাণহস্ত-প্রসারণ, ভক্তের সহিত তাঁহাদের মানবিক ভাবাবেগ-অনুসারী আচরণ এই সার্বভৌম, অব্যভিচারী, সহজ প্রত্যয়ের নিদর্শন। সমগ্র ধর্মসাহিত্য এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর রচিত। সুতরাং (মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেবমহিমার যে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবতা-মানুষে মিলনের যে-অসংখ্য উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ সত্যরূপেই প্রতিভাত ছিল। তাই তাঁহাদের উক্তিতে কোথায়ও দ্বিধা নাই, কোন প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা

সংশয়-নিরসনের কোন ক্ষীণতম প্রয়াসও নাই। মানবিক ঘটনা ও দৈব সংঘটন যেন একই নিয়মের বশবর্তী হইয়া পাশাপাশি চলিতেছে ও নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। দেবতা কোন রহস্যময় যবনিকার অন্তরাল হইতে কোন অদৃশ্য সূত্র-সঞ্চালনে এই পৃথিবীর ভাগ্যনির্ণয় করিতেছেন না, তিনি মানুষের সহযাত্রী হইয়া একই জীবনের পথে চলিতেছেন ও তাঁহার অপরিমিত শক্তিকে মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণে অকুণ্ঠভাবে প্রয়োগ করিতেছেন। যে-সংস্কার-পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্য রচিত, সেই সংস্কার বাঙালী হিন্দুর ধর্মবোধ ও জীবনপ্রত্যয়ের মধ্যে কেমন করিয়া বিকশিত হইল? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে উদাসীন ও বিত্তহীন শিব ভক্তকে যে-নিরাপত্তা-বোধ ও দাক্ষিণ্য-প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না, তাহাই এই নবোদ্ভূত জনদেবতা-গোষ্ঠী অকৃপণ হস্তে পরিবেশন করিয়া অসংখ্য ভক্তের অন্তরলোকে নিজ নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার কি সবটাই কল্পনা ও অপূর্ণ আশা, না ইহার কিছুটা বাস্তব-ফল-প্রাপ্তি-সমর্থিত? শিবের নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে এই সদ্য-আবির্ভূত দেবমণ্ডলীর সক্রিয়তা কোন্ প্রমাণে ভক্তহৃদয়ে অত্যাজ্য সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? দুইপ্রকার দেবতার ফলদাতৃত্বের বিচারে দুই রকমের মানদণ্ড কেন অবলম্বিত হইয়াছিল?

এই দেবতাত্রয়ীর পূজাপ্রচারের উৎকট আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-হিংস্রতা ও অনুসৃত উপায়ের নিন্দনীয়তা ঠিক সমমাত্রিক ছিল না। ইহাদের মধ্যে ধর্মঠাকুর অনেকটা নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয়; হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আদিদেবতারূপে তিনি ইতিপূর্বেই কতকটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ভক্তকে প্রলুব্ধ করার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে ভক্তকে কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তপস্যা করিতে হইত। যুদ্ধে অজেয়ত্ব ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্যয় ঘটাইবার শক্তি তাঁহার প্রসাদলভ্য ছিল। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের দেবচরিত্রে যে-ভক্তিলোলুপতার আতিশয্যের একটা সাধারণ লক্ষণ ছিল, ধর্মঠাকুর অনেকটা তাহার স্পর্শমুক্ত। বৌদ্ধধর্মের বিকারযুগে দেবারাধনা যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে পূজাবিধির উপচার-বহুলতার দিকে ঝুঁকিয়াছিল ও তান্ত্রিকতার জটিল অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে অলৌকিক ফললাভ-প্রত্যাশী হইয়াছিল, ধর্মঠাকুর সেই পরিবর্তনযুগের ভক্তিভাব-সাঙ্কর্যের দেবতা। ইহার হিন্দুধর্মগ্রহণোৎসুক নিম্নবর্ণের উপাসকগোষ্ঠী ইহাকে উচ্চবর্ণের দেবমণ্ডলী-ভুক্ত করিবার প্রয়াসেই মঙ্গলকাব্য-মাধ্যমে ইহার মাহাত্ম্য-কীর্তন করে। ইনি হিন্দুদেবতার মধ্যে স্থান না পাইলেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার পূজাচর্চা এখনও অক্ষুণ্ণ

ধর্মঠাকুরের বৈশিষ্ট্য

আছে। ইঁহার সম্বন্ধে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রবল আকর্ষণ ও প্রবল বিমুখতার মাঝামাঝি একটা নিরুৎসুক উদাসীন মনোভাবই বর্তমান।

চণ্ডী দেবীই তাঁহার দীর্ঘযুগব্যাপী ভাবোন্নয়নের ফলে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের সহিত প্রায় একাত্মভাবেই মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনার ক্রমবিবর্তন-প্রক্রিয়ায় আমরা তাঁহার অনার্যত্ব প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি। যে-মাতৃশক্তি আর্য-অনার্য উভয়েরই সমভাবে অর্চনীয়, তাঁহারই জ্যোতির্মণ্ডল ও বিশুদ্ধ ভাবাদর্শ তাঁহার আদিম কুলপরিচয়কে এক ভাস্বর যবনিকার অন্তরালে গোপন করিয়াছে। তাঁহার আত্মপ্রচার-ক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত মৃদু ও নির্দোষ। তিনি পশুর দেবতা হইতে পশু-হন্তার দেবতায় অনেকটা আকস্মিকভাবেই উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে প্রসন্ন স্নিগ্ধতা ও সরস কৌতুকময়তাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার খামখেয়ালী মেজাজ ও লৌকিক-মাতৃসুলভ সন্তান-বাৎসল্য কলিঙ্গরাজ্য-প্লাবনেই উদাহৃত। কালকেতু উপাখ্যানে কালকেতুকে বিপন্মুক্ত ও রাজত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি-উপাখ্যানে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীরূপে পূজা বণিক-পত্নীদের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছে। শিবভক্ত ধনপতি স্ত্রীদেবতার প্রতি অবজ্ঞা-বশতঃ তাঁহার ঘট পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া তাঁহার রোষভাজন হইয়াছে। তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে মনসার মত প্রাণহননে ও অতন্দ্র প্রতিহিংসাবৃত্তির প্রত্যক্ষতায় নয়, নৌকাডুবির মৃদুতর শক্তিতে ও কমলে-কামিনীর ছলনাময়ী মায়া-বিভ্রান্তিতে। তাঁহার সেবিকা খুল্লনার সপত্নীকৃত নির্যাতনের সময় তিনি নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ধনপতির ত্রুটি-স্বীকারে ও প্রায়শ্চিত্তে তিনি আবার প্রসন্না মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে অনাবিল সংসারসুখে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দৈবী মহিমা প্রকটিত হইয়াছে দৈহিক শক্তির নিষ্ঠুর পীড়নে নয়, দুর্বোধ্য লীলারহস্যের মায়াজালপ্রসারে। চণ্ডী হইতে অন্নপূর্ণার ক্রমবিকাশ-ধারাটি আমাদের নিকট অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যে প্রতিভাত হয়—মধ্যযুগের অলৌকিক কুহেলিকা হইতে প্রাক্-আধুনিক কালের স্বতঃ-আলোকিত সহজবোধ্যতায় তাঁহার অবতরণ একান্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য।

চণ্ডীদেবী-কল্পনার ক্রমবিবর্তন

দেবচরিত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনসার ক্ষেত্রে। সর্পমাতার দেবত্বে উন্নয়ন আমাদের নিকট অস্বাভাবিক ও সহজ ন্যায়ের বিরোধী বলিয়াই ঠেকে। এক দৈবী শক্তি ও ক্রূর প্রতিহিংসার চরম নির্মমতা ছাড়া তাঁহার দেবত্বের আর কোন অধিকার নাই। সমাজমন কতটা ভয়চকিত হইলে ও

সম্ভ্রমবোধ হারাইলে দেবত্বপরিকল্পনা এরূপ হীন রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার পরিমাপ করিতেও সংকোচ হয়। মনে পড়ে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষে যখন বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ভারত-কুশাসনের অভিযোগ উপস্থাপিত হয়, তখন হেস্টিংসের আপাতজনপ্রিয়তা-যুক্তির খণ্ডনে মহামতি বার্ক বাঙালী-চরিত্রের এই এই সর্পপূজা-প্রবণতার বিদ্রূপাত্মক উল্লেখ করেন। মনসামঙ্গল কাব্যেই বোধ হয় মুসলমান-বিজয়ের পরোক্ষ ছদ্মবেশী প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। অসহায় অদৃষ্টনির্ভরতা ও অত্যাচারী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণের বিষ জাতির অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত না হইলে, মনসাপূজা সমাজে অনুষ্ঠিত হইলেও কখনও কাব্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারিত না। ধর্মঠাকুরের মধ্যে আত্ম-সমাহিত মহিমা ও চণ্ডীর মধ্যে মাতার উদ্ভট আচরণে সন্তান-বৎসলার স্নেহোচ্ছলতা আমাদের ভক্তিবিগলিত দেবস্বীকৃতির কিছুটা প্রেরণা দেয়। কিন্তু মনসার হাজার দোষের মধ্যে কোন গুণই আমাদের চিত্তে ক্ষীণতম রেখাপাত করিতে পারে না। ভক্তির মধ্যে কিছুটা ভীতি, সম্ভ্রম ও দূরত্ব-বোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যে-ভক্তি একান্তভাবে ভীতিনির্ভর, যাহার মধ্যে উচ্চতর দেবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার কোনও নিদর্শন নাই, তাহা যেমন বীভৎস দেবতার স্বরূপ কল্পনা করে, সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের চরম অধঃপতনেরও নির্দেশ দেয়। অন্য দেবতার পূজা হয় কিছু ফলপ্রাপ্তির আশায়; মনসার পূজা নিছক আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য-মূলক। মনে হয়, বাংলা দেশ একই নীতিতে বৈদেশিক অভিভব ও হিংস্র দেবতার পূজা মানিয়া লইয়াছিল। মনসার পূজা যদি কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তী হয়, তবে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্পবিষ-স্তিমিত মনোবল লইয়াই বাঙালী বৈদেশিক আক্রমণের ব্যর্থ প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্রতী হয়।

মনসাচরিত্র-কল্পনায় সমাজমনের ভয়ার্ত রূপ

এই-সমস্ত তথ্য ও অনুমানের যথাযথ মূল্যায়নে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। (তুর্কী-আক্রমণের বহু পূর্ব হইতেই—দশম-একাদশ শতক হইতেই—বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং আর্য ও অনার্য-স্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনস্পৃহার জন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি-গত একটা ব্যাপক পরিবর্তন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায়গুলি দৃঢ় অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট ধর্মস্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দু-ধর্ম ও দেবতামণ্ডলীর মধ্যে এক মিশ্র-দেবতত্ত্বের আশ্রয়গ্রহণে উৎসুক হইয়া

মঙ্গলকাব্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের আভাস

উঠিয়াছিল। পৌরাণিক বিশুদ্ধ ভক্তিবাদের সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পার্থিবঐশ্বর্যস্পৃহা মিশ্রিত হইয়া এক আদর্শহীন, দেবপ্রসাদ-লালায়িত, ভক্তিমূল্যে সুখক্রয়লোলুপ ভিক্ষা-মনোবৃত্তি মানুষ ও দেবতার মধ্যে নূতন-সম্পর্ক-নির্ণায়ক হইয়া দাঁড়াইল। ধর্মের উন্নত-আদর্শভ্রষ্ট দুর্বল মানুষ কামনার প্রশ্রয়দাতা দেবতার চরণে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কিছু ধূলিমলিন সংসারসুখ অর্জন করিয়াই ভক্তিসাধনার সুলভ চরিতার্থতা লাভ করিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই পরিবর্তন-তরঙ্গেরই কয়েকটি আলোড়ন-বিন্দু বিধৃত হইয়াছে। উহাদের মূল প্রেরণা রাষ্ট্রনৈতিক নয়, ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত; উহাদের উদ্দেশ্য বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগঠন নয়, সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ মানস-আবেগ-প্রবতিত সমন্বয়-প্রয়াস। বিদেশী শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য নয়, নিজ ধর্মাশ্রয়চ্যুতির শূন্যতা-পূরণের জন্যই এই নবদেবপরিকল্পনা ও বৃহত্তর মিলনাকৃতি। ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্মধারা ও বিচ্ছিন্ন অনার্যগোষ্ঠীর শীর্ণ পারলৌকিক আকূতি-নির্ঝর যে-ভাবতরঙ্গে স্ফীত হইয়া হিন্দুধর্মবোধের সমুদ্র-সঙ্গমে পৌঁছিতে চাহিয়াছিল, মঙ্গলকাব্যসমূহ সেই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত কয়েকটি বিরাট হ্রদ। যে-মুষ্টিমেয় সাধক গীতা-উপনিষদের দুষ্প্রবেশ্য ভাবলোকের অধিবাসী বা বৈষ্ণব-ভাবসাধনার অলৌকিক রসমাধুর্যে সংসার-বিবিক্ত, তাহাদের বাদ দিয়া বাকী অগণিত বাঙালী জনসাধারণ এই মঙ্গলকাব্যের ঈষৎ-কষায় কূপোদকেই আপনাদের ধর্মতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। সাধারণ বাঙালীর ধর্মজীবন, উহার সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তার স্থূল কামনা, উহার পূজা ও প্রসাদের নিত্যসম্পর্কবিষয়ক প্রত্যাশা, উহার নিম্নকোটিক আদর্শ—সবই মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণভাবকল্পনা-পুষ্ট। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ঝটিকাঘাত এই পরিবর্তন-তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের আদিম প্রেরণার সহিত নিঃসম্পর্ক।

৪

মঙ্গলকাব্যে সমাজ-জীবনের ছবি

মঙ্গলকাব্যের ব্যাপ্তিকাল চৈতন্য-পূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় চারিশত বৎসর ধরা চলে। ইহার মধ্যে বাঙালী-সমাজের নানা পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠানশাহীর অবসানে তখন মোগল-সাম্রাজ্য বাংলার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়াছিল। কিন্তু পল্লীপ্রধান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘটা সাময়িক ছায়াপাত করিলেও কোন বাত্যাচঞ্চল দ্রুত পরিবর্তনের প্লাবন আনিতে পারে নাই। স্বাভাবিক ভাবে শম্বুক-গতিতে জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল এবং যে-পরিবর্তনের পথে সমাজ চলিতেছিল,

তাহার গতিও ছিল মন্থর। এই কারণে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা ওলট-পালট না হওয়াতে, এই চারিশত বৎসরের সামাজিক অবস্থা মোটামুটি অতীতানুসারী ছিল এবং মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য হইতে এই ধীর রূপান্তর-প্রক্রিয়ার একটা নক্শা পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিরের আক্রমণের বেগ খুব বেশী না হইলেও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রভাব বাঙালী-সমাজকে শুধু ধর্ম-জীবনে নহে, সামাজিক জীবনেও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল এবং এই গতির প্রবলতাকে অনেকে সমাজ-বিপ্লব বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তখন সবে শুরু হইয়াছে। কিন্তু ইহা চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত নবাব, রাজা, জমিদারের আশ্রয় ছাড়া স্বাধীন বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কবিগণ, 'গুণরাজ খাঁ', 'কবিকঙ্কণ' প্রভৃতি নানা খেতাব পাইতেন।

বেশভূষা-অলঙ্কারের মধ্যেও এই সময়ে সুরুচি ও উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের পোশাক—"একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।" মেয়েরা পশ্চিমাদের মত কাঁচুলি পরিতেন, বিশেষতঃ উৎসব-সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। মেঘডম্বুর-আদি নানা রকমারি শাড়ীর নাম পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পরিত 'খুঞার বসন।' শাঁখা ও স্বর্ণালঙ্কারের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গহনার প্রতিও আগ্রহ দেখা যায়। পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুণ্ডল থাকিত। লম্বা চুল রাখা পুরুষগণেরও সৌন্দর্যবর্ধক ছিল। "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কূল।" নাগর জীবন সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—"নগরে নাগরজনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঞ্জন পরিধান।" কানাড়ী প্রভৃতি নানা ছন্দে খোঁপা বাঁধিতেন মেয়েরা।

বিদ্যাচর্চা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোলের অধ্যাপক ব্রাহ্মণই হইতেন এবং উঁহাদের ব্যাকরণ-প্রীতি অধিক ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন বেশী ছিল না। তবে কেহ কেহ সামান্য কিছু জানিতেন।

দেশে বণিকদিগের খানিকটা খ্যাতি ছিল। সমুদ্রযাত্রার যে-সব বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা শোনা কথা বলিয়াই মনে হয়। বাণিজ্য-বহর নৌকাতে চলিলেও তাহা যে সমুদ্রপার হইয়াছে, বর্ণনা দ্বারা তাহা বোঝা যায় না। দ্রব্যবিনিময় হইত। কড়ি দিয়া সাধারণতঃ কেনা-বেচার রীতি ছিল। পণ্য-মূল্যের তালিকা দেখিয়া জিনিসপত্র অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের বর্ণনা যেগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকখানি কৃত্রিম। যথার্থ বীরত্ব তাহার মধ্যে নাই। বাঙালী সৈনিক ছিল এবং নানা জাতির মধ্য হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইত। বড় রকমের যুদ্ধের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে নাই। ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধগুলি অতি-প্রাকৃত-প্রভাবপুষ্ট বর্ণনা।

রাজনৈতিক পবিবেশে যে একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি বা ব্যাপক মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। মুসলমান ডিহিদার ও নবাবগণ ক্ষেত্রবিশেষে বিধর্মীদের উপব অত্যাচাব করিতেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তাহার আভাস আছে। কিন্তু তাহা কদাচ অরাজকতা সৃষ্টি কবে নাই—স্থানীয় ও সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর নগর-পত্তন-পালার যে নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাব ছবি দিয়াছেন, তাহাতে একটা নূতন সমাজ-সংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের এক সুনিশ্চিত আভাস মিলে। ইংরাজ-যুগ পর্যন্ত যে-সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার যে প্রথম ভিত্তি-পত্তন ষোড়শ শতকে হয়, মুকুন্দবামের মঙ্গলকাব্য হইতে আমাদের এই প্রতীতিই জন্মে। ঘব-গৃহস্থালির কথা, বহুবিবাহের বিষয়, সতীনের জ্বালা, বশী-করণের ঔষধ করিবার চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্র বিবরণ আছে। ভারত-চন্দ্রের আমলে আসিয়া গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাসিতার রুচি দ্বারা অভিভূত হইয়াছে দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে এই কারণে ভারতচন্দ্রের কাব্য অনেকখানি অভিজাত। তাহা হইলেও বাঙালী জাতির অন্তরের সাধারণ কথাটি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষা পাইয়াছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" অর্থাৎ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের প্রাচুর্যপূর্ণ সহজ সরল জীবনই তখন অনভিজাত সমাজের প্রধান কাম্য ছিল।

৫

এখন এই তিনজাতীয় প্রধান মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও সমাজ-চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা সম্বন্ধে কিছু তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। ইহাদের ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় এত অনিশ্চয়াত্মক ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে, এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ এই আনুমানিক কালক্রমের প্রতি অতিমনোযোগ উহাদের শাশ্বত সাহিত্যমূল্য-

নির্ধারণ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা উদাসীন করিয়া তোলে। অথচ বাংলা সাহিত্যে উহাদের স্থান সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যগুণনির্ভর।

(ক) ধর্মমঙ্গল কাব্য

রচনার দিক দিয়া না হইলেও বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে ও বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়-প্রয়াসের প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে ধর্মমঙ্গল কাব্যই আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবতত্ত্ব-অধ্যায়ে যে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নাথ ও বৌদ্ধ ধর্মচিন্তার মিশ্রিত আকর হইতে সংগৃহীত। এইগুলিতে শিবদুর্গার যে পরিণয়-কাহিনী ও গার্হস্থ্য জীবন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা অনার্য ও অ-হিন্দু উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পৌরাণিক ধর্মাদর্শের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুরাণশাস্ত্রসম্মত ও হিন্দুভক্তিসাধনা-পরিশ্রুত পরিণতি লাভ করিয়াছে। ধর্ম সূর্যদেবতাই হউন বা ছদ্মবেশী বুদ্ধই হউন, তিনি যে বাংলার নিম্নবর্ণ সমাজে বহুপূর্ব হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা সুস্পষ্ট। তিনি অনভ্যস্ত পূজালোলুপ নূতন দেবতা নহেন। তিনি সুপ্রাচীন অতীত হইতেই বাঙালী জাতির একটি বৃহৎ অংশের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছেন ও যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণেও নিজের ব্যক্তিত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াই উচ্চবর্ণের পৌরাণিক দেবতার সহিত অভিন্নত্ব-লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

পূজা-নিস্পৃহ প্রাচীন মিশ্র দেবতা ধর্মঠাকুর

ধর্মের পূজাবিধির জটিল বিমিশ্রতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ পরম্পরা, উহার মন্ত্রে সংস্কৃত ও লৌকিক বাংলার যুগপৎ প্রয়োগ ও অর্চনায় উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণ ডোম পুরোহিতের নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতা, উহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রাধান্য ও অসম্ভব সংঘটনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও উহার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সমর্থিত অবিচল প্রত্যয়—এ সমস্তই উহার অসাধারণ সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যের নিদর্শন। আর কোন দেবতার পূজায় জাতিভেদ-বিড়ম্বিত হিন্দু সমাজ এত ভেদবুদ্ধিহীন, সার্বজনীন ভক্তির আশ্রয়ে অখণ্ড ঐক্যের স্ফুরণ অনুভব করে নাই। আর কোন দেবতার পূজায় পূজারী এমন হাতে হাতে ফল পায় নাই। বন্ধ্যার সন্তান-লাভ, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধের সদ্যোরোগমুক্তি জাতির মনে আর কোথাও এমন দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করে নাই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য যে ধর্মের ভক্ত্যাদের আগুনে ঝাঁপাইয়া, হাত-পা-বুক শূলে ফুঁড়িয়া, লৌহকাঁটাবিদ্ধ পাটায় গড়াগড়ি দিয়া

হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে এরূপ অক্ষত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইবার দৃষ্টান্ত আর কোন দেবপূজার মধ্যে নাই। এ সমস্তই ধর্মের অলৌকিক শক্তি ও অসীম ভক্তবাৎসল্যের চাক্ষুষ প্রমাণরূপে ধর্মপূজকদের মনে এক অপূর্ব উন্মাদনা ও সন্দেহ-লেশহীন বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছে। ধর্মঠাকুরের কৃপায় স্বর্গ-মর্ত, সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়াছে ও মৃতের পুনর্জীবন ও পশ্চিমে সূর্যোদয়ের ন্যায় অনৈসর্গিক সংঘটনের সম্ভাব্যতা ভক্তমণ্ডলীর মনে একটা সহজ সংস্কারের মতই বদ্ধমূল হইয়াছে। কাজেই ধর্মঠাকুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি যে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পরোক্ষ আশ্বাস ও বিলম্বিত বিপন্মুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার অপেক্ষা বেশী সজীব ও সক্রিয় ছিল তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ধর্মপূজার সার্বজনীন রূপ ও অলৌকিক বিশ্বাস

বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে ধর্মমঙ্গল কাব্য সর্বাপেক্ষা পূর্বগামী। প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলের ঘটনার কালনির্দেশরূপে ধর্মপাল ও তাঁহার পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অন্ততঃ এই দুইটি নামকে ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিলে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ঘটনাগুলি খ্রীষ্টীয় নবম—দশম শতকের ব্যাপার দাঁড়ায়। অন্যান্য চরিত্রগুলির—যথা লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতির—ঐতিহাসিকতার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না মিলিলেও তাহারা ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাঢ়ের যুদ্ধবিগ্রহবিক্ষুব্ধ, রাজনৈতিক-ষড়যন্ত্রকুটিল, গৌড়েশ্বর ও তাঁহার সামন্ত রাজাদের কখনও আনুগত্য, কখনও বিদ্রোহ-চিহ্নিত সম্পর্কের যে পরিচয় মিলে তাহা বাস্তব ইতিহাসের অঙ্গীভূত রূপে কল্পনা করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না।

ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিকত্ব

অবশ্য যুদ্ধের বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ ও রাজবর্গপ্রকৃতি সমস্তটাই ঘরোয়া ও দেবতার অলৌকিক শক্তি-বিকাশের পটভূমিকারূপে কল্পিত। দেবতারা যুদ্ধ বাধাইয়া ভক্তকে বিজয়ী করিয়া নিজ মহিমা দেখাইতেছেন ও ভক্তির আরও উচ্চতর রাজকর আদায় করিতেছেন। ভাঁড়ু দত্ত এখানে দেবীর ইচ্ছার অসংজ্ঞান বাহনরূপে কলিঙ্গকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে দেবী নিজে ডাকিনী-যোগিনী সহ রণাঙ্গনে অস্ত্র ধরিয়াছেন। মুকুন্দরামে দেবী যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া স্বপ্নাদেশে বিজয়ী কলিঙ্গরাজকে পরাজিত কালকেতুকে নিজরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য করিয়াছেন। মোট কথা এই যুদ্ধ দৈবী মায়ার মতই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়; যুদ্ধের সমস্ত মারামারি-কাটাকাটির পিছনে নেপথ্যবাসিনী মহামায়ার অদৃশ্য উপস্থিতি সমস্ত বিষয়টিকে অমানবিক কুহেলিকায় ঘিরিয়াছে। ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধসমূহ বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়োজন

ও মানবিক-বৃত্তি-সঞ্জাত। সমস্ত যুদ্ধেই ধর্মপ্রসাদপুষ্ট লাউসেন জয়লাভ করে। কিন্তু রক্তপাত ও নৃশংসতা, অস্ত্রের ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপ ও মানবিক বিজিগীষার উত্তাপ-উত্তেজনা উহাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। এইরূপ একটি যুদ্ধে সামন্তরাজ কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়, ছয় বধূ সহমরণে যায়, রানী অসহ্য দুঃখে আত্মঘাতিনী হন, ও বৃদ্ধ রাজার অন্তিম জীবনে নিঃসঙ্গতার বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠে। এই শোকের কোন দেবানুগ্রহমূলক সুলভ সমাধান হয় নাই। পক্ষান্তরে মনসার কোপে হত চাঁদের ছয়পুত্র আবার তাঁহার প্রসাদে বাঁচিয়া উঠে, বৈধব্যব্রতচারিনী ছয় বধূর মুখের হাসি সিঁথির সিঁদূরের সহিত আবার উজ্জ্বল হয়, চাঁদের শোকান্ধকার গৃহে শান্তির মঙ্গল দীপ নূতন করিয়া প্রজ্বলিত হয়। শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী লখীন্দর-বেহুলা তাঁহাদের দৈবনির্দিষ্ট কার্য সমাপ্ত করিয়া স্বর্গলোকে ফিরিয়া যান, কিন্তু ফিরিবার পূর্বে মানবের বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার ভারসাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নির্মম, সান্ত্বনাহীন ভাগ্য-বিড়ম্বনার উদাহরণ-স্বরূপ ধর্মমঙ্গলের জীবনবেদনা মনসামঙ্গলের সহিত তুলনায় আমাদের মনে আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

রাঢ়ের জনজীবনের যে খণ্ডাংশসমূহ ধর্মমঙ্গল-কাব্যে স্থান পাইয়াছে তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব ও জাতীয় মানসের একটা নূতন দিক্ উদ্ঘাটিত করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সাধারণ বাঙালীর যে মেরুদণ্ডহীন নমনীয়তা, দেবতার অভিপ্রায়ের নিকট আতঙ্কিত আত্মসমর্পণের যে চিত্র পাই, এখানে তাহার বিপরীত রূপটিই আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও দেশরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে যে সংকল্পের দৃঢ়তা, যে অনমনীয় প্রতিরোধস্পৃহা স্বাভাবিক, এখানে বাঙালী চরিত্রে সেই সমস্ত গুণেরই বিকাশ দেখা যায়। বিশেষতঃ মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে হীনবর্ণ বাঙালী সমাজের প্রত্যক্ষ দর্শন মিলে না। উহাদের ঘটনা সমস্ত দেবতাকেন্দ্রিক ও ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন মানব চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলে একমাত্র লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দৈবশক্তিসম্পন্ন, দেবানুগৃহীত অতিমানব। কিন্তু অন্যান্য নর-নারী সকলেই দেবতাসম্পর্কহীন সাধারণ মানুষ ও মানবিক শক্তি ও দুর্বলতার উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা জীবনসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কালু ডোম, লখাই ডোমনী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর নর-নারী ও কলিঙ্গা, কানাড়া প্রভৃতি অভিজাতবংশীয়া রমণীরাও অদ্ভুত শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ও প্রখর ব্যক্তিত্বসমন্বিত। দেবভক্তি ও বীরত্বময় আত্মপ্রত্যয় যে পরস্পরবিরোধী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা বহু পরিমাণে

অপনোদিত হইয়াছে। রাঢ়রমণীগণের অপূর্ব বীরত্ব-গাথায় বাঙালীর অদৃষ্টনির্ভর ভীরুত্বের অপবাদ অনেকটা খণ্ডিত হইয়াছে। মহামদ পাত্রের চরিত্রে রাজনীতিসুলভ কূটচক্রান্তপ্রবণতার চমৎকার নিদর্শন মিলে। লাউসেনের প্রতি ঈর্ষ্যাবিকৃত চিত্ত লইয়া সে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে ও লাউসেন যে উপায়ে সে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অলৌকিকত্বের সংস্রব থাকিলেও তাহারা প্রধানতঃ বাস্তব রাজনৈতিক-কারণ-উদ্ভূত। মহামদ দুর্বৃত্ত বটে, কিন্তু তাহার দুর্বৃত্ততা তাহার সচিবসুলভ কূটনীতির সহিত জড়িত। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মহামদ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মঠাকুরের প্রতি যে পূজানিবেদনে প্ররোচিত হইয়াছিল, ধর্মঠাকুর তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুতরাং যে কোন অজুহাতে পূজা-আদায়ের জন্য লোলুপ মঙ্গলকাব্যের দেব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সবসুদ্ধ মিলিয়া ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের রাজনৈতিক জীবনযাত্রা ও উহার নিম্নশ্রেণীর নর-নারীর মহিমান্বিত দেশাত্মবোধের যে উজ্জ্বল, বস্তুরসসমৃদ্ধ চিত্র আমরা পাই, তাহাতে ইহাদিগকে রাঢ়ের মহাকাব্যের খণ্ডাংশরূপে অভিহিত করা অসঙ্গত হয় না।

ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি

ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু প্রাচীনতম; কিন্তু উহার কাব্যনিদর্শনসমূহ সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অত্যাধুনিক। ইহার কারণ এই যে ধর্মের পূজাবিধির মধ্যে যে ব্যাপক ও জটিল সংশ্লেষ-ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহা বহু শতাব্দীর অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল। এই সংশ্লেষ সম্পূর্ণ না হইলে উহার কাব্যরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। আদিতে যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী উহার বীজরূপে বিন্যস্ত ছিল, তাহাই পরবর্তী কালে ইতিহাসের ঘটনা-অবলম্বনে, গৌড়েশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া লাউসেনের বহু-বিস্তৃত বিজয়াভিযান ও অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের দৃষ্টান্তকে নিজ পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে—ছোট বীজ বৃহৎ শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বৃক্ষে প্রসারিত হইয়াছে। তা ছাড়া পূজাবিধির প্রথম প্রবর্তক ডোম পুরোহিতেরা নিরক্ষর ছিল বলিয়া কাব্যাকারে ধর্মমহিমা কীর্তন করিতে পারে নাই। ইহার জন্য উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবিগোষ্ঠীর সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বহু শতাব্দীর পরে যখন কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা ধর্মমন্ত্রে দীক্ষিত ও ধর্মের নিষ্ঠাবান পূজকে রূপান্তরিত হইল, তখনই ধর্মরাজ হীনবর্ণের ভক্তের প্রকাশকুণ্ঠ ভক্তিসাধনা হইতে সারস্বত প্রসাদে স্ফুটবাক কবিসম্প্রদায়ের কাব্যের বিষয়রূপে আবির্ভূত হইলেন। ইহার

প্রাচীনতম বিষয়বস্তুর অত্যাধুনিক কাব্য-রূপতার হেতু

মধ্যে দীর্ঘকাল উচ্চবর্ণের কবিদের সামাজিক প্রতিকূলতা ও জাতিচ্যুতির ভয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেইজন্য কবিগণ কাব্যরচনার প্রেরণা-স্বরূপ দেবতার স্বপ্ন-প্রত্যাদেশ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কেহ কেহ বা ধর্মরাজের নিকট বিনীত অসম্মতিও জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধর্ম যখন তাঁহার পূজাপ্রসারের অভিলাষী ছিলেন না, তখন তাঁহার এই ভক্ত কবিদের প্রতি স্বপ্নাদেশ অকারণ বলিয়াই মনে হয়। অনুমান হয় অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে ধর্মমঙ্গলে এই স্বপ্নাদেশ কিঞ্চিৎ বিসদৃশ ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ধর্মঠাকুরের নিজ অভিলাষ-পূরণ নহে, তাঁহার উচ্চবর্ণের উদ্গাতাদের সামাজিক অপরাধক্ষালন।

ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠী

ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠীর বিস্তৃত পরিচয় ও কালনির্দেশ অনাবশ্যক। ইহার আদি কবি ময়ূর ভট্টের আবির্ভাবকাল ও রচনার নিদর্শন অজ্ঞাত। মাণিকরাম গাঙ্গুলির পরিচয়ও অনিশ্চয়ের কুহেলিকাবৃত—তবে মোটামুটি তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করা যাইতে পারে। রূপরামের রচনাকাল ১৫৯০ খৃঃ অঃ নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে আর এক প্রাচীনতর আদি রূপরামের অস্তিত্ব-কল্পনা দুরূহ হইয়া পড়ে। সীতারাম-দাসের পুঁথিগুলির অনুলিখনের সাল যদি মল্লাব্দ অনুসারে নির্দেশিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার ধর্মমঙ্গলের পুঁথিখানির জন্য একটা স্বতন্ত্র কালের মানদণ্ড-অবলম্বন নিরর্থক। সুতরাং ধর্মমঙ্গলখানির রচনাকালও মল্লাব্দ-অনুযায়ী ১৬০৮ খৃঃ অঃ হওয়াই উচিত।

ঘনরাম

ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয় ১৭১১ খৃঃ অঃ-এ। তিনিই একমাত্র কবি যিনি স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ করেন নাই। ঘনরামের কাব্যে ভারতচন্দ্রের ন্যায় স্মরণীয় সুভাষিতাবলীর প্রচুর নিদর্শন মিলে। তাঁহার কাব্যের বীরত্বপূর্ণ বাতাবরণে শোকাকুলা নারীর চোখের জলও মুহূর্তে শুকাইয়া যায়। আশু কঠোর কর্তব্যের তাগিদ অতিপল্লবিত শোকবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনে। লাউসেনের বীরত্বের পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা কর্পূরের ভীরুতা বৈপরীত্যের সার্থক সন্নিবেশে উভয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকেই চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। সহদেব (১৭৩৫), নরসিংহ (১৭৩৭), হৃদয়রাম (১৭৪৯), গোবিন্দরাম (১৭৬৬?) প্রভৃতি কবিপরম্পরা ধর্মমঙ্গল কাব্যপ্রবাহকে আধুনিক যুগের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

(খ) মনসামঙ্গল

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে ভাবপ্রেরণার দিক দিয়া কোনটি অগ্রবর্তী তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য হইলেও সাহিত্যিক আবির্ভাবের দিক দিয়া মনসামঙ্গলই প্রাচীনতর। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ উভয়ের আমরা যে বর্ণনা পাই, তাহাতে উভয়ই যে সুপ্রতিষ্ঠিত, বহুজনসেবিত, আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ও ভোগোপচারবহুল পূজাবিধিরূপে চৈতন্যপূর্ব সমাজে বর্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হই। হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ যাহাই হউক, এই দুইটি উপধর্ম যে লৌকিক উৎসবরূপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। চৈতন্য-দেবের পুরাণানুসারী, আদর্শবিশুদ্ধি ও ভাবৈশ্বর্যে মহনীয় প্রেম-ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যে ইহারা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহাদের দেশব্যাপী প্রভাবের নিদর্শন। ইহারা যে ছোটখাট কয়েকটি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণগণ্ডীসীমিত, অনার্য ও অশিক্ষিত জনসংঘের সবল-কল্পনা-উদ্ভূত, আদিম স্তরের অনুষ্ঠানমাত্র ছিল না, পরন্তু পৌরাণিক ভক্তি-আবেগ ও রূপারোপপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা সুনিশ্চিত। হয়ত চৈতন্য-ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে শক্তিপূজার বিশুদ্ধতর ভাবদীক্ষা প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ না করিলে মনসা ও অনার্যচিন্তাপ্রসূতা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধান দেবতারূপে পূজিতা হইতে থাকিতেন।

মনসামঙ্গল প্রাচীনতর রচনা

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিম রূপটি কোথায়ও অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয় নাই। আমরা পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্রতর ব্রতকথানুরূপ কাহিনী হইতে বাংলা কাব্যের আদিমরূপটি কল্পনা করিতে পারি। বাঙলা দেশের কবিদের হাতে লক্ষীন্দর-বেহুলার কেন্দ্র-কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর বিবাহ ও সংসারজীবন, মনসার জন্ম ও পার্বতীর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ, তাহার নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-পরিত্যক্ত জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও পূজালোলুপতা ও নরখণ্ডে চাঁদের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও ভাগ্য-বিপর্যয়, লখাইএর সহিত বেহুলার বিবাহ ও বাসরঘরে সর্পদংশনে তাহার প্রাণত্যাগ, বেহুলার অসাধারণ মনোবল ও একাগ্র ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে তাহার

মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবন—এই সমস্ত বিষয়ের অতিপল্লবিত ও সময় সময় বাস্তব-রসপূর্ণ বর্ণনা সংযুক্ত হইয়া কাব্যগুলি একটি বিরাট পুরাণের আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সমস্ত মনসামঙ্গলেই এই আখ্যানবস্তুর অভিন্নতা লক্ষিত হয়। এইরূপ ঘটনা-কাঠামোর সর্বস্বীকৃত গ্রহণ নিশ্চয়ই দুই-তিন শতাব্দীর অনুশীলন ও প্রচারের ফল। এই হিসাবে দেখা যাইবে যে মনসামঙ্গলের বীজ তুর্কী আক্রমণের পূর্ব হইতেই জাতীয় চেতনায় উপ্ত ছিল। তুর্কী বিজয়ের যদি কোন প্রভাব ইহার মধ্যে থাকে, তবে ইহা এই পূর্বাগত সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মনসামঙ্গলের আদিরূপ ও কাল

কানা হরিদত্ত জনশ্রুতিতে মনসামঙ্গলের আদি কবিরূপে প্রখ্যাপিত। ইহার সম্বন্ধে ইহার অব্যবহিত পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্ত যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলা-সাহিত্য-প্রচলিত অতীত-প্রশস্তি-রীতির একটি বিরল ব্যতিক্রম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য বিজয়গুপ্তের এই অশিষ্ট উক্তিকে বিদ্বেষ-প্রসূত ও তথ্যতঃ অযথার্থ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হরিদত্তের যে কয়েকটি রচনাংশ-উদ্ধৃতিব উপর তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংখ্যা ও পরিমাণে এত অল্প যে উহাদের সহায়তায় হরিদত্তের প্রশংসা বা অপ্রশংসা কোনটাই চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায় না। নিন্দা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা গৌণ, কিন্তু যাহা মুখ্যতঃ আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে তাহা হইল বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই স্পষ্টভাষণের অসংকুচিত প্রয়োগ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আদি কবির সশ্রদ্ধ উল্লেখের সহিত তুলনায় হরিদত্তের প্রতি এই কটুভাষণ আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ায়।

আদি কবি হরিদত্ত

লক্ষ্য করিতে হইবে হরিদত্তের এই নিন্দা শুধুমাত্র কবিত্বশক্তি ও আখ্যান-গ্রন্থনৈপুণ্যের অভাবের জন্য নহে। সমস্ত উপস্থাপনারীতি, ছন্দোপতন ও গীতের দিকে আপেক্ষিক অমনোযোগও এই নিন্দার কারণ। অনর্থক লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গীর বাহুল্য সমস্ত অভিনয়টিকে রুচিহীন করিয়া তোলে—ইহাও অভিযোগের অন্যতম হেতু। হরিদত্তের গীত যদি কালে লুপ্ত হইয়া থাকে তবে এই অবলুপ্তির জন্য অন্ততঃ একশত বৎসর লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

হরিদত্তের পাঁচালীর ত্রুটি

হরিদত্তের রচনার প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিলে ইহাতে মঙ্গলকাব্য রচনা ও পরিবেশনের একটি নূতন রীতিপরিবর্তনই সূচিত হইতেছে

এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ঠেকে। মনে হয় হরিদত্ত মঙ্গলকাব্যের যে আদিমরূপ—ইহার ব্রতকথা ও পাঁচালীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকার ও শিথিল অবয়ব-বিন্যাস—তাহারই প্রবর্তক ছিলেন। ইহার কাব্যমূল্য, বর্ণনাপদ্ধতি ও গীতরূপায়ণ খুব নিকৃষ্ট স্তরেরই ছিল ও ইহা নানাবিধ স্থূল অঙ্গভঙ্গী ও বৈচিত্র্যহীন স্বরপ্রয়োগে আবৃত্তির দ্বারা প্রাকৃত জনসাধারণের কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিত। পরবর্তী যুগের নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয়-সন্নিবেশ ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে এক উন্নততর আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহাকে উচ্চশ্রেণীর কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্যই মনে হয় হরিদত্তের সঙ্গে তাঁহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী।

হরিদত্তের কাব্যের সম্ভাব্য রূপ

নারায়ণ দেবের উদ্ভবকাল ও বাসস্থান সম্বন্ধে যে তুমুল বাদানুবাদের অবতারণা হইয়াছে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কাব্যের রস-আস্বাদনের জন্য তাহার সম্যক্ আলোচনা অপরিহার্য নহে। তাঁহাকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িতে হইবে না। তিনি এবং তাঁহার প্রায় সমকালীন কবি বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র—পরিকল্পনা, নানা আখ্যান ও পুরাণকাহিনীর সমাবেশ, উহার সমাজচিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্ম ভাবনা ও জীবনদর্শন—এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও ইহার বহুশতাব্দীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন। ইহারা ইহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কতটুকু পাইয়াছিলেন ও নিজেরা কি নূতন সংযোজনা করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যাইবে না। তবে তাঁহারা যে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের নবরূপের স্রষ্টা তাহা নিশ্চিত।

নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয়ে সুলতান হুসেন শাহের নামোল্লেখ থাকায় তাঁহার রচনাকাল-নির্দেশক ইঙ্গিতের যথাযথ ব্যাখ্যাকে ১৪৯৪ খৃঃ অঃ-র সহিত সমার্থবাচক ধরা সুসঙ্গত। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তকে করুণরস-বর্ণনায় ও পুরাণ-মহিমা-প্রতিফলনে ও দ্বিতীয়কে বাস্তব চিত্রাঙ্কন ও সময় সময় স্থূল ও অমার্জিত পরিহাস-রসিকতায় শ্রেষ্ঠপদবাচ্য করা যায়। নারায়ণ দেব ভাবপ্রবণ ও আদর্শনিষ্ঠ, পক্ষান্তরে বিজয় গুপ্ত সূক্ষ্মতর শিল্পবোধসমন্বিত ও সমাজসচেতন। বিজয় গুপ্ত চাঁদ সদাগরকে মনসার নিকট নতি স্বীকার করাইয়া তাঁহার চরিত্র-মহিমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। কিন্তু

আমরা আধুনিক আদর্শ-অনুযায়ী চাঁদের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব-গৌরব লইয়া যতটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, মধ্যযুগের ভক্তিসর্বস্ব দেববাদনির্ভর কবিগোষ্ঠী চাঁদের স্বাধীনচিত্ততায় সেরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বরং যে মানুষ দেবতার সহিত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইত তাহাকে হঠকারী গোঁয়ার-গোবিন্দ রূপেই তাঁহারা দেখিতেন। সেই জন্যই মনসার সহিত বিবাদে চাঁদকে তাঁহারা নানা বিসদৃশ দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন ও মোটের উপর তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়াই দেখাইয়াছেন। সেই জন্য বিজয় গুপ্ত চাঁদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। সে যুগে পারিবারিক মমতা ও দেবভক্তি ব্যক্তি-চরিত্রে দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ অপেক্ষা শ্লাঘ্যতর গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং আমরা চাঁদের যে আচরণকে অধ:পতনের চিহ্নরূপে গ্রহণ করি, তৎকালীন কবিগোষ্ঠীর চক্ষে তাহাই তাহার সুস্থ জীবনবোধের নিদর্শনরূপে গণ্য হইত।

নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের তুলনা

দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের বিবর্তনের মধ্যস্তরের কবি বলিয়া অনুমিত হইতে পারেন। তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহার বৈষ্ণবধর্মপ্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব। চাঁদ গোড়াতে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবতার প্রতি সমদর্শী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি এই পারিবারিক কলহে জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য হন। অবশেষে শিবের মধ্যবর্তিতায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। সুতরাং ইহার পরিকল্পনা কতকটা মনসামঙ্গলের মূলধারা-বহির্ভূত। মনসার লৌকিক-সংস্কারাচ্ছন্ন মহিমাপ্রচারের গ্রন্থে বংশীদাস এমন একটি গম্ভীর আন্তরিকতা ও উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহার ফলে এই মনসামঙ্গলগাথাটি ময়মনসিংহের জনজীবনের আনন্দ-উৎসব ও স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বংশীদাস

মনসামঙ্গলের পরিণতিস্তরের নিদর্শন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল। তাঁহার আত্মপরিচয়ে বারা খাঁ, বিষ্ণুদাস, ভারামল্ল প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার কবিত্বশক্তি যেমন উচ্চাঙ্গের, তাঁহার ভাষাও সেই পরিমাণে মর্যাদাময় ও গ্রাম্যতা-দোষমুক্ত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

এই কাব্যের অন্তিম স্তরে আমরা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পাই। ইহার

রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডঃ আশুতোষ দাস ও পণ্ডিত সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এই দুই জনের যুগ্ম সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। জগজ্জীবনের আখ্যান-গ্রন্থন ও কবিত্ব উভয়ই প্রশংসনীয়। মনে হয় যে মনসামঙ্গলের কাহিনী ও দেবতত্ত্বের সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে ইহার অন্তিম পর্যায়ের কবিগোষ্ঠী ইহার ঘটনাবিন্যাস ও জীবন-রূপায়ণের একটি সহজ সুসঙ্গতি অর্জন করিয়াছিলেন। কাহিনীর উদ্ভটত্ব তখন অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, দেবরোষপীড়িত মানুষের হৃদয়ার্তির ছন্দ অনেকটা সহজ ও অতিরঞ্জনমুক্ত হইয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের মিলন প্রায় সম্ভাব্য সীমায় পৌঁছিয়াছে ও কবিদের কাব্যরচনা একটি সুনির্দিষ্ট প্রথার অনুসরণে গতির স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জগজ্জীবনের কাব্যে এইরূপ সুষ্ঠু ও সু-বলয়িত পরিণতির নিদর্শন দেখা যায়। চাঁদের দৃঢ় সংকল্পও শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিবের আজ্ঞা লইয়া ও বেহুলার স্নেহপূর্ণ আবদার রক্ষা করিতে বাম হস্তে মনসার পূজা করিয়াছে ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতির পরিবর্তে তাহার প্রতি বদ্ধাঞ্জলি নমস্কার নিবেদন করিয়াছে। জগজ্জীবনের পরিকল্পনায় একমাত্র ত্রুটি হইতেছে লখীন্দরকে কামুকরূপে অঙ্কন ও মাতুলানীর সহিত তাহার গর্হিত ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বর্ণনা। মনে হয় যে লখীন্দরের পিতা-মাতা তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তাহার বিবাহ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই সিদ্ধান্ত-পরিবর্তনের কারণরূপে লখীন্দরের চরিত্রে উৎকট কামায়ন-প্রবৃত্তি ও বিবাহলোলুপতা দেখান হইয়াছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবির মধ্যে ষষ্ঠীবর দত্ত (যাঁহার উপর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 'সেন' উপাধি ভ্রমবশতঃ ন্যস্ত করিয়াছিলেন), জীবন মৈত্র (১৭৪৪ খৃঃ অঃ), বিষ্ণুপাল, তন্ত্রবিভূতি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইহারা মনসামঙ্গলের অবসানযুগের কবি।

সর্বশেষে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, মনসামঙ্গল কাব্যধারার পাঠের ফলে বাঙালীর জীবনচেতনায় কিরূপ চূড়ান্ত ফলশ্রুতির উপলব্ধি ঘটিয়াছিল? অবশ্য সর্পভীতি-নিবারণে ইহার অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস বাঙালী সমাজজীবনের একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইতে সহায়তা করিয়াছে। প্রাকৃত জনসাধারণের নিকট ইহাই মনসামঙ্গলের চরম আবেদন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মচেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহার একটা উচ্চতর আবেদনও ছিল। মানুষের সঙ্গে দেবতার

সম্পর্কের মধ্যে যে একটা অনিশ্চিত, শঙ্কা-সঙ্কুল সীমান্ত-প্রদেশ ছিল, মনসা সেই রাজ্যেরই অধিবাসিনী। তাহার প্রতি আমাদের ভয় ভক্তিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় নাই। ন্যায়নীতিশাসিত শাশ্বত ধর্ম-প্রত্যয়ের অন্তরাল হইতে আকস্মিক দৈবনিপীড়নের যে মূঢ় বিহ্বলতা আমাদের জীবনে মরীচিকার বিভ্রান্তি আঁকিয়া যায়, সর্পদেবীর তির্যক গতি, সাংঘাতিক ছোবল ও দ্রুত অন্তর্ধান তাহারই রূপক। বাঙালী মনসাপূজায় সাপের ছদ্মবেশ-ধারিনী এই রহস্যময়ী, ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বস্থিতা নিয়তিরই রোষোপশমের চেষ্টা করিয়াছে। সাধারণতঃ ধর্মসাধনায় একটি সুনিশ্চিত প্রাপ্তির প্রসন্নতা জাগে। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, পুরাণের ভক্তিবিভোর আত্মনিবেদন, রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার বেদনাময় আকূতির মধ্যে অন্তর্লীন সূক্ষ্ম আনন্দ-প্রত্যয়, হারানোর মধ্যে পাওয়ার পরম আশ্বাস, শাক্ত পদাবলীতে সমস্ত খেদ-বঞ্চনার মধ্যে মাতৃকরুণানির্ভয় অভয়-বোধ—এ সমস্তই ধর্মের চিত্তপ্রশান্তিবিধানশক্তির নিদর্শন। মনসামঙ্গলের কবিগোষ্ঠী এরূপ কোন নিটোল তৃপ্তি দিতে পারেন নাই; এমন কি কামনাপূরণের নিম্নতর নিশ্চিন্ততাও এখানে অনুপস্থিত। মনসার পূজায় বড় জোর বিপদ এড়ান যায়; নিশ্ছিদ্র ও ক্রমবর্ধমান সম্পদও ইঁহার ফলরূপে প্রতিশ্রুত হয় নাই। এমনকি রূপকথার অবাস্তব সুখভোগও ইহার অনায়ত্ত। সমস্ত বিপদোত্তীর্ণ নায়ক-নায়িকা যে বাকী জীবনটা অবিমিশ্র সুখ-স্বস্তিতে কাটাইবে সেরূপ আশ্বাসও এখানে অনুপস্থিত।

মনসামঙ্গলের ফলশ্রুতি

সমগ্র মনসামঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিয়া দৈবাহত মানবজীবনের প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে। দেবরোষের অতর্কিত আবির্ভাব, উহার অতন্দ্র, ক্ষণে ক্ষণে নব নব পীড়নাস্ত্ররূপে দৃশ্যমান প্রতিহিংসা-পদ্ধতি, জালবদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য ব্যর্থ আকূতি, সর্বনাশের অতল গহ্বরমুখে দাঁড়াইয়া তাহার ক্ষণিক, অস্বস্তিকণ্টকিত আনন্দচয়ন, শেষ পর্যন্ত এক অজ্ঞাত ভাগ্যের প্রসাদভিক্ষার উদ্দেশ্যে নানাবিভীষিকাময় নিরুদ্দেশযাত্রা, সিদ্ধি-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায়ের আহ্বান—এই সমস্ত মিলিয়া মানবজীবনকে এক করুণ অসহায় দৈবক্রীড়নকরূপেই প্রতিপন্ন করে। চাঁদের নিষ্ফল পুরুষকার, সনকার পুনঃ পুনঃ শোকদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের অসহ্য বেদনা, লখীন্দর-বেহুলার অতৃপ্ত জীবনাকৃতি, ও বেহুলার অনির্দেশ্য অদৃষ্টনির্ভর নৌকাযাত্রা মানবজীবনের যথার্থ প্রতিরূপ। ক্রুরকুটিল, দৈবশাসন-নিয়ন্ত্রিত জীবনে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্যের জন্য উদ্ভট ও বীভৎস রস সহজেই

মনসামঙ্গলের মানবিক আবেদন

পুঞ্জীভূত হয়। দেবলীলার বিসদৃশ অভিনয়ের পটভূমিকায় নারীদের পতিনিন্দা ও মাছমারা গোদার পারিবারিক আবেষ্টনের বীভৎসতা, চাঁদের হাস্যকর দুরবস্থা, সনকার অতিশয়িত শোকোচ্ছ্বাস ও লখীন্দরের কামোন্মত্ততা যেন জীবনের স্বভাব-ছন্দরূপে প্রতিভাত হয়। কর্কট-দংশনে নলরাজার শারীরিক বিরূপতার মহাভারতোক্ত কাহিনীর ন্যায় এখানে দৈবদষ্ট মানবজীবনও তেমনি সহজ সুষমা ও সঙ্গতি হারাইয়াছে। এই আকস্মিকতার সর্পদংশন-ক্লিষ্ট, পরিণাম-রমণীয়তাহীন, বিষনীল জীবনযাত্রা মনসামঙ্গলের দেবারতিদীপ্ত মন্দিরাঙ্গনের আলোকোৎসবকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। দেবতা-মানবের যে মিলন-বাসর ভক্তি-প্রীতি-চরিতার্থতার ঘন প্রলেপে এক নীরন্ধ্র দেউল নির্মাণ করে তাহারই মধ্যে সংশয়ের একটি অলক্ষিত ছিদ্র দিয়া মনসা-প্রেরিত কালনাগিনীর ন্যায় একটি প্রতিকারহীন অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। মনসামঙ্গলের সমস্ত জোড়াতালা-দেওয়া সমাধান-প্রয়াসের মধ্যে এই দুশ্চিকিৎস্য অসঙ্গতিই আমাদিগকে জীবনের অনির্ণেয় রহস্যময়তার প্রতি সচেতন করিয়া তোলে।

(গ) চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য উহার দ্বি-কোটিক, পরস্পর-অসংপৃক্ত আখ্যানভাগ, উহার দেবতা-মানুষের অপেক্ষাকৃত মৃদু সংঘাত ও অনায়াস মিলন, উহার দেবী-প্রকৃতির আর্যধর্মের মাতৃশক্তিতে ত্বরিত রূপান্তর ও বহুমুখী বিস্তার, উহার শিথিল দেবশাসনের অবকাশে সমাজ-চেতনার স্বাধীন স্ফুরণ, সর্বোপরি দেবমহিমাবর্ণনার গতানুগতিকতার মধ্যে প্রতিভার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। বন্যপশুকুলের রক্ষয়িত্রী হইতে পশুপীড়ক ব্যাধের সম্পদদাত্রী ও সেখান হইতে ধনী বণিক পরিবারের মেয়েমহলের পূজাপাত্রী—দেবীর এই ক্রমবিবর্তনের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্যাধ ও বণিক কাহিনীদ্বয় কেমন করিয়া একসূত্রে গ্রথিত হইল, দেবীর এই সামাজিক উন্নয়ন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ব্যাধসমাজে যে দেবী নির্বিবাদে গৃহীতা হইয়াছিলেন বণিকসমাজে তিনি স্ত্রীদেবতা বলিয়া কেন অবহেলিতা ও প্রত্যাখ্যাতা হইলেন এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে না। কালকেতু-উপাখ্যানে যিনি স্বর্ণগোধিকা, ধনপতি-আখ্যানে তিনি গজলক্ষ্মীর ছদ্মবেশধারিনী সামুদ্রিক মরীচিকায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। কলিঙ্গরাজের রাজ্যে যিনি প্লাবন আনিয়াছিলেন, তিনি কেবল স্বপ্নাদেশ দ্বারা যেমন কালকেতু তেমনি ধনপতি-শ্রীমন্তের কারামুক্তি সাধন করিয়াছেন। যেমন কালকেতুর নগরপ্রতিষ্ঠায়

তেমনি ধনপতির পারিবারিক দ্বন্দ্বমীমাংসায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার নিজস্ব দেবমহিমার গণ্ডীতে তিনি স্থির আসনের আশ্বাস পাইলেই ভক্তের অন্যান্য ব্যাপারে স্বাভাবিক পরিণতির পথে তিনি কোন বাধা দেন না। তাঁহার শান্তির মধ্যে যেমন হিংস্র আতিশয্য নাই, তাঁহার কৃপার মধ্যেও সেইরূপ অপরিমিত দাক্ষিণ্যের অভাব। তাঁহাব ক্রোধ প্রভাত-মেঘের ন্যায় ক্ষণিক বিপর্যয় ঘনাইয়া তোলে; তাঁহার প্রসাদও সেই স্বল্পবর্ষণ মেঘকে গলাইয়া আবার সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ-নীলিমাকে অবারিত করে।

চণ্ডীর বিচিত্ররূপ ও রূপান্তর

দেবতার অনুচিত প্রভাবমুক্ত এই কাব্যজগতে সেইজন্য সমাজ-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, উহার মৃদুবায়ুচঞ্চল, নৃত্যশীল তরঙ্গভঙ্গ, উহার বঙ্কিম কটাক্ষের দ্যুতি ও তির্যক পরিহাসের ঝিলিক। এমন কি এই স্নিগ্ধ পরিহাসের আওতা হইতে স্বয়ং দেবীও বাদ যান নাই। দেবতা সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব যে ভীতি-সম্ভ্রম, এমন কি ভক্তির আতিশয্য হইতে মুক্ত হইয়া সহজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাহার প্রমাণ। দেবতা মানুষের জীবনের উপর ছায়াপাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া দাঁড়ান নাই। ধর্ম ও মনসামঙ্গলে সমাজ আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পারিবারিক সংস্থায় বিভক্তরূপে—ইহাদের মধ্যে সমাজের স্থূল সত্তা আছে, সূক্ষ্ম প্রাণরস নাই, উহার কিছুটা বস্তুপরিচয় আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিকাশের ছন্দ নাই। চরিত্রের দিক দিয়া ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ইছাই ঘোষ, কলিঙ্গা, কানড়া, মহামদ, কালু, লখাই প্রভৃতি কেহ বা অতিমানবিক, কেহ কেহ বা একমুখীন কর্তব্যনিষ্ঠা বা দুষ্প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর, সনকা, লখীন্দর, বেহুলা, মাছমারা গোদা, পতিনিন্দাকারিনী পুরনারীগণ—সবই যেন এক একটি কঠিন প্রথাগত সমস্যার বন্ধনে আড়ষ্ট বা উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আস্ফালনশীল। সহজ, সমস্যামুক্ত প্রাণলীলা ইহাদের কাহারও মধ্যে দেখা যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলে মানবিকতা

চণ্ডীমঙ্গলের সমাজচিত্র ও চরিত্র-কল্পনায় বহিরবয়ব ও অভ্যাসসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরচেতনা ও প্রাণলীলা দ্যোতনারও পরিচয় আছে। সমাজ এখানে একটি বিশিষ্ট সত্তায় সংহত ও একটি অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ের আধাররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কালকেতু ও তাহার পিতা-মাতার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার চারিদিকে রীতি-নীতি-আচারে দৃঢ়বদ্ধ, কেন্দ্রীভূত জীবনোদ্দেশ্যে স্থিরলক্ষ্য, অস্তিত্বের আনন্দে ও গোষ্ঠী-সংহতিবোধে উজ্জ্বল একটি বৃহত্তর ব্যাধসমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গুজরাট

চণ্ডীমঙ্গলে জীবন্ত সমাজ

সহরে নবনগর-পত্তনের বর্ণনায় আমরা বৃত্তিবিন্যস্ত, বিভিন্ন জাতির কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, ব্যাপকতর সংশ্লেষ-বিধৃত এক নূতন সমাজের প্রাণস্পন্দন অনুভব করি। চাঁদ সদাগরের বেণে সমাজের কথা শুনি, কিন্তু উহার সক্রিয়তার বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। কিন্তু ধনপতির স্বজাতীয়েরা মোটেই নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নয়—তাহারা সমাজবিধিরক্ষার জন্য অত্যুৎসাহী, কুৎসায় মুখর, দণ্ডে নির্মম, সন্দেহে তীক্ষ্ণ। এখানে সমাজশাসন দেবশাসনের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষুদ্রতর মানুষ ও পরিবারের নিয়ন্ত্রণভার নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।

চরিত্র-পরিকল্পনায় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃপ্রমাণিত। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা দাসী—ইহারা আপন আপন প্রাণদীপ্তিতে স্বয়ং-সমুজ্জ্বল। ইহারা দেবতার ছাড়পত্র বা কোন নীতির অনুশাসন হাতে লইয়া সংসারে প্রবেশ করে নাই—বাঁচিবার জন্মগত অধিকার, স্ব-ইচ্ছার স্বাধীন প্রেরণা, অবিমিশ্র জীবনানন্দ লইয়াই ইহারা আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কোন উদ্দেশ্যের বাহন নহে, কোন বলিষ্ঠতর শক্তির করদ প্রজা নহে, কোন দৈব ঘটনার পুচ্ছতাড়িত অসহায় ক্রীড়নক নহে—অসংবরণীয় প্রাণবেগচাঞ্চল্যেরই অনিবার্য, অকারণ প্রকাশ। ইহারা আখ্যানের পিছন দরজা দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে জীবনসমারোহের সিংহদ্বার দিয়া। ইহারা একতাল কাদা নয়, এক কণা বহ্নিস্ফুলিঙ্গ, যাহাকে নিভান যায় না বা আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা যায় না। কালকেতু ও ফুল্লরা জাতিতে অন্ত্যজ ব্যাধ হইলেও প্রাণৈশ্বর্যে শাশ্বত অভিজাতবংশীয়। তাহারা সাহিত্যের প্রথানুযায়ী নায়ক-নায়িকা নয়, তাহাদের প্রবল জীবননিষ্ঠা, জীবনরস-উপভোগের একান্ত স্পৃহাই তাহাদের জন্য এক অলঙ্কারশাস্ত্রবহির্ভূত রাজাসন রচনা করিয়াছে। আশ্চর্যের কথা এই যে যখন তাহারা চণ্ডীর অনুগ্রহে সত্যিকার রাজা-রানীর পদে উন্নীত হইয়াছে তখন তাহাদের নৈসর্গিক রাজদীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়াছে। তবু কালু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধান্যগৃহে লুকাইয়া নিজ অনির্বাণ প্রাণমহিমার শেষ ঝলক বিকীর্ণ করিয়াছে। মাংসের পশরাহীন ও বারমাসী দুঃখচক্রের সহিত অসংশ্লিষ্ট রানী ফুল্লরাকে আমরা চিনিতে পারি না। শ্রীমন্তের সহিত সিংহল রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ গতানুগতিক রোমান্স-অনুসারী। কিন্তু ধনপতি খুল্লনার প্রতি যে প্রেমনিবেদন করিয়াছে তাহা তাহার প্রাণের উদ্বৃত্ত ভোগলালসা ও রূপাসক্তিরই প্রত্যক্ষ ফল। পায়রা-উদ্ধারের ছলে হৃদয়-অধিকারের দাবী এই নূতন প্রাণোচ্ছলতা ও অধিকারবোধ হইতে উদ্ভূত। লহনা ও খুল্লনার নির্যাতন-লাঞ্ছিত

চণ্ডীমঙ্গলে প্রাণবন্ত চরিত্র

সপত্নীবিদ্বেষটি আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। খুল্লনার উপর অত্যাচার ও তাহার সতীত্ব-পরীক্ষা পৌরাণিক আতিশয্য-প্রভাবিত। তথাপি গঙ্গা-দুর্গার সপত্নী-কোন্দলের সহিত তুলনায় লহনা-খুল্লনার ঈর্ষ্যা-বিকৃত সম্পর্কটি অধিকতর বাস্তবধর্মী।

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই ধারায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র এই দুই অসাধারণ কবিপ্রতিভার আকস্মিক আবির্ভাব। দৈবপ্রভাবাবিষ্ট জনকল্পনার সমুদ্রতীরে বিকীর্ণ শত শত দ্রুত-উদ্ভাবিত ও যুগে যুগে বিবর্তিত আখ্যান-শুক্তিমালার মধ্যে যে কেমন করিয়া এই দীপ্তিসমুজ্জ্বল মৌক্তিকযুগলের জন্ম হইল তাহা প্রতিভা-রহস্যের একটি অনুদ্‌ঘাটিত সত্য। হাজার কবির হস্তক্ষেপজীর্ণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ধ সংস্কারে মলিন, চিরতরে নির্ধারিত আখ্যান-কাঠামোর মধ্যে এই দুইজন কবি কেমন করিয়া প্রচুর জীবনরসসঞ্চয়ের অবকাশ পাইলেন, জীবন্ত চরিত্র-সংযোজনার প্রেরণা পাইলেন, অপূর্ব সরস বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে জীবনের তির্যক প্রকাশ পরিস্ফুট করিলেন তাহা সত্যই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। চণ্ডীদেবী এক অনার্য ব্যাধনন্দনকে কৃপা করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগকে এক অপরিচিত বিষয়ের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি অরণ্যপশুবৃন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মানুষের অন্তরবেদনা-প্রকাশের এক নূতন রূপকপদ্ধতি কবিদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। নূতন নগরপ্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে তৎকালীন বাঙলা দেশে নূতন স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী নবসমাজ-সংগঠনের উপলক্ষ্যটি যুগের দাক্ষিণ্য বলিয়াই মনে হয় ও সমাজসচেতন কবিগোষ্ঠী এই দাক্ষিণ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে নূতন উপাদানপুষ্ট কবি-প্রতিভা আবার এই উপাদানকেই অবলম্বন করিয়া ইহাদের মধ্যে জীবনরসস্ফুরণ ও শিল্পকলা-মণ্ডনের শাশ্বত সৌন্দর্যরূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল-রচনায় মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিযুগল

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন কবিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আদি কবি বলিয়া খ্যাত মাণিক দত্তের যে একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার অনুলিপিকাল ১৭৮৫ খৃঃ অঃ। ইহা মাণিক দত্তের মৌলিক রচনা কি না তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। পুঁথিটিতে যে ছড়াজাতীয় রচনার নিদর্শন মিলে তাহাই বোধ হয় চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর আদিম অমার্জিত রূপ। কবি বোধহয় মালদহের লোক ছিলেন, কেননা তাঁহার কাব্যে ঐ জেলার নদী, নালা, বিল, সহর, গ্রাম ও মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গলের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি—কালের দিক দিয়া অত্যন্ত সন্নিহিত। দ্বিজ মাধবের কাব্যরচনার কাল ১৫৭৯ খৃঃ অঃ ও মুকুন্দরামের কাব্যরচনা-সমাপ্তি নানা মতবিরোধ সত্ত্বেও ষোড়শ শতকের শেষ দশকে হইয়াছিল এই অনুমানই সঙ্গত মনে হয়। এত অল্পকালব্যবধানে অগ্রবর্তী কবি যে পরবর্তীকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভব ঠেকে না।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি যুগল

দ্বিজ মাধবের হাতে চণ্ডীমঙ্গল-আখ্যান সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। কালকেতু ও ধনপতি উভয় আখ্যানই ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। কালকেতুকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাধসমাজের রীতি-নীতি ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দ্বিজ মাধবের কাব্যে সরস বস্তুনিষ্ঠার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে মুকুন্দরামের সহিত তুলনায় বর্ণনা কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত ও বস্তুভারাক্রান্ত মনে হয়। মুকুন্দরামের মত এই কাব্যেও কালকেতু-প্রপীড়িত বন্য-পশুদের চণ্ডীর নিকট কাতর প্রার্থনার মধ্যে মানুষের দুঃখদুর্দশার রূপকারোপ অনুভূত হয়। তবে মুকুন্দরামের কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শ যেমন একটি সার্বভৌম রসসঞ্চারের হেতু হইয়াছে, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ যেমন অপূর্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ও জীবনরসিক চিত্তের মধ্যবর্তিতায় সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, দ্বিজ মাধবের কাব্যে তথ্যের রসরূপে পরিণতি ততটা শিল্পগুণান্বিত ও ব্যঞ্জনাগর্ভ হয় নাই।

দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম উভয়েরই কাব্য বৈষ্ণবভাবাদর্শ-প্রভাবিত। তবে মুকুন্দরামে ইহা দেবীর রূপবর্ণনা ও তাঁহার চরিত্রে স্নিগ্ধ মহিমা-আরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিজ মাধব এই সীমা ছাড়াইয়া আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি আখ্যানের বিভিন্ন অংশের ভাবানুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে ছোট ছোট গীতিকবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—উহাদিগকে তিনি 'বিষ্ণুপদ' নাম দিয়াছেন। এই যুগে বৈষ্ণব ভাবধারা জনচিত্তে এরূপ সার্বভৌম প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবপরিমণ্ডলে বিচরণশীল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া উহাকে কোমলরসপ্রধান করিয়াছে। মুকুন্দরাম সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়টি প্রায় যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার মধ্যে এরূপ পরিণত বস্তুরস ও জীবনমুখীনতা প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা সে যুগে ত অসাধারণ বটেই, পরবর্তীকালের মানবপ্রীতিরও পূর্বাভাসরূপে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার হাতে সর্বপ্রথম কাব্যে কবির মেজাজ, তাঁহার প্রসন্ন জীবন-স্বীকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে। এমন কি তাঁহার ব্যক্তিগত তিক্ত ও

মুকুন্দরাম

দুঃখময় জীবন-অভিজ্ঞতা এক পরম আস্বাদনীয় আনন্দলীলায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহার দুঃখ পশু-সমাজে আরোপিত হইয়া, পশুদের মুখে এক বিসদৃশ পরিবেশে স্থানান্তরিত হইয়া এক অপরূপ অসঙ্গতির কৌতুকহাস্য সৃষ্টি করিয়াছে। সুখ ও দুঃখ, হাসি ও কান্না, লাঞ্ছনা ও উপভোগ এক অপূর্ব মিশ্রণে একীভূত হইয়া রসপরিণতি লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরাম এই বিরল সমন্বয়শক্তির আধকারী ছিলেন। কলিঙ্গরাজ্যপ্লাবনের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় নদনদী-সম্মেলনের বিবরণ যেমন কাব্যগুণসমৃদ্ধ, তেমনি কল্পনার সরসতায় উপভোগ্য। মুরারি শীল তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি—তৎকালীন সমাজজীবনের ফাঁকি, মিষ্ট কথার আবরণে ঠকাইবার কৌশল, সমাজমনের সুড়ঙ্গপথ-সঞ্চরণশীলতা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে উপভোগ্য রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। ধনপতি-অংশ অপেক্ষা কালকেতু-অংশে তাঁহার মৌলিকতা অধিকতর সমুজ্জ্বল। হরজটাবিহারিণী গঙ্গার নিক্রমণ-পথ-প্রাপ্তি ও সমতলভূমিতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহের ন্যায় দৈবসম্পর্কের চক্রাবর্তনক্ষুব্ধ বাংলা কাব্য হঠাৎ কেমন করিয়া মানবজীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করিয়া বিচিত্রপথগামিনী হইল !

ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' আমাদের একটি অজ্ঞাতপূর্ব চণ্ডীমঙ্গল-ধারার কাব্যের সন্ধান দিয়াছে। গ্রন্থখানির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইহার নৈগরপ্রতিষ্ঠার বর্ণনার মধ্যে 'ফেরাঙ্গি' নামে একটি সদ্যো-আগত পাশ্চাত্ত্য জাতির উল্লেখ থাকায় ইহার রচনাকালকে পোর্টুগিজ জল-দস্যুদের উপদ্রবের পরবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 'বিষ্ণুপদের' বহুল ও সময় সময় মূল ঘটনার সহিত অসংপৃক্ত প্রয়োগে দ্বিজ রামদেব যেন দ্বিজ মাধব-প্রবর্তিত ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দের ও ভাষারীতির বহুল ব্যবহার তাঁহার আঞ্চলিকতার পরিচয় বহন করে।

অভয়ামঙ্গল

চণ্ডীদেবী যে পরিমাণে আর্যধর্ম-প্রভাবিতা হইতেছিলেন ঠিক সেই পরিমাণে তাঁহার সংজ্ঞাও হিন্দু দেবীর গুণানুযায়ী বৈচিত্র্য আহরণ করিতেছিল। চণ্ডী অভয়া, সারদা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের যুগে পৌঁছিয়া তিনি অত্যন্ত ঘরোয়া দেবী অন্নদা নাম পরিগ্রহ করেন। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত কি না সে বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার আলোচনা এক স্বতন্ত্র পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাইবে।

চণ্ডীর নানা নাম

(ঘ) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যধারার অনুকৃতিতে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হইতে আরম্ভ হয়। শিব অবশ্য সুপ্রাচীন দেবতা; তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া উৎসাহ জাগিবার কোন উপলক্ষ্য সৃষ্ট হয় নাই। তথাপি শিব বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি অপরিহার্য যোগসূত্ররূপে উপস্থিত আছেন। হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন ও মান-অভিমান-খণ্ডিত, দারিদ্র্য-বিম্বিত দাম্পত্য লীলা সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের বিষয় ও আখ্যানের ভূমিকারূপে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে। চণ্ডী ও মনসা উভয়েই শিবের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই আর্যদেব-পরিবারে অন্তর্ভুক্তির দাবী করেন। কাজেই মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রসারের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপেই দেবপরিবারের কর্তারূপে শিব-মহিমা সম্বন্ধে সমস্ত লৌকিক ও পৌরাণিক গল্প ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া একটি বিরাট কোষগ্রন্থ-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষতঃ শিবের নানা জটিল, স্ব-বিরোধী আচরণ, তাঁহার উদ্ভট কার্যকলাপ, তাঁহার চরিত্রে নানা বিসদৃশ উপাদানের সমাবেশ ও তাঁহার সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহাকে এক নূতন ধরনের মঙ্গলকাব্যের নায়করূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা যোগায়। অবশ্য এখানে নূতনত্বের কৌতূহল নাই, আছে পরিচিত আদি-দেবতার বিচিত্র জীবনস্তরের একত্র গ্রন্থন। শিবচরিত্রের দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার বা বিভেদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কোন সুপরিকল্পিত প্রয়াসও এখানে লক্ষিত হয় না। সকল তথ্যের একস্থানে সন্নিবেশ, পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের দ্বৈত প্রকৃতির বিস্তারিত পরিচয়দান ও নব দেবতার অভিভবে তাঁহার কিঞ্চিৎ ক্ষীয়মান মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে মঙ্গল-কাব্যের তীব্র সংঘর্ষ ও ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্বের বা সমাজ-জীবনচিত্রের বিশেষ পরিচয় নাই; আছে মাহাত্ম্য-ঘোষণার উচ্চকণ্ঠ আরাব ও বিষয়ের মঙ্গলকাব্যানুসারী বহিরঙ্গমূলক বৈচিত্র্য।

শিব ও মঙ্গলকাব্য

রামকৃষ্ণ রায় এই শিবায়ন-ধারার প্রথম প্রবর্তক। সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ ইহার রচনাকাল বলিয়া মনে হয়। ইহা কেন্দ্রীয়-উদ্দেশ্যহীন, যদৃচ্ছবিন্যস্ত পালার সমষ্টি। এই গ্রন্থটি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পৌরাণিক শিবের মহিমাকীর্তনে ব্যাপৃত; লৌকিক শিবের কাহিনী এখানে গৌণ ও সংক্ষিপ্ত। শিবের সাংসারিক অভাব-অনটন ও তজ্জন্য গৌরীর সহিত কোন্দল অন্যান্য মঙ্গলকাব্যশাখায় বহুধা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় উহার

শিবায়নের প্রবর্তক কবি

নূতনত্ব [illegible]। কিছুটা ছন্দোবৈচিত্র্য, ভাষার সংযম ও মর্যাদা এবং সাহিত্যিক গন্ধের কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন রামকৃষ্ণের শিবায়নকে কতকটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন'ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও প্রসার অর্জন করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে রচিত এই গ্রন্থে শিবসংক্রান্ত লৌকিক কাহিনীগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। পৌরাণিক শিব নিঃসঙ্গ মহিমায় ভক্ত-হৃদয়-বিবিক্ত; লৌকিক শিবই তাঁহার চারিত্রিক দুর্বলতা, গৃহস্থালীর প্রতি অমনোযোগ ও নানা হাস্যকর আচরণ দ্বারা প্রাকৃত জনসমাজের ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং শিব-চরিত্র হইতে এই লৌকিক উপাদানগুলি বাদ দিলে তিনি তাঁর প্রধান আকর্ষণই হারান। রামেশ্বর কিন্তু 'ভব-ভাব্য ভব্র কাব্য' রচনার দাবী জানাইয়াছেন। হয়ত তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্য ও ভাষা-প্রয়োগনৈপুণ্য এ দাবীকে কিছু পরিমাণে সমর্থন করে। কিন্তু যিনি কৃষিকার্যরত ও বাগ্দিনীর প্রতি আসক্ত, গৃহসম্বন্ধে উদাসীন, ভোজনরসিক কিন্তু অর্জনবিমুখ শিবের চিত্র তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাঁহার রুচিশীলতা ও ভদ্রপ্রথানুবর্তন সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নহে। শিবের কৃষিচর্চার মধ্যে লেখকের চাষ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কৃষক জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশে শতকরা নব্বইজন চাষী, সে দেশের জনসাধারণের দেবতাকে কৃষিকার্য-সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখানতে দেবতাকে জীবনের সহজ পরিবেশেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

রামেশ্বরের শিবায়ন

শিবমঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলকাব্যের পরিধির কৃত্রিম সম্প্রসারণরূপেই গণ্য হইবে। একদিকে কৃষ্ণমঙ্গল, অপরদিকে শিবমঙ্গল আর্যধর্মের দুই প্রধান দেবকে পৌরাণিক প্রতিবেশ হইতে মঙ্গলকাব্যের মিশ্র পরিবেশে স্থাপন মঙ্গলকাব্য প্রথার সর্বব্যাপিত্ব, উহার বিশেষ প্রেরণাহীন, গণরুচির দ্বারা শিথিলগ্রথিত বিস্তারপ্রবণতারই প্রমাণ দিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের কৃত্রিম সম্প্রসারণ

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারত

১

রামায়ণ

বাঙলার জাতীয়-কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা শ্রীরামপাঁচালী রচিত হইয়াছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা করিয়া শুধু যে নিজে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে, শত শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়ে যে পরিমাণ আনন্দ-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন বাঙালী কবির ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার প্রপৌত্র বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা। মাতা মালিনীর গর্ভে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

মালিনী নামেতে মাতা বাবা বনমালী
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী॥

নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবির উক্তি—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

বার বৎসরে কৃত্তিবাস পদ্মানদী পার হইয়া পড়াশুনা করিতে যান এবং যথাকালে গৌড়ে আসিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তিতে গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া আসন-পুষ্পমাল্যাদি পুরস্কার লাভ করেন। এইভাবে রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়া কৃত্তিবাস শ্রীরামপাঁচালী রচনা শেষ করেন।

আত্মপরিচয়ে কৃত্তিবাস যে রাজ্য ও রাজসভার কথা বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ সেই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকালনির্ণয়ে কতক-গুলি বিশেষ পূর্বধারণার প্রভাবে গবেষকদিগকে পরস্পরবিরোধী কাল-পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত সামঞ্জস্যবিধান-প্রয়াসের সম্মুখীন হইতে হওয়ায় মীমাংসা জটিলতর হইয়াছে। শ্রীমান্ সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে এই বিষয়সংক্রান্ত নানা তথ্য ও অনুমান আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে।

অবশ্য কোন যুক্তিই একেবারে চূড়ান্তরূপে সংশয়-নিরসক নহে। তথাপি রাজা ও রাজসভা-প্রতিবেশ সম্বন্ধে নানা প্রমাণের, বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির পরস্পর-পোষকতার জন্য ইহা যে সত্যাভিমুখী তাহা নিঃসংশয়। এই যুক্তিপরম্পরার অনুসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্মসময়কে মোটামুটি ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খৃঃ অঃ এই কাল-পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতন্য-পূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তাঁহাকে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার যে অনুমান আমাদের অতিরিক্ত প্রাচীনত্ব-প্রীতির পরিচয় দেয় তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রচনায় যে ভাষারূপ ও লেখকের মানস-সংস্থিতি প্রতিফলিত তাহা অতিপ্রাচীনত্বের বিরোধী ও তাঁহার চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বযুগে অবস্থিতির অনুকূল।

কৃত্তিবাসের কালবিচার

তাঁহার চৈতন্যপূর্বতা সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন নাই। অথচ আভ্যন্তরীণ বিষয়-প্রমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালিক কোন গ্রন্থে তাঁহার অনুল্লেখ-দর্শনে কেহ কেহ কৃত্তিবাসকে চৈতন্যোত্তর বলিয়াও মনে করেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া নবদ্বীপ-শান্তিপুরের অতি সন্নিহিত ও উহাদের ভাব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যদি চৈতন্যদেবের পূর্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিত তবে নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য এই ভক্তিসমুদ্রে অবগাহন করিতেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এ কৃত্তিবাসের উল্লেখ অন্ততঃ চৈতন্যগোষ্ঠীর নিকট তিনি যে অপরিচিত ছিলেন না তাহা প্রমাণ করে।

কৃত্তিবাসের চৈতন্য-পূর্বতা বিচার

যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমরা এখন পাঠ করি তাহার ভাষার মধ্যে কৃত্তিবাসের নিজের ও তৎকালের ভাষা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে বলা কঠিন। কারণ প্রভূত জনপ্রিয়তার ফলে অসংখ্য পাঠক ও গায়কের মুখে মুখে স্বাভাবিকভাবেই উহার বিপুল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষা যে কারণে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল—কৃত্তিবাসের ভাষাও সেই কারণে উহার প্রাচীনত্বের প্রায় সমস্ত লক্ষণ বিসর্জন দিয়া বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের ভাষা

শুধু ভাষায় নহে, বিষয়বস্তুতেও প্রক্ষিপ্ত অংশ কম অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ কৃত্তিবাস করেন নাই এবং বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি বিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলে বাল্মীকির চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত বাঙালী-জীবনের

কৃত্তিবাসের বাঙালী দৃষ্টি

কমনীয়তা মিশিয়া কাব্যখানি একটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য-রূপে পরিণত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের আসল রূপ পাওয়া যায় নাই, বহুল প্রচারের জন্য তাহার ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে। যদি ইহা চৈতন্যপূর্ববর্তী রচনাও হয়, তথাপি ইহার মধ্যে যে প্রেমধর্মের ও ভক্তিরসের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার বর্তমান রূপ যে বিশেষভাবে চৈতন্যপ্রভাবিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু ৫১ জন রামায়ণ-লেখকের নাম করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে **অদ্ভুতাচার্যের** নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি তাঁহার রামায়ণের কাহিনী শুধু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে সংগ্রহ না করিয়া অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা **চন্দ্রাবতী**—রামায়ণ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ-গীতিকায় চন্দ্রাবতীর কাব্যময় জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া কৈলাস বসু, রামশংকর দত্ত, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের রামায়ণের কবিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন **রঘুনন্দন গোস্বামী**। তাঁহার রচিত রামরসায়ন সুলিখিত বিরাট গ্রন্থ।

অন্যান্য কবি

২

মহাভারত

বাংলা মহাভারত রচিত হইয়াছিল রামায়ণের পরে। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর কাছে অবিদিত ছিল না। মোটামুটি মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কাহিনীও হয়ত জনসাধারণের পরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু অনুবাদ-কার্যের স্থির প্রমাণ **কবীন্দ্র পরমেশ্বরের** পূর্বে আর পাওয়া যায় না। অবশ্য আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন **সঞ্জয়** নামক কবিকে কবীন্দ্রপরমেশ্বরের পূর্ববর্তী বলিয়া স্থান দিয়াছেন। মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হয় ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে। হুসেনের পরাগল খাঁ নামে

মহাভারতের কবি

একজন লস্কর চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই উৎসাহে ও আদেশে কবীন্দ্রপরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন) এই জন্য এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারতও বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই, মুখ্যতঃ যুদ্ধকাহিনীই বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল—পাণ্ডব-বিজয়। (পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় **শ্রীকরনন্দী** বিস্তৃতাকারে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ইহার পর কোন বিশেষ পর্ব বা সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন রামচন্দ্র খান, রঘুনাথ, অনিরুদ্ধ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, কাশীরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি।)

(ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন **কাশীরাম দাস**। কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জিলার ইন্দ্রাণী পরগনার সিঙ্গি গ্রামে। সপ্তদশ শতকের সুরুতেই তিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীদাসী মহাভারতকেও প্রচারবাহুল্য ও জনপ্রিয়তার জন্য বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনিও মহাভাবতের কোন আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই এবং বাঙলাদেশের বহুপ্রচলিত কাহিনীকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রের নবরূপায়ণ করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের আসল ভাষা হয়ত জনপ্রিয়তার স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তবু বর্তমান কাঠামো দেখিয়া শব্দের বাঁধুনি ও ভাষার লালিত্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।)

মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক

৩

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ রচনার দিক দিয়া অগ্রবর্তী। ইহার শান্ত রস ও পারিবারিক জীবন বাঙালী জীবনাদর্শের সহিত এমন সহজ-সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা-বলেই লেখা হইয়াছিল। কৃত্তিবাস রাজসভায় অভিনন্দিত হইলেও তিনি যে রাজাদেশে রামায়ণ রচনা করেন এমন কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণ-কাহিনী একজন আদর্শ পুরুষ বা অবতারের জীবন-কথা; ইহার রস গভীর কিন্তু একমুখী; আখ্যায়িকার বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু মহাভারতে যদিও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী নহে; শ্রীকৃষ্ণ ইহার মধ্যে প্রধান চরিত্র নহেন। তিনি যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারথি ও নেপথ্যের অন্তরালে কূট-কৌশলী উপদেষ্টা, তেমনি মহাভারতের কাহিনীতে তিনি পাণ্ডব-সখারূপে গৌণ অংশে অবতীর্ণ। মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতা রামায়ণ অপেক্ষা

রামায়ণ ও মহাভারত

অনেক বেশী। ইহার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত আখ্যায়িকা-বিন্যাস অনেক বেশী কৌতূহল উদ্রেক করে। বিশেষত ইহার যুদ্ধবর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ-পাথর-ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎসরসপ্রধান শক্তি-আস্ফালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহ-নির্মাণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কূট ষড়যন্ত্র ও মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্য। ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি ও ধর্মনীতির সূক্ষ্ম আলোচনা অনেক স্থান অধিকার করে। মোটের উপর মহাভারতে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও পরস্পর বিবদমান রাজশক্তির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহার পাঠান আমলের ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কেন আমাদের তুর্কী-শাসকেরা রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও মহাভারত-কাহিনীকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রমুখ শাসকেরা রামায়ণে হিন্দুধর্মের গুণগান ও হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনের অতিরিক্ত আর কিছু আকর্ষণীয় বস্তু দেখিতে পান নাই। রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মকেন্দ্রিক গ্রন্থ ও পরিবার-জীবনের করুণ ইতিহাস বলিয়া অন্যধর্মাবলম্বী পাঠক যে ইহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিবেন না ইহা স্বাভাবিক। মহাভারতে ধর্মের একাধিপত্য নাই। ইহাতে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া বাস্তব কৌতূহল ও আখ্যান-রসের আনুষঙ্গিক উপাদান-রূপে বর্তমান। হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসীও ইহার বস্তুরস আস্বাদন করিতে উন্মুখ হইবেন। ইহার মানবিক আবেদনই ইহার সার্বভৌম জনপ্রিয়তার মূলে। পক্ষান্তরে হিন্দু অধ্যাত্মরুচি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত-লীলা-আস্বাদনেই চরিতার্থ; মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার প্রতি ইহা অপেক্ষাকৃত উদাসীন। কাশীরাম দাসের অনুবাদের পূর্বে হিন্দুধর্মের যে উদার ও ব্যাপক রূপ মহাভারতে পরিস্ফুট তাহার রসাস্বাদনে হিন্দু প্রাকৃত জনসাধারণ খুব বেশী উৎসাহী ছিল না। সেইজন্যই রামায়ণ-অনুবাদের প্রেরণা আসিয়াছে অন্তর হইতে; আর মহাভারতের অনুবাদ-প্রেরণা আসে বিজাতীয় শাসকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য। অবশ্য পরিচয়ের ফলে ক্রমশঃ মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছে। তথাপি এখন পর্যন্ত রামায়ণের সহজ, সরল ধর্মাদর্শের প্রভাব জাতীয় অনুভূতিতে যতটা সর্বস্তরব্যাপী —মহাভারতের সূক্ষ্ম ও জটিলতর ধর্মবোধ ততটা প্রসারিত হইতে পারে নাই। আমরা রামায়ণকে জানি ইহার একমুখীন রসের সমগ্রতায়; মহাভারতকে জানি ইহার খণ্ড খণ্ড বিচিত্ররসবাহী আখ্যানে।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবিত্বশক্তি-ও এই কাব্যদ্বয়ের স্বরূপ-পার্থক্যের অনুসারী। (কৃত্তিবাস স্বল্প পরিসরের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস-উদ্রেক ও বাল্মীকির অনুসরণে প্রকৃতি-বর্ণনায় নিপুণ। এই সীমার বাহিরে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় না। রামায়ণে যে সমস্ত পরিহাস-রসিকতার উদাহরণ আছে তাহা অধিকাংশই অন্য কবির রচনা, পরবর্তী যুগে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত।) মহাভারতকারের পরিসর আরও বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র রসাপ্লুত। কাশীরাম দাসের বর্ণনা ও রস সৃষ্টি আরও বিবিধ ও বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত, এবং তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি আরও জটিলতর।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম

৪

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বাল্মীকি-রামায়ণ ও বেদব্যাস-মহাভারতের যুগোপযোগী ও বাঙালী মানসিকতার রুচি-অনুসারী অনুবর্তন। সুতরাং একদিকে উহারা সংস্কৃত মহাকাব্যের কাব্যরীতি প্রভাবিত, অন্যদিকে যুগচিত্তের রুচিকর ও হিতসাধক স্বাধীন রচনা। উহাদের কাব্যমূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে উভয় দিক দিয়াই উহাদের আলোচনা প্রয়োজনীয়। এই দুই অনুবাদগ্রন্থ এরূপভাবে বাঙালীর জীবন-সংস্কার ও বাস্তব ধর্মসাধনার অন্তর্ভূত হইয়াছে যে ইহাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যবিচার আধুনিক যুগ পর্যন্ত উপেক্ষিতই হইয়াছে। চৈতন্যোত্তর ভক্তিপ্লাবন ও ধর্মসর্বস্বতা ইহাদের যুগজীবননিদর্শনগুলিকে ত অবলুপ্তই করিয়াছে, এমন কি মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের জীবনমুখিতাকেও এই নূতন ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই বাল্মীকির "নরচন্দ্রমা" মানবশ্রেষ্ঠ রাম কৃত্তিবাসে বৈষ্ণব দীনতার মূর্ত প্রতীক্, মানব প্রেম, ক্ষমা ও করুণরসের ঘনীভূত নির্যাস এক আত্মবিস্মৃত অবতারত্বে নিজ মানবিক পরিচয় বিসর্জন দিয়াছেন। সমাজজীবননির্ভর, মানবিকবৃত্তির অকুণ্ঠিত বিকাশে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকাহিনী আদর্শলোকের অলৌকিকতাপ্রধান, বাষ্পাকুল ভক্তিশাস্ত্রে রূপান্তরিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা নামকীর্তন মুখরিত, ভক্তিবিহ্বলতার অশ্রুপ্লাবিত রঙ্গভূমিতে পরিণত হইল। গুহক চণ্ডালের মিতা রামচন্দ্রের চৈতন্যাদর্শপ্রভাবিত পতিতপাবন রূপটি পরিস্ফুট হইল। ক্ষাত্র শৌর্যবীর্যের সমস্ত পরুষতা কোমল অনুভবের স্পর্শে, প্রীতিরসের আতিশয্যে আর্দ্র হইয়া উঠিল। বাঙালী রামজীবন হইতে কেবল অবিমিশ্র ভক্তিবাদ ও জীবনবন্ধন হইতে মুক্তি-আকূতির প্রেরণা লাভ করিল।

(কাশীরাম দাসের মহাভারতে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ক্রূরসংঘাতময় কর্মজটিলতা

ও ঘটনাবৈচিত্র্যের নানামুখী রসাবেদন ধর্মাদর্শের একাধিপত্যে এতটা আচ্ছন্ন হয় নাই। উহার ভক্তিপ্লাবন জীবনরসের বিচিত্র প্রবাহকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। মহাভারতের আখ্যানের মধ্যে মানবমনের উচ্চনীচ ভাবসমূহ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, অধিকারস্পৃহা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে ক্ষমা, উদারতা, আদর্শ-পরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠার সহাবস্থান গ্রন্থটিকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রামায়ণের মত এখানে একটানা করুণ রসের প্রসার নাই। সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েই ভাগ্যবিড়ম্বিতা; এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা আরও অসহনীয়রূপে অপমানকর। কিন্তু সীতার ন্যায় দ্রৌপদী নিরবচ্ছিন্ন রোদনশীলা নহে; তাহাব এক চোখে জলধারা, অন্য চোখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছে। মহাভারতের নারীচরিত্রগুলি রামায়ণের সহিত তুলনায় আরও বিচিত্ররূপিণী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। রামায়ণে সীতা ও কৈকেয়ী ছাড়া আর কোন নারীর চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য নাই। মহাভারতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি নারী আপন আপন স্বতন্ত্র চরিত্র-মহিমায় সমুজ্জ্বল। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও রাবণ জীবন্ত চরিত্র হইলেও ইঁহারা ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক গুণ অপেক্ষা আদর্শনিষ্ঠার বিভিন্ন বিকাশের দ্বারা অধিকতর চিহ্নিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র তুলনা

দশরথ ও ধৃতরাষ্ট্র এই দুই রাজপিতার চরিত্রের তুলনা করিলেই মহাভারতের চরিত্র-পরিকল্পনার গভীরতর ও জটিলতর বাস্তবতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। ইন্দ্রজিতের মানবিক রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে আমাদিগকে মধুসূদনের চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভার জন্য আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু অভিমন্যু ইন্দ্রজিতের সহিত অভিন্ন শোকাবহ পরিণতির সমসূত্রবদ্ধ হইয়াও মানবিক গুণে ও করুণরস উৎসারে অধিকতর সমৃদ্ধ। রামায়ণে হনুমান ও বিভীষণ তাহাদের পরম ভক্তিপরায়ণতা ও একান্ত আত্মনিবেদনের দ্বারা পাঠকের গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছে। তাহারাই পাঠকের প্রতিনিধিস্থানীয়রূপে কাব্যের রসাবেদনটি আমাদের মনে অপরিবর্তনীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। এমন কি রাবণও শেষ পর্যন্ত বৈরসাধনের অন্তরালে আত্মগোপনকারী ছদ্মবেশী ভক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাবণের সহিত সমধর্মী দুর্যোধন কিন্তু নিজ বৈরভাবে ও ক্ষাত্র অভিমানে অচল থাকিয়া এই হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত ভক্তির জোয়ারে আপন চরিত্রদৃঢ়তা বিসর্জন দেয় নাই। মূল রামায়ণ-মহাভারতের এই স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য অনুবাদগুলিতেও যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মোট কথা রামায়ণ গার্হস্থ্যরসপ্রধান, ভক্তি-উদ্বেল, শান্ত, জীবনপরিণামের কাহিনী। উহার সব সুর ছাপাইয়া পারিবারিক জীবনের বিয়োগবিধুর শোকোচ্ছ্বাস ও ঐশী মহিমার নিকট একান্ত আত্মনিবেদনের সুরটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার চরিত্রপরিকল্পনা ও কাব্যকৃতিও এই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। (মহাভারতের পরিসমাপ্তিতে একটি শান্ত নির্বেদ ও উদাসীন ত্যাগ-বৈরাগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটিতে উচ্চতম নীতিসাধনার সহিত অকুণ্ঠিত জীবনমমতা ও রাজনীতিসুলভ কুটিল ও ছলনাময় আচরণের একটি বাস্তব সমন্বয় লক্ষিত হয়। অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমস্ত আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিকে, এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও মাঝে মধ্যে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে ও অসাধু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত কাব্যটিতে ধর্মের মহিমা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইলেও ও জীবনযাত্রায় উন্নত আদর্শের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হইলেও ইহার অলৌকিক পরিবেশ ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিনিবেদনের মধ্যে একটি বাস্তব জীবনস্তরের স্পর্শ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের সার্বভৌম ঈশ্বরত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই—ঐশীশক্তি-প্রয়োগ অপেক্ষা কূটনীতির সহায়তাই তাঁহাকে অধিকাংশ স্থলে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে নানা লোকসংস্কারের বিচিত্র কাহিনী, নানা রোমান্সধর্মী উপাখ্যান, ধর্ম, নীতি ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে নানা যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা, স্থানে স্থানে আদিম ও অসংস্কৃত প্রাণবেগের অতর্কিত উচ্ছ্বাস, লৌকিক আবেগের উত্তপ্ত উৎক্ষেপ উহাকে ধর্মগ্রন্থের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে উদ্ধার করিয়া এক উদারতর জীবনবেদের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাভারতে পরিবারজীবনের কাহিনী অপেক্ষাকৃত গৌণ পর্যায়স্থিত।) রামায়ণে লঙ্কার যুদ্ধ বিধ্বস্ত পারিবারিক জীবনের পুনরুদ্ধারের উদ্যোগমাত্র ; যুদ্ধরত রাম একদিকে ভ্রাতৃস্নেহবিহ্বল, অপরদিকে দাম্পত্য পুনর্মিলনের জন্য স্বপ্নাতুর। (কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা ; ইহার সর্বগ্রাসী উত্তেজনা কৌরব-পাণ্ডবের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিকে ম্লান-পাণ্ডুর বর্ণে নিষিক্ত করিয়াছে।)

রামায়ণে গার্হস্থ্য রস—মহাভারতে রাষ্ট্রীয় সংঘাত

কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের রচনাদ্বয়ে যে রীতি-পার্থক্য ও কাব্যগুণের তারতম্য আছে, তাহা কতকটা মূলগ্রন্থপ্রভাবিত, কতকটা কবিদের শিল্পসৃষ্টির বিভেদ-প্রসূত। উভয় অনুবাদেই মূলের প্রত্যক্ষ জীবনস্পর্শ প্রথাবদ্ধতার জন্য স্তিমিত হইয়াছে। কিন্তু এই জীবনসম্পর্কক্ষীণতা রামায়ণে যত প্রকট, মহাভারতে ততটা

নহে। উপমা-অলঙ্কার-নির্বাচনে কৃত্তিবাস অধিকাংশ স্থলেই স্বাধীনচেতনাহীন ও নিরুত্তাপ; কাশীরামে এই চেতনা অপেক্ষাকৃত প্রবল ও জীবনবোধ-উদ্দীপ্ত। উভয়েরই রূপবর্ণনার মনোভঙ্গী ও উপমা-প্রয়োগ তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটি পরিস্ফুট হইবে। রামায়ণে রাম বা সীতার রূপ-বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত অলঙ্কার-রীতির যান্ত্রিক অনুসরণ; বর্ণনার সময় কবিমনে যে রূপমোহ ক্ষীণভাবেও উদ্রিক্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে কাশীরাম দাসের স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদীর বা ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের রূপবর্ণনায় মামুলি উপাদানগুলির মধ্যে নববিন্যাসরীতির চমক ও রূপানুভূতির উল্লাস-স্পন্দন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের যুদ্ধবর্ণনা নির্জীব ও নেপথ্যশায়িনী ভক্তির পিছনটানে শিথিল ও উত্তাপহীন। কাশীরামের সতেজ বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে রণোন্মাদনা ব্যঞ্জিত। কৃত্তিবাসের প্রধান আবেদন আমাদের ভক্তিবৃত্তির তৃপ্তিতে ও করুণরসের উদ্দীপনে। ঐশী শক্তির প্রতি স্তবস্তুতির উচ্ছ্বাসে ও সীতাবিরহখিন্ন রামের হৃদয়দ্রাবী বিলাপেই তাঁহার কবিত্বশক্তির মুখ্য পরিচয়। তাঁহার মহাকাব্যের পাত্রে গার্হস্থ্য জীবন-রসই অকৃপণভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারতে একদিকে যেমন অলঙ্কার প্রয়োগ দক্ষতা বেশী, অন্যদিকে তেমনি ভক্তি ও করুণরসের পরিমাণ অপেক্ষা জীবনলীলার বিভিন্ন রস ও ক্ষাত্র জীবনাদর্শের ঐশ্বর্যময়, বর্ণবহুল বাঙালী মানসলোকের উপর বিকাশ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃত্তিবাসের যুগে চৈতন্যলীলাস্মৃতির অসপত্ন অধিকার। কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে আবির্ভূত কাশীরামের প্রেমভক্তির আবেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠোর সংঘাত, রাজনীতি-ধর্মনীতিতত্ত্বের যুক্তিনিষ্ঠ মনন-প্রাধান্য ও ধর্মসংপৃক্ত জীবন-কৌতূহলের সহজ আকর্ষণ কবিচেতনায় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। কৃত্তিবাসে ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাশীরামে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া ধর্মশাসিত জীবনানুরাগকে একটি বৃহৎ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। বৃন্দাবনলীলার মিলিত-রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য হইতে মহাভারতীয় কৃষ্ণে উত্তরণই বাঙালী মানস-চেতনার কৃত্তিবাস হইতে কাশীরামে অগ্রগতির নিয়ামক মানদণ্ড।

কৃত্তিবাস ও কাশী-দাসের রচনারীতির পার্থক্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

১

বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বাভাস যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এই রচনাগুলিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার নিম্নলিখিত তত্ত্ব, আখ্যান ও কাব্যরূপ দেখা যায়:—(১) এই লীলার সূচনা হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস; (২) এক সৌন্দর্যময় বাস্তব পরিবেশে, গ্রাম্য বা নাগরিক জীবনের পটভূমিকায়, ইহার একটি উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ-পূর্ণ ও কবিত্বরসসমৃদ্ধ বর্ণনা; (৩) ক্রমপরিণতির পর্যায়-বিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ক্রমানুসারী পালাগানের আকারে ইহার বিন্যাস; (৪) ঈষৎ-উন্মেষিত ভক্তিরসের স্পর্শে, মানবিক প্রেমকাহিনীর রূপকে, ইহার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র সম্পর্কের ব্যঞ্জনা-আরোপ। এই রচনাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা ভক্তিমিশ্র রূপমুগ্ধ আগ্রহ জাগিয়াছিল ও অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ভীতিসঞ্জাত ও রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুররস-পুষ্ট ভক্তির কাহিনীও বাঙালীর চেতনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ও প্রেমধর্মপ্রচারে, তাঁহার জীবনলীলার প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার জাতীয় ধর্ম-রূপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ধর্মানুভূতি একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য-রূপে জনসাধারণের মনে প্রতিভাত হইল।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার তথ্যকথা ও পীঠভূমি

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোন ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূর প্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৈতন্যধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙালী জাতি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবনযাত্রায়, তাহার কর্মে ও মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আদর্শ-সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত

শ্রীচৈতন্য-জীবন বাঙালীর বহুমুখী আত্মপ্রকাশের অক্ষয় উৎস

নির্ঝর, অলঙ্কার, দর্শন ও বিধি-রচনার এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাঙ্গলীলা যেমন একদিকে আমাদের সমস্ত জীবনকে উর্ধ্বায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব-চেতনা ও ইতিহাস-বোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের দিনলিপি (diary), জীবনী (biography) প্রভৃতি নানা নূতন ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টি করিতেও প্রেরণা দিয়াছে। তাহা ছাড়া, চৈতন্য-যুগে যত অধিকসংখ্যক কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি ও সমাজ কল্যাণ সাধনের যত নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। দুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কণ্ঠে যত গান ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংগঠনে যত উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহার মনন শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তর-ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। সুতরাং চৈতন্যোত্তর যুগকে বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

যে মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য ও জীবনের শুষ্ক তরু ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার বহির্জীবন ঘটনা-বিরল, কিন্তু অন্তর্জীবন বিচিত্র ভাব ও লীলারসে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার জীবনে বিবৃতির অবসর কম, কিন্তু রস-আস্বাদনের অবসর প্রচুর ও অফুরন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম নবদ্বীপ নগরে, ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। এই দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যা-কালে চন্দ্রগ্রহণের সময়, যখন গঙ্গাতীর ও নবদ্বীপ নগর তুমুল হরিধ্বনিতে ও নাম-সঙ্কীর্তনে মুখরিত, তখনই শ্রীচৈতন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র ও ডাকনাম নিমাই। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। শোনা যায় যে তাঁহার শৈশব-চাপল্যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী জ্বালাতন হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার শাস্ত্রাচারে উপেক্ষার জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনে তাঁহার এই দুরন্তপনার মধ্য দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-লীলার ছায়াপাত হইয়াছিল। শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি টোল খুলিলেন ও তাঁহার অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার জন্য শীঘ্রই প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের একখানি

শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা : কৈশোর-লীলা

টীকা রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণির টীকা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, বন্ধুর যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি স্বরচিত টীকাখানি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে প্রথম যৌবনেই তিনি কীর্তিলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার বৈরাগ্য প্রবণতার প্রমাণ দেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথমে লক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে ও তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সকলেই আশা করিয়াছিল যে এই তরুণ মেধাবী যুবক সংসার-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিবেন ও বাঙলা দেশে প্রচলিত পাণ্ডিত্যের মানকে বর্ধিত করিয়া এই জ্ঞানানুশীলনের রাজ্যেই স্মরণীয়তা লাভ করিবেন।

কিন্তু পূর্ণযৌবনে তাঁহার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসিল তাহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। এই সময় তিনি পিতৃকৃত্য করিতে গয়াধামে যান ও সেখানে প্রথিতনামা বৈষ্ণব ভাবসাধক শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার ফল-স্বরূপ তাঁহার জীবনে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায় ও ক্রমশঃ ভগবৎ-সাধনা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া ধ্যানতন্ময়, দিব্যভাববিভোর হইয়া পড়িলেন ও ঐশী লীলার স্ফুরণ তাঁহার বাস্তব চেতনাকেও অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধাকৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন ও সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট এই লীলারসে অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস জীবনগ্রহণের সঙ্কল্পে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সমগ্র জগতের পাপ-তাপ দূর করিয়া ভগবৎ প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নূতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই তিনি বৈষ্ণব-জগতে পরিচিত।

মধ্য-লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণ

তাঁহার জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর তিনি প্রধানতঃ নীলাচলে (পুরীধামে) অবস্থান করিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবনধাম পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রেমধর্মপ্রচারে ও শিষ্যসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এই চব্বিশ বৎসরের ইতিহাস একেবারে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জীবনের নিগূঢ় অনুভূতির

কাহিনী। এই সময় তিনি নিজেকে কখনও রাধা, কখনও কৃষ্ণরূপে কল্পনা করিয়া উঁহাদের পারস্পরিক প্রেমলীলা নিজের মধ্যেই অনুভব করিতেন। দিব্যদম্পতীর মনে পরস্পরের অপ্রাপ্তি ও অদর্শনের জন্য যে মর্মান্তিক খেদ ও আকৃতি জাগিত তাহাই চৈতন্যদেবের নিজের আচরণে অনুকৃত হইত। এই বাস্তাবচেতনাহীনতার অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ আখ্যায় অভিহিত করা হইত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত নামক চৈতন্য-জীবনীতে এই দিব্যোন্মাদের নানা ভাববৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত ও আলোচিত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যের শেষের জীবন-কাহিনী কেবল ভাবজীবনেরই বিবরণ। তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধেও একটা রহস্যের আবরণ এখনও রহিয়া গিয়াছে। ১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ আষাঢ় মাসে কাহারও মতে তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের মধ্যেই লীন হন; কেহ কেহ বা বলেন যে তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় সমুদ্রে অবগাহন করিয়া সমুদ্রগর্ভেই দেহ বিসর্জন করেন।

অন্ত্যলীলা

২

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কেবল কাব্যক্ষেত্রেই নবসৃষ্টি-প্রেরণা জাগায় নাই; নূতন দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কার প্রণয়নের দ্বারা ও জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংগঠনের উৎসাহ উদ্রেক করিয়া বাঙালীর মনীষা ও কর্মশক্তির মধ্যেও এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্য নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও ধর্মতত্ত্বের আদর্শ-বিচারে নবধর্ম প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। কিন্তু মনে হয় যে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপনির্ণয় ছাড়া ইহার সাংগঠনিক প্রয়াসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তিনি বিশুদ্ধ দিব্য অনুভূতির খাঁটি সোনা অপর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাইয়াছিলেন কিন্তু সমাজবিধির যে টাঁকশালে এই স্বর্ণ দেশ-প্রচলিত মুদ্রার আকার ধারণ করে সেই টাঁকশালের কর্মাধ্যক্ষগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। তিনি কেবল পদাবলী-সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দীপনা-সঞ্চার, নামকীর্তন-প্রবর্তন ও তাঁহার ভাবধারায় ও চরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্যমণ্ডলীপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর বিশেষ সৌভাগ্য যে তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার ধর্ম একদল অতি সুনিপুণ তত্ত্বব্যাখ্যাতা ও প্রচারক-মণ্ডলীর সহযোগিতায় সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয় ও লীলাকীর্তনের মধ্য দিয়া

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

জাতির মর্মস্থলে অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার যেরূপ গুরুত্ব, তাঁহার অনুচরবৃন্দেরও প্রায় সেই প্রকারেরই প্রধান অংশ ; কারণ চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সাধনা ও কর্মোদ্যম ব্যতীত এই প্রেমধর্ম বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইতে পারিত না।

চৈতন্যধর্ম-সংগঠকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রায় চৈতন্যের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সমাজে ও কীর্তনিয়াদের কণ্ঠে গৌর-নিতাই—এই যুগ্ম নাম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। কৃষ্ণ-বলরামের সাদৃশ্য রক্ষা করিবার জন্যও এই উভয় মহাপুরুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ কল্পিত ও আরোপিত হয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বৈত আচার্য, যিনি চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রেমধর্মের প্রথম বাঙালী সাধক, শ্রীবাস পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, গদাধর পণ্ডিত, নরহরি ঠাকুর ও পরবর্তী যুগের শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বাঙলা দেশে চৈতন্যধর্মবিস্তারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর চৈতন্য তত্ত্ব-ব্যাখ্যা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদকেই বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন ও বৈষ্ণব সাধনার উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ-সূত্র রচনা করেন।

চৈতন্য-ধর্মের সংগঠক-মণ্ডলী

তত্ত্বানুশীলনের দিক দিয়া বৃন্দাবনের ষড়্‌-গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী—নূতন বৈষ্ণবদর্শন রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যে অবতারশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং ভগবান এবং কৃষ্ণলীলা যে ভগবানের সর্বোত্তম লীলা ইহাই শাস্ত্রবাক্য-উদ্ধার ও প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিপাদন করেন ও শ্রীচৈতন্য যে রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বের মিলিত বিগ্রহ ও নিজ জীবনে রাধাকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য-প্রকটনকারী ইহাও দেখাইয়া—প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি চৈতন্য-জীবনের আলোকে আলোচনা করিয়া চৈতন্য-লীলা ও কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্যের অস্তিত্ব অনুপম মনীষা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদের সাহায্যে প্রচারিত করেন।

ষড়্‌-গোস্বামী ও বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা

৩

জীবনী কাব্য ও কৃষ্ণমঙ্গল

এই যুগের যে দুইটি প্রধান কাব্যধারা—মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী—ইহারা পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ও একের রীতি-বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যেরূপ মঙ্গলকাব্যের, বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতারা—যেমন দ্বিজ মাধব ও রামদেব—কৃষ্ণলীলার কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করেন ও সুযোগ পাইলেই আখ্যায়িকার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে গীতি-কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রবেশ করাইয়াছেন—সেইরূপ মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ ও ভাগবতের অনুবাদসমূহকে কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় ও কৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশই যে ইহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য তাহা ঘোষিত হয়। চৈতন্যলীলা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই লীলার যে মূল উৎস ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী—তাহার প্রতি বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, ও ভাগবতের অনুবাদ চৈতন্য-প্রেমধর্মের পরিপোষকরূপে অধিক-সংখ্যায় রচিত হইতে থাকে। মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল এই অনুবাদপ্রবণতার উদাহরণ। ভাগবতের তত্ত্ব ও কাহিনী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া এই লেখকগোষ্ঠী শুধু যে দেশে পৌরাণিক চেতনা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কৃষ্ণলীলার ব্যাপক পরিচয়ের মধ্য দিয়া পদাবলীর রসাস্বাদনে সহায়ক হইয়াছিলেন এবং কাহিনীর সূক্ষ্ম ও বাঙালী-রুচিসম্মত রূপান্তরের দ্বারা বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসানুভূতির দৃঢ়ীকরণও সাধন করিয়াছিলেন।

ভাগবতের অনুবাদ

অবশ্য ভাগবতের প্রথম অনুবাদ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের রচনা। চৈতন্যদেব এই গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে তাঁহার যে আদর্শ ও অনুভূতি ছিল তাহার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ও ইহার একটি পংক্তির—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের গ্রামবাসী সমস্ত ব্যক্তিকেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। চৈতন্যযুগের পূর্বে কোনও ভক্তের পক্ষে রাধিকা-ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের বিগ্রহরূপে উপলব্ধি

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

করা ও তাঁহাকে দয়িত সম্বোধন করা এতই অসাধারণ ছিল যে, চৈতন্যদেব ইহার দ্বারা অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্য ও কৈশোর লীলা বর্ণিত আছে, যাহার মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় গুণেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার আক্ষরিক নহে, ভাবানুবাদ। অবশ্য যে আকারে এই গ্রন্থটি আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে চৈতন্যোত্তর যুগের প্রচুর ভাব-প্রক্ষেপ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ কীর্তন-মাহাত্ম্যের যে সুবিস্তৃত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায় তাহা চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভক্তিবাদের যথাযথ প্রকাশ বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই যে ভাগবতের অনুবাদের সূচনা হয় ইহাতে প্রমাণিত হয় যে জয়দেব-বিদ্যাপতির মধুর পদাবলীর প্রেরণাতেই লৌকিক ভাষায় ভাগবততত্ত্ব ও কাহিনী জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল—ফলের রসমাধুর্য হইতেই রসবাহী মূলের পরিচয়-গ্রহণের কৌতূহল জাগিয়াছিল।

চৈতন্য-প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুস্মৃতি ও ইতিহাস-চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্য ও দিব্যলীলা-প্রকটনের দ্বারা জাতির মনে এরূপ গভীর রেখাপাত করেন যে এযাবৎ ইতিহাস-বিমুখ বাঙালী তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অনুভূতিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণা লাভ করে। অবশ্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে—বেদ, উপনিষদ ও পুরাণগুলিতে—প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন যে পাওয়া যায় তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মগত উদ্দেশ্যের এত প্রাধান্য, ধর্ম-চেতনার প্রলেপ এত ঘন, ও এই আখ্যানগুলি সূত্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ একক ভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে যে ইহারা যুগের ব্যাপক পরিচয় বহন করে না। সেইজন্য বলা যায় যে চৈতন্য ও তাঁহার মুখ্য পরিকরবৃন্দের জীবন-চরিতই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কনের প্রথম প্রয়াস। অবশ্য সে যুগের ইতিহাসবোধকে বর্তমান যুগের আদর্শে বিচার করা চলে না। চৈতন্য-জীবনীকারদের নিকট চৈতন্যের অলৌকিক লীলাবিলাস ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষাও অধিক বাস্তব ছিল এবং এইগুলির বর্ণনার সময় তাঁহাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস ও কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ বাস্তব সীমার মর্যাদারক্ষার প্রয়োজনকে একেবারেই স্বীকার করে নাই। তা ছাড়া

চৈতন্য-জীবনীতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্দেশ

ভক্তের মনোভূমিতে যাহা স্ফুরিত হয় তাহা যে বাস্তব সংঘটনের অপেক্ষা অধিক সত্য, এ বিষয়ে তাঁহাদের সংশয়াতীত প্রতীতি ছিল। সেইজন্য চৈতন্য-জীবনী-কারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে যে সমস্ত তত্ত্বালোচনা আরোপ করিয়াছেন তাহা সব সময় বস্তুগত তথ্য হয় নাই, কিন্তু উচ্চতর ভাবসত্যের অনুসরণ করিয়াছে। প্রেমধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়-ব্যাপারে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের যে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল—যাহা সাধ্যসাধন-তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়াছে—তাহা সত্য সত্যই গ্রন্থবর্ণিত পদ্ধতিতে ও কালে ঘটিয়াছিল, অথবা উহা সুবিদিত চৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব-বিচারের একটা ভক্তকল্পনাপ্রসূত বিবরণ ও অনেক দিন ধরিয়া যে টুকরা টুকরা তর্ক চলিয়াছিল তাহারই একটি সুসংবদ্ধ সার-সঙ্কলন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে যেটুকু নিশ্চিত সত্য তাহা এই যে রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই প্রেমধর্মের রহস্য জানিতেন ও চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট নিজ অনুভূতির শেষ সীমা উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার পূর্বজ্ঞানকে দৃঢ়তর করিলেন ও তাঁহাকে সাধন-পথে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করিলেন। সেইরূপ চৈতন্যের কণ্ঠে যে সমস্ত গান আরোপিত হইয়াছে সেগুলি হয়ত তাঁহার সময় রচিতই হয় নাই, কিন্তু তাঁহার তদানীন্তন ভাবপ্রকাশের সুষ্ঠু উপায়স্বরূপই নির্বাচিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রেমধর্মের অনুকূল প্রতিবেশ-রূপেই গ্রহীতব্য। তাহাতে হয়ত সমাজের সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না, কিন্তু যুগের ধর্মপিপাসার স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়। এইরূপ বিচারের মানদণ্ডে চরিত-কাব্যগুলির ঐতিহাসিকতা ও তথ্যগত ভিত্তি নিরূপণ করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের যে কয়খানি জীবনী লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপূরের মহাকাব্য চৈতন্যচরিতামৃত (১৫৪২) ও নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৫৭২) উল্লেখযোগ্য। মুরারি গুপ্ত বোধ হয় চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই ও কবি কর্ণপুর তাঁহার তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের চরিতগ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনী

সমসাময়িক সুহৃদ্‌ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিকরের দ্বারা লিখিত হইলেও এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত রীতির অনুবর্তনের জন্য চৈতন্যের মানবিক জীবনের বস্তুরসপ্রধান পরিচয় দেয় না; বরং তাঁহার অবতারত্ব-প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহে ইহারা অলৌকিক উপাদানেই পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব এত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহার নিকটতম

প্রতিবেশীরাও তাঁহাকে ঠিক মানুষ হিসাবে দেখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার জীবনের বাস্তব-তথ্য-নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাও তাঁহারা পূর্ণ করেন নাই। ইঁহারা প্রধানতঃ চৈতন্য-জীবনে কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্য আরোপ করিতে উন্মুখ ছিলেন এবং তাঁহাদের মহাকাব্যকে যতদূর সম্ভব ভাগবতের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। বরং তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীগুলিতে অলৌকিকের দিব্য জ্যোতির অন্তরালে তাঁহার মানবিক পরিচয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা ভাষা দেব-ভাষার ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্যকে একেবারে আবৃত করিতে পারে নাই। তবে মুরারি গুপ্ত ও কর্ণপুর যে ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকারদের পথপ্রদর্শক ও তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও মনোভাব অনেক পরিমাণে নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ।

চৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রথমার্ধ ভক্তিরস, কাব্যকুশলতা ও তথ্যপ্রাচুর্যের সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে চৈতন্য-জীবনীর সন্ন্যাসোত্তর অংশ, তাঁহার নীলাচল-লীলার অপরূপ দিব্যোন্মাদ-কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যভাগবত প্রধানতঃ সরস আখ্যায়িকা-মূলক—ইহাতে চৈতন্য-ধর্মতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মজীবন ও সমাজযাত্রার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক তথ্যরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলো-দ্দীপক। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও পূজাপদ্ধতি প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ও নানা অনার্য ভৌতিক দেবতা-সমূহের আরাধনাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক হিন্দু উৎপীড়নের চিত্রও তাঁহার চরিতগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এগুলি চৈতন্যপূর্ব যুগের বাঙলার যে যথাযথ অবস্থার পরিচয় সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদৃত এবং তাঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব—এই গৌরবময় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পদকর্তা লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই বৃন্দাবন দাসের পরে "চৈতন্যমঙ্গল" নামে জীবনী-কাব্য রচনা করেন। লোচনের কাব্য পাঁচালি গীত রূপে গীত হইত ও লঘু সুরে রচিত বলিয়া সমাজের নিম্নতর স্তরে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। জয়ানন্দের গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদর্শনের সহিত সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই বলিয়া ইহার প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে।

চৈতন্যমঙ্গল

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে অভিহিত গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য কিছু কিছু আধুনিক-কল্পনা-প্রসূত রচনাকে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তথ্যমূলক বিবৃতিরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে অংশ প্রামাণ্য চরিত-গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেই-ফাঁক পূরণের জন্য এই জাতীয় কাল্পনিক গ্রন্থ রচিত হয়। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই তথ্য অবলম্বনে তাঁহার নামে এই ভ্রমণের একটি সুখপাঠ্য ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থরূপে উনবিংশ শতকে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে চৈতন্যভাবপরিমণ্ডল ও তাঁহার ভাববিভোর লীলাভিনয়ের যথাযথ অনুস্মৃতি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক আধুনিক স্থানের উল্লেখ ও পরবর্তী যুগের ভাব-প্রক্ষেপ ইহার প্রামাণ্যতাকে সন্দেহভাজন করিয়াছে। সেইরূপ অদ্বৈত আচার্যের ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ও বিষ্ণুদাস আচার্যের সীতাগুণকদম্ব—তথ্য ও কল্পনায় মিশ্রিত, শিষ্য কর্তৃক নিজ গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে অতিরঞ্জনস্ফীত, অনুকরণপ্রয়াসী রচনাপদ্ধতি ও মনোভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

গোবিন্দদাসের কড়চা ঐতিহাসিকতা

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই গ্রন্থখানি চৈতন্যলীলার বাঙ্ময় বিগ্রহরূপে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর জীবনের শেষার্ধ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কেবল ঘটনামূলক তথ্যসঙ্কলন নহে। ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কাব্যকুশলতার এরূপ আশ্চর্য সমন্বয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল। কৃষ্ণদাস তাঁহার বিষয়-গৌরবের দ্বারা এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে তিনি সচেতনভাবে কাব্যসৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে একেবারেই মনোযোগ দেন নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত

বাংলা পয়ারের শিথিল অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে ও এই অচিরজাত ভাষার অপরীক্ষিত শক্তি-প্রয়োগে, তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে ও নিজ মতবাদপ্রতিষ্ঠায় এরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন যে ইহা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। শ্রুতিকর্কশ পারিভাষিক শব্দসমূহ তিনি এমন অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের বেগবান স্রোতে এই ওজনে ভারী কথাগুলি এমন স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া গিয়াছে, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন বিসদৃশতা আছে তাহা আমাদের লক্ষ্যগোচরই হয় না। মনে হয় যে তাঁহার প্রকৃতি-ধর্ম কবিত্বের অনুকূল ছিল না ; কিন্তু যে দৈবী কৃপা মূককে বাচাল করে, তাহার প্রতি একান্ত-নির্ভর আত্মসমর্পণই তাঁহার অন্তর্লীন কবিত্বকে স্ফুরিত করিয়াছে। চৈতন্যদেবের যে প্রেমবিহ্বল, ভাবতন্ময় রূপটি এই মহাগ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই ভক্ত ও কাব্যরসিকের অনুভূতিতে চিরকালের জন্য যেন পাষাণরেখাঙ্কিত হইয়াছে। কাব্যের চকিত বিকাশ, ভক্তির ক্ষণিক উচ্ছ্বাস দার্শনিকতার এই স্থির আধারে চিরন্তন আশ্রয় লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের আবেদনকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৪

বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনীকাব্য-চতুষ্টয়ের তুলনা করিলে প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্মিতি-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের অতিসন্নিহিত কালবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অলৌকিক ঐশীরূপ প্রতিষ্ঠা করিতেই অত্যন্ত আগ্রহশীল। সুতরাং তাঁহার তথ্যপ্রাচুর্যপরিবেশনের মধ্যেও চৈতন্যের মানবিক সত্তাটি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্যলীলার অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনে তিনি এতই নিবিষ্টচিত্ত যে তাঁহার সমস্ত উপমা-প্রয়োগ এই উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। কৃষ্ণ ও রামলক্ষ্মণের সহিত সাদৃশ্য-আরোপ ছাড়া তিনি চৈতন্যলীলাবর্ণনায় উপযোগী আর কোন জাতীয় উপমান খুঁজিয়া পান নাই। কাজেই তাঁহার তথ্য-সঞ্চয়নের মুকুরে অপার্থিব ব্যঞ্জনার বাষ্পাবরণ এত ঘনবিন্যস্ত হইয়াছে যে উহাতে চৈতন্যদেবের মানবিক রূপটির পরিবর্তে তাঁহার অতিকায় ভগবৎমহিমাস্ফীত মুখাবয়বটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের অধ্যাত্মতত্ত্ববিগ্রহ-মূর্তির স্থলে তিনি এক অতিমানবিক, অলৌকিক লীলারহস্যময় দেবমূর্তিই অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার দুইটি-উপমায় শিল্পীজনোচিত রূপচেতনার স্ফুরণ দেখা যায়।

চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর দেবমূর্তি

লিখন কালীর বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥
(আদিখণ্ড-৪র্থ অধ্যায়)

এখানে গৌরাঙ্গের পড়ুয়ারূপটি কালির ছিটায় মলিন হইয়াও কবির রূপাবিষ্ট দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে অধ্যাত্ম মহিমার ক্ষীণ ব্যঞ্জনা থাকিলেও লোকজীবনের তাজা গন্ধ সমস্ত ভাবমণ্ডলকে সুবাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

পরম অদ্ভুত সভে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন খায় লৈয়া॥
এইমতে প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যাহেন সভে মহানন্দ করি॥
(অন্ত্য খণ্ড—২য় অধ্যায়)

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'—এ চৈতন্যের মানবীয় রূপটি কিছুটা অতিরঞ্জন-মুক্ত হইয়া সহজভাবে প্রকাশিত। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা মাতৃমমতামণ্ডিত হইয়াই তাঁহাব জীবনী-কাব্যে বর্ণিত। চৈতন্যের রূপ ও গুণ লোচনের কবিচেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া পাঠকমনে শিল্পরমণীয়তার সঞ্চার করিয়াছে।

লোচন দাসের সহজ মানবীয়তা

চৈতন্যের রূপবর্ণনায় পদাবলী-সাহিত্যের কোমল অনুভূতি ও উচ্ছ্বসিত রূপমুগ্ধতা মাঝে মধ্যে নিবিড় ভাবাবেশ সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। চৈতন্যলীলাকে এক সৌন্দর্যময় পরিবেশে স্থাপন ও মানবীয় ভাবমণ্ডিত করার প্রয়াস লোচনের কাব্যে কিছুটা লক্ষিত হয়। ইহার সঙ্গে লঘু ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ ও গৌরাঙ্গ-নাগরীভাবের প্রবর্তন গৌরাঙ্গের লোকোত্তর জীবনের জন-আবেদন অনেকাংশে বাড়াইয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া লোচনের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যের মানবিকতা ও কাব্যসৌন্দর্য-মিশ্রিত একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

(জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ প্রধানতঃ ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চৈতন্যজীবন-চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস। ভক্তির প্রবল আবেগই কবির রূপনির্মাণের প্রেরণা যোগাইয়াছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ-উপলক্ষ্যে তাঁহার মস্তকমুণ্ডন কবির মনে যে অপূর্ব ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই তাঁহার কাব্যদেহে ক্ষণিক লাবণ্য-রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্য-বর্ণনায় কবি যে করুণ রসের উদ্দীপন করিতে চাহিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবতত্ত্বের সমর্থনহীনতায় আত্মপ্রত্যয়ের

স্থিরতা হারাইয়াছে। সুতরাং জয়ানন্দের জীবনীকাব্য নিজের দৃঢ় প্রতীতি ও বৈষ্ণব জগতের অনুমোদন এই উভয়বিধ আশ্রয়ের মধ্যে সংশয়াচ্ছন্ন ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিতগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মনোভাবপ্রসূত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী বিশুদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্বের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের মনে মানব শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কোন আবেদন নাই। তাঁহার তত্ত্বাবিষ্ট মন চৈতন্যজীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার বস্তুরসকে গৌণ করিয়া উহার দার্শনিক তাৎপর্য ও অধ্যাত্ম ভাবানুরঞ্জনকে প্রধানরূপে দেখিয়াছে। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদের বিবরণেও তিনি তাঁহার প্রাচীনশাস্ত্রানুগত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাবিলাসই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার উপমা-অলঙ্কার-প্রয়োগে রূপরস অপেক্ষা অমূর্ত মননক্রিয়ারই প্রাধান্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি অপেক্ষা বিশুদ্ধ ভাবসত্যের ইঙ্গিতের প্রতিই অধিক মনোযোগ। অপূর্ব চৈতন্যলীলা ভক্তের চিত্তে যে বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস, যে আত্মহারা আবেগমত্ততার ঘূর্ণী-চক্র উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল, কৃষ্ণদাসের মনে তাহার ঢেউ দোলা দিয়াছে। কিন্তু এই ভক্তিবিহ্বলতায় আত্মসমর্পণই তাঁহার চরম মানস প্রতিক্রিয়া নহে। তিনি দৃঢ় দার্শনিক মননের তটভূমিতে এই আবেগ-উদ্বেলতাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহাগ্রন্থে চৈতন্যতত্ত্বের যে প্রশান্ত, চিরন্তন রূপটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহা সমস্ত আকুল, অধীর ভাবোৎক্ষেপের ঊর্ধ্বে শাশ্বত স্থির উপলব্ধির উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণদাসে দার্শনিকতা ও অধ্যাত্মতত্ত্ব

পদাবলী-সাহিত্যে রূপের যে অজস্রপ্রবহমানতা ও ভাবের যে অশ্রান্ত, পৌনঃপুনিক রোমন্থন ঈশ্বরতত্ত্বকে রসে পরিণত করিয়াছে, সুদূর ভগবৎরূপের উপর মানব প্রেমের অন্তরঙ্গ নৈকট্য আরোপ করিয়াছে, কৃষ্ণদাসে তাহারই বিপরীত প্রক্রিয়াটি লক্ষ্যগোচর হয়। তাঁহার দার্শনিক অভিপ্রায় রূপোজ্জ্বল ও রসঘন দেববিগ্রহের বহির্মণ্ডলকে অন্তর্লোকে সংহরণ করিয়াছে, তাত্ত্বিক অনুভবকে সৌন্দর্যের সর্বগ্রাসী অভিভব হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে নিজ অন্তর্নিহিত সুষমায় ও স্বরূপ-লাবণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে ভাবসত্য রূপকের অত্যধিক প্রয়োগে ও মানবিক রসের অবিরল অভিসিঞ্চনে নিজ সত্তার সুস্পষ্টতা হারাইতে বসিয়াছিল, কৃষ্ণদাসের জীবনীকাব্যে তাহাই আপনার ছদ্মপ্রসাধন ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার নিজস্ব গৌরবে প্রতিভাত হইল।

অথচ শঙ্খের মধ্যে সমুদ্র-স্বননের ন্যায়, গীতার শ্লোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের ক্ষণিক-স্তব্ধ সৈন্যকোলাহলের ন্যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই ভাবনিয়ন্ত্রিত চৈতন্যতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার অন্তরালে পদাবলী-সাহিত্যের সমস্ত সঙ্গীত-মূর্ছনা, রূপোন্মাদ ও আবেগ-কল্লোল নিঃশব্দে আত্মগোপন করিয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলী যদি ভাব হইতে রূপে নিষ্ক্রমণ হয়, তবে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যতত্ত্ব রূপের বহুবিসর্পিত প্রসাব হইতে ভাবের কেন্দ্রবিন্দুতে নিগূঢ় গুহাপ্রবেশ। রূপের মোহ ও রসেব আবেদন যদি কখনও বাঙালীর অনুভব-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিবার ক্ষমতা হারায়, তখন এই দৃঢ় মনন-প্রতিষ্ঠিত, দার্শনিক-ভাবনা-নিরূপিত অধ্যাত্ম তত্ত্ব উহার শাশ্বত প্রত্যয় লইয়া আমাদেব অন্তর্লোকে স্থির আলোকস্তম্ভের ন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

৫

চৈতন্যোত্তর ভাগবত-কাহিনী

(রামায়ণ-মহাভারতের সহিত তুলনায় বাঙালী মনে ভাগবত-কাহিনীর আকর্ষণ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতিব ছিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎস ও ভাবাদর্শের দার্শনিক আশ্রয়রূপে ভাগবত প্রভাব বাঙালী সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের মত ভাগবত কথা বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত জীবন-সংস্কারে পবিণত হয় নাই। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমভক্তিধর্মে দীক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ তাহাদের ভাববিহ্বলতার পোষক তত্ত্বসমর্থনলাভের জন্য ভাগবত-পাঠের প্রেরণা পান। ভাগবতের রাধাকৃষ্ণপ্রেমাত্মক রসতত্ত্ব সমসাময়িক বৈষ্ণবগোষ্ঠী ইতিপূর্বেই শ্রীচৈতন্যলীলাবিলাসের মাধ্যমে আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে অপরূপ রসমাধুরীময় দিব্য নাটক অভিনীত হইতেছিল তাহার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। যাঁহারা ভাবতন্ময় গোরাকে দেখিয়া বা তাঁহার অপার্থিব রসবিভোরতার কথা শুনিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারা ভাগবতে বিবৃত কৃষ্ণপ্রেমলীলাকাহিনীর মধ্যে পরিচিত বিষয়ের ভাবোন্নয়নমহিমা অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনার নূতনত্ব তাঁহাদের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করে নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সরল আখ্যানসমূহ যেমন প্রাকৃত জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছে, তেমনি ইহাদের মাধ্যমে প্রচারিত ভক্তিবাদ সমস্ত তত্ত্বসীমা উত্তীর্ণ

ভাগবতের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য-

হইয়া এক স্বতঃস্ফূর্ত সুনিবিড় অধ্যাত্মপ্রত্যয়াবেশে তাহাদের চিত্তকে রসাপ্লুত করিয়াছে।) (ভাগবতে কাহিনীর আবেদন গৌণ ও তত্ত্বের আবেদন মুখ্য বলিয়া ইহা প্রধানতঃ পণ্ডিতসমাজের অনুশীলনের বিষয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ জনসাধারণ ভাগবতের বঙ্গানুবাদের রসাস্বাদনশক্তি অর্জন না করিয়া পণ্ডিতের মৌখিক ভাষণ ও ব্যাখ্যার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে। ইহার এক পরোক্ষ ফল হইয়াছে এই যে ভাগবতের কোন অনুবাদ কৃত্তিবাস-কাশীরামের অনুবাদ-গ্রন্থের মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করে নাই। সুতরাং ভাগবতের অনুবাদকার্যে কবিগণ বাঙালী মনোধর্ম ও জীবনরুচির আদর্শে মূলের সামগ্রিক রূপান্তরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তাঁহারা মূলের অনেকটা যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন ও উহার তত্ত্বপ্রাধান্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভাগবতের দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের লোকায়ত, রুচিকর, সরল সংস্করণ পূর্বেই পদাবলীসাহিত্য ও চৈতন্যজীবনীর মাধ্যমে অনেকটা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উহার অনুবাদে আর সর্বজনবোধ্যতা ও রসতারল্যের আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভাগবতের অনুবাদ অচিরোদ্ভূত বাংলা ভাষার শক্তিপরীক্ষার এক নূতন ক্ষেত্র রচনা করিল।)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়

(মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' চৈতন্যপূর্ব যুগের রচনা ও অনুবাদ-শাখার প্রথম প্রয়াস। ইহাতে চৈতন্যদেবের যে আসন্ন আবির্ভাব সমস্ত বাতাবরণকে প্রতীক্ষা-চঞ্চল করিয়াছিল তাহার পূর্বাভাসটি পরোক্ষভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি গীতিমূর্ছনার সুরে সুরে, ভাবমুগ্ধতার নিবিড় আবেশে যে দিব্য প্রেমের লীলা কীর্তন করিয়াছেন, মালাধর তাহারই তথ্য ও দর্শনভাবনামূলক ভূমিকা যোগাইয়াছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া চৈতন্যধর্মের ভাবভূমি রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগে ভাগবতের অনুবাদকবৃন্দ—মাধবাচার্য, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, কৃষ্ণদাস ও দুঃখী শ্যামদাস—কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার সম্মিলিত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ক্রমবর্ধমান উদ্বেলতাকে উচ্চতর তত্ত্ববেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে উহার চৈতন্যতত্ত্বে রূপান্তর শুধু অত্যুচ্ছ্বাসময় ভাববিলাসের পর্যায় হইতে প্রকৃত জ্ঞানমূলক সত্যবোধে উন্নীত হইবে ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহারা কেবল আখ্যানভাগের বিবরণে সন্তুষ্ট হন নাই; ভাগবতের গভীরভাবাত্মক, স্বল্পতম কথায় ব্যক্ত দুর্বোধ্য অধ্যাত্ম তত্ত্বকূটসমূহের ভাষান্তরের প্রতিও মনোযোগ দিয়াছেন। এই

উভয়-উদ্দেশ্যমূলকতার জন্যই এই অনুবাদগুলির কাব্যোৎকর্ষ ও ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সামর্থ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত সহযোগিতায় ইহারা বাংলা কাব্যের দার্শনিক মনন-সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছে।)

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপ উভয় দিকই প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদক কবিরা যদিও দশম স্কন্ধের রাসলীলা প্রভৃতি ভগবানের রসবিলাস-প্রধান লীলার প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহার অসুরসংহাররূপ ঐশ্বর্যশক্তিরও যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎস্বরূপই বাঙালী পাঠকের গোচর হইয়াছে। **শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা**

ঐশ্বর্যগুণপ্রধান বর্ণনার মধ্যে উদ্ধবের নিকট বিশ্বরূপপ্রদর্শন, পুতনা ও অঘাসুরের মৃত্যুপূর্ব বীভৎসরূপ, কংসবধ, যুদ্ধচিত্র প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। সংস্কৃতের গাঢ়বদ্ধ, ব্যঞ্জনাঘন ও ধ্বনিমন্দ্রিত বাক্য-বিন্যাসের তুলনায় বাংলা অনুবাদ অনেকটা লঘু, স্বল্পশক্তি ও নিছক তথ্যবিবৃতিমূলক হইলেও দেবভাষার গাম্ভীর্যের ও তত্ত্বচিন্তার খানিকটা বাংলায় সঞ্চারিত হইয়াছে। **ঐশ্বর্য-বর্ণনা**

মাধুর্যরূপবর্ণনায় রাসলীলার ঘন রূপসম্মোহের মধ্যেও মাধবাচার্য দার্শনিক মনের একটু ত্বরিত স্পর্শে সমস্ত বর্ণাঢ্যতার মধ্যে একটা অবাস্তবতার ম্লান ইঙ্গিত দিয়া উহাকে রূপ হইতে অরূপলোকে উন্নীত করিয়াছেন। কৃষ্ণের গোপীদের লইয়া খেলা **মাধুর্য-লীলা**

যেন শিশু খেলা করে লৈয়া আপন ছায়া।

কৃষ্ণরূপের সম্মোহন-শক্তিতে স্থাবর-জঙ্গম কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধ তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য বলিতেছেন :—

পল্লব-পুলকে অতি আকুল স্থাবর।
প্রেমেতে শিশিরধারা বহে নিরন্তর॥

রাসলীলার সৌন্দর্য-আবেদন, কৃষ্ণ ও গোপীবৃন্দের বর্ণের পার্থক্য মূলের অনুসরণে প্রথাবদ্ধ উপমা-প্রয়োগে ব্যক্ত হইয়াছে। এইসব স্থলে উপমার অভিনব ঔচিত্য অপেক্ষা শব্দের কোমল ধ্বনিই মোহ-পরিমণ্ডল-রচনায় সহায়তা করিয়াছে।

কৃষ্ণের মথুরাগমন জন্য গোপীদের বিরহবেদনাদ্যোতনায় মাধবাচার্য বৈরাগ্য ও মৃত্যুসূচক ভাবের অবতারণা করিয়াছেন।

বিবেকী গৃহস্থ যেন লড়ে দূর দেশে।
দেহ ছাড়ি চলে যেন পরাণ-পুরুষে॥

নিসর্গবর্ণনায় মূল ভাগবত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মাঝে মধ্যে কোন বিশেষ ঋতুতে প্রকৃতিপরিবেশের রূপ-পরিবর্তন ভাগবতকারকে রূপক-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

মার্গাঃ বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণাচ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব॥

বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন অপরিষ্কৃত পথ সন্দেহের বিষয় হইয়াছে—কালেব প্রতিকূলতায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক অপঠিত বেদের মত। এই অর্থঘন শ্লোকটির ভাষান্তরে বিভিন্ন কবি আপন যুগ-প্রতিবেশ, মানস প্রেরণা ও জীবনাভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে বিভিন্ন প্রকাবের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা কেহই এই চমৎকৃতিময় রচনাটির দীপ্তি-চমকটি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই। ভাগবতের যুগের বেদ-বিলুপ্তির আশঙ্কা কাহারও নিকট দ্বিজের জাতিগত অধোগতি (মালাধর), কাহারও নিকট কুলীন পণ্ডিতের দারিদ্র্য (কৃষ্ণদাস), কাহারও নিকট বা কলিযুগের অধর্মপ্রবণতা (রঘুনাথ) রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মোটকথা ভাগবতের মূল অবলম্বনে বিভিন্ন কবি নিজ নিজ স্বাধীন কল্পনাবিকাশ ও জীবন-সমালোচনাব প্রেরণা পাইয়াছেন।

অনুবাদে স্বাধীন কল্পনা

ভাগবতের অনুবাদগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই শ্রীচৈতন্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। মাধবাচার্য তাঁহার আত্মীয় ছিলেন ও রঘুনাথের স্খলিত ভাগবতপাঠ তিনি পানিহাটি-আগমনের সময় স্বকর্ণে শুনিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সমস্ত যোগাযোগ হইতে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইঁহাদের ভাগবত-আস্বাদন মূলতঃ চৈতন্যলীলা-প্রণোদিত। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিশেষতঃ কেবল দশম স্কন্ধে স্বীয় ধর্মানুরাগ ও রসরুচি সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি ভাগবতের ৪র্থ, ৫ম স্কন্ধেও নিজ রুচিকর বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনে হয় যে ভাগবতের উপাখ্যানের মধ্যে তিনি বিস্তারিত রূপকার্থপ্রয়োগের অনুকূল অবসর পাইয়াছিলেন ও বাংলা কাব্যে সার্থক রূপকারোপের দ্বারা উহার অর্থগূঢ়তা ও কাব্যসম্ভাবনা অনেকটা বর্ধিত করিয়াছেন।

চৈতন্যলীলার প্রভাব

ভাগবত বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ না করিয়াও চৈতন্যলীলার সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য বাঙালী ধর্ম-চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

করিয়াছে ও পদাবলীসাহিত্যের প্রেরণা-উৎসের সহিত নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। বাঙালী জীবনের ভৌগোলিক সংস্থার ন্যায় উহার সাংস্কৃতিক সংস্থায়ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিধারা-সঙ্গম ঘটিয়াছে ইহাদের মধ্যে রামায়ণকে প্রসন্নসলিলা গঙ্গা ও মহাভারতকে রহস্য-গভীরা যমুনার সহিত তুলনা করিলে, ভাগবতকে সরস্বতীর অন্তর্হিত ফল্গু-স্রোতোধারার সহিত যথার্থভাবে তুলনা করা যায়।)

সংস্কৃতির ত্রিবেণী-ধারা

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

১

বৈষ্ণব ভাবধারার কাব্য-প্রকাশ পদাবলীর মাধ্যমে। কয়েকটি ক্ষুদ্র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ খণ্ড-কবিতার মালা গাঁথিয়া রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য-লীলার বিভিন্ন ভাবপর্যায় ও ঘটনা-পরিণতি এই পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উপস্থাপনারীতির চরম বিকাশ ও রস-পরিপূর্ণতা পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-রচয়িতারা কৃষ্ণলীলা অনুভব করিয়াছেন চৈতন্যদেবের দিব্য অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের নির্দেশ তাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অলঙ্কার ও মীমাংসা গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে তাহাই পদাবলী-সাহিত্যের ঘটনা-বিন্যাস ও ভাবধারাকে নিয়মিত করিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য

বিদ্যাপতির পদে লৌকিক রসেরই প্রাধান্য; উহারই মাঝে মাঝে অধ্যাত্ম তাৎপর্যের স্ফুরণ অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। বিদ্যাপতি অধিকাংশ স্থলেই রাজসভার বিদগ্ধ কবি। কোথাও কোথাও তিনি সাধক ও ভক্ত কবি। তাঁহার প্রেমলীলাবর্ণনা সর্বদা অধ্যাত্ম অনুশাসনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের সমস্ত বৈষ্ণব কবি দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত; তাঁহাদের সমস্ত কল্পনাবিলাস ও রূপানুরাগের পিছনে এই সদা-জাগ্রত অধ্যাত্ম চেতনার নিয়ন্ত্রণ। তাঁহাদের ভণিতায় বা অন্তিম মন্তব্যে তাঁহারা কোনও না কোনও রূপে দিব্য লীলার সহায়ক রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কেহ বা সখীরূপে, কেহ বা দূতীরূপে, কেহ বা সহানুভূতিশীল দর্শক বা সেবকরূপে প্রেমপরিপুষ্টির কার্যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ভণিতায় কেবল তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবির ভণিতায় তাঁহার ভক্তরূপ, সমস্ত প্রাকৃত বর্ণনার পিছনে প্রচ্ছন্ন ধর্মের ইঙ্গিতের প্রতি তাঁহার সচেতনতা পরিস্ফুট। পদাবলী-সাহিত্যে সমস্ত প্রকৃতি-সৌন্দর্য, মানবিক প্রেমের সমস্ত সুকুমার ভাববিলাস কেবল এক অলৌকিক রস-স্ফুরণের, এক অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম রহস্যের পরিস্ফুটনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী

পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণ-লীলার যে কোন পালাগানের পূর্বে চৈতন্য-জীবনে তাহার সূচক বা অনুরূপ

ভাবকে গৌরচন্দ্রিকারূপে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নবদ্বীপ-লীলা যে বৃন্দাবনলীলারই পুনরভিনয়, কৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ভাবসমূহ যে শ্রীচৈতন্য-জীবনে নবরূপায়ণ লাভ করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে এই অভিন্নত্ববোধই গৌরচন্দ্রিকায় ব্যঞ্জিত হয়। কাজেই চৈতন্যোত্তর কবির চক্ষে কৃষ্ণলীলাবর্ণনার সময় চৈতন্য-লীলা সর্বদাই প্রকট থাকে। চৈতন্যের ভাববিহ্বলতা, রস-আস্বাদন-পদ্ধতি, কীর্তনোল্লাস, ও প্রেমধর্মসাধনার উজ্জ্বল স্মৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইঁহারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রহস্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। যেমন চৈতন্যের মধ্যে ইঁহারা রাধাকৃষ্ণ-দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি কৃষ্ণলীলাতেও চৈতন্যলীলাভিনয় আরোপিত হয়। বৈষ্ণব কবির মুগ্ধ অনুভূতিতে যেন দুই জ্যোতিষ্কের আলোক এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই পদাবলীর আক্ষরিক অর্থের পিছনে একটা গভীরতর ভাবব্যঞ্জনা সর্বদা অনুভূত হয়।

গৌরচন্দ্রিকা

(পদাবলী-সাহিত্য বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি, বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধতম কাব্যময় প্রকাশ।) বাঙালীর সমস্ত মধুর ও কোমল অনুভূতি, তাহার রূপমুগ্ধতা ও ভাবতন্ময়তা, তাহার জীবন-দর্শনের স্নিগ্ধ, ভক্তিনির্ভর কমনীয়তা, তাহার ভালবাসার আগ্রহ এই পদগুলির ক্ষুদ্র পরিসরে এক অপরূপ প্রকাশ-সুষমা লাভ করিয়াছে। মনে হয় বাঙালী-হৃদয়ের সবটুকু মধু, উহার অন্তরের সমস্ত সুবাস যেন এই পদ-গুলির মধ্যে কবিরা ঢালিয়া দিয়াছেন। হয়ত ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও বৈচিত্র্যের অভাব, একই সুরের পুনরাবৃত্তি আছে; হয়ত জীবন-জটিলতার সম্পূর্ণ পরিচয় ইহাদের মধ্যে মেলে না। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের প্রেমময় মূর্তিতে বিশ্বাসী বা মধুর আত্মনিবেদনেই সমস্ত জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পান, তাঁহাদের নিকট পদাবলী-সাহিত্য মানবজীবনের পরম পরিণতি, ভক্তিসাধনার শেষফলরূপে প্রতিভাত হয়।

বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধ কাব্যময় প্রকাশ পদাবলী

পদাবলী-রচয়িতা-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তী ছিলেন তাঁহারা প্রায়ই চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সহচর এবং প্রধানতঃ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। নরহরি সরকার, বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ এই তিন ভ্রাতা, বংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রামানন্দ বসু ও মুরারি গুপ্ত—ইঁহারা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। মনে হয় যে গৌরাঙ্গের মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়দ্রাবী ভাববিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রথম পর্যায়ের কবিরা,

চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তাগণ

নূতন করিয়া বিদ্যাপতির অনুকরণে পদরচনার প্রেরণা পান,' এবং কিছু পরেই চৈতন্যলীলার সীমা অতিক্রম করিয়া উহার ভাব-প্রেরণা যে উৎস হইতে আসে সেই বৃন্দাবনলীলার প্রতি ইঁহারা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হন। নরহরি সরকার এই নব-পর্যায়ের পদরচনার আদি স্রষ্টা বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনিই প্রথম গৌরাঙ্গ-দেবের লীলা-মাধুরী পদাবলীর মাধ্যমে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বয়সেও বোধ হয় ইনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রায় রামানন্দের ব্রজবুলি পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল' পদাবলীর একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহাতে শুধু প্রেমের বিরহার্তি নহে, রসতত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেত সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, যদুনাথ দাস, বংশীবদন, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কবিসম্প্রদায় গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, কৈশোর-দুরন্তপনা, সন্ন্যাস-গ্রহণ, শচীবিলাপ প্রভৃতি গৌরাঙ্গ-জীবনীর বিভিন্ন অধ্যায় লইয়া পদরচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পদে গৌরাঙ্গনাগরলীলাবিষয়ক আখ্যানও কৃষ্ণলীলার অনুকরণে পরিকল্পিত হইয়া উভয় লীলার মধ্যে সংযোগসূত্র রচনা করিয়াছে। নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পদগুলি বৈষ্ণবীয় দীনতা ও আত্ম-ধিক্কারের গভীর প্রভাবচিহ্নিত হইলেও ইহারা বিদ্যাপতির অনুরূপ পদাবলীর ন্যায় এক উদার, সার্বভৌম আত্মনিবেদনের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

২

দ্বিতীয় যুগে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। এই যুগে বৈষ্ণবধর্ম সাধারণের মধ্যে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে ও প্রেমধর্ম জীবনসাধনার অঙ্গীভূত হয়।

চৈতন্যোত্তর পদাবলীর মূলতত্ত্ব

প্রথম যুগে বৈষ্ণবতত্ত্ব কতকটা প্রতিপাদনের বিষয় ছিল এবং এই তত্ত্বের গন্ধ মাঝেমধ্যে উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। চৈতন্যের অবতারত্ব ও তাঁহার তাত্ত্বিক রূপনির্ণয়ও কিছু পরিমাণে অনিশ্চয়তাগ্রস্ত ছিল এবং সর্বসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগে যে পদাবলী রচিত হয়, তাহাতে চৈতন্যের দেবত্ব এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার অভিন্নত্ব একটা সুগভীর স্বতঃস্ফূর্ত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়াছে এবং লেখকের অনুভূতিতে ও লেখনীমুখে সহজ উৎসারিত রসধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে—রস-চেতনার এই পূর্ণ বিকশিত পুষ্প আর তত্ত্বের কণ্টকবিদ্ধ নহে। এখানে কবিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস, রূপ ও অরূপ চেতনা, মানবিক প্রেম ও ঐশী ব্যঞ্জনা অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতায় একীভূত হইয়াছে।

বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিও এই যুগে আবির্ভূত হইয়া এই লীলা-কাহিনীকে অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আছেন শ্রীখণ্ড-গোষ্ঠীর কবিরঞ্জন (বাঙালী বিদ্যাপতি), কবিশেখর বা শেখর রায় ও লোচন দাস (চৈতন্য-জীবনীকার), নিত্যানন্দ শাখার জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস, সহজিয়া মতবাদের পুষ্টিকর্তা ও পরকীয়া প্রেমের সাধক চণ্ডী-দাস ও শাক্তধর্ম হইতে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত, ভাষা ও ভাবের আলঙ্কারিক প্রয়োগে ঐশ্বর্যময়, বিদ্যাপতি-রীতি-প্রভাবিত গোবিন্দ দাস। ইঁহাদের রচনায় গোষ্ঠীর সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তি-বিশেষত্বের সন্ধান মিলে। কবিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্যাপতির সুর ও রচনা-রীতি বৈষ্ণবতত্ত্বে জারিত হইয়া এক অভিনব প্রকাশোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ইহার বাঙালী বাগ্‌ভঙ্গী-মিশ্রিত (idiom) ব্রজবুলিতে রচিত বহু পদ বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কবিশেখর গোবিন্দদাসের সহিত অভিসার-বর্ণনার শ্রেষ্ঠ কবি। লোচন দাস হালকা সুরে ও লঘু বাচনভঙ্গীতে (ধামালীপদ) কৃষ্ণলীলার বর্ণনাকে সাধারণ পাঠকের তরল রুচির নিকট আস্বাদনীয় করিয়াছেন—ইনি গৌরাঙ্গকেও কৃষ্ণের অনুসরণে নবদ্বীপে প্রেমলীলার নায়করূপে এক বিসদৃশ ভূমিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। বলরাম দাসের পদগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাসম্বন্ধীয় ও বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ।

চৈতন্যোত্তর শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তাগণ

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস পদাবলীসাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠতম কবি। গোবিন্দদাসের পদে গভীর ভাবাবেগের সহিত যুক্তিশৃঙ্খলার অনুবর্তন ও অলঙ্কার-বহুল, ঝঙ্কারপ্রধান, মর্যাদাপূর্ণ ভাষাপ্রয়োগের চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইনি অভিসার ও নায়িকার আত্মবিস্মৃত প্রণয়াবেগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। মান ও ভাব-সম্মিলনের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদও ইঁহার আছে। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কাব্য-গগনের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক—বৈষ্ণব-ভাব-রাজ্যের উন্নততম মহিমা ও কারুণ্য ইঁহাদের রচনায় উদাহৃত। নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অন্তর্দাহ ও প্রেমের প্রকৃতি-দুর্বোধ্যতার স্বরূপনির্ণয়, বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ও পুনর্মিলনের সংযত-গম্ভীর আনন্দনিবিড়তা প্রভৃতি সর্ববিধ ভাবপ্রকাশে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ও অতুলনীয়। ইঁহাদের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর ও ব্যঞ্জনাশক্তির বিকিরণে দীপ্তিময়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা অনুমাত্র প্রভাবিত না হইয়াও বাংলা ভাষা আত্মশক্তিতে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য-উদ্ঘাটনে

তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি —গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস

কিরূপ আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে, বাঙালী ধর্ম ও সমাজের সমস্ত সংস্কার-আবরণ ভেদ করিয়া ইহা কিরূপে অভ্রান্ত লক্ষ্যে মর্মের গভীরতম অনুভূতিকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম, এই কবিদ্বয় তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্থল। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের কবিধর্মের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে ইহাদের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পদের রচয়িতা যে কে তাহা আভ্যন্তরীণ বিচারে নির্ণয় করা অসম্ভব। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু'– এই বিখ্যাত পদটি কোন কোন পুঁথিতে জ্ঞানদাস ও আর কয়েকটি পুঁথিতে চণ্ডীদাসে আরোপিত হইয়াছে এবং উভয় শ্রেণীর পুঁথির সংখ্যাগণনা ছাড়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত-গঠনের কোন উপায় নাই। জ্ঞানদাস সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা এই মাত্র যে বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে তাঁহার আশ্রম ছিল ও তিনি খেতুরি বৈষ্ণব সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্জীবন বা বহির্জীবন সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ও তিনি বৈষ্ণব-ভাব-সাধনার মূর্ত প্রতীকরূপে বৈষ্ণব কবিকুলের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া আমাদের জ্ঞানে না হউক কল্পনায় বিরাজিত। তিনি যে পরকীয়া প্রেমের জন্য অনেক সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, প্রেমের রহস্যময় অলিতে গলিতে বিচরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে তাঁহার ছিল ও এই প্রেমই যে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান মন্ত্র ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের এই কাহিনী জনশ্রুতির পথ বাহিয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহা লৌকিক তথ্য না হইলেও যে ভাবসত্য তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রেমতত্ত্ববিষয়ক পদগুলি, যাহাতে প্রেমের গভীর অন্তর্বেদনা ও বিপরীতধর্মী প্রকৃতিরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহারা চণ্ডীদাসেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাব্যপ্রকাশ ও প্রধানতঃ তাঁরই রচনা। জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রে এরূপ সমর্থক প্রমাণের অভাব; তবে কবিপ্রতিভার সহজ সংস্কারের বলে তিনি যে প্রেমরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে বা অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়কের রূপের কোনো আদর্শ নাই—সুতরাং জ্ঞানদাস অনেকটা স্বাধীনভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপকল্পনায়

জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস

শুধু অলঙ্কার-সজ্জা-বর্ণনা বা বাঁধা-ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে নায়কদেহে সৌন্দর্যতরঙ্গের সচল প্রবাহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র-প্রতিবিম্বের সহিত ও উঁহার রক্ত-চন্দন-চর্চিত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো জবা-পুষ্পের সহিত

তুলনা-করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার-বর্জিত ও মর্মস্পর্শী; জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব ও আধুনিক অন্তর্দৃষ্টিশীল কল্পনা-মননের কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই, মানব-জীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের উর্ধ্বলোকে বিচরণ করিয়াছেন। ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অনুভূতি-গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।) পদাবলী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই দুই মহাকবির রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পরই বৈষ্ণবভাবপ্রবাহের জোয়ার শেষ হইয়া ভাটা আরম্ভ হইল। তৃতীয় স্তরের কবিদের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ (গোবিন্দ দাসের পৌত্র), নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ, রাধামোহন, দীনবন্ধু, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর প্রভৃতি মহাজন কবিত্বশক্তিতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াও বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিসাধনাধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিয়াছেন। কল্পনার সরসতা প্রথাগত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইল—ভাবের গাঢ়তা কমিয়া বাক্‌চাতুর্য, কষ্ট-কল্পনা, আখ্যানের পল্লবিত বিস্তার দেখা দিল। বৈষ্ণব ধর্ম জাতীয় ভাবধারার সর্বব্যাপী মানস প্রসার হারাইয়া সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত হইল। জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল, জাতির মর্মানুভূতি হইতে ইহা দূরে সরিয়া আসিয়া অতিরঞ্জিত কল্পনার রূপ গ্রহণ করিল। (সমাজের বাস্তব অবস্থা আর এই প্রেম-ধর্মের অনুকূল রহিল না। স্মৃতির অনুশাসন, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর মাধ্যমে মাতৃচেতনার প্রসার, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি, অনাচার ও দলাদলির আবির্ভাব, সমাজ-জীবনে প্রেমের পরিবর্তে শক্তির প্রতিষ্ঠা—এইসব কারণেই বৈষ্ণব-সাহিত্য ধীরে ধীরে শুষ্ক ও প্রাণহীন হইয়া উঠিল। তথাপি সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছুদিন পর্যন্ত পদাবলী-সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। এই সময় ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, পদরসসার ও পদরত্নাকর প্রভৃতি পদাবলীর সংকলনগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। (নূতন পদ-রচনা বন্ধ হইয়া পুরাতন পদের সংগ্রহ ও শ্রেণী-বিভাগ চলিতে লাগিল।) জীবনের ধারা প্রবহমান নদীর রূপ ত্যাগ করিয়া সরোবরের তটবন্ধনে স্থির ও গতিহীন হইল।

পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ ও সংকলন-গ্রন্থ-প্রকাশ

এই অবক্ষয়ের যুগে যে সমস্ত কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলা লইয়া এক বিরাট গীতি-আখ্যান রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁহার যত পদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির মধ্যে একটিও নাই—সুতরাং তিনি যে স্বতন্ত্র কবি ও পরবর্তী যুগের কবি এই সিদ্ধান্তে আপাতত পৌঁছিতে হয়। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি মাঝামাঝি ধরনের —ভাবস্ফুরণ অপেক্ষা আখ্যানের ধারাবাহিকতাই তাঁহার লক্ষ্য। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে যত কাহিনী পল্লবিত হইয়াছিল তাঁহার কাব্যের বিরাট পরিধিতে তিনি সে সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মনে হয় যে পদাবলী-সাহিত্যের যে প্রকৃত আদর্শ ও নির্দিষ্ট রূপ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গীতিকবিতার সাহায্যে লীলারসবিকাশ—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের আখ্যান-প্রাধান্যের রীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ রাঢ়ের লোক ছিলেন।

দীন চণ্ডীদাস

এই যুগে কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা লইয়া কবিতা লেখেন ও বাৎসল্যরসেরই বিশেষ অনুশীলন করেন। মুসলমান কবিগোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সবটা গ্রহণ না করিয়া ও নিজেদের লীলাভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মনে না করিয়া, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবধান রক্ষা করিয়াছেন ও তাঁহাদের ভণিতায় কেবল সর্বধর্ম-সাধারণ মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিগোষ্ঠীর অভ্যুদয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বব্যাপী জাতীয়তারই নিদর্শন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কতকটা ধর্মসমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহাও প্রমাণ করে। হিন্দু যেমন মুসলমানের সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ আখ্যা দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানও তেমনি ভগবানের রসময় ও আনন্দময় মূর্তির নিকট কাব্যশ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে দ্বিধা করে নাই।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী মনের এক উচ্ছল ভাবাবেগ, এক অপূর্ব আনন্দানুভূতি ভগবৎ-উপলব্ধির একান্ত আকূতির সহিত মণিকাঞ্চনযোগে সংযুক্ত হইয়াছে। ভগবানের রূপগুণ-আকর্ষণীয় শক্তি লইয়া এরূপ আবেগমত্ততা ও সৌন্দর্য-মুগ্ধতা আর কোন যুগে জাতীয় চিত্তকে অধিকার করে নাই। নায়ক-নায়িকার রূপ, পরস্পরের মিলনের প্রতি আগ্রহ, বিরহ-ব্যাকুলতা ও পরিণামে চিরবিচ্ছেদ-

স্বীকৃতি প্রচলিত কাব্যালঙ্কারপ্রয়োগ হইতে অন্তরের নিগূঢ়তম অনুভব-কেন্দ্রে অনুরণিত হইয়াছে—শিল্পীর সচেতন কারুকৃতি ভক্ত ও রূপাবিষ্ট মনের অনিবার্য সৌন্দর্যচেতনার দ্বার খুলিয়াছে। প্রথাবদ্ধ উপমা মনের অস্থির, অতৃপ্ত আবেগে, সাদৃশ্য-সন্ধানের উন্মত্ত ব্যাকুলতায় সূর্যালোক-প্রতিঘাতী, দ্রুত-আবর্তিত হীরক-খণ্ডের ন্যায় নানাবর্ণের দ্যুতি ছড়াইয়াছে। অলঙ্কারের অভাবিত ঐশ্বর্য, উক্তির পৌনঃপুনিকতা, ছন্দের প্রমত্ত উল্লাস, শব্দের সূক্ষ্ম, কোমল ব্যঞ্জনা, রূপসম্ভাবনার শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়াইয়া-আনা মানস আগ্রহ—এ সমস্ত মিলিয়া এক সর্বগ্রাসী আবেশে আত্মহারা, এক সামগ্রিক দিব্যচেতনার ইন্দ্রজালমুগ্ধ কবিমনের পরিচয় বহন করে। এই প্রবল আবেগোৎক্ষেপে দূরের বস্তু একত্র মিলিয়াছে, জড় পদার্থ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ধ্বনিতে, সুরে, কবিকল্পনায় এক অপরূপ সৌন্দর্যচক্র নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির চিত্র মানব-চেতনার মধ্যে অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছে, নিসর্গের চলমান প্রাণপ্রবাহ নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনাকে জীবনলীলার গতিবেগ দিয়াছে, তাহাদের প্রণয়াবেশের বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে এক সূক্ষ্মতর সঙ্কেতদ্যোতনার চমৎকৃতি জাগাইয়াছে। এমন কি লৌকিক জীবনের আচার-সংস্কার ও সরল, অমার্জিত ভাষা পর্যন্ত লেখকগোষ্ঠীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বলে এই দিব্যপ্রেমসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে—ভক্তির স্পর্শে মৃত্তিকাস্তরও হিরণ্যদ্যুতিময়তা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যাত্মভাব-বিভোর জাতির অপূর্ব কাব্যনির্মিতি—রূপদক্ষতা আসিয়াছে ভক্তের ঐকান্তিক ভাবকল্পনার টানে। যখন হইতে কল্পনায় ভাটা ধরিয়াছে, তখন হইতেই বৈষ্ণব কবিতা শিল্পস্বর্গচ্যুত হইয়া ভাবহীন প্রথানুবর্তনের ধূলিশায়ী হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদের সৌন্দর্য ও গৌরব

বৈষ্ণব পদাবলীর বেশি-কম তিন হাজার পদ একসঙ্গে পড়িতে গেলে সেই প্রয়াস আপেক্ষিক বৈচিত্র্যহীনতার জন্য ক্লান্তিকর হইয়া উঠে ও উহার কাব্যকৃতির দুর্বলতা বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা হইতে প্রায় কোন প্রথম শ্রেণীর রচনাই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে। ইহার শ্রেষ্ঠ পদগুলিতে—যথা 'সখি, কি কহব অনুভব মোয়,' 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু', 'বঁধুয়া, কি আর কহিব আমি', 'আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে', 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে', 'যাহা যাহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি', 'আক্ষেপ প্রেম' প্রভৃতি পদগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী। ইহাদের মধ্যে প্রেমের রহস্য-

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও বৈষ্ণব পদ

মগ্নতা ও অসীম অতৃপ্তি, উঁহার ঐকান্তিক আত্মনিবেদন ও অন্তর্দাহ, মিলনের নিবিড় আনন্দ ও বিরহের অতলান্ত দুঃখবোধ অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে রক্ষণশীল, বিধিনিষেধবারিত জীবন অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণব কবিবৃন্দ প্রণয়ের এই অপরিসীম রহস্য ও আর্তির স্বরূপ কি করিয়া জানিলেন? অথবা, ভগবৎ-লীলায় সমর্পিতচিত্ত কবির নিকট জীবনের কোন রহস্যই অবগুণ্ঠিত থাকে না।

নবম অধ্যায়

শাক্ত পদাবলী

১

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বাঙালীর মানস-চেতনায় বৈষ্ণব ভাবপ্লাবন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল ও তাহার ভক্তিরসধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা জাতীয় জীবনে উহার পূর্বপ্রভাব হারাইল ও উহার পরিবর্তে মাতৃদেবতার পূজা প্রাধান্য লাভ করিল। ভাবস্রোতের এই পরিবর্তনের কারণ সমাজচেতনা ও জীবনাদর্শের রূপান্তরের মধ্যেই নিহিত আছে। বৃন্দাবন-লীলার অখণ্ড মধুর রস ক্রমশঃ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া অপার্থিব কল্পনাবিলাসের রূপ ধারণ করিল। (ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, মোগল শাসনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পৌনে একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে মোটামুটি একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির যুগ প্রতিষ্ঠিত ছিল।) অন্ততঃ কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ের দ্বারা ইহার জীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয় নাই। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে যে প্রজা-উৎপীড়নের চিত্র পাই, তাহা শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্তনের অনিবার্য সাময়িক ওলট-পালট বলিয়াই মনে হয়। টোডরমল-মানসিংহের সময় হইতে সুজা-সায়েস্তার সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে যে শক্তি, প্রাচুর্য ও আদর্শ-গত আত্মস্থতার যুগ ছিল সেই পরিবেশেই বৈষ্ণবীয় প্রেম-মাধুর্য পরিপূর্ণ রস-বিকাশের সুযোগ পাইয়াছিল ও জাতীয় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

মোগল আমলের শান্তিময় পরিবেশ ও বৈষ্ণব সাহিত্য

(কিন্তু এই সুখশান্তি বেশী দিন রহিল না—দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া বাংলার তটভূমে আঘাত করিল ও উহার জীবনধারায় ঘূর্ণীবেগের সঞ্চার করিল। প্রেমের পরিবর্তে শক্তি, মধুর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে দুর্দমনীয় জিগীষা ও আত্মরক্ষার অনিবার্য প্রেরণা সমাজ-পরিবেশে অনস্বীকার্য সত্যরূপে দেখা দিল।) অবশ্য মঙ্গল-কাব্যে এই শক্তিপূজার প্রবণতা পূর্ব হইতেই ছিল, কিন্তু সেখানে অশান্তি আসিয়াছে কোন বহিঃশক্তির অভিভবে নয়, দেবতারই জোর করিয়া পূজা-আদায়-চেষ্টায়। কিন্তু দেশে যখন সত্য সত্যই দুর্দৈব ঘনাইয়া আসিল, যখন বাস্তব জীবনের

রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে শক্তি-সাধনার প্রবণতা

সহিত প্রেমসাধনার আদর্শের সামঞ্জস্য রহিল না, যখন বৈষয়িক অনিশ্চয়তার নূতন জটিল পরিস্থিতিতে বৈষ্ণবধর্মের রসমাধুর্য অপ্রযোজ্য হইল, তখন দেশের চিত্ত মোড় ঘুরিয়া মাতৃশক্তি-উপাসনাকেই আশ্রয় করিল। শাক্ত পদাবলীর কবিদের মধ্যে অনেকেই রাজা, জমিদার বা রাজবংশাশ্রিত সাধক ছিলেন—ইঁহারা যুগের বিপর্যয়, ধনদৌলতের অনিত্যতা, সংসারের ক্রূর বঞ্চনা প্রভৃতি ভাব তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনুভব করিয়া এই মায়ার ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতার নিকট কাতর আবেদন জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগোষ্ঠী সংসার-বিমুখ ছিলেন—শাক্ত সাধকেরা কিন্তু বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; তাঁহাদের এই অবস্থা-বৈষম্য হইতে তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতি ও আত্মনিবেদনের সুরের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য উদ্ভূত হইয়াছে।

এই পরিবর্তনের মধ্যে কেবল বহির্জীবন নয়, অন্তর্জীবনেরও প্রভাব লক্ষণীয়। শাস্ত্রবিধিশাসিত, স্মৃতিব্যবস্থাপ্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক হৃদয়বৃত্তি যে বিশেষ প্রশ্রয় পাইবে না ইহা স্বাভাবিক; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে সমাজের বুকে অবৈধ প্রণয়াভিনয় সমাজ-চেতনায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ, কঠোরনীতিনিয়ন্ত্রিত সমাজে মাতার প্রভাব বাড়িতে লাগিল, ও ধীরে ধীরে মাতা প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত করিয়া পরিবার-জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জননীর এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবার ও সমাজ হইতে স্বভাবতই অধ্যাত্ম জীবনে সম্প্রসারিত হইল। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—বৈষ্ণবধর্মের এই উন্নত অধ্যাত্ম তত্ত্ব বাংলার বাস্তব জীবনে এক অপরিচিত অনুভূতি-লোকের বার্তা বহন করিয়া আনিল ও প্রাকৃত গণচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটি ভাববিলাসরূপে প্রতিভাত হইল। পক্ষান্তরে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহ-ভক্তি-মমতা, পারস্পরিক আদর-আবদার, মান-অভিমান প্রাত্যহিক জীবনে এমন একটা উজ্জ্বল সত্য ও সার্বভৌম অভিজ্ঞতা যে অধ্যাত্ম জীবনে এই সুর স্বতঃই ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাজেই বাংলা গীতিকবিতা মাতার জয়গানে, মাতার প্রতি একান্ত আত্মনিবেদনে, দুরন্ত শিশুর স্নেহানুযোগে, প্রতিদিনকার গার্হস্থ্য-জীবনের শত কল-কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিল।

অন্তর-জীবনে মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য

অনেকে মনে করেন যে কাব্যে এই মাতৃপ্রাধান্য অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতে আর্যধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। এই অনুমান যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঋগ্‌বেদে দেবী-সূক্তে বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

মার্কণ্ডের চণ্ডীতেও নারীদেবতার অমিত পরাক্রম, তাঁহার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধায়িনী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির কিছুটা ছায়া দেখা যায় ও ইহাদের উচ্চবর্ণের পূজামণ্ডপে প্রবেশের বিরুদ্ধে মৃদু বা দৃঢ় প্রতিবাদ শোনা যায়। কিন্তু তথাপি ইহারা মাতৃ-সত্তার প্রতীকরূপেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিরুদ্ধতা জয় করিয়া ভক্তের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। মনসাপূজায় ভক্তির সহিত প্রচুর ভীতি মিশিয়াছে; চণ্ডীপূজায় দেবী তাঁহার উগ্রচণ্ডা মূর্তি ত্যাগ করিয়া প্রায় অবিমিশ্র স্নেহময়ী, ভক্তবৎসলা জননীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। মনে হয় মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করিয়া চৌতিশায় যে স্তব-স্তুতি ও আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই শাক্ত-পদাবলীতে আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদে উদ্বর্তিত হইয়া বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবও সুরের এই বিশুদ্ধীকরণে সহায়তা করিয়াছে। (মায়ের ভালবাসা যেমন সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত থাকিয়া নিজ অনাবিল, অকৃত্রিম ভাব-মাধুর্য বিকিরণ করে, তেমনি মাতৃনির্ভর অধ্যাত্ম সাধনাও সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ও কেবল মুক্তিকামনা করিয়া অপার্থিব ভক্তিরসকেই ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।)

শাক্ত-পদাবলীর উৎস

যে মাতৃশক্তি শাক্ত-পদাবলীতে বন্দিত হইয়াছে তাহা ভয়াবহ কালীমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কালীমূর্তি তন্ত্রসাধনার ফলেই ভক্ত-চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে। তন্ত্রে যে দেবীর আরাধনা করা হইয়াছে তিনি শ্মশানচারিণী, নরকঙ্কাল-শোভিতা, নৃমুণ্ডমালিনী ও রক্তাপ্লুতদেহা। তন্ত্র-উপাসনা-পদ্ধতিও নানা জটিল ও দুরূহ ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ। বাঙালী সমাজে তন্ত্রসাধনাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই কালীমূর্তি ভক্তসাধক ও কবির মনে অন্য সমস্ত দেব-দেবীর উপরে প্রাধান্য লাভ করিল। হয়ত এই বীভৎস-ভীষণ রূপের আরাধনার পিছনে সে যুগের বাস্তব সমাজচেতনা, দেশের দুর্বিষহ, বিপদসঙ্কুল অবস্থাও ক্রিয়াশীল ছিল। মুরশিদকুলি খাঁ বাংলাদেশে যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে রাজস্ব-আদায়ের কড়াকড়িতে ও করভারবৃদ্ধিতে জমিদারবর্গের অবস্থা শোচনীয় ও অত্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হইল ও তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইল। আজিকার রাজা

তন্ত্রের ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রভাব

কালিকার ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। এই যুগে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাবের হাতে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সময় বিষয়-সম্পদের অনিত্যতা, নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার বিপর্যয়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্মম নিষ্পেষণ ও ক্রূর চক্রান্ত সমস্ত জাতির চিত্তকে এক ভীতি-বিহ্বল সংশয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং ভক্ত কবির গানে ইহাই বিশ্বমাতার প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ, বিষয়-বৈরাগ্য ও সংসার-বিমুখতার সুরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

২

বৈষ্ণব কবিতায় সংসার কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার বাধারূপে কল্পিত হইয়াছে—"ঘরে পরিজন, ননদী দারুণ"—ইহারাই সমাজ-বিরুদ্ধতার একমাত্র নিদর্শন। এমন কি অত্যাচারী রাজা কংসও পদাবলী-সাহিত্যে উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার ন্যায় এক অস্পষ্ট কল্পনার জালের অন্তরালে আত্ম-গোপনশীল। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীতে সংসার উহার সমস্ত ক্রূরতা, বঞ্চনশীলতা ও অত্যাচার-উৎপীড়নের দারুণ বোঝা লইয়া অতি স্থূলরূপে প্রকট। পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখ-ইঙ্গিতে-তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিস্‌মিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা প্রভৃতি আমোদপ্রকরণকে রূপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি; বহু-বিবাহ-বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীনতা, বিমাতৃশাসিত পিতার ঔদাসীন্যের খবর পাই। বৈষ্ণব-পদাবলীতে এক প্রেমমধুর, সৌন্দর্যসার কল্পলোক বাস্তব জীবনকে আবৃত করিয়াছে; এমন কি অধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিতও মানবিক প্রেমের রূপকান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। শাক্ত-পদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্লানি-কুশ্রীতা, দারিদ্র্যরিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট ও ইহার সাধনা-ক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত; উহার মধ্যে কোন নিগূঢ় ব্যঞ্জনা নাই, কোন রূপমুগ্ধতার আতিশয্য নাই। কালীর রূপবর্ণনা আছে, তবে উহা একেবারে শাস্ত্রবর্ণিত প্রতিমার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, উহাতে কবিকল্পনার বিশেষ অনুরঞ্জন লক্ষিত হয় না। রূপবর্ণনায় যে ভাবোচ্ছ্বাস আছে তাহা ভক্তিমূলক, সংযত ও প্রেমকল্পনার অতিরেক-বর্জিত। বৈষ্ণব-পদাবলীতে বাঙালীর মনের কথা যেন বেনামীতে ব্যক্ত হয়; শাক্ত-পদাবলীতে উহার একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেইজন্য মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকে

শাক্ত-পদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলী

বাঙালীর সংসার ও ভাব-জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাই তাহার ভক্তিসাধনার নূতন রীতিতে ও কাব্যপ্রকাশের নূতন ভঙ্গীতে স্বতঃই প্রতিফলিত হইয়াছে।)

(শাক্তগীতির প্রথম রচয়িতা বোধ হয় রামপ্রসাদ সেন—কেননা ইহার পূর্বে এই ধরনের ভক্তিরসপূর্ণ শ্যামা-সঙ্গীতের কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। তাঁহার এই গান এত জনপ্রিয় হয় যে ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধকগোষ্ঠী ছাড়াইয়া অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে ও রামপ্রসাদী সুরের সরল বৈরাগ্য-ময় ব্যঞ্জনার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়। যাহারা বৈষ্ণব ধর্মের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না, তাহারাও মাতা-পুত্রের এই সহজ সম্বন্ধটি অনুভব করিয়া এই মাতৃসাধনার পথেই ভগবানের নিকট তাহাদের কাতর প্রার্থনা পৌঁছাইয়া দিল। আজকালও সুদূর পল্লীতে শ্যামাসঙ্গীত যত অধিক সংখ্যায় গীত হয়, মানুষের কণ্ঠে যত আবেগ-মূর্ছনা ফুটাইয়া তোলে, এমন আর কোন জাতীয় ভক্তি-সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায় না। রামপ্রসাদ আবার তাঁহার কালী-স্তুতির সহিত দুর্গার বাল্য ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর দুর্বোধ্য, ভয়-দেখানো আচরণের সহিত উমার বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত, স্নেহের দুলালী কন্যামূর্তি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমল রূপ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গেল—শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের পরিচিত স্নেহ-আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয়া গেল। মহামায়া দুহিতা-রূপে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বাঁধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই সুপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতির মধ্যেই মাতৃশক্তির যুগ্মরূপের সমন্বয়ের কল্পনা নিহিত আছে।)

রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদের রীতি-অনুসরণে যাঁহারা কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, নন্দকুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামা-সঙ্গীতের ধারা কবিওয়ালা, পাঁচালিকার দাশরথি রায় প্রভৃতি রচয়িতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া শেষ পর্যন্ত অতি-আধুনিক কবি নজরুল ইসলামে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। (শেষ প্রাচীনপন্থী কবি দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে শ্যাম ও শ্যামার

অন্যান্য শাক্ত কবি

সমন্বয়মূলক অনেকগুলি গানের দর্শন পাওয়া যায় ও ভক্তিরসপ্রবাহের দুইটি ধারা এক হইয়া মিশিবার নিদর্শন মিলে।)

৩

(শাক্ত-পদাবলীর কাব্যমূল্য বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ ইহার জীবননিষ্ঠা, সংসারযাত্রাসংশ্লিষ্ট বিচিত্র ভাবরাশির সার্থক উদ্বোধনের উল্লেখ করিতে হয়। ইহারা যেন ভক্তির প্রচুর জলসেচে লৌকিক জীবনের কণ্টকবৃক্ষে কাব্যেব সুরভিত পুষ্পরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে জীবনের একটি মাত্র অভিজাত-বিকাশ ও এক সর্বব্যাপী রূপকানুভূতির নিশ্ছিদ্র আবরণকে আশ্রয় করিয়া এক অপ্রাকৃত কাব্যমাধুর্য বিকশিত হইয়াছে। সমস্ত জীবনকে এক সুকুমার প্রেমচর্চার ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করিয়া এই মানুষী প্রেমের মধ্যে অলৌকিক প্রণয়-রহস্যের ব্যঞ্জনা আরোপ করিয়া বৈষ্ণব কবি জীবনবৃক্ষের উচ্চতম শাখায় এক দিব্য ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। ইহাতে জীবনের মধুরতম রসনির্যাস আছে, কিন্তু ইহার অনিবার্য বস্তু-প্রক্ষেপের কোন ভার নাই। শাক্ত কবি কিন্তু এইরূপ অতিসতর্ক সৌন্দর্যবিলাসী নহেন। তিনি বাস্তব জীবনের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি কাঁটাবিছানো বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে ভক্তিপ্রসূত নিঃসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া উহাদেরই দিব্য রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। বাংলা সমাজ ও পরিবার-জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এই পদাবলীতে এক অপূর্ব ভাবপ্রেরণার উপকরণরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কাবর কল্পনায় যেমন রাধিকার প্রতিটি চরণ-ক্ষেপই এক-একটি রক্তপুষ্পের আবির্ভাবে চিহ্নিত হইয়াছে, তেমনি শাক্ত কবির অনুভবে জীবনযাত্রার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই যেন মাতৃনির্ভরতার রাগ-স্ফুরণে ধন্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐকান্তিক ধর্মবিশ্বাস যে পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছ বিষয়কে, জনজীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের অকিঞ্চিৎকর আয়োজনকে কাব্যরসস্ফুরণের উপায়রূপে প্রয়োগ করিতে পারে, শাক্ত-পদাবলী তাহারই বিরল দৃষ্টান্ত। ইহার ভাষাও সম্পূর্ণ কাব্যমার্জনাহীনভাবে সাধারণ জীবন হইতে যদৃচ্ছ সংগৃহীত হইয়াও কাব্যোচিত আবেগ-উদ্দীপনে ও সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তি-সাধনে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

শাক্ত-পদাবলীতে জীবননিষ্ঠা

শাক্ত পদাবলীর স্তোত্র বা প্রার্থনা-পদগুলিতে যদিও অসহায় আর্তির অভাব নাই, তথাপি নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়, সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে

জয়লাভের দৃপ্ত আশা উহাদের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হইয়াছে। মাতৃপ্রদত্ত অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত, শক্তিময়ীর আশ্বাসে দৃঢ়-আস্থাশীল কবি-সাধক সমস্ত পার্থিব বিপদকে, এমন কি মৃত্যুভীতিকেও তুচ্ছ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে নিজ বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। তন্ত্রের বীরোচিত সাধনার উপযুক্ত কাব্যপ্রকাশ এই পদাবলীতে পাওয়া যায়।

প্রার্থনা-পদে আত্মপ্রত্যয়

শ্যামার রূপবর্ণনায় কবির স্বাধীন অনুভূতি অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্রের আনুগত্যই বেশী ফুটিয়াছে। সময় সময় এগুলিকে সংস্কৃত মন্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদই মনে হয়। তথাপি স্থানে স্থানে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় কবির স্বকীয় উপলব্ধির চকিত প্রকাশ বর্ণনার গতানুগতিকতার মধ্যে দীপ্ত হইয়া উঠে। তাছাড়া দেবীব ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপের আপাত-বিসদৃশ সম্মিলন কবিমানসের এক অসংবরণীয় আবেগমত্ততার নিদর্শনরূপে আমাদিগকে চমৎকৃত করে। মনে হয় যেন কবিচিত্তের অব্যবহিত উত্তপ্ত স্পর্শে মাতার সংস্কৃতমন্ত্রবেষ্টনীতে বিধৃত, সুদূর অতীতের হিমানীশীতল নিশ্চল রূপটি বিগলিত নির্ঝর-প্রবাহের ন্যায় বেষ্টনী ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে। মোটামুটি রূপবর্ণনার পদগুলি সীমাসংযমহীন ও আতিশয্যদুষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

রূপবর্ণনায় গতানুগতিকতা

৪

রূপকপ্রয়োগে ও সাধনসংকেতনির্দেশে শাক্ত-পদাবলীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। শক্তিসাধনার যে জটিল ও দুরূহ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, কতকগুলি পদে পারিভাষিক শব্দের সহায়তায় তাহার পূর্ণ তাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই সাধনতত্ত্ব অষ্টাদশ শতকের শাক্ত কবিগোষ্ঠীর নিকট জীবনাবেগে অভিসিঞ্চিত ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্পর্শে সজীব থাকার জন্য কাব্যপ্রবাহের সহিত বেশ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। পারিভাষিক শব্দগুলি উপলখণ্ডের ন্যায় কবিত্ব-স্রোতে কোন বিপরীত গতির সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ (এমন কি, আধুনিক) যুগের পাঠকের নিকট এই শব্দগুলি অর্থহীন ধ্বনিসমাবেশের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া কাব্যের রসাস্বাদনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক যুগে যাহারা আবেগ ও অনুভূতির মর্মগত প্রেরণা ছিল, অন্য যুগে তাহারাই কৃত্রিম আরোপরূপে প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং এই জাতীয় পদগুলি সার্বভৌম রসস্বীকৃতি হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। পারিভাষিকশব্দ-প্রয়োগ বাদ দিলে শাক্ত পদাবলীর মধ্যে

গঠন-সংকেত ও রূপক-প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য

রূপকাবরণ খুব ক্ষীণ, নাই বলিলেই চলে। অর্থাৎ কোন স্থির ভাবান্তরের অবগুণ্ঠনে মূল বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয় নাই। চর্যাপদে যেমন কতকগুলি আপাত-অসঙ্গত ভাবের ছদ্মবেশে গুহ্য সাধনতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন মানব প্রেমের অন্তরালে দৈব প্রণয়লীলার স্বরূপটি অর্ধব্যক্ত ও অর্ধ-অন্তরায়িত হইয়াছে, শাক্ত-পদাবলীতে সেরূপ কোন স্থায়ী আবরণ পরিকল্পিত হয় নাই। দয়িত-দয়িতার সম্পর্কের মধ্যে যেরূপ অর্ধস্বচ্ছ যবনিকার প্রয়োজন, মাতা-পুত্রের খোলাখুলি সম্বন্ধের মধ্যে সেরূপ কোন গোপনতার অবকাশ নাই। প্রেমের রসের পরিপুষ্টি ব্যঞ্জনায়; বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের পরিপুষ্টি নিঃসঙ্কোচ, এমন কি রূঢ় প্রকাশ্যতায়। বিশ্বের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে প্রিয়রূপে কল্পনা একটা অসমসাহসিকতার নিদর্শন, কাজেই উহাকে ইঙ্গিতে আবছায়ায় আভাসিত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বিশ্বজননীকে নিজ মাতৃরূপে কল্পনা মানুষের ভক্তিপ্রবৃত্তির একটা স্বাভাবিক বিকাশ। সুতরাং রূপকের ছলনা এখানে অনাবশ্যক। কাজেই শাক্ত কবিগোষ্ঠী কখনও কখনও রূপকের আশ্রয় লইলেও এই রূপক এক ক্ষণিক, দ্রুত-অপসরণশীল আবরণ রচনা করিয়াছে। আর এই রূপক প্রধানতঃ জগতের বঞ্চনা ও মাতার দৈবমায়াদ্যোতনার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, মূলগত সম্পর্কের কোন আদর্শগত প্রহেলিকা বুঝাইবার জন্য নয়। এখানে ভক্ত নিজ আকূতির তীব্রতা ও অভিলাষের আন্তরিকতার জন্যই ভগবানের সহিত মিলনের জন্য হাত প্রসারিত করিয়াছে; রূপকরচনার দ্বারা উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে সেতুবন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। শাক্ত-পদাবলীতে বাসকসজ্জিতা ও অভিসারিকা নায়িকার কোন স্থান নাই—মাতা-সন্তানের মিলন অবাধ ও সর্বকালীন।

৫

গীতিকবিতার একটি লক্ষণ কবির আত্মভাবের আবেগময় ও চমৎকৃতি-স্পন্দিত প্রকাশ। যেখানে সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীভাবের অতিপ্রাধান্য সেখানে কবির ব্যক্তিভাব এই গোষ্ঠীভাবের আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিরা গোষ্ঠীভাব-অনুবর্তনের মধ্যেও তাঁহাদের নিজস্ব অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণব কবির রচনায় ধ্বনি অপেক্ষা প্রতিধ্বনিই বেশী। অবশ্য ইহারা শব্দের ঐশ্বর্য ও ছন্দঝঙ্কারের অনবদ্য শিল্পগুণে ইহাদের ভাবপ্রেরণার আপেক্ষিক ক্ষীণতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তথাপি বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কারের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা তাঁহাদের ব্যক্তি-প্রেরণাকে যে অনেকটা শৃঙ্খলিত ও অভিভূত করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। শাক্ত-পদাবলীতে স্থায়িত্বের স্বল্পকালীনতার জন্য এরূপ কোন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পায় নাই। পূর্বরাগ, দৌত্য, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাবসম্মিলন, সর্বোপরি চৈতন্য-অনুভূতির নিবিড়তা ও চৈতন্যলীলার সর্বাতিশায়ী প্রভাব কবি-কল্পনাকে যেরূপ সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে বিন্যস্ত ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের জালে আবদ্ধ করিয়াছিল, শাক্ত-পদাবলীতে তাহার অনুরূপ কিছু ছিল না। বৈষ্ণব-সাধনা জীবনের বিচিত্র বিস্তার হইতে সঙ্কুচিত একটিমাত্র নিবিড় প্রেমবিন্দুতে সংসক্ত; শাক্ত সাধনা সমস্ত বাস্তব জীবনের উপর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণশীল। কাজেই শাক্ত-কবিরা অপেক্ষাকৃত মুক্ত মন ও স্বাধীন অনুভূতি লইয়া তাঁহাদের সাধনার আকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যক্তিপুরুষ গোষ্ঠীরাহুগ্রাসে সম্পূর্ণ কবলিত হয় নাই। সংসারের শত জ্বালা, দুঃখ-উৎপীড়নের অনির্বাণ দাহ, প্রবহমান জীবনস্রোতের অসংখ্য অভিঘাত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখিয়াছিল। তাছাড়া এক রামপ্রসাদ ছাড়া আর কোন প্রথম শ্রেণীর কবি শক্তিকবিগোষ্ঠীর মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। এই সমস্ত কারণে গীতিকবিতার বর্ণময় ও সুরময় উচ্ছ্বাস শাক্ত-পদাবলীতে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও গীতিকবিতার আত্মভাবপ্রধান মৌলিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রকটিত। শাক্ত-পদাবলীতে জীবনধর্মিতা বেশী, বৈষ্ণব-পদাবলীতে আদর্শায়নেরই প্রাধান্য।

বৈষ্ণব কবিতায় সম্প্রদায়গত আবেগ শাক্ত কবিতায় ব্যক্তিগত আবেদন

৬

আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক পদগুলি শাক্ত-পদাবলীর সংসারমুখী প্রবণতার চরম দৃষ্টান্ত। বিশ্বজননীকে শুধু মা রূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া, তাঁহার সহিত মান-অভিমানের পালা অভিনয় করিয়া, তাঁহার ভীষণা মূর্তিকে কল্যাণী-মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া কবিদের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা মা-কে মেয়েতে পরিণত করিয়া তাঁহাদের ভক্তিসাধনার পরিবর্তে স্নেহবুভুক্ষার তৃপ্তিসাধনের উপায় আবিষ্কার করিলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব এই রূপান্তরে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। Gulliver's Travels-এ Gulliver যেমন আপনাকে একবার অতিকায় দৈত্য ও আর একবার বামনরূপে অনুভব করিয়া

আত্মশ্রেষ্ঠতা ও হীনম্মন্যতা এই উভয়বিধ বিপরীত রসের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, সেইরূপ শাক্ত সাধক একবার মায়ের কাছে ছোট ছেলে ও মেয়ের কাছে বয়স্ক অভিভাবকরূপে আপনাকে কল্পনা করিয়া দুই প্রকার ভাবাস্বাদনের উপলক্ষ রচনা করিয়াছে। বাঙালী পরিবার-জীবনের বিবর্তনে এই স্নেহের দুলালী মেয়ে একটি অতর্কিত প্রাধান্য লাভ করিয়া কাব্যাভিষেকের প্রতীক্ষায় ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গলে এক বেহুলা ও ময়মনসিংহগীতিকায় (যদিও পরবর্তী রচনা মনে হয়) কয়েকটি দুর্ভাগিনী কন্যা-কুমারী করুণরসে অভিষিক্ত হইয়া কাব্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের দুর্ভাগ্যই ইহাদের কাব্য-প্রবেশের ছাড়পত্র ছিল। উমাও দরিদ্রগৃহিণী বলিয়া মাতা মেনকার বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু এই ছদ্মবেশী দারিদ্র্য স্বাভাবিক দুহিতৃস্নেহকে গাঢ়তর করিয়াছিল মাত্র।

আগমনী ও বিজয়ার চমৎকারিত্ব ও ক্ষণ-স্থায়িত্ব

শাক্ত কবিরা সংসারের সমস্ত বিচিত্র সুখ-দুঃখ দিয়া দেবীর অর্ঘ্য রচনা করিয়াছিলেন। এখন সংসার-উদ্যানে এই নব-প্রস্ফুটিত দুহিতা-পুষ্প নিবেদন করিয়া তাঁহাকে শেষবারের মত ব্যাকুল স্নেহালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিল। বৈষ্ণবীয় প্রেমের মত শাক্তকবির এই স্নেহকল্পনা দীর্ঘস্থায়ী হইল না। স্নেহের আতিশয্য কিছুদিন বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়া ও তাহার চোখে অশ্রুপ্লাবন বহাইয়া নিজ বাস্তব-বিড়ম্বিত সত্তাকে সংহরণ করিল। দেবীকে আর বেশীদিন মেয়ে রূপে ধরিয়া রাখা গেল না। সমুদ্র আর স্নিগ্ধ শিশির-বিন্দুতে আত্মসংকোচন করিল না। ভক্তিকল্পনার ঐকান্তিকতায় কাব্যরাজ্যে দুহিতার অনুপ্রবেশ শাক্তসাধকের শেষ দুঃসাধ্য সাধনরূপে স্বীকৃতি-লাভের যোগ্য।

দশম অধ্যায়

বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত

সমাজবহির্ভূত সাধনার ধারা বাংলাদেশে সুদূর অতীত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; চর্যাপদাবলীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যগণের এই সাধনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। তারপর আর্যীকরণের ক্রমপরিণতি ও পৌরাণিক চেতনার অগ্রগতির ফলে অধিকাংশ অনার্য ও বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অ-হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে বিবৃত অনার্য দেব-দেবীর উপাসনা এইরূপে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লাভ করিয়া অকৃত্রিম হিন্দুধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আর্যীকরণ-প্রক্রিয়া সত্ত্বেও কতকগুলি ধর্মমত হিন্দুধর্মের প্রধান শাখাগুলির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনা-সমূহও শাস্ত্রীয় সাধনার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি হিন্দু-ধর্মের অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া ইহার সীমান্তে সংলগ্ন হইয়াছে।

লোকসঙ্গীতের উৎস ও পরিচয়

শাস্ত্রীয় ধর্মের অন্তরালে বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের নিজস্ব সাধনা ও সঙ্গীতের ধারাও ফল্গুর মত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বাউল, কর্তাভজা, মারফতী, গুরুসত্য প্রভৃতি গান এই ধরনের সাধন-সঙ্গীত। উহা ছাড়া কবি, পাঁচালি, তর্জা, বোলান, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি নানা লোকসঙ্গীত-ও মুখ্যতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত হইয়া হিন্দুধর্মের প্রধান ধারাগুলির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া, হিন্দুদর্শন ও অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ও ইহাদের পাশাপাশি বহিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

এইসব সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল-সঙ্গীতই প্রধান। 'বাউল' কথাটি খুব সম্ভবতঃ 'বাতুল' শব্দ হইতে আসিয়াছে। সংসার-সমাজের বিধিসম্মত সকল নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া এই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসমলমান ধর্মের কড়াকড়ি নিয়মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বিশিষ্ট সাধনার পথে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের কান্ত-কান্তার মধুর সম্পর্কটি ইহাতে 'মনের মানুষ' নামে অভিহিত

বাউল গান

এক প্রেমের ঠাকুরের প্রতি আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হইয়াছে। চর্যাপদের ও সহজিয়াবাদের মতই বাউল সঙ্গীতগুলি খানিকটা হেঁয়ালীপূর্ণ সন্ধ্যাভাষায় রচিত। ইহা প্রচলিত দেহতত্ত্বাশ্রয়ী হইলেও এবং ইহার মধ্যে দেহ-

সাধনার প্রাধান্য থাকিলেও বাউল গীতের গভীর আধ্যাত্মিক-প্রেরণা ও ভাবাবেগ ইহাকে আধুনিক চিত্তের উপযোগী করিয়াছে। বাউল গীতের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের দিকে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব সাধনার পরকীয়া তত্ত্ব ও সহজ সাধনার সহিত সুফী ধর্মমতের অপূর্ব মিশ্রণে বাউল ধর্মের সমৃদ্ধি হইয়াছে। আউলচাঁদকে এই বাউল সম্প্রদায়ের আদি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতকারদিগের মধ্যে লালন ফকিরের নাম বিখ্যাত। ইহা ছাড়া ফকির পাঞ্জ শাহ্, যাদবেন্দু, গঙ্গারাম বাউল, জগা কৈবর্ত, পদ্মলোচন, কুবীরচাঁদ, মদন প্রভৃতি অনেক বাউল সাধক ও সঙ্গীতকার আছেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে অনেক শিক্ষিত লোকও বাউল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুইটি গানের নমুনা দিতেছি।

(১)

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহাব পায়॥
চিরদিন পুষলেম পাখী, বুঝলেম না তার ফাঁকিজুকি।
দুধ-কলা দিই, খায়বে পাখী তবু ভোলে না তায়॥

(২)

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
আমি হারায়ে সেই মানুষে
ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে॥

মুর্শিদী-মারফতী গানের সহিত বাউল গানের মূলতঃ পার্থক্য কম। মুসলমানী সাধনার পরিবেশে এই গানগুলি রচিত হইয়াছে।

বাউল গানের পিছনে যে সাধনাতত্ত্ব ও ঐশী-মিলন-আকূতি তাহা নানা সম্প্রদায়ের মতবাদের মিশ্রণে গঠিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বপ্রভাবিত হইলেও, ইহার একটি নিজস্ব ভাবপ্রেরণা আছে। ইহা পৌরাণিক ভক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণ—প্রেমলীলা, শাক্ততান্ত্রিক ভজন-পদ্ধতি ও সুফিধর্মের মরমিয়া অনুভূতির উপাদান-পুষ্ট ও প্রয়োজনমত এই বিচিত্র উপাদানসমূহের প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার মূল কথা হইল সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্মাচার-নির্দেশকে

অগ্রাহ্য করিয়া হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ইঙ্গিতে অন্তর্মুখী সাধনায় আত্ম-নিমজ্জন। মনের মানুষকে অন্তরের মণিকোঠায় খুঁজিয়া বাহির করা ও তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনরসে তন্ময় হইয়া যাওয়াই বাউল-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। এই পরম সিদ্ধির অনুকূল পারিপার্শ্বিক প্রস্তুত করার জন্য ইহা মানবের ভগবত্তা-ঘোষণা, গুরুবাদ, কায়সাধনা ও বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান-বাহুল্যের বর্জন প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্বাশ্রয় রচনা করিয়াছে। ইহাদের ভাব ও ভাষার মধ্যে লোকজীবনের বিভিন্ন বৃত্তির ছাপটি প্রায় উদ্ধতভাবেই প্রকট। প্রকাশভঙ্গীর তির্যক ব্যঞ্জনা, পরোক্ষ ভাষণের মাধ্যমে গূঢ় মানস অভিপ্রায়ের অস্পষ্ট আভাস, গভীর অনুভূতির আশ্চর্য দ্যোতনা বাউল-সঙ্গীতের কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। বাউল গান প্রমাণ করে যে দেশব্যাপী ধর্মসাধনার ফলে ধর্মের নিগূঢ় অনুভূতি অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সর্বব্যাপ্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল ও সাধনার একাগ্রতা এক নূতন ধরনের কাব্যরসসমৃদ্ধ ও লোকচেতনাপুষ্ট গীতিকবিতার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। প্রবল ধর্মাকূতি অশিক্ষার সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত শক্তিতেই আপনার প্রকাশপথ রচনা করিয়াছে। কবির, দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তের শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন ধর্মবোধও বাংলা বাউল-গীতির মধ্যে আপন অনুভবের বিশিষ্ট সুরটি রাখিয়া গিয়াছে।

বাউল গানের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও কাব্যোৎকর্ষ

কবি-পাঁচালি-তর্জা প্রমুখ সঙ্গীতগুলি কোন সাধন-সঙ্গীত নহে—সাধারণভাবেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। কবিগানকে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর লৌকিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। রাধাকৃষ্ণপ্রেমের উন্নত মধুর রসের সাধনা ও মাতৃ-শক্তির ঐকান্তিক, ভক্তিবিহ্বল অনুভূতি কবিগানে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের স্থূলরুচি—অনুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে ও ইহার গাঢ়তা অনেক পরিমাণে ফিকে ও অকৃত্রিমতা ইতর ভাবের সংস্পর্শে অনেকটা ঘোলা হইয়া পড়িয়াছে। কবিগান বোধ হয় অষ্টাদশ শতকে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের মোহানায় উহা বাংলা দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, এনটনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালবৃন্দ সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। ভবানী-বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ—এইভাবে শ্যামা, শ্যাম ও মানবীয় প্রেমের সঙ্গীত—এই তিনটি স্তরে কবি-সংগীত গীত হইত। ইহাদের প্রধান মৌলিক দান হইতেছে ধর্মসম্পর্কহীন প্রেমসঙ্গীতের সৃষ্টি। ইহাই পরবর্তী-

কবিগান

যুগে উন্নত ধরনের প্রণয়-গীতির প্রেরণা দিয়াছে। কবির টপ্পাগুলি সাধারণতঃ স্থূল ও অশ্লীল হইত। হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদের একটি উদাহরণ দিতেছি।—

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও।
হেরি চিকণ কালোবরণ তিলেক দাঁড়াও
এ অধীনীর মনের বাসনা পূরাও।
সাধ মম বহুদিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটি বাজাও॥
নির্জনে এমন পাব না দরশন
যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ
ও বংশীর গুণ কত বিশেষ শুনাও॥

কবিগানে কোন মৌলিক সাধনার পরিচয় নাই। কিন্তু উচ্চবর্ণের ভক্তসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ও শাক্তসাধনা কিরূপ অবলীলাক্রমে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত কবিয়াল-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল ও তাহাদেব সুপ্ত কবিত্বশক্তির উন্মেষসাধন করিয়াছিল ইহাতে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়।

পাঁচালি গান গাওয়া হইত পালার আকারে। খানিকটা আবৃত্তি, খানিক ছড়া, খানিক গান হইত। কৃষ্ণবিষয়ক, রামবিষয়ক, শিববিষয়ক পালা ছাড়াও লৌকিক পালা—বিরহ, বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা ইত্যাদি বিষয় লইয়া পাঁচালি রচিত হইত। সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচালিকার হইতেছেন দাশরথি রায়।

পাঁচালি

দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৮) পাঁচালি একটা নূতন আদর্শের মিশ্র কাব্য-কৃতি। বাঙালী মনের ভক্তিরসোচ্ছলতার কাব্যাভিব্যক্তির শেষ নিদর্শন তাঁহার রচনাবলী। ইহার মধ্যে সনাতন উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্ত ভক্তিবিভোরতার সঙ্গে আশ্চর্য শিল্পকুশলতা ও কবিকল্পনার অজস্র উৎসারের অদ্ভুত সমন্বয় দৃষ্ট হয়। দাশরথি ভক্তিরসপ্রধান নানা-বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে নূতনভাবে বিন্যাস করিয়া, নূতন উপমা-অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া ও নবযুগোপযোগী তাৎপর্য আরোপ করিয়া উনবিংশ শতকের শ্রোতৃমণ্ডলীর ক্ষীয়মান ভক্তিপ্রবণতার মধ্যে নূতন স্রোতোবেগ ও ভাবানুকূল্য সঞ্চারিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতাতে যে রসাবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, শাক্ত পদাবলীতে যে সরল ও নিরলঙ্কার

প্রকাশভঙ্গী পাঠকের মর্মমূলে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইত, দাশরথির পাঁচালিতে তাহাই সরস, চাতুর্যময় বাক্যপ্রয়োগে, চমকপ্রদ কল্পনালীলার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, সমকালীন সমাজজীবন হইতে সুকৌশলে সংগৃহীত দৃষ্টান্তপরম্পরার সহায়তায় এক অতিরঞ্জিত কাব্যকলা ও মানস চেতনার উত্তেজিত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া পাঠকের ঔদাসীন্যকে সবলে জয় করিয়াছে। ভক্তির সহিত ব্যঙ্গের ফোড়ন দিয়া, ভাবতন্ময়তার সঙ্গে সমাজ-সচেতনতার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া, আবেগময় বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বাক্‌চাতুর্যের আঘাত হানিয়া, তিনি প্রাচীন বিষয়ের একটি নূতন উপস্থাপনারীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি যেন ভক্তিরসপ্রবাহের শান্তমধুর ধারাটি কাব্যকৌশলের পিচকারী-যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া পাঠকের নাকে-মুখে তাহা বৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাকে পুলকিত করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিপর্যস্তও করিয়াছেন। মধুর রস যেন উদ্দাম হইয়া খানিকটা বীভৎস রসের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই আতিশয্যপ্রবণতার জন্য তাঁহার আন্তরিক ভক্তিপ্রাণতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার কতকগুলি গানে বিদ্যাপতি ও নরোত্তম দাসের মত একান্ত আত্মনিবেদনের সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। বাঙালীর মনে এই ভক্তি এমন একটি অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল যে সে ইহাকে লইয়া নানা রকমের খেলা খেলিয়াছে, নানা রসের উৎসরূপে ইহাকে ব্যবহার করিয়াছে ও বিচিত্র কাব্যপ্রকাশের প্রেরণা ইহা হইতে পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবি ইহার মধুর রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছেন; শাক্ত-কবি ইহাকে বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া ইহা হইতে মাতার রহস্যময় আচরণের মধ্যে নিগূঢ় স্নেহলীলার পরিচয় পাইয়াছেন; বাউল-কবি ইহাকে কোন নির্দিষ্ট ভাবসাধনার গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া অন্তরের গভীরে ইহার দিক্‌চিহ্নহীন অস্তিত্বকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। আর পাঁচালিকার দাশরথি রায় ক্রীড়ারসবিভোর করিশাবকের ন্যায় এই প্রবহমান ভক্তিস্রোতে বপ্রক্রীড়ার আনন্দমত্ততা অনুভব করিয়াছেন।

দাশরথির বৈশিষ্ট্য

রসিক রায়, ব্রজ রায়, নন্দ রায় প্রভৃতি পাঁচালিকারের পাঁচালিও মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া সারি, ভাটিয়ালী, জারি, তর্জা ও নানা পল্লী-সঙ্গীত এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই গানগুলির বৈচিত্র্য বাঙালী কবিচিত্তের সরসতা ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার নিদর্শন বহন করে।

একাদশ অধ্যায়

নাথ-সাহিত্য

১

নাথ-সাহিত্য ভাবের দিক্ দিয়া চর্যাপদের সহিত সম্পর্কিত; উভয় ধারাতেই সিদ্ধদিগের কয়েকটি সাধারণ নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে উভয়ে বর্ণিত সাধনাক্রম একই উৎস হইতে উদ্ভূত। চর্যাপদে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা আছে তাহা উন্নত ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, অনেকটা উপনিষদ ও প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত যোগসাধনার বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রতিরূপ। ইহার প্রধান কথা হইল চিত্তবৃত্তির উন্মূলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শূন্যতা-বিধান—পরম সত্যচেতনার মধ্যে উহার বিলয়। নাথ-সাহিত্যে এই তত্ত্বকে প্রাকৃত উদ্ভট কল্পনার সহিত মিশাইয়া, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের আদিম বিস্ময়বোধ ও অন্ধ আজগুবিপ্রীতির স্তরে নামানো হইয়াছে। আর ইহার সাধনার রহস্যকে প্রধানতঃ কায়সাধনার দ্বারা ঐহিক অমরতা ও অসাধ্য-সাধন-শক্তি-লাভের উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস-গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য মৃত্যুজয়ের দ্বারা ভোগের পথকে নিষ্কণ্টক করা। সুতরাং ইহার আধ্যাত্মিক আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। প্রাকৃত মন যে অবাধ ভোগসুখের জন্য লালায়িত যোগ-বিভূতির দ্বারা তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায়াসলভ্য করাই ইহার আসল কাম্য। নাথ-সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার একটি মৌখিক রূপ উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত অ-লিখিত অবস্থায় ছিল। রংপুর-কুচবিহার অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখে মুখে ইহার আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ইহার কাহিনীর দুইটি রূপ পাশাপাশি প্রচলিত ছিল—এক, বিভিন্ন কবি-রচিত সাহিত্যিক রূপ, দুই, লোকমুখে গীত, সাহিত্য-পরিমার্জনাহীন, লৌকিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রূপ।

নাথ-সাহিত্যের উৎস ও স্বরূপ

এই কাহিনীর দুইটি প্রধান শাখা—মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান। প্রথমটির বিষয় সিদ্ধাচার্য মীননাথের কদলীপত্তনের নারীদের মোহে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান-বিস্মৃতি ও শেষ পর্যন্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধার-সাধন। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে গোরক্ষনাথ-শিষ্যা ও তত্ত্বজ্ঞা ময়নামতীর

নির্দেশে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সংসারত্যাগ ও দীক্ষাগ্রহণ। দ্বিতীয় আখ্যানটিতে তরুণী রাজমহিষীদ্বয় অদুনা-পদুনার স্বামিবিচ্ছেদবেদনার মর্মান্তিক খেদের বর্ণনা থাকার জন্য ইহা জনসাধারণের মনের গভীরে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। প্রথমটিতে কেবল দুরূহ সাধনতত্ত্বের রূপক-ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহা সাধারণের দুর্বোধ্য। ইহার কবি বা রচয়িতাব মধ্যে শ্যামাদাস সেন, ভীমসেন রায়, শেখ ফয়জুল্লা ও কবীন্দ্র দাসের নাম করা যায়; কিন্তু বিভিন্ন গাথাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয় যে ইহাব রচয়িতারা একই আখ্যান-আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন ও মাঝে মধ্যে, রচনার অভিন্নতার মধ্যে বর্ণনার এক-আধটুকু পরিবর্তন কবিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কে যে আদি কবি আর কে যে নকলকারক শুধু ভণিতার মধ্যে নিজ নাম বাখিয়া গিয়াছেন তাহার যথার্থ অবধারণ অসম্ভব। দ্বিতীয় আখ্যানটির লেখকদেব মধ্যে দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও আবদুল সুকুর মহম্মদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

নাথসাহিত্যের-কাহিনীদ্বয়

ইহাদের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে কিছু যোগ রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর যে চিত্র এখানে পাই, তাহা লৌকিক কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও সময় সময় হাস্যাস্পদ। দুর্গা সিদ্ধাদের চরিত্রবল-পরীক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অশোভন ও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মহিমাবিরোধী। যমের সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর যে শক্তিপরীক্ষার বোঝাপড়া তাহাতে প্রাকৃতরুচিসম্মত উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ, পরস্পরকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ আজগুবি কৌশল-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইহাদের পারলৌকিক পরিকল্পনার মধ্যেও ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধাদের মধ্যে অনেককেই হীনবৃত্তিধারী ও স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রকটনে অতিব্যগ্র রূপে দেখানো হইয়াছে। এমন কি ময়নামতী, গোবিন্দচন্দ্র ও রানী অদুনা-পদুনার মধ্যেও অভিজাতসুলভ আচার-আচরণের বিশেষ নিদর্শন নাই—সকলেই যেন ছেলেমানুষের মত অস্থির, খামখেয়ালী ও নিরঙ্কুশ কল্পনার মূর্ত বিকাশ। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণে রানীদের খেদ মর্মস্পর্শী করুণ রসে অভিষিক্ত হইলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু-নারীর অধ্যাত্ম-আদর্শের স্পর্শহীন। এ যেন ছোটমেয়ের পুতুল-ভাঙার জন্য শোকোচ্ছ্বাসের একটু উন্নততর সংস্করণ। এই সমস্ত হইতে এই ধারণাই জন্মে যে সমস্ত আখ্যানটি আদিম দেবকল্পনার একটা

হিন্দুধর্মাদর্শ ও নাথ-সাহিত্য

অর্ধবিকশিত রূপ এবং আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। কবিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতাও এই ধর্মসংস্কারের প্রাগ্-আর্য প্রাচীনত্বের আরও একটি প্রমাণ—ভবিষ্যতে ভিন্নধর্মাবলম্বী আদিম জাতিগুলি যখন ধর্মগত বিভেদের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই, সেই সুদূর অতীতের স্মৃতিবাহী।

২

মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় পুঁথিতে দেখি গুরু মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়া সেখানকার নারীদের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া সাধনামার্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন ও সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সুখপ্রধান জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অধঃপতনের কাহিনী জানিতে পারিয়া নর্তকীর ছদ্মবেশে কদলী-নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্কেতে গুরুকে তাঁহার বিস্মৃত মহাজ্ঞানের তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলেন। শিষ্য গুরুকে তত্ত্বকথা শোনাইতে শোনাইতে গুরুর চৈতন্যোদয় হইল ও তিনি হীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন ত্যাগ করিয়া সাধনা-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানারূপ হেঁয়ালি ছড়া ও রূপক-প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ত্ব-প্রতিপাদনই আখ্যানের প্রধান উপজীব্য। এই আপাত-অসম্ভব উক্তি-সমাবেশ ও রূপকের মাধ্যমে তত্ত্বের আভাসদান—চর্যাপদের সঙ্গে নাথ-গীতিকার মিলের নিদর্শন। এই গভীরার্থক হেঁয়ালি-রচনার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। (ডুবে)
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥
ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন।
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন॥

এইরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বরহস্য একই সঙ্গে আবৃত ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সহজিয়া, বাউল ও তন্ত্রসাধনাতেও এই বিপরীত ভাবের রহস্যময় সমাবেশ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

'গোরক্ষবিজয়'-এর আদি রচয়িতা খুব সম্ভবতঃ শেখ ফয়জুল্লা। ইঁহার কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'নাথ-সাহিত্য' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্যপ্রকাশিকা', প্রথম খণ্ড) ডাঃ এনামূল হক কর্তৃক আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতায় প্রাপ্ত 'সেখ ফয়জুল্লা'র 'সত্যপীরের পাঁচালি'—রচনার কালনির্দেশক সঙ্কেতের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা শেষার্ধে স্থাপন করিয়াছেন। এই বিক্ষিপ্ত পত্রে শুধু 'সত্যপীরের পাঁচালি'র রচনাকালই সঙ্কেতিত হয় নাই। কবির পূর্বরচিত দুইখানি কাব্যও—গোর্থবিজয় ও গাজীবিজয়—উল্লিখিত হইয়া তাঁহাব পবিচয়ও নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মনে হয়।

গোরক্ষবিজয়ের আদি কবি ও রচনাকাল

ইহার পব আবাব সত্যপীবের সম্পূর্ণ পুঁথিখানিও আবিষ্কৃত হইয়া ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য সমগ্র পুঁথিটির মধ্যে গ্রন্থারম্ভের কালনির্দেশক ও বিভিন্ন বচনার পৌর্বাপর্ব-নির্ধাবক উক্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে কি না তাহা অনিশ্চিত। কোন প্রাচীন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র প্রমাণপঞ্জীর লুপ্তরত্নোদ্ধার খুব বিরল ও আশাতীত দৈবপ্রসাদ বলিয়াই ঠেকে। কোন পূর্ব হইতে সুপরিকল্পিত আয়োজনও এত নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি দ্বারা পুরস্কৃত হইত কি না সন্দেহ। পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি-রচিত 'গোরক্ষবিজয়'-এর একখানি খণ্ডিত পুঁথির আবিষ্কার এই কাহিনীর প্রাচীনত্বের নিদর্শন। নাটকটি সংস্কৃতে লেখা ও ইহার গানগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত।

'গোরক্ষবিজয়'-এর কেন্দ্রস্থ অভিপ্রায় হইল নাথধর্মের কায়াসাধনের তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখবিভ্রান্ত মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদন ও সাধনা-সংকল্প-উদ্দীপন। কাজেই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্বপ্রতিপাদনে লেখক কেবল নীরস, দুরূহ দর্শনভাবনাপরম্পরাই গ্রথিত করেন নাই, লোকজীবন হইতে সংগৃহীত নানা তথ্য ও অভিজ্ঞতার সরস প্রয়োগে ইহাকে কাব্যরসোত্তীর্ণ করিয়াছেন।

গোরক্ষবিজয়ে তত্ত্বোপদেশ-প্রাধান্য

সময় সময় গুহ্য-রহস্য-সঙ্কেত দিবার জন্য তিনি দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগে আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তিনি সার্থক উপমা ও অলঙ্কার-সাহায্যে আমাদের মনে অনুকূল রসবোধই উদ্রিক্ত করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তত্ত্বালোচনার মধ্যে যে সংহত অর্থগূঢ়তা, অচ্ছেদ্য যুক্তিশৃঙ্খলা ও দৃষ্টান্ত-সহযোগে জীবনরসের

প্রয়োগদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উচ্চাঙ্গের মনন ও কাব্যকৌশলের নিদর্শন।

কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়'-এ তত্ত্বপ্রাধান্য মানবিক আবেদনকে একেবারে অভিভূত করে নাই। আদর্শভ্রষ্ট গুরুব চৈতন্য-সম্পাদনের সুদীর্ঘ প্রয়াসের মধ্যে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই চরিত্র, পারস্পবিক ঘাত-প্রতিঘাত ও মনোভাবের দ্রুতগামী উত্থান-পতনেব যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা কাব্যখানিকে শুষ্ক ধর্মচর্চার উর্ধ্বে একটি নাটকীয় প্রাণময়তায় উন্নীত করিয়াছে। এই দীর্ঘ-প্রলম্বিত বাগ্-বিতণ্ডার মধ্যে—একদিকে যেমন গোবক্ষনাথের অসীম ধৈর্য, অটল অধ্যবসায় ও অবস্থানুযায়ী বিভিন্নরূপ উপায়-দক্ষতা দেখা যায়, সেইরূপ মীননাথেরও উৎসাহ-অবসাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মুহুর্মুহু সংকল্প-শিথিলতা ও আত্ম-অবিশ্বাসেব ওঠা-নামা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমবা গোরক্ষনাথ ও মীননাথকে কেবল দুই বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতীকরূপে দেখি না, তাহারা তাহাদের জীবনের সবটুকু শক্তি-দুর্বলতা, নিষ্ঠা-নীতিশৈথিল্য, অধ্যাত্ম-সংগ্রামরত দুই মানবাত্মার সমস্ত উত্তেজনা ও অবসাদ লইয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। গোবক্ষনাথের গুরুব প্রতি মাতৃস্নেহকোমল ও মাতার ন্যায় দুর্জয় সংকল্পে কঠিন মনোভাবটি একটি আশ্চর্য সুন্দর পংক্তিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে :—

গোরক্ষবিজয়ে মানবিকতা

বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায়।

বৈরাগ্যব্রতনিষ্ঠ বাঙালীর মায়ামমতাভরা গৃহের প্রতি মধুর আকর্ষণ কোন দিনই নিঃশেষিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণপ্রেম সংসারত্যাগের কৃচ্ছ্রসাধনকে অলৌকিক পিরীতির নিবিড় মাধুর্য দিয়া আচ্ছাদন করিয়াছে—গৃহ ছাড়িয়া মিলনকুঞ্জে নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। রামপ্রসাদ ও শাক্ত কবিগোষ্ঠী শ্মশানের নরকঙ্কালাকীর্ণ সাধনক্ষেত্রে মাতৃস্নেহের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে নিঃশঙ্ক হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরাও প্রতিকূল দৈবের নির্যাতনকে দেবপ্রসাদলাভের সাধনারূপে কল্পনা করিয়া গৃহসুখের আশায় জীবনযন্ত্রণাকে সহ্য করিয়াছে। সেইরূপ নাথ-সাহিত্যেও আমরা ভোগাসক্ত পদস্খলিত প্রৌঢ় ইন্দ্রিয়াকর্ষণের বিদায়বেদনাটুকু উত্তুঙ্গ সাধনমহিমার দুর্গপ্রাকারের ফাঁক দিয়া উপলব্ধি করি। এই ধর্মধিক্কৃত প্রেমও কবির সহানুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাই কদলীরানী মঙ্গলা ও গোরক্ষনাথের রূপমুগ্ধা কদলীবাসিনী নারী তাহাদের ব্যর্থ আকূতি ও উচ্ছিন্ন

বাঙালীর প্রকৃতিজাত গৃহপ্রীতি

জীবনের করুণা দিয়া আমাদিগকে কাব্যের আদর্শবিরোধী সহানুভূতিতে ক্ষণিক বিচলিত করে।

৩

নাথধর্মেব দ্বিতীয় গ্রন্থ—ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস—প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই কাহিনী বাংলা দেশকে অতিক্রম করিয়া সর্বভারতীয় প্রসার লাভ করিয়াছে। একখানি নেপালে প্রাপ্ত নাট্যপালার—'গোপীচন্দ্র নাটক'—(সপ্তদশ শতক)—বিষয় ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় যে গোপীচন্দ্রবিষয়ক রচনা, বাংলা দেশের বাহিরেই আরম্ভ হয় এবং উহাব প্রাচীনতর নিদর্শনগুলি বহির্বঙ্গ ভূভাগের সহিতই সংশ্লিষ্ট। বাংলা দেশের কবিগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই তাঁহাদেব নিজেব ঘরের কথার কাব্যসম্ভাবনা আবিষ্কার করিয়াছেন।

ময়নামতীর গানের সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা

'গোপীচন্দ্র'—আখ্যানেব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাব একটি অমার্জিত লৌকিক রূপ বিভিন্ন-কবি-রচিত কাব্যশিল্পাত্মক রূপের সঙ্গে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ ছড়াটি অশিক্ষিত নাথ-যোগীদের মধ্যে মৌখিক আবৃত্তির সাহায্যে স্মৃতিবিধৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহা খাঁটি লোকসাহিত্যের ন্যায় যৌথ রচনার শিথিল বাগ্‌ভঙ্গী, পুনঃপুনঃ-আবৃত্ত ধুয়া, অতিপল্লবিত বর্ণনা-বাহুল্য ও ঘটনাবিস্তার প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। প্রাকৃত জনসাধারণের উদ্ভট দেবকল্পনা ও পারলৌকিক সংস্কার ইহার মধ্যে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অনুশীলিত, শিল্পবোধসম্পন্ন কবিমন ও অনিয়ন্ত্রিতকল্পনাপ্রবণ, সূক্ষ্মরুচিহীন গণকবির রসস্পৃহা একই বিষয় হইতে কিরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যপ্রেরণা গ্রহণ করে, এই দুই জাতীয় কাব্যে তাহার কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন মিলে।

গোপীচন্দ্র পালার লৌকিক রূপ

গোপীচাঁদ-বিষয়-অবলম্বনে তিনজন কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে। দুর্লভ মল্লিক-রচিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', ভবানী দাস-রচিত ও কবি কর্তৃক অভিহিত 'অপূর্ব কথন' ও সুকুর মহম্মদ-রচিত 'যোগান্তপুঁথি' বা 'যোগীর পুঁথি'—নিতান্ত আধুনিক যুগে বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মূল বিষয় অভিন্ন হইলেও আখ্যান-বিবৃতি ও ঘটনা-সমাপ্তির মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই প্রভেদ হয়ত কবির সচেতন পরিবর্তনমূলক নহে; বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীর রূপভেদভিত্তিক বলিয়াই মনে হয়। দুর্লভ মল্লিকের কাব্যে গোপীচন্দ্রের অকালমৃত্যুভয়ই যে তাঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল এরূপ ঘটনাবিন্যাস নাই। ময়নামতী যোগমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞা বলিয়াই পুত্রকে যোগে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন। ভবানী দাসের রচনা অনেকটা বৈষ্ণবপদাবলীপ্রভাবিত ও মাঝে মধ্যে কৌতুকরসোদ্দীপক। সুকুর মহম্মদের কাব্যে ময়নামতীকে কিছুটা স্বামিদ্বেষিনী করিয়া দেখান হইযাছে ও মানিকচন্দ্র প্রখরা স্ত্রীর ভয়ে একমাত্র পুত্রের বিবাহ গোপনে অনুষ্ঠান করিযাছেন। এই বিবৃতিব দ্বারা ময়নামতীর প্রবল ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। গোবক্ষনাথ-চরিত্রেও তিনি খানিকটা হীনতা আরোপ কবিযাছেন ও হাড়িপাকেও কোপনস্বভাব ও নেশাসক্তরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার হাতে নাথ-সাহিত্য কিছুটা তত্ত্বশাসনাতিগ মনোভঙ্গী ও প্রথাবদ্ধ গঠনপদ্ধতির দিকে অগ্রসব হইয়াছে। কাব্যোৎকর্ষে, বর্ণনাকুশলতায় ও তত্ত্বপ্রতিপাদনের সরসতায় কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মসাধনার নিগূঢ় প্রক্রিয়া ও সিদ্ধাদের অলৌকিক কার্যকলাপের সহিত এক প্রকার শিশুসুলভ কল্পনা-সংস্কার মিশ্রিত হইয়া কাব্যগুলিকে রূপকথাধর্মী করিয়াছে। আদিম যুগের কল্পনা-ভাবনার অসংস্কৃত আতিশয্য ও স্বেচ্ছাচারিতা পরিণত প্রজ্ঞার সংস্পর্শে বিলীন হইতে হইতে নাথগাথাগুলিতে উহার শেষ চিহ্নটি কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গানের কবিগোষ্ঠী ও কাব্যমূল্য

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্য। ময়নামতী তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্য ছেলেকে কায়সাধনার রহস্য শোনাইয়াছেন ও হাড়ির ছদ্মবেশে অবস্থিত সিদ্ধযোগী হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুত্র নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে এই হীনবর্ণের গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে সম্মত হইল, কিন্তু গুরুর প্রতি তাহার প্রকৃত ভক্তি বোধ হয় কোন দিনই জন্মে নাই। গুরুও শিষ্যকে নানা অবাঞ্ছিত ও অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়া তাহার ধর্মবোধের দৃঢ়তার পরীক্ষা লইয়াছে। এই সমস্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে যে সমাজ-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রুচিবোধ, সংস্কৃতির মান ও ধর্মচেতনার বিচারে কোন সমুন্নত উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে না। পুত্র মাতার পরীক্ষার জন্য যে

আদিম জীবনবোধের বিস্ময়কর কাব্যরূপ

সমস্ত নৃশংস ও রূঢ় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে হয়ত ময়নামতীর যোগৈশ্বর্য বিস্ময়করভাবে ফুটিয়াছে, কিন্তু মাতা পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহমমতাময় সম্পর্কটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। গুরুকে মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখার মধ্যে গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধটি উহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়াছে। গোবিন্দ-চন্দ্রের যোগসাধনা যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সে যে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছে, তাহার সংসার-জীবনে ব্যগ্র প্রত্যাবর্তনে ও রানীদের তরলপ্রমোদপূর্ণ সঙ্গলিপ্সায় তাহার কোন প্রমাণ মিলে না। শেষ পর্যন্ত শিষ্য চিরসন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুর অনুগমন করিয়াছে—এই ঘটনা-নির্দেশের মধ্যেই আখ্যানের পরিসমাপ্তি। যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনীটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র, ক্রুর, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্ছ্বাসে, অসংবৃত ভোগলালসায়, শৈশব-সুলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপবিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। এই অশিক্ষিত, আদিমসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত, যথাযথ-ভাবপ্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়।

দ্বাদশ অধ্যায়

আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠী

১

(বাংলার মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণ হিন্দুমুসলমানের পৌনঃপুনিক বিরোধে উত্তপ্ত ও বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাস আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছে। কিন্তু বাংলার জীবনযাত্রা ও সাহিত্যচর্চার নিরুদ্বিগ্ন প্রবাহ এই ধারণার সম্পূর্ণ পোষকতা করে না। মাঝে মধ্যে ধর্মান্ধতার উগ্র অসহিষ্ণুতা জীবনের শান্তিকে নিশ্চয়ই বিঘ্নিত করিয়াছে ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ প্রীতি ও মিলনকামনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া উহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের প্রাচীর তুলিয়াছে। কিন্তু এই রেষারেষি ভাব সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হইলেও মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়ম ছিল না। বোঝাপড়া ও মিলনের প্রবল আগ্রহ সমস্ত ধর্মমত ও সমাজপ্রথার পার্থক্য সত্ত্বেও এই প্রতিবেশী সম্প্রদায় দুইটিকে পরস্পরের নিকটে আকর্ষণ করিত।) শাসনব্যবস্থার সুপরিকল্পিত নীতি নহে, পদস্থ ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারপ্রবণতা ও আকস্মিক ঘটনাপ্রসূত বিক্ষোভই ইহাদের প্রীতিসম্পর্কটি বিচলিত করিত বলিয়াই মনে হয়। তবে বাঙলা দেশে এই সামাজিক সহৃদয়তা বিশেষ সাহিত্যিক প্রকাশ পায় নাই। কেননা মধ্যযুগীয় হিন্দু সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা ছিল ধর্মপ্রচার ও ধর্মভাব-উদ্দীপন। সেখানে অপর সম্প্রদায়ের কথা বলিবার বিশেষ অবকাশ ছিল না। মুসলমান সুলতান, সেনাপতি ও উজীর হিন্দু কবিকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন, পুরাণ—অনুবাদের প্রেরণা যোগাইয়াছেন ও তাঁহাদের রাজসভায় আগ্রহ সহকারে হিন্দুধর্মমতের আলোচনা শুনিয়াছেন। (হোসেন শাহ্, নসরত শাহ্, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি মুসলমান অভিজাতবর্গ নবোদ্ভিন্ন বাংলাকাব্যতরুর মূলে অনুরাগের রসসিঞ্চন করিয়া উহার বর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন—শুধু এইটুকু উৎসাহদান ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সম্মানজনক স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের উদার অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপ্রীতি আরও প্রশংসনীয় এইজন্য যে তাঁহারা তাঁহাদের অনুগৃহীত হিন্দু কবিদের কাছে কাব্যে মুসলমান ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রের আখ্যান প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তির

মুসলমান পৃষ্ঠপোষণায় হিন্দুকবিদের কাব্যরচনার স্বাধীনতা

কোন শর্ত আরোপ করেন নাই। কাজেই হিন্দু কবিরা রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা গাহিতে গাহিতে বা মহাভারত-রামায়ণের অনুবাদ করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার ঋণশোধের চিন্তায় বিব্রত হন নাই; তাঁহাদের দেব-দেবীর প্রশস্তি-রচনায় তাঁহারা হৃদয়ের অবিভক্ত ভক্তি অর্পণ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। কেবল মাঝে মধ্যে ভণিতায় তাঁহাদের হিতৈষী রাজন্যবর্গের স্তুতি করিয়াই তাঁহারা আপনাদের ঋণমুক্ত করিতেন। মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে হিন্দু বা মুসলমান কোন কবিই এই যুগে আমাদের কৌতূহল মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

অকস্মাৎ বঙ্গদেশের বাহিরে ব্রহ্মদেশের সীমান্তস্থিত আরাকান রাজ্যের মগ রাজাদের রাজসভায় মুসলমান কবির প্রাদুর্ভাব হইল ও তাঁহাদের কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন যে কত গভীর হইয়াছে তাহার অপ্রত্যাশিত নিদর্শন পাইয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে বাংলা কাব্যের এরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধ বিকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহার নিগূঢ় কারণটি আমাদের অপরিজ্ঞাত। আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের সহিত বাংলা সাহিত্য ও চিন্তাধারার কতখানি অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ। বাংলা দেশের সঙ্গে আরাকান রাজবংশের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে ১৪০৪ খ্রীঃ অঃ—সেই বৎসর রাজা নরমেইখলা (১৪০৪ খ্রীঃ-১৪৩৪ খ্রীঃ) ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বাংলার পাঠান সুলতানের সাহায্যপ্রার্থীরূপে গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ১৪৩০ খ্রীঃ অঃ গৌড়াধিপতির সহায়তায় তাঁহার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। বাংলা দেশে দীর্ঘপ্রবাসের ফলে হয়ত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার কিছুটা পরিচয় ঘটে। এই সাংস্কৃতিক সংযোগ চট্টগ্রাম-বিজয়ের ফলে নিশ্চয়ই নিবিড়তর হয়। দৌলত কাজি ও আলাওলের সময় পর্যন্ত চট্টগ্রামের কিছুটা আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং মনে হয় পঞ্চদশ শতকে আকস্মিক দুর্দৈবে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয় তাহা সপ্তদশ শতক পর্যন্ত প্রধানতঃ চট্টগ্রাম-প্রচলিত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একটা স্থায়ী মানস সংস্কারে পরিণতি লাভ করে। ইহারই সুদূরপ্রসারী ও বহুশতাব্দীব্যাপ্ত প্রভাবে শ্রীসুধর্ম (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ অঃ) ও তাঁহার পরবর্তী শ্রীচন্দ্র সুধর্মের (১৬৫২ খ্রীঃ-১৬৮৪ খ্রীঃ অঃ) আমলে আরাকান রাজসভায় দুইজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবির—কাজি দৌলত ও আলাওলের—আবির্ভাব হয়।

আরাকানে বাংলা-চর্চার পটভূমি

উপরি-উল্লিখিত কার্যকারণসম্পর্ক ও প্রতিবেশ-প্রভাবও,' যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যারূপে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে হয় না। (এই দুই কবির গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রাজা নহে, দুই রাজার দুই প্রধান অমাত্য—আশরফ খাঁ লস্কর ও মাগন ঠাকুর।) ইঁহাদের বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ রাজসভাবপ্রভাবলব্ধ না হইয়া জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। ইঁহারা আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বাংলার প্রতিবেশী ভাষা ও সাহিত্য হইতে সংগৃহীত ভাবরস-আস্বাদনে উন্মুখ, জটিল-উপাদান-গঠিত বৃহত্তর ভাবপরিমণ্ডলে বিচরণশীল, অভিজাত-বংশীয় বাঙালী ছিলেন। (ইঁহারা কবিদের যে ফরমায়েস করিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহাদের মানস রুচি স্বয়ং-প্রকাশিত। আশরফ খাঁ দৌলত কাজিকে লোর-চন্দ্রানীর আখ্যান হিন্দী হইতে বাংলায় বর্ণনা করিবার নির্দেশ দেন ও মাগন ঠাকুরও আলাওলকে হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্যকে বাংলা রূপ দিবার জন্য ফরমায়েস করেন।) এই আখ্যান দুইটি যে ঠিক মুসলমান ভাবধারা-প্রভাবিত তাহা নহে। 'লোর চন্দ্রানী' সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুভাবাদর্শানুসারী; 'পদ্মাবতী'তেও কাহিনীভাগের মধ্যে ইসলামী জীবনযাত্রার কিছু সংমিশ্রণ থাকিলেও ইহার আলোচনা-রীতি প্রধানতঃ হিন্দুজীবনদর্শনাশ্রয়ী। সুতরাং ইঁহাদের আকর্ষণ, আখ্যানের অভিনবত্ব, বাংলাকাব্যপ্রচলিত, বহুধা-পুনরাবৃত্ত পৌরাণিক পরিমণ্ডলের সীমা-তিক্রম। ইহাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধর্মপ্রভাবোত্তীর্ণ মানবিক প্রেমের কাব্যরূপায়ণ। এই কাহিনীগুলিতে বিষয়ের অভিনবত্বের সঙ্গে আস্বাদন-বৈচিত্র্য যুক্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে এক নূতন রসসঞ্চার হইয়াছে। আলাওলের অন্যান্য কাব্যগুলি—'সয়ফুলমুলূক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৯), 'সপ্তপয়কর' (১৬৬০), 'তোহফা' (১৬৬৪), 'সেকেন্দরনামা' (১৬৭৬)—উর্দু ও পারস্যভাষায় রচিত গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ ও ইহাদের মধ্যে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও সমাজবিধি এবং সে যুগের মুসলমান বিদগ্ধজনের রুচিবৈশিষ্ট্য ও জীবনায়নের একটি বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের রুচি ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

কিন্তু এই কাব্যরচনায় সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রভাব হইল রাজামাত্যবৃন্দ ও কবিদ্বয়ের ব্যক্তি-পরিচয়। লস্কর উজীর আশরফ খাঁ ও কাজি দৌলত উভয়েই চট্টগ্রামবাসী ছিলেন—চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়ান আছে। (আলাওলের পিতৃভূমির যে পরিচয় তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত, তাহার

পৃষ্ঠপোষকদ্বয় ও কবি-যুগলের ব্যক্তি-পরিচয়

অনিশ্চয়তায় নানা জল্পনা কল্পনা-অনুমানের এক দুর্ভেদ্য অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। তবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর যে পুরুষানুক্রমে রোসাঙ্গে বাস করিতেন ও উহাই কার্যতঃ তাঁহার স্বদেশ ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবসর নাই। আশরফ খাঁ লস্কর ও মাগন ঠাকুর উভয়েই বাঙালী ছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি সহজাত। কিন্তু তাঁহারা যে অনুকূল দৈববশে মধ্যযুগের দুইজন শ্রেষ্ঠপ্রতিভাসম্পন্ন কবিকে তাঁহাদের সভাসদরূপে লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের মনে কাব্যপ্রেরণা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ইহা বাংলা সাহিত্যের একটা আশাতীত সৌভাগ্য। রাজসভায় সাধারণতঃ যে সব হীনশক্তি কবিযশঃ-প্রার্থী লেখক আতিশয্যস্ফীত চাটুবাক্যের দ্বারা মুনিবের মনোরঞ্জন করেন, এই দুই কবি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। খাঁচায় পোষা কর্কশভাষী ময়নার পরিবর্তে আমরা অকস্মাৎ সুধারসস্রাবী, গগনবিহারী পাপিয়াদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম)

কাব্যানুরাগ ও কবির প্রতি আনুকূল্য রোসাঙ্গ রাজসভাসদবর্গের অনেকেরই স্বভাবজাত ছিল। আলাওলের প্রতি অনুগ্রহশীল হিতৈষীর অনেকেরই নাম কবির বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কবি সকলের প্রতি প্রায় একই ভাষায় নিজ অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষককেই তিনি নানা গুণের অধিকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ও সকলের প্রতিই তাঁহার বিনীত আনুগত্য ও উচ্ছ্বসিত ঋণস্বীকার আমাদের মনে তাহাদের সত্যিকার গুণবত্তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ খটকা জাগায়। লোর-চন্দ্রানী ও সয়ফুলমুলুক বদি-উজ্জমালের—প্রথমাংশে রাজার অর্থভাণ্ডারী শ্রীসোলেমান ও দ্বিতীয়াংশে সৈয়দ মুছা, 'সেকেন্দরনামা'-তে শ্রীমন্ত মজলিস, 'সপ্তপয়কর'-এ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ মহাম্মদ ও 'তোফায়' শ্রীমন্ত সোলেমান কবির কাব্যচর্চায় সহায়তা করিয়া ও তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার কবিখ্যাতির অংশভাক্ হইয়াছেন। (বাংলার প্রত্যন্ত-প্রদেশ-সন্নিহিত এক বৌদ্ধ রাজবংশের সভাসদমণ্ডলীতে এত অধিকসংখ্যক বাংলা কাব্যানুরাগী ও কবির প্রতি সহানুভূতিশীল বিদগ্ধরুচি ব্যক্তি ছিলেন ইহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এই কাব্যপ্রীতি কতকটা প্রথানুসৃতিমূলক ও প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক হইলেও উহার ব্যাপকতা ও আন্তরিকতা যে একটি দুর্লভ মানসপ্রবণতা তাহা স্বীকার করিতেই হয়। রোসাঙ্গ রাজসভার আকাশে-বাতাসে এমন কোন কুহকমন্ত্র ছিল যাহাতে বাংলা কাব্যের শুষ্ক তরু নূতন

রোসাঙ্গ রাজসভায় প্রভূত বঙ্গসাহিত্য-প্রীতি

রসাকর্ষণ করিয়া ফুলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে ও অভিজাতবংশীয়দের অভ্যস্ত বিলাসব্যসন নিজ স্থূল রুচি ভুলিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির রসাস্বাদনে তন্ময় হইয়াছে।) এই রাজসভায় কিন্তু হিন্দু ভাবসাধনা অপেক্ষা ইসলাম আদর্শের চর্চাই বেশী প্রচলিত ছিল ও বিভিন্ন রাজা বিকল্প মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইতেছে আলাওলের ভাগ্যচক্রঘূর্ণিত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ও সর্বতোমুখী ব্যুৎপত্তি। বোধ হয় বাংলার কোন কবিরই জীবনে এরূপ রোমাঞ্চকর ভাগ্যবিপর্যয় ও সর্বস্তরবিন্যস্ত মানস সম্পদ সঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার আত্মকাহিনী হইতেই জানা যায় যে কবি এক রাজ-অমাত্যের পুত্র ছিলেন। যৌবনে তাঁহার পিতার সঙ্গে নৌকাযাত্রার সময় তিনি হার্মাদ জলদস্যুদের হাতে পড়েন। এই যুদ্ধে পিতা প্রাণত্যাগ করিয়া সহীদ হন, পুত্র ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রোসাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও আরোগ্য-লাভের পর রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগ দেন। এই সময় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির জন্য মাগন, সোলেমান প্রভৃতি রাজামাত্যবর্গের সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও তিনি ইঁহাদের নিকট প্রভূত সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। এই সময় ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আবার তিনি ঘোর বিপদে পতিত হন। সাজাহান-পুত্র শাহ্ সুজা আরাকান-রাজ্যে আশ্রয় লইয়া আরাকান-রাজের বিরাগভাজন হন ও ইতিহাস-বিখ্যাত এক নির্মম চক্রান্তে তাঁহাকে সপরিবারে প্রাণ বলিদান দিতে হয়। কবি আলাওল শাহ্ সুজার পক্ষাবলম্বী বলিয়া মিথ্যা অভিযোগে জড়িত হন ও এগার বৎসর রাজরোষের পাত্ররূপে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর জরাজীর্ণ দেহ ও দারিদ্র্যপিষ্ট জীবন লইয়া তিনি অনেক দুঃখে সময় কাটান—এমন কি দারিদ্র্যের যে সর্বনিম্ন ধাপ ভিক্ষুকত্ব, তাহাতেও তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইয়াছিল সে কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ নানা উত্থান-পতন-বন্ধুর, দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি যে কখন তাঁহার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার আহরণের সময় পাইয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু এই সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য ও রুচিপ্রকর্ষের নিদর্শন তাঁহার প্রতি গ্রন্থের পাতায় পুঞ্জীভূত। বহুমুখী জ্ঞানের দিক দিয়া তিনি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। বিদ্যাপতির জ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা ও কয়েকটি লৌকিক আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলাওল

আলাওলের বিচিত্র জীবন ও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য

হিন্দু ও ইসলাম এই উভয়বিধ জ্ঞান বিষয়ে সমান পারদর্শী; এবং জ্ঞানের যে সমস্ত বিভাগ সাধারণ পণ্ডিতের অনধিগম্য সেই যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ-অধিগত বিষয়েও তাঁহার অবাধ ও স্বচ্ছন্দ অধিকার।) কাজী-দৌলতের জীবনকাহিনী অজ্ঞাত, কিন্তু হিন্দুধর্ম ও যোগসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তিনি আলাওলের প্রায় সমকক্ষ।

২

(কাজী-দৌলতের 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খৃঃ অঃ-র মধ্যে শ্রীসুধর্মের রাজত্বকালে (১৬২১—১৬৩৮) রচিত হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি আল্লা ও মহম্মদের বন্দনা করিয়া তাঁহার মুসলমান ধর্মে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। ঈশ্বর-বন্দনার মধ্যে তিনি ইসলাম-আদর্শ-অনুযায়ী ভগবৎ-মাহাত্ম্য ও তাঁহার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণের যে কথা বলিয়াছেন তাহার প্রকাশভঙ্গী হিন্দু ভক্তিবাদ হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র হইলেও ইহার উদার ও সার্বভৌম ভাবটি ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য।)

লোর-চন্দ্রানীর প্রারম্ভিক প্রশস্তি

মহম্মদ-প্রশস্তিতে তাঁহার অপার-শক্তি-দ্যোতক উপমা প্রয়োগও ভাষায় ও ভাবে কিছুটা অভিনব।

অঙ্গুল-ইঙ্গিত-শরে শশী দুই খণ্ড করে
প্রলয়-সমান তান দাপ॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু-বৃষ্টি-জলে।

তাহার পর রোসাঙ্গরাজের প্রশস্তি-উপলক্ষ্যে তাঁহার দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনের চিত্র হিন্দু পুরাণের উল্লেখসংবলিত নূতন দৃষ্টান্তপরম্পরার সাহায্যে অঙ্কিত হইয়াছে।

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি॥
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
ভীমসম বলীও না করে বলাৎকার॥
সীতা সম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজ-ভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে॥

রাজার নৌকাবিহার ও বনপার্শ্বে শিবির-সন্নিবেশ-বর্ণনায় ঐশ্বর্যদীপ্তিপ্রকাশের

পিছনে একদিকে সুবিন্যস্ত বর্ণবৈভব, অন্যদিকে নূতন বস্তুরসচেতনা পরিস্ফুট। নায়িকা ময়নামতীর রূপবর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতকাব্যপ্রথানুগামী। তাহার স্বামী লোর তাহাকে ফেলিয়া বনবিহারে গেলে তাহার বিরহদুঃখাভিব্যক্তিও প্রাচীনছন্দশাসিত। তাহার পর চন্দ্রানীর সহিত তাহার স্বামী খর্বাকার বামনের দাম্পত্যসম্ভোগহীন অদ্ভুত সম্পর্ক ও চন্দ্রানীর স্বামী-মিলন-প্রত্যাশার বারবার ব্যর্থতায় তাহার অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত খণ্ডিতা নায়িকার মনোবেদনার অনুভব বর্ণিত হইয়াছে। এই স্ত্রীসম্ভাষণবিমুখতার জন্য ধাত্রীকর্তৃক বামনের গঞ্জনা চমৎকারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

চন্দ্রানীর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন

কাপুরুষ না শোভয় রমণী সম্পাশ।
লবণ উদকে নহে কুমুদ-বিকাশ ॥
... ...
এতেক তোমার যোগ্য না হবে কুমারী।
মণ্ডুকের ভোগ কোথা অমৃত—মাধুরী ॥
... ...
যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎর্সনা ॥

বামনের সঙ্কোচশ্লথ অন্তঃপুরযাত্রা অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের অনিচ্ছাকৃত মন্থর অন্তর্ধানের চমৎকার উপমাটি কবিকে স্মরণ করাইয়াছে। রাজকন্যা অতঃপর স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সখীজনপরিবৃত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে ও পর্বসময়ে দেবমন্দিরে পূজা দিবার সময় মন্দিরযাত্রী কাহারও কাহারও চোখে পড়ে। এক যোগী এই সংবাদ রাজপুত্র লোরের নিকট আনিল।

অতঃপর লোর চন্দ্রানীকে দেখিতে গোহারি-রাজপুরে অতিথি হইয়াছে। কবি লোরের এই প্রিয়াসন্দর্শনের জন্য যাত্রাকে বিদ্যার জন্য সুন্দরের প্রণয়াভিসারের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার আখ্যায়িকাকে একটি সুপ্রসিদ্ধপ্রথানুগত কাহিনীপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার, দূতীপ্রেরণের দ্বারা মিলনের উপায়-নির্ণয়, দড়ির সিঁড়ি-সহযোগে প্রণয়ীর প্রণয়িনার কক্ষে প্রবেশ ও পরস্পরের রূপমুগ্ধ প্রেমিকযুগলের আবেশময় মিলন একদিকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রথা, অপরদিকে রোমিও-জুলিয়েটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। এই

লোর ও চন্দ্রানীর মিলন

উভয় রীতির সংমিশ্রণে প্রেমকাহিনীটি যেন একটি নূতন আস্বাদ পাইয়াছে। কয়েকদিন মিলনের পর চন্দ্রানী নিজ স্বামী বামনের প্রতিহিংসা ও নিজের কলঙ্কভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া লোরকে তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সীতার সহিত তুলনা আমাদের মনে কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের উদ্রেক করে।

জীবনে কি ফল যদি কলঙ্ক রহিল।
কলঙ্কেব ভয়ে সীতা পাতালে নামিল॥

ইহার পর প্রেমিকযুগলের বনাভিমুখে পলায়ন, বামনের পশ্চাদ্ধাবন, বামন ও লোরের দ্বৈরথ যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের নানা পরিবর্তনস্তরের মধ্যে শেষ পর্যন্ত লোরের জয় ও বামনের মৃত্যু আমাদিগকে ঘটনাপরিণতিব দিকে অগ্রসব করিয়া দিয়াছে। দ্বৈরথ যুদ্ধের বর্ণনায় পৌরাণিক স্মৃতি খুব সুস্পষ্ট হইলেও ইহা কেবল রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনার অনুকৃতিমাত্র নহে। ইহার মধ্যে কিছুটা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যোদ্ধাদ্বয়ের মানস প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন অনুভবগম্য।

বামনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও মৃত্যু

এই পর্যন্ত প্রেমকাহিনীবিবৃতিব পর লেখক অকস্মাৎ অতিপ্রাকৃতের মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। মধ্যযুগের কবিব বাস্তব চেতনার সঙ্গে দৈবসংঘটন, পরলোকচিন্তা ও অলৌকিক রহস্যের স্ফুরণ প্রায় অব্যবহিতভাবে সংলগ্ন থাকিত। বিশেষতঃ রোমান্স-কাহিনীর মধ্যে অপ্রাকৃতের বীজ গোড়া হইতেই উপ্ত ছিল —প্রেমাঞ্জনলিপ্ত চক্ষুর সম্মুখে পরলোকের রহস্যদ্বার সর্বদাই উন্মোচিত হইতে প্রস্তুত থাকিত। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কালিকার অনুগ্রহ প্রেমানুভূতির সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সহাবস্থাননীতিরই রূপক প্রকাশ। ভাবতন্ময় প্রেমিক ভাবতন্ময় সাধকের একটা পূর্বাবস্থার সূচক, বস্তুবাধা-উল্লঙ্ঘনের একটা পূর্ববর্তী সোপান। এখানে বোধ হয় মনসামঙ্গলের প্রভাবেই চন্দ্রানীর সর্পদংশনে মৃত্যু ও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত-উদ্ধারের আশ্রয়ে এক ঋষির যোগবিভূতিপ্রকাশে তাহার পুনর্জীবনপ্রাপ্তির বর্ণনায় লেখক অতি সহজেই অলৌকিক রাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন। মৃত্যু কবিকে জীবনের নশ্বরতাবিষয়ক অধ্যাত্ম চিন্তার অবসর দিয়াছে।

চন্দ্রানীর মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ

যত শক্তি করে যেই যতেক বিক্রম।
আসিতে বীরের মত যাইতে অন্ধসম॥
.. ..

মহাজন-মৃত্যু যেন স্থানান্তরে যায়।
মহাসেতু লঙ্ঘিয়া কাঞ্চনপুরী পায়॥

ভারতের শাশ্বত অধ্যাত্মতত্ত্ব কত সহজে, কিরূপ অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের ন্যায় মুসলমান কবির মুখে ধ্বনিত হইয়াছে!

ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ডে পতি-পরিত্যক্তা অভাগিনী ময়নামতীর কথা দীর্ঘকাল ব্যবধানে কবির মনে পড়িয়াছে। এক প্রতিবেশী রাজপুত্র ছাতনকুমার ময়নার রূপমুগ্ধ হইয়া রতনা মালিনীকে কুট্টনীরূপে ময়নার নিকট দৌত্যকার্যে প্রেরণ করিয়াছে। রতনা মালিনী নিজেকে ময়নার শিশুকালের ধাত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয়ে তাহার পরিবারে স্থান লাভ করিয়াছে ও রতিশাস্ত্র-নির্দিষ্ট উপায়ে তাহার মনে কামপ্রবৃত্তি উদ্রেক করিতে চাহিয়াছে। এই মালিনী ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর পূর্বসূচনা। তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহার কার্যক্রম বহু-প্রসারিত ও বিবিধ-উপায়-প্রয়োগ-চিহ্নিত।

ময়নাবতী ও রতনা

মধুরসম্বল তুণ্ড   হৃদয় গরলকুণ্ড
কপট মন্ত্রণা দমনক।

ময়নার নিকট দূতী সুযোগসন্ধানীরূপে প্রতীক্ষা করিতেছে;

যেন শুক-বধ-আশে   মার্জার খোপেতে বৈসে,
শিবা যেন মৃগের বিনাশ।

কিন্তু

বিধি রক্ষা করে যারে   বক্ষ নহে কেশ-অগ্রে,
তার ছায়া না লঙ্ঘে সংসারে।
বিপরীত বায়ুবলে   সত্যঘট নাহি টলে
সতীত্বকে টলাইতে নারে॥

কবি কাব্যপ্রসিদ্ধ বারোমাস্যা-প্রথাকে এক নূতন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রতি মাসে নায়িকার বিরহক্লেশ দূতীর সহানুভূতি উদ্রেক করিয়া দূতীকর্তৃক নায়িকাকে পরপুরুষমিলনের প্রতি প্ররোচনা দিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রতি ঋতুতেই সুমতি-কুমতির একটা খণ্ডযুদ্ধপালা অভিনীত হইয়াছে। নায়িকা দূতীর প্রলোভনকে জয় করিয়া সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। নায়িকা ও দূতীর এই উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবকাব্যপ্রভাবিত। (প্রকৃতিবর্ণনায়, সংস্কৃতমিশ্র ব্রজবুলি ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে, ছন্দোবিন্যাসে ও ধ্বনিপ্রবাহে, বিরহিনী নায়িকার অন্তর-চিত্র-

বৈষ্ণব প্রভাব

উদ্‌ঘাটনে, নীতিতত্ত্বপ্রতিপাদনে—সর্বত্রই পদাবলী-সাহিত্যের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতির প্রভাব এত সুপরিস্ফুট যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে একজন মুসলমান কবি নিজ বিশিষ্ট ধর্মমত ও সমাজনীতিসত্ত্বেও এমন অকুণ্ঠভাবে পদাবলীভাবরসে কেমন করিয়া আত্মনিমজ্জন করিতে পারিয়াছেন। নূতনত্বের মধ্যে শ্রাবণ-প্রকৃতি বর্ণনায় বৃন্দাবনের শ্যামলতমালকুঞ্জের সহিত বাংলার শ্যাম শস্যক্ষেত্রের বাস্তব সৌন্দর্য মিলিত হইয়াছে।

শ্যামল অম্বর শ্যামল খেত-খেতি।
শ্যাম লখি দশ দিশ দিবসক যুতি (জ্যোতি) ॥

এমন কি দিনের জ্যোতি পর্যন্ত শ্যামরসস্নিগ্ধ। এখানে কবি প্রথাশাসনমুক্ত নিজ স্বাধীন পর্যবেক্ষণশক্তির সদ্‌ব্যবহার করিয়াছেন।

বৈশাখ মাসে মালিনীর প্ররোচনার মধ্যে কিছুটা মনন-স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সুকোমল হৃদয়বৃত্তির প্রসূতি—যেখানে ইহার অভাব সেখানে মানুষ পশুস্বভাবাপন্ন ও কঠিনহৃদয়। মনন-স্বাতন্ত্র্য

যাহার হৃদয়ে নাহি প্রেমের সন্ধান।
রূপে নরাকৃতি সেই হৃদয় পাষাণ ॥
প্রেম প্রীতি দয়া মায়া কাম-নৃপ-সখা।
সে সকল মিত্র সঙ্গে কারো নাহি দেখা ॥

কামের অনুকূলে এই যুক্তি প্রায় আধুনিক যুগের চিন্তা-স্বাধীনতার সমপর্যায়ভুক্ত।)

এইখানে দৌলত কাজী-রচিত কাব্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হইয়াছে। কবির মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে তৎকালীন রোসাঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মের মহাপাত্র সোলেমান এই অসম্পূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করিবার ভার আলাওলের উপর ন্যস্ত করেন। আলাওল তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই গুরুদায়িত্ব স্বীকার করেন। এক কবির পরিত্যক্ত কাজ আর এক কবির পক্ষে সম্পূর্ণ করা হয়ত তাঁহার পক্ষে স্বভাবানুমোদিত ও রুচিকর না হইতে পারে। বিশেষতঃ আলাওলের কবিকল্পনা এই বিষয়ের মানবিক রস ও আবেদন-গভীরতার ক্রমবিবর্তনের প্রতি নিবিষ্ট না থাকিয়াই একেবারে ইহার পরিসমাপ্তি-অংশে মনোযোগী হইতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই এখানে চর্বণস্বাদুতার সঙ্গে অন্তিম পরিপাক-প্রক্রিয়ার, জারকরসনিঃসৃতির মাধ্যমে, স্বাভাবিক যোগসাধন হয় নাই। লোর-চন্দ্রাণীর শেষ অধ্যায় ও আলাওল

আলাওল সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া ঘটনার শেষ অংশটুকু জুড়িয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ মালিনী রতনার নির্বন্ধাতিশয্যে ময়নাবতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং নায়িকা যুক্তিখণ্ডনের সরল পথ ছাড়িয়া প্রহারের রুক্ষ পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে নায়িকার যে মর্যাদাহানি ও জাতিচ্যুতি হইয়াছে তাহা বোধ হয় কবি উপলব্ধি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ একটি বাস্তবসম্পর্কহীন রূপকথার কাহিনীর দৃষ্টান্তে তিনি নায়িকার বিধ্বস্ত ধৈর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন ও এক সারীপক্ষী ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চতুর দৌত্যের উপর দীর্ঘ-বিচ্ছিন্ন পতি-পত্নীর মিলনসাধনেব ভার অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপে খুব দ্রুত ও কৃত্রিম উপায়ে ও জীবনগভীরতার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কভাবে এই গ্রন্থেব উপসংহাব হইয়াছে। এই গ্রন্থে কবিত্বশক্তিতে আলাওলের আপেক্ষিক অপকর্ষ প্রমাণিত হইলেও ইহা তাঁহার কাব্যোৎকর্ষেব চূড়ান্ত মানদণ্ডরূপে গ্রহণীয় নয়।

দৌলত-কাজীর এই কাব্যটির প্রারম্ভিক দুই তিন সর্গ বাদ দিলে ইহাতে তাঁহার মুসলমান মানসিকতা ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন পবিচয় নাই। সুফী ধর্ম ও বৈষ্ণব প্রেমসাধনাতত্ত্বের মধ্যে একটি সহজ ঐক্য থাকায় কাজী-দৌলতের অধ্যাত্ম ভাবপ্রতিবেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাঁহাব ভাষাপ্রয়োগ ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে উন্নত কবিকল্পনা ও প্রকাশশক্তির চিহ্ন সুপবিস্ফুট। তাঁহার উপমা ও দৃষ্টান্তগুলি প্রায় সমস্তই হিন্দুপুরাণ হইতে আহৃত। তাঁহার বারোমাস্যা অংশ সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবকল্পনাপ্রভাবিত। তবে বর্ণনা ও আখ্যানবিবৃতির মধ্যে সময় সময় যে মৌলিক মনন ও অনুভূতির স্পর্শ মিলে তাহা তাঁহার মুসলমান ভাবপ্রতিবেশের পরোক্ষ ফল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ও আলাওলের ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির পরিবেশনে একটা সংযত উচ্ছ্বাস ও ধীর মননের সুচিন্তিত প্রয়োগ দেখা যায়—ইহা অনভ্যস্ত ক্ষেত্র-বিচরণের সতর্ক-পদক্ষেপ-প্রসূত। একজন হিন্দু কবি চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ফলে যে ভাবপ্রবাহে নিজেকে আবেগ-উচ্ছলতায় ভাসাইয়া দিতেন, মুসলমান কবি সেখানে যুক্তির রজ্জু ধরিয়া চিন্তাশীলতার লগিতে গভীরতার মাপ করিতে করিতে সতর্ক পদে অগ্রসর হইয়াছেন। স্রোত-বিথার জলে দাঁড়াইয়া কূলের কুকুরের কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। বিশেষতঃ কবি আখ্যানের নির্বাচনে ও উহার বিস্তারিত রূপায়ণে নূতন স্বাধীনচিত্ততা ও কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। লোরের সহিত বিবাহিতা চন্দ্রানীর সমাজবিগর্হিত প্রণয়সম্পর্ক একজন হিন্দুসংস্কারপুষ্ট লেখকের মনে যে বিরুদ্ধতা জাগাইত,

দৌলত-কাজীর কবি-কল্পনা-বৈশিষ্ট্য

অথবা স্নেহপ্রশ্রয়ের কৈফিয়ত যোগাইত তাহা মুসলমান কবির মনে সেরূপ কোন নীতিগত সংশয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। এইখানেই একটি রুচিবিষয়ক পার্থক্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া, কাজি-দৌলতের রচনায় যে স্মরণীয় সুভাষিতা-বলীর প্রাচুর্য লক্ষিত হয় তাহা একদিকে তাঁহার সমাজ-অভিজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ষ, অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহাব কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় বহন করে।

৩

আলাওলের জীবনে চমকপ্রদ ঘটনাবৈচিত্র্য ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতির কুটিল চক্রান্তজাল হইতে অপরদিকে নিঃসঙ্গ যোগসাধনা, গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি ও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মে অসাধারণ শাস্ত্রব্যুৎপত্তি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁহাব মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনাকৃতি চবম সিদ্ধিরূপ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পদ্মাবতী কাব্য (১৬৫১) মালিক মহম্মদ জয়সীর "পদুমাবৎ" কাব্যেব ভাবানুবাদ। কবির অনুবাদে সিদ্ধহস্ততা সংস্কৃত ও আরবী উভয় ভাষার বাংলাতে রূপান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাবপ্রবাহ ও প্রকাশদক্ষতা মৌলিক রচনারই অনুরূপ। জয়সীর পদুমাবৎ কাব্য প্রেমকাহিনীর রূপকে অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস।

আলাওলের অসাম্প্রদায়িক মিলনাকৃতি

আলাওল এই অধ্যাত্ম রূপকটিকে তাঁহার কাব্যে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রতন সেনের পদ্মিনীর জন্য অভিযান বাহ্যতঃ রোমান্টিক প্রণয়-গাথা হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ অধ্যাত্মসাধনাবিষয়ক। কবি প্রেম ও বিরহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দৃশ্যতঃ লৌকিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মরস-ব্যঞ্জক। তিনি দৈহিক রূপবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে আত্মার জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়াছেন; ইহা মরমীয়া সাধনতত্ত্বের সুরভিত-ইঙ্গিতবহ। পদ্মিনীর রূপবর্ণনাতেও অরূপ, বিদেহী সৌন্দর্য উঁকি মারিতেছে। ইহাতে সংস্কৃত-অলঙ্কারশাস্ত্রানুগামী প্রতি অঙ্গের লাবণ্য সুপরিচিত উপমাসহযোগে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের পিছনে এক অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কবির অন্তর প্রেমরসপূর্ণ ও এক অনির্দেশ্য অতীন্দ্রিয় আকৃতির উদ্দীপক। তাঁহার প্রেমপ্রশস্তি মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য মরমিয়া ও আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার সহিত একসুরে বাঁধা।

আলাওলে অধ্যাত্মরস

যে জনে পড়িল প্রেম-সাগর গম্ভীরে।
খাল জোল সম দেখে এই সমুদ্রেরে॥
জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প।
অগ্নির সমুদ্র দেখি তাতে দেয় ঝম্প॥

এই প্রেম কেবল নর-নারীর মিলনসাধন করে না, ইহা সার্বভৌম সত্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে পরিব্যাপ্ত।

প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর॥
.. ..
প্রেমমূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর॥
দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি।
প্রেম-দুঃখ সহে যেবা সুপ্রসন্ন বিধি॥
প্রেমপথে চলি যদি অন্ত নাহি পায়।
সেই পন্থে ভাবকের মরণ জুয়ায়॥

বিরহ সম্বন্ধে কবির একইরূপ উঁচু সুরে বাঁধা অধ্যাত্ম ভাবনা।

যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ-মোক্ষ-প্রাপ্তি তার আপদ তরিল॥
বিরহ-অনলে যার দহিলা পরাণ।
পিতল আজুটি করে হেম দশবান॥
আন বেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর।
গোপন মাণিক্য যেন ধূলির ভিতর॥

এই প্রেম ও বিরহতত্ত্ব বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবাদর্শের প্রত্যয়দৃঢ়, মননশীল প্রকাশ।

আত্মবিলোপের সাধনা

এই দার্শনিক অনুভূতি কাব্যের ভাবকেন্দ্রিক হৃৎপিণ্ড। কবি আলাউদ্দীনের পদ্মিনীর প্রতি আকর্ষণের প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহার অপেক্ষা রতন সেনের দ্বারা পদ্মিনীর চিত্তজয়-প্রয়াস আরও নিগূঢ় তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া

কবি যোগের গূঢ় তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভগবৎ-লাভের প্রধান উপায় আত্মবিলোপের সাধনা, ভেদবুদ্ধির বিলোপ, জীয়ন্তে মৃত্যুবরণ।

জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে।
পুনি কোথা মরণ, কে মরে কেবা মারে॥
আপনা গুরু যোগী আপনাই চেলা।
আপনে সকল মাত্র, আপনে একেলা॥
... ...
আপনি করিয়া নাশ আপে সর্বময়।
আপনি যাহাকে ভাবে সেই আপ হয়॥

সংসারের অনিত্যতা, সংসারখেলায় ফলের বিভিন্নতা, আত্মার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে কবির কি আন্তরিক অনুভূতি!

সাথীগণে ডুব দিয়া বিচারিয়া চায়।
কার হাতে মুকুতা শামুক কেহ পায়॥
সুখ দুঃখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ
সম্পদ অন্তে বিপদে।
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস
পূর্ণে গ্রাসে বিধুন্তুদে॥

অন্যত্র—

জগতে দণ্ডনা দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্ত আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥
পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যায়।
পথিক নিশ্চিন্ত কেন চলিতে জুয়ায়॥

কবির ভূয়োদর্শন

এই দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে কবি হিন্দু অলঙ্কার, পিঙ্গলাচার্যের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বহির্বিষয়ক বর্ণনাতেও কবির অনায়াস-নৈপুণ্যের পরিচয় পরিস্ফুট। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার, রাজসভার ঐশ্বর্য, ঘোড়া ও হাতীর বিবিধ খেলা প্রভৃতি বিষয়কে কবি স্বীয় কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কাব্যপরিধি প্রসারিত করিয়াছেন। কবির সুভাষিতাবলী ও প্রবাদবাক্যরচনাও তাঁহার বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার উৎস হইতে সহজ ভাবেই উৎসারিত হইয়াছে।

তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়।
ছেদিলে শতেক বার দুইখণ্ড নয়॥

অথবা

পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই॥

অথবা

প্রথমে নিশ্চিন্তে রইলে কর্ম অকুশল।
গ্রীবাবদ্ধ হইলে রোদনে কিবা ফল॥

আলাওলের অন্যান্য রচনাবলী মুখ্যতঃ ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক। এগুলিতে অনেক আববী-পারসী শব্দ থাকিলেও মোটামুটি সংস্কৃতপ্রভাবিত সাধু বাংলারই প্রাধান্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই সমস্ত গ্রন্থের বিরল প্রচার বাঙালী পাঠককে মুসলমান সংস্কৃতিব পরিচয় হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের যে অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক মিলনের অভাবে উহাদের বাজনৈতিক মিলন মুহুর্মুহু খণ্ডিত হইতেছে, তাহাকাজি-দৌলত ও আলাওলেব কাব্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া ঐ মিলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ধাবা অক্ষুন্ন থাকিলে বাংলা সাহিত্য এক নূতন ভাবসমন্বয়ে সংহত হইয়া এক মিলিত সংস্কৃতির বাহন হইত ও ইতিহাসের অনেক কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের কলঙ্ক অপনোদন করিত।

অন্যান্য রচনার প্রচার-গুরুত্ব

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

১

এই দুইখানি গাথাকাব্যসংগ্রহ ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা সচেতন ব্যক্তিশিল্পপ্রয়াসের ফল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন এই কাহিনীর প্রাচীন নৈর্ব্যক্তিক রচনার মধ্যে আধুনিক ব্যক্তিহস্তের সযত্ন মার্জনার চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়। ইহা হয়ত সত্য হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনীগুলিতে যে কবিমন ও রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার ভাবরসনিমগ্ন ও প্রাচীন পল্লীসমাজের ভাষাছন্দবিন্যস্ত। যদি আধুনিক যুগের কোন কবি এগুলির রচয়িতা হন, তবে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান—কালোচিত সমস্ত মানস জটিলতা ও স্ববিরোধ পরিহার করিয়া তৎকালিক জীবনরসতন্ময় হইয়া গিয়াছেন ও রূপকথাসুলভ ভাষাভঙ্গী ও চিত্রকল্পের অব্যভিচারী অবলম্বনে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য। সমস্ত গাথাগুলি রূপকথারই নিকটআত্মীয় ও বিভিন্ন সমাজপরিস্থিতিতে উহারই সম্প্রসারিত সংস্করণ। রূপকথার উদ্ভব যে পরিবেশে, ইহাদেরও উদ্ভব সেই একই পরিবেশে ও কিছুটা পরবর্তীকালে।

গীতিকাগুলি লোক-সাহিত্য না আধুনিক রচনা

আমাদের বাংলা রূপকথাগুলি যে ঠিক জাতির শৈশবকালজাত তাহা উহাদের জীবনদৃষ্টি ও পরিণত শিল্পরূপ হইতে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সমাজের অলৌকিকসংস্কারপুষ্ট ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন-লালিত বয়স্ক ব্যক্তির মনে যে শিশুকল্পনা সুপ্ত থাকে রূপকথা তাহারই বর্ণোজ্জ্বল, সমৃদ্ধ প্রকাশ। বাংলা রূপকথা আদিম সমাজের মনের কথা নহে; যে সমাজে জীবনাভিজ্ঞতা আদিম বিস্ময়বোধকে উন্মুলিত না করিয়া বরং উহাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছে, নানা কুটিল পথের কাঁটা অতিক্রম করিয়া দৈবপ্রসাদের আনুকূল্যে এক শুভ পরিণতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সমাজেরই পরীক্ষিত জীবনবোধ ইহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দৈবনির্ভর সমাজে জীবন-বিপর্যয়ের বহু অভিজ্ঞতার পরেও

জীবন সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা অবিচলিত থাকে। বিপদ নিজ কৃতকর্মের ফল নহে, রুষ্ট দৈবের অভিশাপ; সুতরাং মৃত্যুও আত্মদায়িত্বের অভাবে মনে খুব গভীর বিষাদরেখা অঙ্কিত করে না। আমাদের সমস্ত বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আনন্দময় পবিণতির জন্য উন্মুখ বলিয়া দুঃখের অন্তে মিলন এত স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই রূপকথাধর্মী, পল্লীজীবনের দুঃখমথিত-রসনির্যাসগঠিত গাথাগুলি বাঙালীর গভীরতম জীবনপ্রত্যাশারই সংকেতবহ। এই গীতিকাগুলিকে জাতির স্বপ্নাতুর শৈশবকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে উহাদের কাব্যমূল্য ও জীবনসত্যের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। জাতির বাস্তব জীবনের সঙ্গে, রূপকথার এই আকস্মিকতার গ্রন্থিবদ্ধ, অভাবনীয়ের চকিত-আলোকদীপ্ত জীবনলীলার সম্বন্ধ গভীর ও অবিচ্ছেদ্য।

রূপকথা-ধর্মী সাহিত্যের গুরুত্ব

এই গাথাগুলিতে যে জীবনচিত্র ও সমাজরূপ উদ্ঘাটিত হইযাছে তাহা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের বস্তু-অবলম্বন হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন আবেগের দুর্দমশক্তিচালিত। এখানে সমাজের যে ক্রূর, হিংস্র অত্যাচারী রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন সাহিত্যে অঙ্কিত ও আমাদের সার্বিক অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু এখানে সমাজ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নহে, মানুষের গড়পড়তা নিম্নগামী চিত্তবৃত্তির সমষ্টিগত রূপ। দুষ্ট কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ সমাজের দুঃশীল ও দুর্বল চরিত্রের উদাহরণ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্তের যে সংঘর্ষ তাহাতে প্রথার যান্ত্রিক মূঢ়তাই প্রধান উপাদান, কোন ধর্মান্ধতার বিস্ফোরক শক্তি ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। একদিকে আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি ও নিষ্করুণ দৈব, অন্যদিকে অদম্য জীবনোল্লাস ও দুর্দম প্রেমচেতনা পরস্পরের সহিত এক নির্মম সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে।

গীতিকায় ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজচিত্র

সমাজচিত্র সাধারণ ও পরিচিত কিন্তু প্রেমের বিচিত্র আবেগ নানা পরিস্থিতিতে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও বিভিন্ন পরিণতিতে উহার প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে। আমরা এতদিন কাব্যসাহিত্যে প্রেমের যে পার্বত্য নির্ঝরিণী-বেগের কথা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা এই গীতিকাগুলির নায়ক-নায়িকার বাক্যে ও আচরণে প্রমূর্ত হইয়াছে। এ প্রেম সমাজবিধির ধার ধারে না,

শাস্ত্রের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে, প্রতিকূল দৈবের ভ্রূকুটিতেও ভীত হয় না, একমাত্র প্রণয়াকূতির অমোঘ আকর্ষণে অজানা ঘটনাস্রোতে নিজ জীবনতরীকে ভাসাইয়া দেয় ও মনোবল না হারাইয়া চরম মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করে। বাংলার ক্ষীণ, সমাজশাসিত, আদর্শনিয়ন্ত্রিত, অদৃষ্টনির্ভর জীবনধারায় যে এত স্রোতোবেগ কোন্ উৎস হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। মনে হয় কেন্দ্রশাসন হইতে বহুদূরে স্থিত, পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, শাস্ত্রবিধি ও পৌরাণিক চেতনার দ্বারা অস্পৃষ্টপ্রায় এই প্রত্যন্ত-প্রদেশ আর্যধর্মের ভৌগোলিক সীমার বহির্ভূত ছিল। ইহার অধিবাসীরা হিন্দুমুসলমান-আদিমজাতি-নির্বিশেষে শাস্ত্রাতিরিক্ত এক সার্বভৌম হৃদয়নীতির অনুবর্তী ছিল। ইহাদের নারীর সতীত্ব পৌরাণিক দৃষ্টান্তনির্ভর না হইয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাশ্রয়ী হইয়াছে। এই সতীত্বমাহাত্ম্যঘোষণায় আমরা যত না সতী-সাবিত্রীর নাম শুনি, তাহার চেয়ে বেশী শুনি নারীর অবিচল প্রণয়ানুগত্যের কথা। অবশ্য কোন কোন কাহিনীতে পুরাণচেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; মনে হয় যে পুরাণের দূরাগত ভাবনির্যাস তথ্যভারমুক্ত হইয়া এই দুর্গম প্রদেশের আকাশ-বাতাসে ক্ষীণ সুরভির ন্যায় পরিব্যাপ্ত ছিল। মুসলমান ও হিন্দুর প্রেম-কাহিনীগুলিও মূলতঃ অভিন্ন; বিবাহিত প্রেম ও বিবাহবন্ধনমুক্ত প্রেম একই সুরে কথা বলে ও একই আদর্শের ছাপ অঙ্গে বহন করে। করুণ বিরহার্তি ও স্পর্ধিত দুঃসাহস উভয় জাতীয় কাহিনীতেই এক অভিন্ন ভাবপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভালবাসার যে কোন জাতি নাই—এই সার্বভৌম সত্য গাথাসমূহের সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রভাবক্ষীণতায় ও একই অন্তরছন্দের অনুবর্তনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সামান্য ঝিনুকের মধ্যে অসামান্য মুক্তার ন্যায় এই তুচ্ছ সমাজজীবনই যে গাথাগুলির রূপকথাজাতীয় অন্তর-ঐশ্বর্য ও রূপদীপ্তির মূল উৎস তাহাও ইহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দাম প্রণয়াবেগের চিত্র

২

কাহিনীগুলির রূপবর্ণনায়, ঘটনার ইঙ্গিতময় বিবৃতিতে ও প্রেমের গভীর ও বিচিত্র মানস ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে পল্লীপ্রকৃতির সর্বতোমুখী দ্যোতনা-শক্তি আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত মানবমনের ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। পল্লীজীবন হইতে আহৃত রূপশ্রী প্রেমের সমস্ত আকৃতিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবহৃদয় যেন এক

আশ্চর্য স্বরসঙ্গতিতে একাত্ম হইয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এ শুধু প্রকৃতির রাজ্য হইতে উপমাচয়ন নহে, উভয়ের প্রাণরহস্যের ও জীবনলীলার পারস্পরিক অনুপ্রবেশ। উপমান-উপমেয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন এই অন্তরঙ্গ সাদৃশ্যরসে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিলীন হইয়াছে। ঘটনা বা ভাবে যাহা কিছু কর্কশ, অসুন্দর, গ্লানিকর ও ভয়াবহ তাহার উপরেও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের এই উদার আস্তরণ বিস্তৃত হইয়া উহাদিগকে একটি সাঙ্কেতিক স্বপ্নময়তায় আবিষ্ট করিয়াছে। মলুয়ার মৃত্যু একটি করুণ যবনিকার অন্তরালে আবৃত হইয়াছে, এক নিরুদ্দেশযাত্রার অনির্দেশ্যতায় উহার বস্তুগত নির্মমতা হারাইয়াছে; মেঘের গর্জনে মানবহৃদয়ের হাহাকার চাপা পড়িয়াছে।

প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একাত্মতা

পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥
... ...
ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কায করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল॥ (মহুয়া)

এখানেও শেষরাত্রির অস্ফুট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের আবছায়াসঙ্কেত কন্যার নিষ্ঠুর সংকল্পের মধ্যে মানস অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করিয়াছে ও রক্তাপ্লুত হত্যার ভীষণতাকে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাববিপর্যয়ের রহস্যদ্যোতনায় আবৃত করিয়াছে। বিষবাণপ্রয়োগে নায়কের সাংঘাতিক আঘাত ও অতর্কিত রূপক-প্রয়োগে—ঘরের বাতি নিবানো ও নগর-কানা কালা মেঘের উদয়ের দ্বারা—বস্তু-কাঠিন্য হইতে ভাবসুষমার রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে।

তারা হইল ঝিকিমিকি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেই না নদীর জলে॥

—একই উপায়ে মৃত্যুকে রমণীয় করিয়াছে।

রূপবর্ণনায় এই প্রকৃতিপ্রাণতা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট। নারীরূপের রং ও রেখার সহিত প্রকৃতিরূপের রং ও রেখা গভীরভাবে মিশিয়া উভয়ে মিলিয়া এক যৌগিক সত্তা রচনা করিয়াছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির প্রাণলীলা মানবীর রূপে আরোপিত হইয়া উহাকে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় রহস্যময় করিয়াছে। প্রকৃতির

রূপ-বর্ণনায় প্রকৃতি-প্রাণতা

সহযোগিতা মানবের অন্তররহস্যের নিগূঢ়তাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছে।

ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥ (কঙ্ক ও লীলা)

অথবা

বৈকালীন রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায়॥

এখানে আসন্ন মৃত্যুর উপর রামধনুর ক্ষণস্থায়ী বর্ণচ্ছটা আরোপিত হইয়া উহার বিলয়ের মধ্যে এক করুণ মাধুরী সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি যে সমস্ত স্থলে প্রথাসিদ্ধ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সর্বব্যাপিত্ব পুরাতন উপমাসমূহকেও এক নূতন ভাবদ্যোতনায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাচনভঙ্গীর অভিনবত্ব ও আবেগের গাঢ়তা পরিচিত উপমানগুলিকেও প্রথাজীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়া উহাদিগকে জীবনরসের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৩

প্রেমাকৃতির সার্থক প্রয়োগ

প্রেমের আরম্ভ রূপবর্ণনায়; কিন্তু উহার পরিণতির পথে আমরা প্রেমিক হৃদয়ে উচ্ছ্বাসের মর্মস্পর্শী প্রকাশকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করি। রূপমুগ্ধতা, বিস্ময়, অন্তরের প্রবল আলোড়ন, মিলনের একান্ত আকূতি, বিরহের তীব্র অস্বস্তি ও বিদায়ের অসহনীয় জ্বালা—এই ভাবপরম্পরা যখন প্রণয়ীদের উক্তিতে বা লেখকের নিবিড় উপলব্ধিতে যথাযোগ্য অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই প্রেমকবিতার কাব্য-সার্থকতা। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাদ্বয়ে এই সার্থক আবেগপ্রকাশের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলে। এখানেও প্রাকৃতিক দৃশ্য পটভূমিকারচনায় ও সাদৃশ্যব্যঞ্জনায় নর-নারীর হৃদয়াবেগকে একদিকে ব্যাপ্তি ও বিস্তার, অপরদিকে আবেদন-গভীরতা দিয়াছে। প্রেমিক হৃদয়ের আর্তি প্রকৃতির নিপুণ সহযোগিতায় আপনার আকুলতাকে সুকুমারসৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া নিখিলচিত্তজয়ের সুদূর অভিযানে প্রেরণ করিয়াছে।

আমি ত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর-পূড়া।
কুল ভাঙ্গিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া॥

(মহুশাল বন্ধু)

প্রেমের ক্ষোভ ও অতৃপ্তি বর্ষাস্ফীত নদীর একটি খেয়ালী আচরণের উপমায় অপূর্বভাবে ফাটিয়া পড়িয়াছে। আত্মপ্রসারণের মধ্যে আত্মক্ষয়ের সম্ভাবনা সাধারণ নদীর মত প্রণয়-স্রোতস্বিনীরও একটি অনিবার্য বিপদ। প্রণয়মূঢ়া নারীর ব্যাকুল আলিঙ্গনপ্রয়াস সময় সময় শূন্যতাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

সময়-সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অধীর, সম্ভব-অসম্ভবের সীমালঙ্ঘী প্রণয়াকৃতি প্রায় একইরূপ ভাষায় অথচ পল্লীনারীর সংকীর্ণ জীবনাভিজ্ঞতার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই গাথা-কাব্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

আজি হৈতে তোমায় বন্ধু ছাইড়্যা নাই সে দিব।
নয়ানের কাজল কৈরা নয়ানেতে থুইব॥
বসন কইর‍্যা অঙ্গে পরব মালা কইর‍্যা গলে।
সিন্দুরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে॥
... ...
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব॥
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
এমন হইলে ঘুচবো তোমার দুই আঁখির আঁধার॥

(আন্ধা বন্ধু)

বৈষ্ণব পদের সমধর্মী

এই উদ্ধৃতিটিতে অনন্তরূপের ধ্যানবিভোর, অধ্যাত্মসাধনার উচ্চভাবলোক-বিহারী বৈষ্ণব কবি আর অন্ধ বন্ধুর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী এক সামান্য কৃষক-রমণী একই উপমার প্রয়োগে নিজ অন্তরের আকূতিকে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রেম উহাদের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া উহাদের ভাবরাজ্যের একই স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হয়ত এইখানে পল্লীগীতির মধ্যে কিছুটা সাহিত্যশিল্পের পরিমার্জনা সন্দেহ করা যায়। বিপরীত দিকে, অন্ধ নারী নিজ ভুবনজোড়া আঁধারের মধ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রেমিককে আহ্বান জানাইতেছে:—

না জ্বালিলাম ঘরের বাতি রে বন্ধু অন্ধ আমার আঁখি।
হাত বুলাইয়া বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি॥

(শ্যামরায়ের পালা)

কখনও কখনও প্রেমবিষয়ে সংলাপকুশলতা প্রেমের অশিক্ষিতপটুত্ব ও নাটকীয় চমকসৃষ্টির উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা যায়। প্রণয়ানুভূতি যে সকল মানুষকেই একটা স্বভাব-আভিজাত্যের পদবীতে উন্নীত করে ইহা তাহারও প্রমাণ।

প্রেমের বিচিত্র চিত্র

"মহুয়া" গল্পে ব্রাহ্মণকুমার নদেরচাঁদ বেদের মেয়ে মহুয়ার প্রণয়ভিখারী। মহুয়া কপট ক্রোধে এই প্রণয়-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

লজ্জা নাই—নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের সপ্রতিভ উত্তর আমাদিগকে বিস্মিত করে।

কোথা পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥

অপাত্র-ন্যস্ত অশুভান্ত প্রেমের বিড়ম্বনা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্য-বর্তিতায় আশ্চর্য ব্যঞ্জনাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেক উদয়॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা বটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে॥

(ধোপার পাট)

আবার এই বিসদৃশ অভিজ্ঞতার উপর মন্তব্য অপূর্বভাবে প্রেমের স্বরূপরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

এক প্রেমেতে মারে কন্যা আর প্রেমে জিয়ায়।
যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেম কেবা চায়॥
চক্ষের কাজল কন্যা ঠাঁইগুণেতে কালি।
শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি॥

এই উক্তিটিকেও ঠিক অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনা বলিয়া মনে হয় না।

প্রেমসম্পর্কবিরহিত বিশুদ্ধ প্রকৃতিবর্ণনাতেও এই গীতিকাব্যের অনুভূতি-স্বাতন্ত্র্য ও রূপকথাধর্মী প্রকাশ-উচ্ছলতা লক্ষিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে কবিরা যে মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহাই অবিকৃতভাবে তাঁহাদের ভাবোচ্ছ্বাসময়, কারুকার্যহীন বাচনভঙ্গীর মধ্যে বিধৃত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ প্রকৃতি-চিত্র

আগ-রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া (মহুয়া)

কান্ধে কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া।
আসমানে খাড়াইয়া জমীনে ঢালে ধারা॥ (আয়না বিবি)

গৃহস্থবধূর কল্পনায় বর্ষার এই নূতন মূর্তি আমাদিগকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুরূপ বর্ষাকল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়।

সূর্যোদয়ের চিত্র:

দুধের বরণ ঘোড়াগোটা আগুনবরণ পাখা।
(আরে) বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে যায় দেখা॥
আবের বাড়ী আবের ঘর করে ঝিলিমিলি॥ (কমলারাণীর গান)

বৈদিক সপ্তাশ্ব-বাহিত, অরুণ-সারথি সূর্যরথেরই একটি গ্রাম্য সংস্করণ। এখানে সূর্য রথারূঢ় দেবতা নন, শ্বেত-অশ্ব, তাহার অগ্নিবর্ণ পাখা। সূর্যমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, কিন্তু এই মণ্ডলবিচ্ছুরিত রশ্মিজাল আগুনের মত রাঙা। গ্রাম্য কবি নিজ প্রত্যক্ষতার মানদণ্ডে বৈদিক ঋষির কল্পনাকে এইরূপে সংশোধন করিয়া লইয়াছে।

৪

রূপকথাসুলভ শব্দ ও বাক্যাংশসম্ভার প্রকৃতিবর্ণনার মৌলিকতা ও কবিদের রূপমুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। মনে হয় প্রকৃতিরূপের প্রথম বিস্ময়বোধ, রূপকথারাজ্যের অপার্থিব সৌন্দর্যের মত, ছেলেভুলান ছড়ার মত, অভিধানে অপ্রাপ্য ও কাব্যরীতিতে অপ্রচলিত নূতন চিত্রকল্প শব্দ আবিষ্কারের দাবি জানায়। এই জাতীয় কাব্যে **আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ডাগল আঁখি, তেল-ফুরাণ্যা বাত্তি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্কামাখা পরভাত** প্রভৃতি দ্বৈতশব্দ ও বাক্যাংশগুলি যেমন সজীব কল্পনার নিদর্শন, তেমনি রূপচাঞ্চল্যের ঝিলিক-মারা। পল্লীকবির সৌন্দর্যোত্তেজিত মনোভাব এইরূপ অসাধারণ শব্দপ্রণালী বাহিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

মৌলিক শব্দসম্ভার

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ তাহা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের সাধারণ, অসুন্দর অংশের প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণশক্তি কম তীক্ষ্ণ নহে। কেনারাম ডাকাতের চেহারা, যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট চোখ ও থপথপে চলনভঙ্গী, সাঁওতাল হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু নর-নারীর পলায়নত্রস্ততা

অকপট জীবনবোধের কাব্যচিত্র

প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিকতার কথাও এ কাব্যে যথাযথ স্থান পাইয়াছে। দুই একটি গ্রামজীবনসম্ভব উপমার সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য-সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবনক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল।

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে।
হরা (সরা) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে ॥

(সুবন্নেহা ও কবরের কথা)

অথবা

সতি-পুতেরার (সতীন-পুতের) লাগ্যা রহিল বসিয়া।
বগা যেমন চউথ বুজ্জ্যা পগারের ধারে।
সাধু হইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে ॥

(দেওয়ান মদিনা)

কোন মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির মনে এই জাতীয় উপমা উদিত হইত না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধুয়া ও বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী এই কাব্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু ভাবব্যঞ্জনার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে।

গাছের শোভা পাতা রে ভাই,
পাতার শোভা ফুল।
মাথার শোভা সিঁথার সিন্দুর
কানের শোভা দুল ॥

(সুরন্নেহা ও কবরের কথা)

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি ॥

(ভেলুয়া)

প্রভৃতি বাক্যযোজনারীতি লোকসাহিত্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকা বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি অসাধারণ সংযোজনা। বাংলা সাহিত্যে লোকগাথার অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক সাধনাতত্ত্বনির্ভর। জনসাধারণের চিরাচরিত ধর্মসাধনা নাথ-সাহিত্য ও বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভাব ও ভাষা অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সীমিত গোষ্ঠির গূহ্য ভজনতত্ত্ব অর্ধদুর্বোধ্য, রহস্যময় ভাষাকে অনেকটা অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যসংগ্রহে কোন নিগূঢ় সাধন-প্রণালী নহে, সর্বমানবিক হৃদয়াকুতিই অসাধারণ রূপচেতনা

ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সহযোগিতায় এক সজীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব-স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই স্বর্গের চাবি যে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান কবিগোষ্ঠীর হাতে নাই, আছে জনসাধারণের অতিসন্নিহিত পল্লী-কবির হাতে ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। যখন উপলব্ধি করা যায় যে এই চাবি হয়ত চিরকালের মত হারাইয়াছে তখন কবিত্বের একটা সর্বসাধারণের আয়ত্ত উৎস রুদ্ধ হওয়ার আক্ষেপ আমাদের সমস্ত আধুনিক প্রগতির মধ্যেও মনকে ক্ষুণ্ণ করে।

গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতচন্দ্র

১

পুরাণে চণ্ডী, কালিকা, অন্নপূর্ণা, অন্নদা একই মহাদেবীর নামান্তর হইলেও মঙ্গলকাব্যে তাঁহাদের রূপ ও মহিমা স্বতন্ত্র। কাজেই একই চণ্ডীমঙ্গলধারার পরিণতি হইলেও অন্নদামঙ্গলের সহিত চণ্ডীমঙ্গলের পার্থক্য উৎসমুখ হইতে সঙ্গো—উৎসারিতা, তীব্রস্রোতা, ক্ষীণকায়া, উপল-প্রতিহতা নির্ঝরিণীর সহিত সমতলে প্রবহমানা, বিপুলাকারা, শ্লথস্রোতা, সমুদ্রসন্নিহিতা স্রোতস্বিনীর স্বাতন্ত্র্যের মত গভীর ও ব্যাপক। দেবী-কল্পনায়, কাহিনীর সংগঠনে, কাব্যের মেজাজে ও উদ্দেশ্যে সব দিক দিয়াই চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান। পূজা আদায় করিবার জন্য সেই হিংস্রতা, ভয়ংকরত্ব ত্যাগ করিয়া চণ্ডীমঙ্গলের কোপনা চণ্ডী অন্নদামঙ্গলে অভয়া, অন্নপূর্ণা বরদা হইয়াছেন। কালিকার বাম করের নরমুণ্ড, খড়্গাই যেন ছিল চণ্ডীর আসল রূপ, চণ্ডীমঙ্গলে তিনি বামা; কিন্তু অন্নদামঙ্গলে দেবীর দাক্ষিণ্য-বরাভয়ের মধ্যে মাতার স্নেহ গলিয়া পড়িয়াছে। তিন শত বৎসরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, জগন্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যযুগের প্রান্তসীমায় ভারতচন্দ্র এই মাতৃমূর্তির বন্দনা গাহিয়াছেন। কাহিনীরচনা কোন দৈবাদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশকেই শিরোধার্য করিয়াছে। দেবীর সন্তুষ্টিবিধান বা মঙ্গলকামনা অপেক্ষা এইখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টি ও রাজপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়াছে। বস্তুত একটি রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাসরচনার উদ্দেশ্যে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত দৈবী মহিমার কাহিনী মিশাইয়া, নাগরসংস্কৃতিসুলভ একটি আদিরসপ্রধান প্রণয়োপাখ্যান যুক্ত করিয়া—বিদগ্ধ ভাষা-ছন্দের অভূতপূর্ব ঝংকারে যে মিশ্রকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই অন্নদামঙ্গল, অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদা-মঙ্গলের পার্থক্য

অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি খণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড—শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল; তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল।

প্রথম উপাখ্যানের মূল কাহিনী পৌরাণিক। সতীর দেহত্যাগ, পার্বতী-পরিণয়, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তিগ্রহণের বর্ণনা আছে: ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে হরিহোড়ের লৌকিক কাহিনী: দেবী হরিহোড়কে ছাড়িয়া অন্নপূর্ণার ঝাঁপি লইয়া কি ভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সে কাহিনী। দ্বিতীয় অংশটি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান। ভবানন্দের জবানী উপাখ্যানটি মানসিংহ শুনিয়াছেন। কালিকার উপাসনা করিয়া কিভাবে সুন্দর বিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে মশান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন—ইহাই উহার মূল কথা। তৃতীয় অংশটি অনেকখানি ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ আসিয়া কিভাবে ভবানন্দের সাহায্য পান এবং প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং কিভাবে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে 'রাজা-ই ফরমান' লাভ করেন, তাহাই এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

কাহিনী

অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র** [১৭০২ (১৭১১ ?)-১৭৬০]। ভারতচন্দ্রের জীবন অতি বিচিত্র। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্তমানে হাওড়া জিলার সীমান্তে ভূরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে। ভারতচন্দ্রের পিতা জমিদার ছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হন। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া ভারতচন্দ্র অবশেষে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন এবং মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সভাকবি-পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব লাভ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্র ছিলেন শব্দকুশলী কবি, সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বহু সংস্কৃত ছন্দ সার্থকভাবে বাংলায় প্রয়োগ করিয়া ও তদানীন্তন যাবনী-মিশাল নাগরিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের দেবচরিত্রের মহিমা অপেক্ষা মনুষ্যচরিত্রের জীবন্ত রূপায়ণ অধিকতর স্পষ্ট। রচনাভঙ্গি শাণিত, কিন্তু সর্বত্র মার্জিত রুচির পরিচয় নাই।

অন্নদামঙ্গলের কবি

২

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি এই ধারণাই তাঁহার সম্বন্ধে বলবৎ আছে। কিন্তু প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সহিত তাঁহার যোগ যৎসামান্য। তিনি কাব্যে যে যুগের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর মত সম্পূর্ণরূপে দেবভাবনির্ভর বা দৃঢ়নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসের যুগ নহে। কাজেই যদিও তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের বহিরবয়ব কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি উহার অন্তরাত্মা মধ্যযুগীয় ভক্তি ও বিশ্বাসের অন্ধ আতিশয্য হইতে স্বতন্ত্রগুণবিশিষ্ট। অষ্টাদশ শতকে বাংলার ধর্মসংশ্লেষক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত অনার্য দেব-দেবী হিন্দু দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা লোকের মনে সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। নূতন দেবতার অনুপ্রবেশে সমাজমনে যে উত্তেজনা ও তীব্র বিরোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কালক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। নবাগত দেবতারা প্রাচীন দেবমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন ও আর কোন নূতন পূজার দাবি সমাজ-শান্তিকে বিচলিত করে নাই। নূতন দেবতার পূজাবিধিপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের দৃঢ় অসম্মতি ও প্রতিরোধ যদি মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তবে ভারতচন্দ্রের কাব্য মোটেই মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী ভারতচন্দ্রে আসিয়া অতিপরিচিতা, কল্যাণময়ী সমাজাধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীর সহিত অভিন্না অন্নপূর্ণা বা অন্নদামূর্তিতে বিবর্তিত হইয়াছেন। যিনি এককালে অন্ত্যজ জীবনের সুড়ঙ্গপথে বা অন্তঃপুরিকাদের নিভৃত ব্রত-অর্চনার মাধ্যমে আমাদের ভক্তিরাজ্যসীমায় প্রবেশের কুণ্ঠিত আবেদন জানাইয়াছিলেন তিনিই প্রায় দুই শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে সাড়ম্বর পূজাবিধির প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া আমাদের ধর্মবোধের কেন্দ্রাধিষ্ঠিতা দেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। যিনি বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ও জনচিত্তের সংশয়ভীরু অভ্যর্থনার বাধা কাটাইয়া কোন মতে অনিচ্ছুক স্বীকৃতির আঘাটায় নৌকা বাঁধিয়াছিলেন তিনি এখন পূজাবেদীর ঠিক মাঝখানটিতে নিজ অভ্যস্ত আসনটি সর্বসম্মতিক্রমে অধিকার করিয়াছেন। চণ্ডী দেবীর দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার চণ্ডী-অংশ কালীর আপাত-নিষ্করুণ, রহস্যময় আচরণে ও উহার স্নিগ্ধ-অংশ জননী-রূপিনী দুর্গার বরাভয়দানকারী, অজস্র বাৎসল্য-প্রশ্রয়ে হিন্দু ধর্মচেতনার অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করিয়াছে ও ধর্মানুমোদিত ভক্তিসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাজেই

চণ্ডীদেবীর অন্নদা-মূর্তিতে বিবর্তন

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে দেবীর প্রশস্তি রচনা হইয়াছে তিনি ইতিমধ্যে সর্বসংশয়মুক্তরূপে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কুলদেবতায় পরিণত হইয়াছেন। আগন্তুক দেবতার প্রাথমিক প্রচারকার্যের তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

তথাপি ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার পূজাপ্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছেন তাহা কোন নবাগত দেবসম্মানপ্রত্যাশীর পক্ষেও যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। দেবখণ্ডে তিনি প্রথানুযায়ী গণেশবন্দনার পর যে সমস্ত দেবদেবীর—যথা শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌষিকী বা কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির—বন্দনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই হিন্দুর ঘরোয়া, পুরাণশাস্ত্রসম্মত দেবতা ও কোন নূতন দেবী-পরিচিতির ভূমিকারূপে তাহাদের অংশ ঠিক সুস্পষ্ট নহে। সর্বোপরি তিনি গ্রন্থারম্ভে অন্নপূর্ণার সুদীর্ঘ ও ভক্তিগদ্‌গদ বর্ণনার দ্বারা কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে ইঁহার নূতন পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইনি ইতিপূর্বেই স্বপ্রতিষ্ঠ। তাহার পর সতীর দক্ষালয়যাত্রা ও দেহত্যাগ, শিবানুচর কর্তৃক দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, শিবের ধ্যানভঙ্গ-চেষ্টায় কামের ভস্মসাৎ হওয়া ও রতির বিলাপ, হিমালয়-কন্যা উমার সহিত শিবের পুনর্বিবাহ, শিবের সাংসারিক অভাব ও তজ্জন্য শিবদুর্গার কোন্দল প্রভৃতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ ঘটনাবিন্যাসের অনুসরণ করিয়াছেন। গৌরী যখন শিবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃগৃহগমনের উদ্যোগ করিতেছেন তখনই জয়ার পরামর্শে তাঁহার অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে নব আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ✓কবির অন্নপূর্ণা-পরিকল্পনার নূতনত্ব এইখান হইতেই পরিস্ফুট। অন্নপূর্ণা ত্রিভুবনের অন্ন হরণ করিয়া শিবের ভিক্ষা-সংগ্রহকে ব্যর্থ করিয়াছেন ও শিবকে শেষ পর্যন্ত তাঁহারই শরণাগত হইয়া নিজ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। ভূরিভোজনের পর অকিঞ্চন শিব অন্নপূর্ণার নিকট উল্লাস-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কাহিনী-বিন্যাসে পূর্বানুসৃতি ও স্বকীয়তা

ইহার পর কাশীখণ্ডের অনুসরণে ভারতচন্দ্র কাশীতে শিবের অধিষ্ঠান ও বিশ্বকর্মা কর্তৃক অন্নপূর্ণার মন্দিরনির্মাণ বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং শিব অন্নদাপূজার প্রথম সাধক ও অন্নদা-মহিমার প্রথম উদ্‌গাতা। শিবের দৃষ্টান্ত-অনুসরণে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য সমস্ত দেবদেবী অন্নপূর্ণার প্রসাদভিক্ষায় তপশ্চর্যায় রত হইয়াছেন। অন্নপূর্ণার সর্বাতিশায়ী মহিমা ও তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠতা সমস্ত দেবসমাজ কর্তৃক অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা বরদানের পূর্বে সমস্ত দেবতাকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত

কাশীখণ্ডের অনুসরণ ও অন্নপূর্ণা-মূর্তি

করিয়াছেন ও দেবতারা এই সুখাদ্যসম্ভারে অভিভূত হইয়া বরপ্রার্থনার কথা ভুলিয়াছেন। বামহস্তে রত্নময় পানপাত্র ও দক্ষিণহস্তে সঘৃত পলান্নপূর্ণ রত্নহাতা এই নবকল্পিত অন্নপূর্ণামূর্তিব প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। অন্নপূর্ণাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভোজনবিলাসমাহাত্ম্যই উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে যে ধর্মবিরোধের একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্থান আছে, তাহা অন্নদামঙ্গলে ব্যাসদেবের আচরণে পূর্ণ হইয়াছে। ব্যাসের মুহুর্মুহু উপাস্য দেবতার পরিবর্তন, হবি ও হরে ভেদবুদ্ধি ও অভিমানান্ধ হইয়া উভয়েরই প্রতি আনুগত্যত্যাগ, শিবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দ্বিতীয় কাশীপ্রতিষ্ঠাসংকল্পের হাস্যকর ব্যর্থতা, ক্ষুৎপীড়িত ব্যাসকে অন্নপূর্ণার ভোজ্যদান, গঙ্গার সহিত ব্যাসের বাদানুবাদ ও শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাবেশিনী অন্নপূর্ণা কর্তৃক ব্যাসের ছলনা—এই আখ্যানাংশটি সাধারণ মঙ্গলকাব্যের ধর্ম-সংঘর্ষমূলক যে প্রত্যাশা তাহা পূর্ণ করে। প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যে যে ঘটনাবলী জনসমাজে প্রচলিত লোককল্পনা হইতে গৃহীত হয়, এখন তাহা অর্বাচীন পুরাণ হইতে আহৃত হইয়াছে।

ব্যাস-চরিত্রে ধর্ম-বিরোধের আভাস

কিন্তু সর্বজনবন্দিতা, জগতের মূল শক্তি এই মহাদেবী নিতান্ত অনভিজাত দেবতার ন্যায় অশোভন ও অনাবশ্যক পূজালোলুপতা দেখাইয়াছেন। তিনিও পূজাপ্রচারকল্পে সেই মঙ্গলকাব্য-প্রসিদ্ধ, নর-নারীরূপে অবতীর্ণ, শাপভ্রষ্ট দেবতার সহায়তাই বারে বারে গ্রহণ করিয়াছেন। হরিহোড় ও ভবানন্দের মত সামান্য মানুষকেও তিনি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কাল্পনিক কালকেতু, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, লখীন্দর, বেহুলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে অভিশাপজনিত স্বর্গচ্যুতির দৈব-কল্পনা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য তাহা হরিহোড় ও ভবানন্দের মত সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির পক্ষে একেবারে বে-মানান। অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের যে সহজ পটভূমিকা পূর্বতন মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়, পরবর্তী যুগের ইতিহাস ও সমাজের বাস্তব পরিবেশে তাহা একেবারেই অনুপস্থিত। দেবমহিমাঘোষণার কাব্যহিসাবে অন্নদামঙ্গলের এইখানেই কেন্দ্রীয় দুর্বলতা। ভারতচন্দ্রের পরিবার-চিত্রাঙ্কনের নিরেট বস্তুনিষ্ঠতা দেবতার আবির্ভাবের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কালকেতু ও হরিহোড় উভয়েই দরিদ্রসন্তান; কিন্তু কালকেতুর বন-বাদাড়ে ঘোরা শিকারী জীবন ও শিকারলব্ধ পশুমাংস-

ভারতচন্দ্রে অলৌকিক দৈব-মহিমা-ঘোষণার অসুবিধা ও অবিশ্বাস-যোগ্যতা

বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকার্জন, তাহার বন্য সরলতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা সাধারণ সমাজজীবন হইতে অনেকটা বিবিক্ত বলিয়া সেখানে চণ্ডীর আবির্ভাব অসম্ভব ঠেকে না। পক্ষান্তরে হরিহোড় সমাজজীবনের সমস্ত জটিলসূত্রবিধৃত বলিয়া তাহার প্রতি অন্নদার অহেতুক কৃপা ঠিক তাহার জীবনযাত্রাব সহিত সঙ্গতি লাভ করে নাই। যে ভবানন্দ দুই স্ত্রীব মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত, তাহার এই ঘোরতব সাংসাবিকতাব নিবেট বুননির কোন্ ফাঁক দিয়া দেবীর অনুগ্রহ তাহাব উপব বর্ষিত হইয়াছিল তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পাবি না। মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও অন্নপূর্ণার অনুগ্রহে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে মানসিংহ-বাহিনীব রক্ষা দেবমহিমাপ্রচাবের অনুকুল ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মনসার সর্পবাহিনী কর্তৃক উদ্বাস্তু অজ্ঞাত-পবিচয় কাজীর দুরবস্থা আমাদেব সঙ্গতিবোধকে পীড়িত করে না। কিন্তু স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর যে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অন্নদার ভূতপ্রেতগোষ্ঠীর দ্বাবা উৎপীড়িত হইয়া অন্নদার পূজা কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ইহা আমাদের বিশ্বাসেব সীমা ছাড়াইয়া যায়। সমাজেব প্রান্তিক ও অনেবটা অসংসক্ত জীবনে দৈব বহস্যেব স্ফুরণ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজের অতিবাস্তব প্রতিবেশের কঠিন মৃত্তিকায দেবলীলা অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায় না। মধ্যযুগের বাস্তব জীবন কল্পনাকুহেলিজড়িত ও অতিপ্রাকৃতের প্রতি সহজ বিশ্বাস-পুষ্ট। ভারতচন্দ্রেব জীবনবোধ এত প্রখব-সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ যে সেখানে ভক্তির প্রকাশই অনেকটা শিল্পচাতুরীবিকৃত; সুতরাং এই অতি-প্রত্যক্ষ বাতাববণে দেবীর পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ও সুদীর্ঘ লীলারহস্য-উদঘাটন খানিকটা সামঞ্জস্য-হীন মনে হয়। এক ঈশ্বরী পাটনীর নিকট দেবীর আচবণ, ঈশ্বরীর বরপ্রার্থনা ও ঈশ্বরীর বরদান দেবমানবের সহজ সম্পর্কের দ্যোতকরূপে প্রতিভাত হয়। ভারতচন্দ্রের মনীষা এখানে যেন সরল ভক্তি ও অকৃত্রিম স্নেহের সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী স্বতন্ত্র পর্যায় হইতে আহৃত হইয়া গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই অবৈধ ও অশালীন প্রাকৃত প্রেমের আখ্যানটি শতাব্দীব কক্ষপথে আবর্তন কবিতে করিতে হঠাৎ দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের অঙ্গ-সংসক্তি লাভ করিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই ভক্তবৎসলা দেবী অন্নদা নহেন, তিনি অন্নদার চণ্ড প্রতিরূপ কালিকা। যদিও অন্নপূর্ণা মূলতঃ ভোগপ্রাচুর্যদাত্রী দেবী, তথাপি বৈরিনির্যাতনে তিনি কালিকায় ন্যায়ই

চণ্ডনীতির পক্ষপাতিনী ও ভৌতিক সেনাবাহিনীর নেত্রী। বিদ্যাসুন্দরে আদিরসের নিকট ভক্তিরস গৌণ—দেবী নায়ক-নায়িকাকে কামকলাজালবিস্তারের অকুণ্ঠিত অবসর দিয়া স্বয়ং অন্তরালবর্তিনী হইয়াছেন। তিনি কেবল নায়কের চরম বিপদে তাহার স্তব-স্তুতিতে বিগলিত হইয়া তাহার রক্ষার্থ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর মঙ্গলকাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, উহার বিষয়-পরিধির অতিবিলম্বিত সম্প্রসারণ। ভক্তিবাদের অতি-বিস্তৃতির যুগে ইহা যে কামকেলির রুচিবিগর্হিত বর্ণনাকেও নিজকুক্ষিগত করিয়াছিল ইহা তাহারই নিদর্শন। ঐশী প্রশ্রয় যে ভক্তের গর্হিত, নীতিহীন আচরণ পর্যন্ত প্রসারিত, কালিকা-সাধকের যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন বা অনিন্দিত আচরণের প্রয়োজন হয় না অন্নদামঙ্গলের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি তাহাই প্রমাণ করে।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি অপ্রাসঙ্গিক

৩

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নপূর্ণা দেবীর এই রূপান্তর সাধনের পিছনে কোন তীব্রভাবে অনুভূত যুগ-প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল কি না তাহাই এখন বিচার্য। কাশীতে অন্নপূর্ণামন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও এই ভোগপ্রাচুর্যবিধায়িনী দেবীর প্রশস্তি-রচনার কি কোন বিশেষ যুগঘটনাসম্ভব উপলক্ষ্য ছিল? ঈশ্বরী পাটনীর যে অতি সরল, ন্যূনতম বর-যাচ্ঞা—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে—তাহার পিছনে কি কোন নবজাত আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত অনুভব করা যায়? ইহা কি বর্ধমান ভোগলিপ্সার নিদর্শন, না স্বল্পতম জীবনপ্রয়োজন মিটাইবার আকূতি? বাঙলার জনসাধারণ কি হঠাৎ অন্নের কাঙাল হইয়া উঠিয়াছিল, না রাজসিক ভোগাড়ম্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল? অচিরকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বর্গীর হাঙ্গামা বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে এমন গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছিল যে জনপ্রবাদ ছড়ার মাধ্যমে এই বিপর্যয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা নয়, টিয়াপাখীতে ধান খাওয়ার তুচ্ছ অজুহাত খাজনা দিবার অক্ষমতার কারণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় যেন টিয়াপাখী বা বুলবুলি অনুল্লেখ্য বর্গী-দস্যুর রূপক-অভিধারূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরী পাটনী যে শাক-ভাতের পরিবর্তে দুধ-ভাতের প্রার্থনা জানাইয়াছে ইহাতে মনে হয় যে জনসাধারণের জীবনমান একেবারে নিম্নতমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। আর অন্নপূর্ণা দেবী শিব হইতে আরম্ভ করিয়া

অন্নপূর্ণারূপকল্পনায় যুগপ্রয়োজনপ্রেরণা

ভবানন্দ মজুমদার পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত শ্রেণীর ভক্তবৃন্দকে যেরূপ অকৃপণ হস্তে নানা জাতীয় সুখাদ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা উপবাসক্লিষ্ট নরনারীর চিত্র তুলিয়া ধরে না। অথবা মনস্তত্ত্বের বিপরীত রীতি অনুসারে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার মত অনাহাবজীর্ণ মানুষের কল্পনাই বিপুল ও বিচিত্র খাদ্যসম্ভারের তালিকা রচনা করিয়া বাস্তব অভাবজ্বালার কৃত্রিম উপশম-প্রয়াসে আত্মবিস্মৃতি খোঁজে। ভোজনরসিকতা বাঙালীর চিরন্তন প্রাণধর্ম। শুধু মঙ্গলকাব্যে নয়, রামায়ণ-মহাভারতেও ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিপূর্বে অন্নের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকল্পনা বা তাঁহার নিকট অন্নপ্রার্থনা কোন কবিমন বা কাব্যবীতির বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহাতে হয়ত দেবমহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু একটি সার্বভৌম পার্থিব প্রয়োজনের অতি-নৈকট্য এই দেবতাকে আমাদের বিশেষ প্রিয় ও আমাদিগকে তাঁহার উপর বিশেষ নির্ভরশীল করিয়াছে। একদিকে ঐশ্বর্য-ও-প্রতিষ্ঠাকামী মানসিংহ-ভবানন্দ, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত দেব শিব, ঋষি ব্যাস ও জনসাধারণেব প্রতিনিধি ঈশ্বরী-পাটনী ও হরিহোড়—সকলেই অন্নপূর্ণার পূজাবিধি-অনুষ্ঠানে মিলিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের মনোভাবে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রথমতঃ তাঁহার কৌতুকরস, বাস্তবচেতনা ও সুমার্জিত শিল্পবোধ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সরল, নির্বিচার ভক্তিপ্রবণতায় সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মঙ্গলকাব্যরচয়িতাদের শিথিল-এলায়িত রচনাভঙ্গী, ভক্তিবৃত্তিচরিতার্থতার মননহীন আবেগ, গ্রাম্যসংস্কারপ্রবণতা ভারতচন্দ্রে দেখা যায় না। তিনি দেবতার স্তব-স্তুতিতে আত্মহারা হন নাই, বৈদগ্ধ্যপ্রধান মননক্রিয়া তাঁর ভক্তি-আবেগকে দৃঢ় অর্থবন্ধনে ও সুনির্বাচিত শব্দশৃঙ্খলে সংযত করিয়াছে। প্রাচীন মঙ্গলকবিদের মধ্যে একমাত্র অসাধারণ ব্যতিক্রম মুকুন্দরাম সুপ্রযুক্ত শিল্পবোধের সঙ্গে পল্লীকবির মানস স্নিগ্ধতার সমন্বয় করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার শিল্পকৃতি কখনই উগ্র হইয়া দেখা দেয় নাই। তাঁহার সমগ্র রচনা ও মনোভঙ্গীর সহিত ইহা একাত্ম হইয়াছিল, অতিপ্রসাধনে পাঠকের চমকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ভারতচন্দ্রের অতিরিক্ত কারুকার্য ও ধ্বনি ও—শব্দসংযোজনা-কৌশল এক হিসাবে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যবিরোধী। মঙ্গলকবি প্রথমে ভক্ত, পরে কবি; তাঁহার কবিত্ব ভক্তিকে অতিক্রম করিয়া উগ্রভাবে প্রকট হইলে সাধারণের সহিত তাঁহার সহজ সংযোগ ছিন্ন হইবে। যে তীর্থযাত্রী মন্দির-

ভারতচন্দ্রের রীতিমঙ্গল কাব্যের ঐতিহ্যবিরোধী

অঙ্গনে সকলের সহিত ধূলায় গড়াগড়ি দিবে তাহার মহামূল্য রাজবেশ যেমন অশোভন, তেমনি যে কবি জনপ্রিয় দেবতার কথা সর্বসাধারণকে শোনাইবেন তাঁহার কাব্যাড়ম্বর তাঁহার সহজভূমিকাবিরোধী। ভারতচন্দ্র রাজসভায় বসিয়া রাজদরবারের অলঙ্কৃত রীতিতে নূতন মঙ্গলদেবতার গান গাহিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভক্তিমাত্রসম্বল, নিরক্ষর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিল কি না সে বিষয়ে তিনি উদাসীন।

তথাপি মঙ্গলকাব্যের জন্মপরিবেশ ও আত্মার সহিত সংযোগ হারাইয়াও তিনি ইহার বাহ্যরীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন; পুনঃ পুনঃ স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করিয়াছেন; যাঁহার মর্তে নামার কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁহাকে বিনা কারণে মর্তের ধূলিতে অবতরণ করাইয়াছেন; এমন কি ইতিহাসবিশ্রুত মানসিংহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌কেও তাঁহার মহিমাব নিকট নতশির করিয়াছেন। সর্বোপরি দেবীর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে যৌবনরূপোন্মত্ততার অনভ্যস্ত কক্ষপথে ভ্রমণ করাইয়াছেন। প্রতিভাশালী শিল্পী-কবির হাতে কাব্যকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু দেবপরিকল্পনা ম্লান হইয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা লইয়া মঙ্গলকাব্যের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিয়াছেন। পাঁচশতাব্দীব্যাপী জীবনযাত্রার পর মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্রের শিল্পকুশল রচনায় মর্মর-সমাধি লাভ করিয়াছে।

বাহ্যরীতির অনুকরণ ও দেবচরিত্রের দুর্গতি

৪

এইবার ভারতচন্দ্রের কাব্যকুশলতা ও শিল্পকৃতির কিছু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। তিনি নানা অভিনব প্রবর্তনার সাহায্যে মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুকরস ও পরিহাসকুশলতা নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি দেবতাকে লইয়া যত খুশী রঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার দেবসমাজ একটি বিরাট হাস্যরঙ্গভূমি। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবসচেতন মন ভক্তির আবেশে ঘুমাইয়া পড়ে নাই, সব সময়ই সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছে। আবার ইহার সঙ্গে কখনও কখনও তিনি এরূপ গভীর দার্শনিক তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছেন, যাহা অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মঙ্গলকবির দুরধিগম্য। তাঁহার যে সমস্ত শাণিত মন্তব্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ তাহাদের উৎস অবিমিশ্র ভক্তিসাধনা নহে, সর্বতোমুখী জীবনাভিজ্ঞতা।

কৌতুক ও হাস্যরস

তিনি অভিজাত জীবনের সমস্ত অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, ও মঙ্গলকাব্যের বিসদৃশ পরিবেশে তথা বিদ্যাসুন্দরের কামক্রীড়ার অনুকূল আবেষ্টনে ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরসিকতার সহিত ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার কামকেলি-বর্ণনা অক্ষম আক্ষরিকতার স্থূল অবলম্বন স্বীকার করে নাই; ইহা কটাক্ষ-কৌতুকে, তির্যক ব্যঞ্জনায়, অব্যবহিত অর্থের অন্তরালশায়ী বিদগ্ধজনবোধ্য চটুল ইঙ্গিতে পাঠকের মনকে সূক্ষ্মভাবে নাড়া দিয়াছে ও ইন্দ্রিয়লালসা ও বুদ্ধি-বৃত্তির যুগপৎ তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছে। ইহার কুরুচি অনস্বীকার্য; কিন্তু কুরুচিকে আবৃত করার আশ্চর্য কৌশল, স্থূল তথ্যের অন্তর্নিহিত ভাবের দ্যোতনা-নৈপুণ্য লেখকের অসাধারণ প্রকাশশক্তিরও পরিচয় বহন করে। জৈব সম্ভোগের এমন কাব্য-রূপান্তরের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আর নাই, বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশী নাই।

স্থূল কুরুচির ও অনন্য-সাধারণ শিল্পকৃতি

ভারতচন্দ্র যেখানে প্রথা অনুবর্তন করিয়াছেন, সেখানেও তাঁহার মৌলিকতা দুর্লক্ষ্য নয়। রূপবর্ণনাতে তিনি প্রথাজীর্ণ উপমা-অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়োগকৌশলে এই অভ্যাস-ম্লান অলঙ্কৃতি এক নূতন বিস্ময়-চমকে ক্ষণদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুপ্রাচীন উপমার উপকরণসমূহ—চাঁদ, পদ্ম, সিংহ, হস্তী, মৃগ, মুক্তা, বিম্বফল প্রভৃতি—তাঁহার কল্পনার সজীবতায় ও উল্লেখের সাংকেতিকতায় আমাদের কাছে নূতন অর্থে প্রতিভাত হয়। এই অতি-পরিচিত-উপমানশব্দগুলি নির্জীব নয়, উহারা যেন এক আকস্মিক প্রাণচেতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া উপমেয় রূপকে গতানুগতিকতার জড়তামুক্ত রসোচ্ছলতায় তরঙ্গিত করিয়াছে। ইহা অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কবির নিদর্শন নহে; কিন্তু যে কবি জড়প্রায় পদার্থের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব সঞ্চার করিতে পারেন তাঁহার কবিত্বশক্তি উপেক্ষণীয় নহে।

প্রথাজীর্ণ উপমান-প্রয়োগে মৌলিকতা

ভারতচন্দ্রের ছন্দোনৈপুণ্য অসাধারণ। তিনি নানা নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া বাংলা কাব্যের উপর বিচিত্র গতিশীলতা অর্পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর পর যে গীতিকবিতার সুর ও ছন্দোবৈচিত্র্য বাংলা কাব্যে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্র সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার আখ্যানের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গীতিকবিতার সংযোজনা তাঁহার গীতি-প্রাণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য ভারতচন্দ্রের প্রভাবে অনুপ্রাণিত। এই গীতিকবিতার মধ্যে কোন গভীর আবেগ-অনুভূতি নাই, কিন্তু সাধারণ ভাবের উপস্থাপনা-লালিত্য ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে

অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য

উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আধুনিক যুগে এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া ছন্দসম্বন্ধীয় নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ বিশেষ কেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের সাহসিকতা তাঁহার রুদ্র ও বীভৎসরস-বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ধ্বন্যনুরূপ শব্দের প্রয়োগদক্ষতায় বিশিষ্ট ভাবদ্যোতনাকার্যে তিনি সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধবর্ণনা, শিবের ভূত-প্রেতের দ্বারা দক্ষযজ্ঞভঙ্গের বর্ণনা, ঝটিকাবিধ্বস্ত মানসিংহ-বাহিনীর দুর্দশা-বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দপ্রয়োগে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইসব অর্থহীন, ধ্বন্যনুকারী শব্দপ্রয়োগের বিশেষ দৃষ্টান্ত ভারতপূর্ব বাংলা কাব্যে বিরল। একঘেয়ে পয়ার ও ত্রিপদীর স্তিমিত, নিদ্রাতুর ছন্দে লেখা বাংলা কবিতায় এই মানস উত্তেজনা ও ত্বরিতগতিপ্রবর্তন ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার নিদর্শন। হয়ত এই প্রয়োগের মধ্যে কিছুটা কৃত্রিমতা ছিল ও এই প্রয়োগফলও ভাষা-শ্রুতিতে স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তাহাতে ভারতচন্দ্রের উদ্ভাবন-কৃতিত্ব কমে না।

ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দের প্রয়োগ-দক্ষতা

ভারতচন্দ্রের প্রধান ত্রুটি হইল তাঁহার কাব্যে ভাবগভীরতার ও কল্পনা-সমুন্নতির অভাব। তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ শোভার দিকে এত বেশী মনোযোগ দিতেন, যে ভাবের সূক্ষ্মতা ও আবেগের গভীরতার দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল না। দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কনে তিনি সুলভ কৌতুকরস ও আলঙ্কারিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। উন্নত, গম্ভীরভাব যে সুনিয়ন্ত্রিত মিতভাষিতার দাবি করে তাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। রতিবিলাপ ও সুন্দরের মশানে কালীস্তবের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস-উদ্দীপনে তিনি ব্যর্থই হইয়াছেন। তাঁহার রসব্যঙ্গপ্রবণতা তাঁহার উচ্চতর কাব্যফলপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। রাজসভার ফরমায়েস, স্থূলরুচি ব্যক্তিবৃন্দের মনোরঞ্জন ও প্রাচীন প্রথার অনুসৃতি তাঁহার অন্তরপ্রেরণার স্বচ্ছন্দ স্ফুরণের ও মন্ময় কল্পনার বিকাশের দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বহুভাষাজ্ঞান ও বহুসাহিত্যে অধিকারও তাঁহার অনুভূতিকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত ও উহার কেন্দ্রসংহতি ও অন্তর্মুখীনতাকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল। যে কবি লিখিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার ভাষাদর্শ সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন ও বাদশাহ্ ও মানসিংহের সংলাপ যাবনিক ভাষায় লেখা উচিত কি না সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করিতেন তিনি যে কবিকল্পনার উচ্চতম বিকাশ হইতে বঞ্চিত হইবেন তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নহে।

ভাবগভীরতা ও কল্পনা-সমুন্নতির অভাব

তাঁহার যুগ অবক্ষয়ের যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই যুগে ধর্মাদর্শে খানিকটা শিথিলতা ও অর্থনীতিতে কিছুটা ভাঙ্গন ধরিয়াছিল ইহা ঠিক। কিন্তু যে রুচিহীনতা ও অশ্লীল বিষয়ের অবতারণার জন্য ভারতচন্দ্রকে অবক্ষয়ের চিহ্নাঙ্কিত করা হয়, তাহা তাঁহার যুগের বিশেষত্ব নহে। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী উদ্ভাবন করেন নাই; এবং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যে অন্যান্য রাজসভার তুলনায় বিশেষ ভাবে কলুষিতরুচি ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর—কাহিনীর আরম্ভ ষোড়শ শতকে; ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরীগণ যে কামকলাবিষয়ে অধিকতর সংযতচিত্ত ও বিশুদ্ধরুচি ছিলেন তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। রামপ্রসাদের মত বিশুদ্ধ ধর্মভাবপ্রবণ, ভক্ত কবিও বিদ্যাসুন্দর কাহিনী-বর্ণনায় একই প্রকার স্থূল রুচি ও ইন্দ্রিয়লালসাপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী কোন কবির স্বোপার্জিত সম্পত্তি নহে, অষ্টাদশ শতকের সমস্ত কবিরই সাধারণ উত্তরাধিকার। হীরা-মালিনী বহুশতাব্দীবাহিত কুট্টনী-সম্প্রদায়ের শেষ ও শিল্পস্মরণীয় প্রতিনিধি, ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচিবিকারের নিদর্শন নহে। সুতরাং এবিষয়ে বেচারা ভারতচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা পক্ষপাতমূলক বিচার। ভারতচন্দ্রের প্রকৃত অপরাধ হইল যে যে-বিষয়ে সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেখানে তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র কবি যিনি কামসম্ভোগকে কাব্যরমণীয় করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে অন্য কবির কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ফল এই দাঁড়াইল যে আমরা অক্ষম কবিপ্রয়াসকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিভার অসাধারণ সাফল্যই আমাদের নিকট অমার্জনীয় অপরাধরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যবিচারে তাঁহার বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গীর অশ্লীলতা যাহাতে আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত না করে সে দিকে সাবধান হওয়াই বোধ হয় আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

কুরুচি ও অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত নহে, যুগগত ত্রুটি

পঞ্চদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ

১

ইউরোপে অষ্টাদশ শতক সত্য সত্যই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ ও ভবিষ্যতের বীজও উহার মধ্যে অঙ্কুরিত। ইংরাজি সাহিত্যে উহা এলিজাবেথীয় ও ষ্টুয়ার্টবংশীয় রাজতন্ত্রযুগের ক্ষীয়মান সংস্কৃতির ভস্মস্তূপ হইতে নবজীবনারম্ভের উদ্বোধন-লগ্ন। যে কল্পনার আতিশয্য ও ভাব-ভাবনার কৃচ্ছ্রসাধন সপ্তদশ শতকের শেষ প্রান্তে আসিয়া নিষ্প্রাণ প্রথায় নিঃশেষিত হইয়াছে তাহারই সমাধির উপর যুক্তিবাদনির্ভর, বাস্তবভিত্তিক, আদর্শস্বপ্নবিমুখ এক নূতন জীবনবোধের শিল্পসদন নির্মিত হইয়াছে। জাতি যেন কল্পলোকের সৌন্দর্যস্বপ্ন ও আবেগোচ্ছল জীবনা-কাঙ্ক্ষা হইতে প্রতিহত হইয়া কাজের সংঘর্ষময়, আঘাত প্রত্যাঘাতে তীক্ষ্ণকণ্টকিত জগতে নামিয়া আসিয়াছে। একদিকে নূতন দর্শন বিজ্ঞান জাতির মনকে বস্তুনিষ্ঠ করিয়াছে; অন্য দিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ঝটিকা উদ্দাম হইয়া উঠিয়া তাহার কোমল বৃত্তিগুলিকে ভূলুণ্ঠিত ও উগ্র আক্রমণাত্মক মনোভাবকে প্রখর করিয়া তুলিয়াছে। বহির্বাণিজ্যের হিরণ্যচ্ছটা ম্লান হইয়া উহার পিণ্ডদেহই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—নূতন দেশ-আবিষ্কারের বিস্ময়কৌতূহলকে হটাইয়া বিজিগীষার অধিকারপ্রতিষ্ঠা ও লালসার হিংস্র জ্বালা মানব মনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই পরিবর্তিত প্রতিবেশে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এই নবযুগের উপযোগী হইয়াছে। ইহার উপর সামাজিক মনের, বিজ্ঞানচিন্তার, রাজনৈতিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ-দলাদলির, জীবনের লঘু ও চটুল বিকাশগুলির, যুক্তিসর্বস্ব দর্শন-ভাবনার একটি পুরু ধূলিময় আস্তরণ জমিয়াছে। ইহার মনোজগতের নিয়ামক, বেকন, হব্‌স, লক্ প্রভৃতি যুক্তিবাদী দার্শনিক-মণ্ডলী; ইহার কবি ড্রাইডেন ও পোপ প্রমুখ ব্যঙ্গবিদ্রূপনিপুণ ও আক্রমণাত্মকমনোবৃত্তিসম্পন্ন রচনাকার; ইহার ঔপন্যাসিক সুইফট-রিচার্ডসন-ফিল্‌ডিং প্রভৃতি শ্লেষতীক্ষ্ণ, তির্যকদর্শী জীবন-পর্যবেক্ষক, ইহার নাট্যকার শেরিডান ও গোল্‌ডস্মিথের ন্যায় চটুল হাস্যরস ও কৌতুকপূর্ণ আচরণ-অসঙ্গতির পরিবেশক ও

অষ্টাদশ শতকের ইংরাজি সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠা

সর্বপ্রকার অসাধারণত্বের প্রতি প্রতিকূল

ইহারুরুচি নির্দেশক ও সাহিত্য-ব্যাখ্যাতা জন্‌সনের মত সাধারণ জ্ঞান ও শিষ্ট রীতির উদ্‌গাতা।

তথাপি অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডেব ভাবাকাশ নূতন চেতনা-কণিকায় আন্দোলিত ও নব জীবনদর্শনের প্রেরণায় তাৎপর্যময় হাওয়া-বদলের জন্য প্রতীক্ষমান। সাহিত্যে এই যুগব্যাপী মানস চাঞ্চল্যের যথাযথ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। জাতির মন মোড় ফিরিতেছে ও এই মোড় ফেবার উদ্যোগ যেমন সাহিত্যসৃষ্টিতে তেমনি চিন্তা-রাজ্যে একটা তবঙ্গ তুলিয়াছে। এই পরিবর্তন কেবল সাহিত্যশিল্পে সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত জাতীয় চেতনায় সমভাবে পবিব্যাপ্ত। সমকালীন ফরাসী সাহিত্যে এ লক্ষণ আরও সুপবিস্ফুট। সেখানে শতকের প্রথম পাদে চতুর্দশ লুইএর অতিকেন্দ্রীভূত একনায়কত্ব ও তাহার অন্তর্জীর্ণতার পূর্বাভাসরূপ ছোট-বড় ফাটলের আবির্ভাব ও আভ্যন্তরীণ বিপ্লববহ্নির সঙ্কেতবাহী ধূম্র-উদ্‌গীরণ। সাহিত্যেও এই নিয়ম-তান্ত্রিকতার কেন্দ্রীয় শাসনে ব্যক্তি-মানসিকতার কঠোর অবদমন। তাহার পবই রুসো, ভলটেয়ার ও কোষগ্রন্থকারগোষ্ঠীর (Encyclopaedists) রচনায় এই অতিশাসিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও সাহিত্যনীতির তলদেশে যে বিপ্লবের বিস্ফোরণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল তাহার অগ্নিগর্ভ প্রকাশ। ফরাসী বিপ্লবের যজ্ঞানল হইতে উদ্ভূত সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার যে মহামন্ত্র সমগ্র বিশ্বের আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বমানবের নবজীবনের সূচনা করিল তাহা এই যুগেরই অবদমিত ক্ষোভ ও অভীপ্সা-সঞ্জাত। অষ্টাদশ শতকের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে নব ভাবশিশু জন্ম পরিগ্রহ করিল তাহা পুরাতন জীর্ণ জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ও সাহিত্যে আত্মভাবপ্রধান, ব্যক্তিকল্পনাশ্রয়ী, যুক্তি-অতিসারী দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের নবদিগন্ত-উন্মোচনকারী এক রোমান্টিক সৌন্দর্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল।

ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপীয় রোমান্টিকতার সূচনা

আবার যখন কালের অমোঘ নিয়মে এই রোমান্টিক ভাবকল্পনা যুগমানসের সহিত সহজসম্পর্কচ্যুত হইল, তখন অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা, উহার বস্তুনিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধিৎসা বিংশ শতকের জীবনবোধ ও সাহিত্যসৃষ্টিতে পুনরাবির্ভূত হইল। এইরূপে কালচক্রের আবর্তনে ম্যাথিউ আর্ণল্ড যাহাকে "অপরিহার্য" আখ্যা দিয়াছিলেন সেই অষ্টাদশ শতক মানবমনের একটি শাশ্বত ভাবপ্রেরণারূপে ঋতুপর্যায়ের ন্যায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া, কিন্তু অস্খলিত শৃঙ্খলায় অবতীর্ণ হইতে থাকে।

যুক্তিবাদের পুনরাবর্তন

২

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে যে কোনও দেশে সাহিত্যের অন্তঃপ্রকৃতি-পরিবর্তনের গভীরতা উহার মানস প্রস্তুতির সর্বাত্মকতারই ফল। যে দেশে সমাজচেতনায় কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন জাগে নাই, সেখানে সাহিত্যের নবরূপ যদি কোন কারণে আসে, তাহা বাহিরের শিল্পকলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্তঃপ্রকৃতির গভীর পর্যন্ত মূল বিস্তার করে না। বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকীয় পরিবর্তন পাশ্চাত্ত্য দেশের ছন্দানুসারী নয় কেননা বাঙলা দেশের সমাজচেতনায় কোন মৌলিক রূপান্তর দেখা যায় নাই। তথাপি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারা কালপ্রভাবে কতকটা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ও ইহার ফলেই মানসলোকের কক্ষ-পরিক্রমায় কিঞ্চিৎ নূতন আকর্ষণ অনিবার্যভাবেই অনুভূত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে মুরশিদ কুলি খাঁর কার্যতঃ বাংলার স্বাধীন অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠা ও তৎপ্রবর্তিত নূতন রাজস্বব্যবস্থা জমিদার ও প্রজার বাস্তব অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। ইহারই জন্য সাধারণ প্রজার মনে বহুশতাব্দীপ্রচলিত দেবানুকূল্য-প্রভাবিত জীবনবাদের মধ্যে ইহমুখীনতার স্পষ্টতর চেতনার প্রবর্তন সাধিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের বাংলার সামাজিক পটভূমি

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ডিহিদারের অত্যাচারজর্জরিত কবি মুকুন্দরাম তাঁহার বেদনাবিমূঢ় হৃদয়টিকে দুর্ভাগ্যঝটিকা দ্বারা দূরোৎক্ষিপ্ত অর্ঘ্যকুসুমের ন্যায় চণ্ডীদেবীর চরণাশ্রয়ে সমর্পণ করিয়া জীবনে স্বস্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সুখশান্তি ও অখণ্ড দৈব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার কালকেতুর নবনির্মিত নগরীবিন্যাস ও জাতিধর্মনিবিশেষে সমদর্শী ও সমৃদ্ধ সমাজপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বিকশিত হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার স্বর্গ খুব দূরবর্তী ছিল না। প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করিয়াই উহাকে স্পর্শ করা যাইত। তাঁহার দৈব শক্তিও সহজপ্রসন্ন ও প্রার্থনালভ্য সন্নিহিতত্বেই অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বৈষয়িক অশান্তি তাঁহার অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা দুরারোগ্য ছিল না—দেবানুগ্রহের প্রলেপই তাহা নিঃশেষে নিরাময় করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ইহার কারণ হয় ক্ষতের অগভীরতা, না হয় দৈব ঔষধের ব্যাধি-উপশমে অমোঘতা। মনের এই ধারাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রণালী বাহিয়া দুই শতাব্দী ধরিয়া সাহিত্যকে অতীতমুখী ও বাস্তববিমুখ করিয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতকে এই একটানা স্রোত কিঞ্চিৎ মন্দগামী হইয়াছে। মুরশিদ কুলি খাঁর নূতন রাজস্বব্যবস্থাকে ডিহিদার মামুদ শরিফের খামখেয়ালীপ্রসূত অন্যায়ের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা গেল না। দেবীর আবাহনমন্ত্রেও এই অতিপ্রত্যক্ষ শ্বাসরোধী চাপের সুলভ সমাধান সম্ভব হইল না। বর্তমান যুগেও আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষের প্রত্যক্ষীকৃত অলৌকিক দেবমহিমার কথা আলোচনা করি ও উহার প্রতি ক্ষীণ বিশ্বাসও পোষণ করি। কিন্তু এই অপ্রাকৃত শক্তিকে ভাবস্বীকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করিলেও আমরা কার্যতঃ মানবিক প্রতিকারের উপায়ই প্রয়োগ করি। অষ্টাদশ শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নবাবকৃত লাঞ্ছনা শুধু অন্নদার আশীর্বাদেই ঠেকান গেল না। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ বাদশাহের হাতে ভবানন্দের দুর্গতি ও শেষ পর্যন্ত দেবীর স্বপ্নাদেশে ভীত জাহাঙ্গীর কর্তৃক তাঁহার কারামুক্তিরূপ দৈবলীলায় মানবিক ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের কাহিনী সালঙ্কারে ও রসাল যাবনীভাষামিশ্র বাগ্‌ভঙ্গীর সাহায্যে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ মুনিব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরূপ বিপদুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অবশ্য মঙ্গলকাব্যধারায় প্রথাগত দেবস্তুতির পালা পূর্বের মতই চলিয়াছে। কিন্তু সমকালীন ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্যের বিরোধিতায় এই দেবস্তুতির ভাবৈশ্বর্য কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। চোখের সামনে সংঘটিত বর্গীর অত্যাচার ও নবাবের ব্যঙ্গসৃষ্ট 'বৈকুণ্ঠ-বাসে'র তীক্ষ্ণ বাস্তবতার নিকট মঙ্গলকাব্যের প্রাণস্বরূপ দেবনির্ভরতা না কবি না পাঠকগোষ্ঠী কাহারও নিঃসন্দেহ আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতকে যাহা নিঃশ্বাসবায়ুর মত সহজ ছিল, অষ্টাদশ শতকে তাহাই যোগাভ্যাসের মত কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের কাল ও দেবনির্ভরতায় সংশয়

ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন আসিয়াছে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বাঙালীর মনে নূতন চেতনার উন্মেষ হইয়াছে। রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র দিল্লী হইতে মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় রাজনীতি সম্বন্ধে নৈকট্যজাত নূতন আগ্রহ ও সচেতনতা জাগিয়াছে। যে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও রাজপরিষদবর্গের ক্ষমতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সুদূর জনরবরূপে বাঙালীর কানে পৌছিত, মাঝে মধ্যে বাদশাহী ফরমানের মাধ্যমে বা ক্বচিৎ বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর পদযাত্রা—সমারোহে যে শক্তির পরিচয় কল্পনারাজ্য ছাড়াইয়া বাস্তবরাজ্যে মূর্ত হইত, তাহাই এখন নৈমিত্তিক হইতে নিত্যরূপ ধারণ করিল, রূপকথার স্বপ্নলোক হইতে প্রাত্যহিক বোধগম্যতায় নামিয়া আসিল। মুরশিদাবাদ রাজকাহিনীর কুশীলবেরাও বাস্তবতর

মূর্তিতে প্রতিভাত হইল। দাক্ষিণাত্য হইতে আগত ও দিল্লীনিয়োজিত মুরশিদ কুলি খাঁ খানিকটা অবাস্তবতার গোধূলিলোকবাসী, ইতিহাস-প্রান্তরে ভ্রাম্যমান প্রেতচ্ছায়া। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী নবাবেরা—সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দি, সিরাজউদ্দৌলা সকলেই—শুধু ইতিহাসের কুয়াশা-ঢাকা, অপরিণত ভ্রূণপিণ্ডমাত্র নয়, বাঙালী জীবনপ্রতিবেশলালিত, পূর্ণবিকশিত প্রাণসত্তা। সরফরাজের নবাবীলীলা অতিস্বল্পায়ু, কিন্তু সে অবিমৃষ্যকারিতা ও অস্থিরমতিত্বের প্রতীকরূপে সাহিত্যের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই বাঙালীর কথ্য ভাষায় ও লোকচেতনায় নিজ ব্যক্তিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। রাজসিংহাসন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সে জনপ্রবাদের মণিকোঠায় নিজ মূল্যকে কালজয়ী তাৎপর্যে মুদ্রিত করিয়াছে। তাহার পূর্ববর্তী সম্রাট্ আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ টুগলক তাহার অপেক্ষা শতগুণে বেশী খেয়ালী হইয়াও ও নানাবিধ অদ্ভুত আচরণে তাহাদের খেয়ালের পরিতৃপ্তি করিয়াও তাহাদের ঐতিহাসিক পরিচয় অতিক্রম করিয়া কোন নিগূঢ়তর দ্যোতনায় জনস্মৃতিতে অবিস্মরণীয় হইতে পারে নাই। আলীবর্দির রাজনৈতিক সমস্যা বর্গীর হাঙ্গামার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হইয়া বাঙালীর স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মত অক্ষয় হইয়া আছে। তাহার তিন কন্যা ও দৌহিত্রদের পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বেষ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তাল পরিবারজীবনও বাঙালীর সুপরিচিত কাঠামোতে বিন্যস্ত হইয়া কৌতূহল ও বাস্তববোধকে অধিকতর মাত্রায় উদ্রিক্ত করিয়াছে। মনে হয় যেন মঞ্চসংস্থাপনার কোন্ অপূর্ব কৌশলে এক সুদূর ইন্দ্রপুরীর যাত্রাভিনয় মায়ালোক হইতে বস্তুজগতে নামিয়া আসিয়া বাঙালী জমিদারের গৃহাঙ্গণে ও তাহার একান্ত-পরিচিত অভিনেতৃবর্গের সহযোগিতায় গার্হস্থ্য নাটকরূপে অচিন্তনীয় নবরূপায়ন লাভ করিয়াছে। নিয়তির এই নাট্যপ্রদর্শনীতে বাঙালী যেন এক মুহূর্তে নির্লিপ্ত ও হতবুদ্ধি দর্শক হইতে মর্মরসগ্রাহী, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

এই প্রাসাদবিপ্লবে যাহারা প্রধান পুরুষ সেই হতভাগ্য সিরাজ, দুর্বুদ্ধি মীরজাফর, ধনকুবের জগৎশেঠ, অর্থগৃধ্নু উমিচাঁদ—ইহারা সকলেই প্রাচীন ধারার অনুবর্তী হইয়াও অনেকটা অজ্ঞাতসারেই আধুনিকতাধর্মী। পাশ্চাত্য চক্রান্তশীলতার সহিত দৈবসংঘটিত মিলনই ইহাদের আধুনিকতাকে অকস্মাৎ মধ্যযুগের নির্মোকমুক্ত করিয়াছে। ইহারা চাহিয়াছিল সনাতন প্রথারই নব সংস্করণ, কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা এক অভাবনীয় আমূল ওলট-পালট। ইহারা বিদ্রোহের চাকাকে যেখানে থামাইতে চাহিয়াছিল,

যুগশক্তির প্রভাব ও দেশের নবঅদৃষ্ট

অজ্ঞাত এক যুগশক্তি বাহিরের আরএক সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত মিলিত হইয়া পরিবর্তনচক্রকে আরও অনেক বেশী পাক ঘুবাইয়া দিল। সুতরাং যাহা ঘটিল তাহা শুধুমাত্র শাসক-পরিবর্তন নয়, সমস্ত দেশের এক নব অদৃষ্টবচনা। এই চক্রান্তের প্রকৃতি এবং ইহার সুদূবপ্রসারী ফলাফল অতীত অন্য সমস্ত বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র ও আধুনিককালোপযোগী নিগূঢ়তর তাৎপর্যবাহক।

এই আন্দোলনে যে সমস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের চবিত্র ও উদ্দেশ্য অতীত ইতিহাসেব মানদণ্ডে বিচার্য নয়। সিরাজের বিতর্কমূলক চবিত্রই তাহার আধুনিকতার লক্ষণ। উহার যথার্থ মূল্যায়নে আমাদের মতভেদ এক দুর্ভেদ্যতব সত্তারহস্যের ইঙ্গিত দেয়। মীরজাফরকে আমরা অবিমিশ্র দুবৃত্তরূপে গ্রহণ করিয়াই স্বস্তি পাই। কিন্তু তাহার আচরণে ও চরম সঙ্কটমুহূর্তে কর্তব্যবিমূঢ়তার যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস প্রচ্ছন্ন আছে তাহাব গ্রন্থি-উন্মোচন মোটেই সহজসাধ্য নয়। সাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষ বিশ্বাসঘাতকের সহিত তাহাকে হুবহু মেলান যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মীরজাফর গাঁজা খায় ও ঘুমায়" তাহার নির্বিকার ঔদাসীন্য ও অপদার্থতার সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সাব মত্ত প্রেবণাব সামঞ্জস্যবিধান করা কঠিন। ইতিহাসের স্থূল ছাঁকনিতে এই সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বনির্যাসের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া আটকান যায় না। দোষেগুণে মিলাইয়া সে মধ্যযুগীয় পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ধনকুবের জগৎশেঠের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। মধ্যযুগীয় রাজশক্তির নীতি ছিল অর্থশক্তির প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য শোষণ, অর্থপতিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারত্বে আমন্ত্রণ নয়। সম্ভবতঃ মারাঠা দস্যুর ক্রমবর্ধমান দাবী মিটাইতে উদ্ব্যস্ত আলীবর্দির সময় হইতে জগৎশেঠবংশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি। সিরাজ উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলার সিংহাসনের সহিত এই অর্থনৈতিক অধীনতা লাভ করিয়া থাকিবে। কারণ যাহাই হউক, কার্যতঃ দেখা গেল যে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রজালবয়নের প্রধান শিল্পী হইল এই কোটিপতি বণিক্‌-প্রতিষ্ঠান। মীরকাশিম সিংহাসন হারাইবার পূর্বে অর্থনীতির এই দুর্দম শক্তির বাহনকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যৎ নবাবের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর কণ্টকময় পথে চলিবার দায়িত্ব নবাবের ছিল না। উমিচাঁদ আর একটি বহিরাগত চরিত্র যে ষড়্‌যন্ত্রে ফাঁসযোজনার কার্যে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ক্লাইব তাহার খনিত সুড়ঙ্গতলে আরও শক্তিশালী বিস্ফোরক স্থাপন করিয়া তাহার পূর্ববিন্যস্ত মাইনকে উড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে এই রাষ্ট্রনৈতিক

রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে আধুনিকতার উপাদান

বিপর্যয়ের মধ্যে এমন উপাদান-বিশেষত্ব ছিল যাহা আধুনিকতার আসন্ন আবির্ভাবকে সম্ভব ও ত্বরান্বিত করিয়াছে। পলাশীপ্রাঙ্গণে নবাবের গ্লানিপাংশুল পরাজয়ের রক্তমেঘের মধ্যে যে সূর্য অস্ত গিয়াছে তাহা বাংলার মধ্যযুগের শেষ সূর্য। পরদিন প্রভাতে যে সূর্যের উদয় হইয়াছে তাহা নবযুগপ্রবর্তক, আধুনিকতার প্রথম সূর্য।

ইহার পরে যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইল তাহা বাহ্যতঃ পূর্বব্যবস্থার অবিকল অনুবর্তন হইলেও স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র ভাবকেন্দ্রে স্থানান্তরিত। ইংরাজ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল না কিন্তু রাজস্বের অধিকার দাবী করিয়া, কর্তব্য ও অধিকারের এই বিচ্ছেদসাধনে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। বাঙলার প্রজা পলাশীর যুদ্ধের তের বৎসরের মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই শাসনদায়িত্বহীন, শোষণসর্বস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার মৃত্যুযন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করিল। কেবল সমাজদৃঢ়তার ভেলা-অবলম্বনে বাঙালী এই প্রলয়সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অস্তিত্বরক্ষার কূলে পৌঁছিল। যাহারা রক্ষা পাইল তাহারা আধুনিকতার এই প্রথমমন্থনজাত বিষ পরিপাক করিয়া ইহার অমৃতফলপ্রসবিনী পরিণতি উপভোগের জন্য প্রস্তুতি অর্জন করিল। এই শ্মশানযজ্ঞকুণ্ডে শান্তিবারিসেচনের তিন বৎসরের মধ্যেই (১৭৭৪) আধুনিক জীবনবোধের পুরোধা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন।

বিশৃঙ্খল সূচনা

অষ্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থপাদ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার যুগ। তথাপি এই যুগে কিছু কিছু শৃঙ্খলাস্থাপন ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় ও বাঙালী নিজ মনের সহিত নূতন পরিস্থিতির সামঞ্জস্যসাধনে কিছুটা প্রয়াস করে। অবশ্য একদিকে ইংরাজের অবাধ ও প্রতিযোগিতাহীন বাণিজ্যনীতি বাঙালী ব্যবসায়ীর সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করে ও পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি হইতে তাহাকে উৎখাত করিয়া তাহার জীবনযাত্রাকে আরও দুর্বিষহ করিয়া তোলে। এই দেশব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে ইংরাজের নব বাণিজ্যনীতির প্রসাদে কোন কোন পরিবার বেনিয়ানবৃত্তি অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসৌধের ভিত্তি স্থাপন করে ও নব আভিজাত্য-সংস্কৃতির বীজ বপন করে। বিদেশী বাণিজ্যের সহিত পরিচয়ের ফলে বাঙালীর মন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিস্তৃততর পরিধির মধ্যে প্রসারিত হয়, ও বৈদেশিক বাণিজ্য-স্রোতের স্ফীতিসঙ্কোচরহস্য সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট চেতনা জাগে। ইংরেজের সঙ্গে প্রয়োজনাত্মক ভাববিনিময়ের জন্য সে যে কয়েকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অপপ্রয়োগে হাস্যকর শব্দ আয়ত্ত করে তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিস্তারের প্রেরণা যোগাইয়া

বেনিয়া-সংস্কৃতির সংস্পর্শ

তাহার সম্মুখে এক অকল্পিতপূর্ব মানস দিগন্ত-উন্মোচনের হেতু হয়। ভূস্বিত্ব আইনের পরিবর্তনপরম্পরা তাহাকে নূতন কার্যবিধির জ্ঞান দিয়া তাহার বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখরতর করে। এই সব দিক দিয়াই তাহার মনে আধুনিকতার প্রথম বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। সাহিত্য ও গভীরতর জীবনবোধে এখনও তাহার সহিত আধুনিকতার দুস্তর ব্যবধান।

৩

অষ্টাদশ শতকীয় সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরোক্ষ অনুমানগম্য। নবভাবধারা পরিণতির যে স্তরে সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে অষ্টাদশ শতকে মননের সে পরিণতি ঘটে নাই। কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যধারাই অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছে। গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গান নাথধর্মতত্ত্বকে লোককল্পনার উদ্ভট অতিরঞ্জনের সহিত ও যোগসাধনার পারিভাষিক প্রক্রিয়াকে হেঁয়ালিধর্মী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের গঠনশিল্প ও অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ অনেকটা মঙ্গলকাব্য-প্রভাবিত। উহাদের মধ্যে নব চেতনা ও লোকজীবনবৈশিষ্ট্যের যে অপরিস্ফুট আভাস পাওয়া যায় তাহা মঙ্গলকাব্যের প্রথানুগত্যের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আর এই তত্ত্বচিন্তার মূল অষ্টাদশ শতক অতিক্রম করিয়া সুদূরতর অতীতে নিহিত। চর্যাপদের বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ও বেদের ইঙ্গিতের পরিণততর রূপ, পরবর্তী-কালের হিন্দু তান্ত্রিকতার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়, কিন্তু ইহার কায়সাধনা অধ্যাত্মফললিপ্সু নয়, অক্ষয়ভোগাদর্শবিলাসী। ইহার আপাতবৈরাগ্য কেবল সংসারভোগকে নিরঙ্কুশ করিবার জন্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অধ্যাত্মচিত্তবিশুদ্ধি-নিরপেক্ষ অলৌকিকশক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাজাত। পারলৌকিক সাধনার ছদ্মবেশে ইহা ইহমুখীনতারই একটা উদ্বর্তিত রূপ, প্রাকৃত চিত্তের স্বর্গকামনার মত ইন্দ্রিয়রমণীয়তার স্থূল উপাদানে গঠিত। এই নাথগীতির মধ্যে আধুনিকতার একটা সূত্র হয়ত আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু এই সূত্র সুপ্রাচীন আদিম সংস্কারের অংশুনিঃসৃত।

সাহিত্যে অতীতের অনুবর্তন

মোটামুটি তিনজন লেখকে আধুনিকতার সুর কমবেশী পরিস্ফুট হইয়াছে—ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও মহারাষ্ট্রপুরাণের কবি গঙ্গারাম। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলএ বিষয়টি গতানুগতিক কিন্তু উহার রূপায়ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়বাহী।

উহার শ্রেণীনির্দেশ অনুকরণাত্মক, কিন্তু শ্রেণীর সাধারণ গুণগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত। দেবী চণ্ডী তাঁহার চণ্ডত্ব পরিহার করিয়া লোকধাত্রী অন্নপূর্ণায় নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কাশীধামে তাঁহার দেবমহিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে ও ভবানন্দকেও তিনি রাজৈশ্বর্যদানে কৃপা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমগ্র আচরণ দেবশক্তির গার্হস্থ্য সংস্করণে নামিয়া আসার সাক্ষ্য দেয়। কালকেতুর নিকট চণ্ডীর আবির্ভাবের মধ্যে কিছুটা অভাবনীয়তার বিস্ময়-চমক আছে, আর ব্যাধনন্দনের প্রতি বনপশুরক্ষয়িত্রী দেবীর অহেতুক প্রসাদ-বর্ণনায় আরণ্য জীবনের অসঙ্গতিপুষ্ট কৌতুকরস দেবী-মহিমায় কিঞ্চিৎ রহস্যস্পর্শের জৌলুষ সঞ্চার করিয়াছে। এ দেবী কাছে আসিয়াও সম্পূর্ণ মানবিক হইয়া যান নাই, কিছু দূরত্ব রক্ষা করিয়াছেন। ব্যাধদম্পতির একের অবোধ, বিস্ময়ভরা চোখে, অপরের ঈর্ষ্যা-আবিল দৃষ্টিতে আর দৈবাহত কলিঙ্গ প্রজাবৃন্দের অসহায়, বিহ্বল আর্তিতে যে দেবরহস্য প্রতিভাত হইয়াছে- তাহাতে অন্ততঃ দেবতা-মানবের সহজ সম্পর্কটি ফুটিয়া ওঠে নাই। ইহার সহিত তুলনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেব-মানবের পারস্পরিক সম্পর্কে সহজ ভক্তি ও প্রসন্ন আশ্রিত-বাৎসল্যের উজ্জ্বল ছবিটি কোনরূপ সংশয়ছায়ায় মলিন হয় নাই। ভগবান মানুষের অনধিগম্য থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে মানুষের মনে কোন অনিশ্চয়তা, কোন পথখোঁজার ধাঁধা নাই। যে পাটনি অন্নপূর্ণাকে গঙ্গা পার করিয়াছে, সে দ্ব্যর্থক পরিচয়ের প্রহেলিকা কাটাইয়া যে মুহূর্তে তাঁহার স্বরূপ চিনিয়াছে সেই মুহূর্তে অকুণ্ঠিত সরল প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার প্রতি অনন্যশরণত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ইহার আশ্রয় লইলেই যে জীবনের সকল সমস্যা মিটে সে সম্বন্ধে তাহার লেশমাত্র সংশয় নাই। কালকেতু না চাহিতেই সাত ঘড়া টাকা পাইয়াছিল এবং সম্পদদাত্রীর আন্তরিকতায় বক্রকটাক্ষও নিক্ষেপ করিয়াছিল। আশাতীত সৌভাগ্য তাহার নিকট স্বপ্নবৎ অলীক মনে হইয়াছিল। ঈশ্বরী পাটনী কিন্তু ঈশ্বরীর করুণায় দৃঢ়বিশ্বাসী; সে ঘরে ফিরিয়াই গৃহিণীকে 'দুধ-ভাতে'র ফরমাস করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। হরিহোড়কে দেবী যখন দয়া করিয়াছিলেন, তখন তাহার গার্হস্থ্য সচ্ছলতা উথলাইয়া উঠিলেও সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যেই বিধৃত ছিল। ভবানন্দ দেবীর প্রসাদে রাজা হইলেও তাহার ঐশ্বর্যের ছন্দ অসম্ভব পরিমাণে দীর্ঘায়ত হয় নাই। এই সমস্তই প্রমাণ করে যে মুকুন্দরামের অপরিচিতা অসাধ্যসাধনক্ষমা দেবী ভারতচন্দ্রের যুগে গৃহদেবতায় পরিণত হইয়াছেন—নবযুগের মানুষ অদৃষ্ট নিয়তিকে, চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ভক্তি ও সেবার

ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা

স্বর্ণপিঞ্জরে অচলা করিয়া রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, আকাশের পাখীকে খাঁচার পাখীরূপে পোষ মানাইয়াছে। ভক্তের দিক হইতে কোন অপরাধ না হইলে ইষ্টদেবতা তাহাকে ত্যাগ করিবেন না এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই দেব-মানবের সম্বন্ধকে অনিশ্চয়তামুক্ত করিয়া কার্যকারণশৃঙ্খলায় নিয়মবদ্ধ করিয়াছে। (আদি মঙ্গলকাব্যের খামখেয়ালী দেবতার যুগ শেষ হইয়া ভক্তাধীন দেবতার যুগ আরম্ভ হইয়াছে; যথেচ্ছাচার দৈবশক্তি নিয়মতান্ত্রিক বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের এইখানেই প্রভেদ।)

আদিম পর্যায়ের মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল নব দেবতার পূজা-প্রবর্তন ও ইহারই জন্য প্রাচীনের সহিত দ্বন্দ্ব ও অনিচ্ছুক পূজকের প্রতি জোর-জবরদস্তির প্রয়োগ। পরবর্তী যুগে এই উগ্র বিরোধ ও অনভিজাত দেবতার পূজা পাইবার জন্য অশোভন লোলুপতা ঘটনার দিক হইতে অভিন্ন থাকিলেও মনোভাবের দিক দিয়া ক্রমশঃ মৃদু ও শিথিল হইয়া আসিল। এমন কি মনসার জিঘাংসা ও চাঁদের অনমনীয় বিরোধিতাও অতিপরিচয়ের ফলে পূর্বের তীব্রতা হারাইল ও উত্তাপ বজায় রাখিবার জন্য কৃত্রিম অতিরঞ্জনের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। মাতৃপূজার ক্রমপ্রসারের ফলে চণ্ডী ও মনসা উভয়েই তাঁহাদের চরিত্রগত নির্মমতা হারাইয়া মাতৃ-আদর্শের সহিত ক্রমবর্ধমান স্বারূপ্যের জন্য স্নিগ্ধভাবাপন্ন হইলেন ও তাঁহাদের চারিদিকে যে উত্তপ্ত বিরোধের পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অনেকটা প্রশমিত হইল। এই ভাবসাম্যবিধানে বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাবও যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছিল। চণ্ডীর অন্নপূর্ণাতে রূপান্তরণ, ভৈরবী দেবশক্তির স্নিগ্ধা মাতৃমূর্তিতে উত্তরণ যুগপ্রভাবেরই প্রেরণা সূচিত করে।

যুগপ্রভাবে চণ্ডীদেবীর চরিত্রগত পরিবর্তন

মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত অঙ্গবিন্যাসও ভারতচন্দ্রে সম্পূর্ণ অনুসৃত হয় নাই। ইতিহাসচেতনা যে ক্রমশঃ কল্পলোকের কল্পনার নিবিড়তাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে ও কালিকাদেবী শ্মশানচারিণী হইয়াও যে ভক্তমনোবাঞ্ছাপূরণের জন্য রোমান্টিক প্রেমবাসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেও আবির্ভূত হইতে দ্বিধা করিতেছেন না এই অনভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যে নূতন উপাদান ও প্রেরণা যোগাইয়া উহার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের ইতিহাসবোধ হয়ত সীমিত ও ম্লান; পলাশীর যুদ্ধ তাঁহার কাব্যদিগন্তের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তথাপি পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও যে যথার্থ জীবনঘটনা স্থান পাইতে পারে, দেবমাহাত্ম্য সন্তোসংঘটিত ইতিহাসকথা ও ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যেও আত্মঘোষণার সুযোগ

পায়, ইহা একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক। হয়ত ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা তাঁহার মধ্যে প্রখর নয় ও তাঁহার ইতিহাসবিবৃতি কল্পনাশ্রয়ী ও দেবমহিমাখ্যাপনে নিয়োজিত হইয়া বস্তুতন্ত্রতার মর্যাদা হারাইয়াছে। তথাপি দেবতা যে ভাবরাজ্য হইতে বাস্তব জগতে অবতরণ করিয়াছেন ও কবি তাঁহার পূর্বসংস্কার অতিক্রম করিয়া এই তথ্যনিয়ন্ত্রিত বাতাবরণে দৈবশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন ইহার তাৎপর্য লঘু করিয়া দেখিবার নয়। এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্র পৌরাণিকতার প্রাচীন বৃক্ষে আধুনিকতার নূতন কলম জুড়িয়াছেন। এই নবরোপিত কলমে ঠিক জোড় লাগিল কি না বা ইহাতে কোন সুস্বাদু ফল ধরিল কি না সে সম্বন্ধে তিনি অবশ্য উদাসীনই ছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ইতিহাস-বোধ

দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুটি অবশ্য ততটা যুগধর্ম নয়, যতটা ব্যক্তিমেজাজের বৈশিষ্ট্য। মুকুন্দরাম ভক্তিপ্রধান ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মিয়াও ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া যান নাই—সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্রের অসঙ্গতির প্রতি প্রসন্নহাস্যমধুর ব্যঙ্গদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তি যেন আরও শাণিত, মর্মঘাতী ও সামগ্রিক মনে হয়। তিনি যেন আঘাতশীলতার সচেতন উদ্দেশ্য লইয়াই, প্রচলিত মূল্যমানের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটনের জন্যই, বড়ঘরের গোপন কলঙ্ক ফাঁস করার মনোবৃত্তি লইয়াই তাঁহার ব্যঙ্গাস্ত্র শাণিত করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের মুরারিশীল ও ভাঁড়ু দত্ত সরল বিশ্বাসনিষ্ঠ সমাজে ব্যতিক্রমস্থানীয়; কালকেতুর বিশ্বাসপ্রবণ সারল্য ও সাধারণ সমাজের কর্তব্যনিষ্ঠ ও সদাচারনিয়মিত জীবনযাত্রা এই ব্যতিক্রমত্বের দৃঢ় প্রতিবাদ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত মুরারিশীল সৎ বণিকবৃত্তিতে ফিরিল কি না ও তাহার বাটখারার ওজন ফাঁকি সংশোধিত হইল কি না তাহা জানা যায় না। তবে ভাঁড়ুর ক্ষণিক বিজয়গর্ব শেষে যে চরম অপমানে তিরস্কৃত হইয়াছে ও সে যে সমাজদেহ হইতে দুষ্টক্ষতের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। ইহার সহিত তুলনায় ভারতচন্দ্রের শ্লেষ তীক্ষ্ণতর ও ব্যাপকতর। তাঁহার নায়ক-নায়িকা, হীরা মালিনী, কোটাল চৌকিদার, স্বয়ং রাজা-রানী, এমন কি কালিকাদেবী পর্যন্ত কমবেশী ব্যঙ্গস্পৃষ্ট ও উপহাসদৃষ্টিসংবর্ধিত। এখানে সকলেই ঠারে ঠোরে কথা কয়; সকলেই ব্যঙ্গকটাক্ষ-নিক্ষেপনিপুণ; সকলের আচরণের মধ্যেই একটা পরিহাসযোগ্য অস্বাভাবিকতা ও অতিচতুরতা ক্রিয়াশীল; হয় ঠকান না হয় ঠকা ইহাদের সকলেরই সাধারণ জীবন-ফলশ্রুতি। কাব্যে কোন চরিত্রই ঠিক সুস্থ জীবনমর্যাদার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয় না। মাতা-কন্যা বা শ্বশুর-জামাই-এর সংলাপও এখানে অশালীন অনুচিত

ব্যঙ্গ ও শ্লেষ—প্রয়োগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

তির্যক-ভাষণদুষ্ট। স্বয়ং কালিকা দেবীও ভক্তরক্ষার জন্য তাঁহার ডাকিনী যোগিনী লইয়া শ্মশানে অবতীর্ণ হইয়া শক্তির অশোভন আস্ফালনে দেবমর্যাদাভ্রষ্টা হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গরসিকের তুলির আঁচড়ে সকলের মুখেই কিছুটা চুণকালি লাগিয়াছে—সবাই কিয়ৎপরিমাণে প্রহসনের পাত্র-পাত্রীর অংশ অভিনয় করিয়াছেন। আর এই ব্যঙ্গচিত্রণের প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ না করিলেও ইহা যে প্রশ্রয়দাক্ষিণ্যস্নিগ্ধ নয়, ইহাব সমস্ত হাসি-খুসী ও শিল্পচাতুরীর উজ্জ্বল প্রলেপ সত্ত্বেও ইহার মধ্যে যে মানব জীবনের একটা গ্লানিময় দিক, একটা হীনঅবজ্ঞা-মাখানো ধারণা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই ব্যঙ্গপ্রসূত হীনম্মন্যতা আধুনিকতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণরূপে নির্দেশিত হইতে পারে। ভারতচন্দ্রের দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ চিত্রের মধ্যে হয়ত ভক্তির অভাব নাই। তাঁহাব শিব ও অন্নপূর্ণা যুগপ্রচলিত দেবাদর্শ হইতে হয়ত বেশী প্রাকৃতলক্ষণ-সমন্বিত নহেন। তাঁহাব স্তব-স্তুতির মধ্যে কটাক্ষ-চাতুর্যের ও শিল্পরীতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত প্রকট হইলেও অকপট আত্মনিবেদনের স্বর বিরলশ্রুত নহে। কিন্তু যে জীবনপরিবেশে এই দেবমণ্ডলীর অধিষ্ঠান হইয়াছে তাহাতে ভক্তি ও কামকেলি-চর্চার মধ্যে ঝোঁক যে দ্বিতীয়ের প্রতি প্রবলতর তাহা নিঃসন্দেহ। ভক্তির ধারা শুষ্ক হইবার ফলেই তলস্থ পঙ্কস্তর অবারিত হইয়া পড়িয়াছে ও কবি দক্ষ শিল্পীর ন্যায় পাঁক লইয়াই তাঁহার মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন।

৪

রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলীর প্রথম স্রষ্টারূপে ও ঐ পদাবলীতে একাগ্র ভক্তি-সাধনাকে সমকালীন জীবনঘটনার উপমা-রূপকের প্রয়োগে প্রকাশ করার মৌলিকতায় আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুরাণের ছাঁচে ঢালা ও অলৌকিক দেবমাহাত্ম্যবর্ণনায় পরিপূর্ণ আখ্যানকাব্যের মধ্যে যে গীতি—নির্ঝরের উৎসটি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাকে অবারিত করিয়াছেন; বাস্তব জীবনের ঘটনাবহুল স্থূলতাকে মন্ময় গীতিকবিতার সুরে উদ্বর্তিত করিয়াছেন; ভক্তির ছদ্মাবরণধারী ঐহিক ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সর্বত্যাগী আত্মনিবেদনের গৈরিক বস্ত্র পরাইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের বিচিত্র গল্পাকর্ষণ ও বিরাট বস্তু-অবয়বকে সূক্ষ্ম মানস প্রেরণার রসনির্যাসে রূপান্তরণই তাঁহার আধুনিক মনের প্রধান পরিচয়। দ্বিতীয়তঃ এই ভক্তিবিহ্বলতাকে তিনি বৈষ্ণব কবির ভাববৃন্দাবনের অপার্থিব সৌন্দর্যলোক হইতে সমকালীন সমাজের মলিন জীবনচর্যার বস্তুজগতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

অথচ এই ভাবতন্ময়তার দিব্য স্বরূপের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। অবশ্য কান্তাসাধনা ও মাতৃসাধনা এই উভয়প্রকার ভগবৎ-তত্ত্বরসানুভূতির স্বরূপেও যেমন, ভাবাবহ ও কাব্য-উপস্থাপনাতেও তেমনি একটি বিশিষ্ট স্বভাবছন্দ আছে এবং উভয় জাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিসাধকই নিজ নিজ কবিসংস্কার-প্রবর্তনায় সেই কাব্যরীতিরই অনুবর্তন করেন। মধুরলীলার মধ্যে যেমন আদর্শ সৌন্দর্যের দিব্য দীপ্তি রসসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য, মাতৃমূর্তিকল্পনায় তেমনি গার্হস্থ্য জীবনের ধূসরতা ও প্রাত্যহিকতার চিরাভ্যস্ত উপকরণজীর্ণতা ভাবপটভূমিকার সহিত সুসঙ্গত। যেমন রামপ্রসাদী সুরে বৈষ্ণব কবিতার মর্মকথা প্রকাশিত হইত না, তেমনি বৈষ্ণব কবির অপার্থিব ভাববিলাসে রামপ্রসাদের ভক্ত আত্মা চরিতার্থতা লাভ করিত না। সুতরাং রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার বশে তাঁহার চারিপাশের জীবনযাত্রার অতিপরিচিত, তুচ্ছ উপকরণ লইয়া, তৎকালীন সমাজের খেলাধূলা, বৈষয়িক কার্যনির্বাহপদ্ধতির সমস্ত বঞ্চনা-চাতুরী লইয়া, পারিবারজীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র আসক্তি ও অবোধ মান-অভিমানের অভিনয় লইয়া তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার মহানাটকের রূপসজ্জাবিধান করিয়াছেন। এই তুচ্ছ ভাব ও বস্তুসঞ্চয়কে তাঁহার হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুবাইয়া সেই নিমজ্জনোত্থিত বুদ্বুদ্‌রাশির উদ্ভব-বিলয়ের মানদণ্ডে তাঁহার ভক্তিসমুদ্রের গভীরতার পরিমাপ করিয়াছেন। যেমন জেন অস্টেন তাঁহার উপন্যাসে জীবননাট্য ফুটাইবার জন্য সঙ্কীর্ণ পল্লীপরিবেশের অতিসাধারণ ঘটনা ও চিত্তসংঘাতকে অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি রামপ্রসাদও ধর্মজীবনের চরম রহস্যদ্যোতনার জন্য তাঁহার অন্তরের গভীর, বেগবান আকূতি ও সেই আকূতিবলয়ে ঘূর্ণ্যমান কয়েকটি মৃৎকণার চিত্রকল্পে আধ্যাত্মিক মাধ্যাকর্ষণের অপরিমেয় শক্তির আভাস দিয়াছেন। জেন অস্টেন যে কৌশলে প্রাকৃত জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন, রামপ্রসাদও সেই কৌশলে অধ্যাত্ম জীবনের মানচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উভয়েই বিন্দুসমষ্টির মধ্যে সিন্ধুরহস্য প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছেন এবং উভয়েই একই কারণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতিলাভের অধিকারী হইয়াছেন।

রামপ্রসাদের সূক্ষ্ম মানসনির্যাস

গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' বা 'ভাস্করপরাভব' অষ্টাদশ শতকে ঐতিহাসিক চেতনা-উন্মেষের ও উহার কাব্যপ্রয়োগের আর একটি উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তথাকথিত গুরুতর তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র সাময়িক আভ্যন্তরীণ উপদ্রবের কাহিনী বাঙালী মনকে আরও গভীরভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। যেমন

অনেক বাস্তব বিপৎপাত অপেক্ষা কোন কোনও দুঃস্বপ্নবিভীষিকা আমাদের স্মৃতিপটে দৃঢ়তরভাবে অঙ্কিত হয় ও আমাদের চেতনাকে স্থায়ীভাবে অধিকার করে, তেমনি পলাশীর যুদ্ধের বৈপ্লবিক ভাগ্যবিপর্যয় অপেক্ষা মারাঠা দস্যুর লোমহর্ষণ অত্যাচার শুধু বাঙালীর চিত্তে প্রবলতর ভীতির সঞ্চার করে নাই, তাহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মায়েদের ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে চিরন্তনভাবে গ্রথিত হইয়াছে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া শিশুচেতনার বোধহীন গভীরেও এক রোমাঞ্চকর অজ্ঞাত বিভীষিকার মূল সংক্রামিত করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়া এই যে ইতিহাসের বাস্তব সংঘটনের স্মৃতি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায় ও ইতিহাসের বই পড়িয়া এই বিলুপ্তপ্রায়, মন হইতে মুছিয়া যাওয় স্মৃতিকে জীয়াইয়া তুলিতে হয়। কিন্তু রূপকথার তথ্যনিরপেক্ষ, কল্পনাময় আবেদন মানবচিত্তে অক্ষয় ও অবিনশ্বর। আমরা সুলতান মামুদ, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ীদের অন্তর হইতে বিদায় দিয়াছি ও ইতিহাসের সমাধিতে তাহাদের প্রেতমূর্তিদের কোন মতে স্মরণসীমার শেষ প্রান্তে ধরিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু বর্গী দস্যুরা রূপকথার রাক্ষস-খোক্ষসের সহিত এক সাঙ্কেতিক অমরতায় আমাদের চিত্তে চিরবিধৃত হইয়া আছে। ঐতিহাসিকের পুঞ্জীভূত তথ্যজালের ও সচেষ্ট তথ্যসন্ধানের বাঁধন ছিঁড়িয়া যাহারা অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মায়ের স্নেহাপ্লুত কলগুঞ্জনের ক্ষীণ স্বর্ণসূত্রে আটকাইয়া গিয়া আমাদের নিদ্রাজড়িমাচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে চিরবন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

গঙ্গারামের বিস্ময়কর ঐতিহাসিকবোধ

অবশ্য গঙ্গারাম সেই কল্পনার মোহময় আবেশ অনুভব করেন নাই। তিনি ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়া এই কল্পনার বাস্তব পশ্চাৎপট উন্মোচন করিয়াছেন ও যে প্রচুর শুক্তিসঞ্চয় হইতে এই স্বপ্নের এক ফোঁটা নিটোল, আতঙ্কপাণ্ডুর মুক্তা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত ঘটনাপরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য এই সদ্যোসংঘটিত, লক্ষ লক্ষ লোকের মর্মবেদনাসমর্থিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়াও তিনি পুরাণ-কল্পনার আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানেও তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে দেবসংকল্পসঞ্জাতরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। জগন্মাতার আদেশে ভাস্কর পণ্ডিত যবনকৃত অত্যাচারের শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার স্বহস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আবার বর্গীদের নারীনিগ্রহে রুষ্টা বিশ্বজননীর ইচ্ছাতেই তাহার নিধন ঘটিয়াছে। সুতরাং এই আধুনিকবিষয়প্রণোদিত কাব্যেও মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যাগত ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'-এর পূর্বে কোন কবিরই মানবিক ঘটনাকে দেবপ্রভাব-মুক্ত ক'রয়া দেখাইবার সাহস হয় নাই। অবশ্য নবীনচন্দ্রও পলাশির যুদ্ধের পূর্বরাত্রিতে দুঃস্বপ্নপরম্পরাপীড়িত নবাবের বি'নদ্র অস্বস্তিতে ও পরদিন প্রভাত-সূর্যোদয়ের মধ্যে বিধাতার রক্তিম নয়নের প্রতিচ্ছবিকল্পনায় এবং ক্লাইবের স্বপ্নদর্শনে পুরাণের স্থূল দেহকে বর্জন করিলেও উহার সূক্ষ্ম আত্মার প্রভাব মানিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, এগুলিতে দেবলোকের সশরীর আবির্ভাব হয়ত স্বীকৃত হয় নাই, কেন না ইহাদের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব ও ইহাই লেখকের ইহলোকনিষ্ঠতার কৈফিয়ৎরূপে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গঙ্গারাম খুব স্থূল ও আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাসকে দৈবশক্তিপ্রকাশের রঙ্গভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি কেবল শ্রীচৈতন্যের জীবনব্যাখ্যা ছাড়া অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বৈষ্ণব চরিতকারদের বাস্তব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই, তেমনি গঙ্গারামও পৌরাণিক কাঠামোকে কেবল ভূমিকারূপে রাখিয়া তথ্যবিন্যাসে ও মানবিকপ্রতিক্রিয়া-বিশ্লেষণে কোন সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। দেবশক্তি একবার আবির্ভূত হইয়াই অলৌকিক নেপথ্যান্তরালে অপসৃত হইয়াছে, ঘটনানিয়ন্ত্রণে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। ইহাতেই অষ্টাদশ শতকে দেবলোকের কতটা মর্যাদাহানি ঘটিয়াছে ও বাস্তববোধের ক্রমবর্ধমান প্রসারে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই লোকবিশ্বাসের সীমার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কতটা সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ মিলে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংযোগ

সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হইতেছে আধুনিক যুগে অতিপ্রাকৃতের সীমানির্ধারণ। পুরাণও হয়ত স্মরণাতীত কালের ইতিহাসের স্মৃতি-লালিত। মহাঅরণ্য যেমন যুগযুগান্তরব্যাপ্ত ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কয়লারূপে ভূস্তরে রক্ষিত আছে ও এই কয়লাও কোথাও কোথাও হীরকে রূপান্তরিত হইয়াছে তেমনি ইতিহাসও নানা কল্পনাস্তরের নিবিড় পেষণপিষ্ট হইয়া কিংবদন্তীর কাব্যতায় ও ক্বচিৎ পুরাণের দিব্যজ্যোতিরুদ্ভাসিত বর্ণময়তায় নবজন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের হয়ত একটা রক্ত-সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আধুনিককালে ইতিহাসের সম্প্রসারণের সঙ্গে পুরাণের অনুরূপ পরিধি-সঙ্কোচ ঘটিতেছে। পুরাণ ক্রমশঃ ইতিহাসকে গ্রাস ও পরিপাক করিবার শক্তি হারাইতেছে। ইতিহাসও এখন পুরাণরূপান্তরনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতকে পুরাণ ও ইতিহাসের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ ইতিহাস ঢুকাইয়াছেন, কিন্তু সে ইতিহাস অনেকটা

প্রাচীন ও কিংবদন্তীর কুহেলিকাচ্ছন্ন। পুরাণ এখানে ইতিহাসকে পূর্ণগ্রাস না করিলেও অর্ধগ্রাস করিয়াছে। ভারতচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে মঙ্গলকাব্য নিছক দেবপ্রশস্তিসর্বস্ব নয়, তাহার মধ্যে কিছুটা প্রাচীন ইতিহাস উপাদানরূপে প্রবর্তন মঙ্গলকাব্যের মূলউদ্দেশ্যবিরোধী নয়, বরং উহাতে উহার সমকালীন আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই তিনি কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমাকীর্তন ও তাঁহাকে দেবীর আশ্রিতরূপে দেখাইবার জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গুণবর্ণনা, দেবীভক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, পরিপূরকরূপে সান্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য খর্ব না হইয়া বরং উজ্জ্বলতর হইয়াছে। যদি বা ভক্তির খাঁটি সোনায় ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির কিছুটা খাদ মিশিয়া থাকে তাহা উহাকে বিনিময়বাহনরূপ স্বর্ণমুদ্রারই ব্যবহারিক মূল্য ও জনপ্রিয়তা অর্পণ করিবে। সুতরাং তিনি পুরাণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া ইতিহাসের নূতন উপকরণে মঙ্গলকাব্যের সুপ্রাচীন প্রতিমা সজ্জিত করিয়াছেন। তখনও কমলে-কামিনীর করী-গ্রাসের ন্যায় পুরাণ-দেবী ইতিহাস-গজকে গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ। অবশ্য দৃশ্যটা খানিকটা উদ্ভট হইতে পারে। কিন্তু মহারাষ্ট্রপুরাণ-এর লেখকের নিকট পুরাণের উপস্থিতি কেবল সাংকেতিক, কেবল প্রতীকরূপী। ইতিহাস কেবল একবার তাহার পায়ে মাথা ঠুকিয়া নিজ স্বাধীন অভিযানে বাহির হইবার শক্তি অর্জন করিয়াছে। ইতিহাসও কালীভক্ত সুন্দরের দেবানুমতি লইয়া প্রণয়সাধনায় রত হইবার মত পুরাণের আশীর্বাদ লইয়া কাব্যসুড়ঙ্গপথে স্বেচ্ছাবিহারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এইখানেই পুরাণপ্রভাবের শেষ অধ্যায় ও বাস্তবতার দিগবিজয়ের সুরু। অষ্টাদশ শতক বাংলা সাহিত্যের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এক যুগান্তকারী দৃশ্যপরিবর্তনের দিকে অর্ধবিমূঢ় নেত্র মেলিয়া ধরিয়াছে।

পুরাণ ও ইতিহাসের পরস্পরসাপেক্ষতা

ষোড়শ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

১

ইংরাজ-রাজত্বপ্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাপ্রবর্তনের পর পাশ্চাত্য প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক ও বদ্ধমূল হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তথাপি উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে এই ক্রমব্যাপ্ত প্রভাবের নানা স্তর ও পর্যায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব আমাদের মনের উপরিভাগ হইতে উহার যে গভীর তলদেশে সৃষ্টিপ্রেরণার মূল প্রসারিত সেখান পর্যন্ত ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে জড় উপকরণ বা যান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের অন্ধ অনুবর্তন, তাহার পর সূক্ষ্ম সারাংশের স্বীকরণ ও স্বাধীন সৃষ্টিচেতনা-উন্মেষের ফলে নব জীবনবোধের উদ্দীপন, মর্মাশ্রয়ী নিগূঢ় কল্পনাশক্তির বিকাশ এবং সাহিত্যের ভাবপ্রেরণা ও শিল্পরূপের সামগ্রিক রূপান্তর—এই পথ ধরিয়াই পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই ক্ষীণ সাহিত্যসৃষ্টি-প্রয়াসের অন্তঃপ্রেরণাহীন সূচনা। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ শাসকসম্প্রদায়কে বাংলাভাষা ও দেশীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা হইতেই বাংলা গদ্যের উন্মেষ। তখন ইহা নিতান্তই তথ্যভারবিড়ম্বিত, গঠনসুষমাহীন ও ভারসাম্যরক্ষায় অক্ষম বিবৃতিমাত্র ছিল। সেই আদিম অপটুতার যুগে ইহা তথ্যভারবাহী, অষ্টাবক্রগতি উষ্ট্রের মতই ছিল, উহার দেহে বা মনে কোন লাবণ্যচ্ছটার সঞ্চার হয় নাই। তাহার কিছুদিন পর রামমোহন রায় তাঁহার বেদান্তবিষয়ক আলোচনা ও ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদমূলক গদ্যরচনায় প্রয়োজনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আবেগ মিশাইয়া গদ্যশিল্পকে কিছু পরিমাণে সাহিত্যধর্মী করিয়া তুলিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে খৃষ্টান ধর্মমতের ত্রুটি ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য বিতণ্ডারীতিও তাঁহাকে কিছুটা আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। আবার বেদান্ততত্ত্বপ্রতিপাদনেও তাঁহাকে অনেকটা পাশ্চাত্যসুলভ যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ও বিশেষতঃ ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজনীতির সহিত গভীর পরিচয়ের ফলে তাঁহার মনোভাব স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়াও অনেকাংশে পাশ্চাত্য-আদর্শ-প্রভাবিত ছিল।

প্রথম যুগের গদ্যচর্চা

রামমোহনের ধর্ম-চেতনায় পাশ্চাত্য আদর্শ

এই সময়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস বাঙালী তরুণের জ্ঞানপিপাসা ও সৌন্দর্যবোধকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়া তাহার অন্তরে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এক আনন্দমধুচক্র রচনা করিল ও তাহার সামাজিক জীবনাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এখন শুধু জীবিকার্জনের সীমিত প্রয়োজনে আবদ্ধ না থাকিয়া বাঙালীর মনে এক ভাবদীক্ষার প্রেরণা জাগাইল। উহার স্থূল তথ্যপিণ্ড তাহার অন্তররসে জারিত হইয়া এক তীব্র মাদক রসে রূপান্তরিত হইল ও বাঙালী যুবককে এক ভাবমত্ততার মায়ালোকে উন্নীত করিল। তাহার সমস্ত চিৎকণাগুলি পূর্বস্থাণুত্বের বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া এক অসংবরণীয় পুলকাবেগে নবসত্তাসংশ্লেষে মিলিত হইবার জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিল। শুধু শিক্ষার মাধ্যমে কোন জাতির এইরূপ মানস বিপ্লব সংঘটিত হইবার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্রেরা যেন তাহাদের যুগযুগান্তরনির্দিষ্ট কক্ষপরিক্রমা হইতে তীব্রবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় নব গতিপথে আবর্তিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক দুই একটি তরুণেরই যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টিপ্রতিভা ছিল। কিন্তু সকলেরই জীবনদর্শনের মধ্যে একটা সর্বতোমুখী পরিবর্তনের ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হইয়া এক বিরাট তাণ্ডবের নৃত্যঘূর্ণী সঞ্চারিত করিল। সমাজসংস্কারের উগ্র প্রেরণায় ইহারা সকলেই প্রথাশৃঙ্খল ভাঙিতে অত্যুৎসাহী হইয়া উঠিলেন। অনেকে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; যাঁহারা পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিলেন না তাঁহারাও রীতি-নীতি ও আহার-বিহার সম্বন্ধে সমস্ত প্রাচীন অনুশাসনের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্মবিরোধী নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিলেন! ডিরোজিও-এর 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে আখ্যাত ছাত্রদল হিন্দু সমাজের বদ্ধ জলাশয়ে প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ তুলিয়া ও মনের সমস্ত বদ্ধমূল সংস্কারকে সবলে উন্মূলিত করিয়া, নব নব চিন্তাধারার বেগবান প্রবাহে অবগাহন করিল ও ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানের মাদকতাময়, রোমাঞ্চকর প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া এক অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অনুকূল প্রতিবেশ রচনা করিল। পূর্বগামী ভাববিপ্লবের পরিণত ফলরূপেই উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যপ্রভাবপ্রসূত সাহিত্য-বিপ্লব দেখা দিল।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী চিত্তে উহার প্রভাব

ডিরোজিও ও ইয়ং-বেঙ্গল

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ এই নব বীজবপনের যুগ; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর

ধরিয়া এই বীজ লালিত ও পুষ্ট হইয়া ১৮৬০ খৃঃ অঃ এর কাছাকাছি শস্যফলনের উপযোগী পরিণতি প্রাপ্ত হইল। মধুসূদন দত্তের মধ্যেই এই সৃষ্টিপ্রতিভা যুগ-প্রতিবেশের সমস্ত চাঞ্চল্য, যুগমানসের সমস্ত অস্ফুট আদর্শকল্পনাকে এক নিগূঢ় শক্তিপ্রেরণাসংহত করিয়া উহাকে প্রাণোচ্ছল সৌন্দর্যশিল্পে রূপান্তরিত করিল। মধু কবিই সর্বপ্রথম প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত নূতন প্রতীচ্য প্রেরণার এক প্রাণময় সংযোগ ঘটাইয়া নব সাহিত্যের উদ্বোধন করিলেন। তাঁহার কাব্য-নাটক হইতেই আমরা এই রসায়নপ্রক্রিয়ার একটা ধারণা করিতে পারি। বিশেষতঃ নাটকের ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক অনুকারকদের হইতে তাঁহার স্বকীয়তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের বাংলা নাটক মঞ্চানুকরণের সুড়ঙ্গপথ বাহিয়া ইউরোপীয় প্রভাবক্ষেত্রের মধ্যে প্রথম অনুপ্রবেশ করে। তাহার পর পুরাতন সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকবিন্যাস, অভিনয়কলা ও দৃশ্যপটসংস্থাপনের বহিরঙ্গমূলক অনুসৃতির মধ্য দিয়া বাংলা নাটক ধীরে ধীরে ইংরাজি নাট্যকলার প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে দুই বিসদৃশ নাট্যাদর্শের অসার্থক সংমিশ্রণের জন্য সে নিজের প্রাণকেন্দ্র-আবিষ্কারের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তৃতীয় স্তরে সামাজিক অসঙ্গতির প্রহসনাত্মক অঙ্কনের মাধ্যমে বাংলা নাটক অতি মন্থরগতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বিদেশী চাবিতে বাংলার নিজস্ব সমাজজীবনের দ্বার-উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। ইহা বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি ও দেশীয় প্রাণরসে পরিপূর্ণ হইলেও নাট্যশালার দিক্ দিয়া ব্যর্থ, কেননা ইহা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি ও নাটকীয় পরিণতির ঐক্যবন্ধহীন। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি নাটকেরও ভাবানুবাদ আরম্ভ হইল। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', নাটকে প্রাণসঞ্চারের কৃত্রিম প্রয়াসরূপে ও নাট্যাদর্শের প্রয়োগহীন তত্ত্বপরিচয়রূপে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী।

মধুসূদনের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সমীকরণ

নাট্যসাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব

এই প্রাণহীন অনুকরণের অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ, ভগ্নমূর্তিবিকীর্ণ পটভূমিকায় মধুসূদনের নাট্যকাররূপে আবির্ভাব। অবশ্য তিনিও যে নিখুঁত শিল্পপ্রতিমা নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিলেন, নাটকের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন যে তাঁহার নিকটেও ধরা দিয়াছিল এ দাবী করা যায় না। তিনিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের অসমাহিত দ্বন্দ্বে যে কিয়দংশে স্রষ্টার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়চ্যুত হইয়াছিলেন তাহাও অস্বীকার

করা যায় না। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' সংস্কৃত ও গ্রীক্ নাট্যাদর্শের বিপরীতমুখী আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভারসাম্যভ্রষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্ব-ঘটনার চাপে নাটকের মূল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায়ই আত্মবিস্মৃত ও অস্পষ্ট, অভিশাপের দৈব প্রাধান্যে মানবচিত্তের স্বাধীনতা অনেকাংশে আচ্ছন্ন ও উহার উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যঘটনা ও নায়কনায়িকার ভাগ্যবিপর্যয়ের সুলভ অবসান। একমাত্র 'কৃষ্ণকুমারী'ই (১৮৬০) প্রথম সার্থক ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক বাংলা ট্রাজেডিরূপে প্রতিভার প্রাণদীপ্ত নাট্যরচনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। সুদীর্ঘকালব্যাপী অনুসরণ ও পথসন্ধানের পালা শেষ হইয়া দ্বিখণ্ডিত জরাসন্ধ-মূর্তির পরিবর্তে ইহা এক অখণ্ড শিল্পসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন এখনও দীনবন্ধুর মত গার্হস্থ্য জীবনে ট্রাজেডির বীজ রোপণ করিতে বা প্রহসনে নিমচাঁদের মত প্রতিনিধিস্থানীয় অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তিনিই প্রথম নাটককে স্বদেশীয় পরিবেশে ও জাতীয় জীবনযাত্রার সহিত নিবিড়-সম্পর্কযুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। নাটকের ভবিষ্যৎ ইতিহাসও কিন্তু জাতীয় আত্মার সহিত সম্পূর্ণ সমীকরণের পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অতি-আধুনিক নাট্যকারগোষ্ঠীর কেহ কেহ অনেক চমৎকার নাটকরচনার দ্বারা বাংলার নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণে নাটক সম্বন্ধে আমাদের একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তি কোন দিনই সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। নাটকে আতিশয্য ও অসংযমের অস্তিত্ব, উপাদানসমন্বয়ের ত্রুটি, ভাববিন্যাস ও ফলশ্রুতির অপরিণতি, তত্ত্ব ও থিয়োরির অতিপ্রকট তীক্ষ্ণতা, সংলাপ ও ঘটনা, অনিবার্য জীবনবোধ ও প্রচারধর্মিতার অসঙ্গতি আমাদের শিল্পবোধের সর্বোত্তম আদর্শকে বরাবর ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আমরা যেখানে পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছি অথবা যেখানে জাতীয় প্রেরণাকে অবলম্বন করিয়াছি, সর্বত্রই কোন অভ্রান্ত নাট্যসংস্কার আমাদের নাটকসৃষ্টিকে অনবদ্য রূপ দিতে পারে নাই। কাজেই নাটকীয় চেতনা আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত হয় নাই, নাটক আমাদের মনের পরোক্ষ প্রকাশ মাত্র, ঘর ও পরের মিলন এখানে প্রায় কখনই সমন্বিত রূপসৃষ্টিতে আবির্ভূত হয় নাই, এইরূপ ধারণা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

নাট্যকার মধুসূদন

পরবর্তী নাট্যধারা

কাব্য-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টিপ্রতিভার যাদু-দণ্ডের আন্দোলনেই নব কল্পনারীতির বৈদ্যুতী শক্তি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হইল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী

কবিতাবলী'ই এই আকাশ-বাতাসে বিকীর্ণ ও প্রতিভার দিব্য আধারে ঘনীভূতরূপে বিধৃত বিদ্যুৎছটার প্রথম দীপ্ত শিল্পসুষম আত্মপ্রকাশ।

মধুসূদনের কাব্য পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাব

সাধারণতঃ আমরা এই কাব্যগুলিতে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখাইতে গিয়া মধুসূদনের বিভিন্ন প্রতীচ্য মহাকবির নিকট তথ্য ও পরিকল্পনাগত ঋণের হিসাব দিতেই ব্যস্ত হই, তাঁহার মহাকাব্যে আহৃত বিভিন্ন উপাদানের আকরনির্দেশকেই মুখ্য স্থান দিয়া থাকি। কিন্তু মধুসূদনের তথাকথিত মহাজনগোষ্ঠীর তালিকাবচনা বা তাঁহার ভাববস্তুর উৎস-সন্ধানই তাঁহার আশ্চর্য স্বীকরণশক্তি ও প্রয়োগদক্ষতার যথার্থ পরিমাপক নহে। পুরাতন উপাদানসমূহের নূতন উদ্দেশ্যসাধনেব উপযোগী বিন্যাস, বিদেশীয় বস্তুর সহিত প্রাচ্য আদর্শেব সামঞ্জস্যস্থাপন, পরিচিত ঘটনাবলীর মধ্যে নবতাৎপর্যসঞ্চার এবং এই মিশ্র ও দূরাহৃত উপকবণবিশৃঙ্খলার এক অখণ্ড আবহ-রচনা-কার্যে সার্থক নিয়োগ কবিকল্পনার এক অভাবনীয় নির্মাণশক্তির পরিচয়। মধুসূদন যেন মন্ত্রবলে এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে হোমার-ভার্জিল ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে একাসনে বসিয়াছেন, গ্রীক দেবদেবী ও হিন্দু দেবতা তাঁহাদের সমস্ত স্বরূপপার্থক্য ভুলিয়া একই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। রণক্ষেত্র ও প্রমোদকানন, বীর, মধুব ও করুণরস, রাজনীতির নির্মমতা ও গার্হস্থ্য জীবনের কোমল আকৃতি, অদৃষ্টেব দুর্জ্ঞেয়তা ও কর্মফলের অমোঘতা—এক কথায় অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের অপরিমেয় বৈচিত্র্য সব যেন এক স্বর্গমর্তপাতালব্যাপী সৃষ্টি-যজ্ঞশালায় আমন্ত্রিত হইয়া এই বিরাট যজ্ঞসম্পাদনে সহায়তা করিয়াছে। এই বিপুল আয়োজন এবং উহাব সূক্ষ্মতমরূপে পরিকল্পিত, নিখুঁত পরিণতি বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে এক অকল্পনীয় শক্তির আবির্ভাব ও উহার আশ্চর্য-কুশল প্রয়োগসিদ্ধি সূচিত করে। এযেন দ্বৈরথ সংগ্রামের সমতলভূমিতে গিরিসঙ্কটচারী, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর জটিল ব্যূহরচনা ও মুহূর্তে মুহূর্তে সুযোগসন্ধানী রণকৌশলের পরিবর্তনশীল দ্রুত ছন্দসমাবেশ।

আধুনিক মহাকাব্যের আদর্শ

যখন কোন কবি প্রাচীন মহাকাব্যের অনুসরণে আধুনিক মহাকাব্যরচনায় ব্রতী হন, তখন তাঁহাকে মহাকাব্যোপযোগী বিশেষ ভাবাবহ ও ফলশ্রুতিলাভের জন্য বিশেষ কল্পনারীতির প্রয়োগ ও কলাকৌশলের অবলম্বন করিতে হয়। ভারতে ব্যাস ও বাল্মীকির ও প্রতীচ্য দেশে হোমারের মহাকাব্য তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রেরণারই অনায়াসসাধনালব্ধ ফল। তাঁহাদের অনুভবে জীবনপ্রেরণার যে সহজ মহিমা প্রতিভাত হইয়াছিল,

তাহাই তাঁহাদের কাব্যে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি পাইয়াছে। হিন্দু ভারতের সাধনা র্জিত জীবনাদর্শ ও সহজ ধর্মসংস্কার, প্রাচীন গ্রীসের চিরাভ্যস্ত জীবনচর্চা হইতে উদ্ভূত সরল বলিষ্ঠতা ও শক্তিবাদ, দেবনির্ভর নিয়তিবোধ, উহার রাজনৈতিক বিখণ্ডতার ফলস্বরূপ ঈর্ষ্যা-অভিমান প্রভৃতি প্রাকৃত বৃত্তির প্রাদুর্ভাব, উহার বর্বরতা-মিশ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, ও উহার বিচিত্র-অভিজ্ঞতা-বিচ্ছুরিত লাবণ্য ও মহিমাচ্ছটা—এগুলি সবই কবিদের কোন শিল্পসচেতন অলঙ্করণপ্রয়াস ব্যতীতই তাঁহাদের কাব্যে নিজস্ব গৌরবে প্রতিফলিত। সমস্ত সমাজের অন্তরাত্মা, সমস্ত লৌকিক কাহিনী-কিংবদন্তীর ভাব ইতিহাস, মাথার উপরকার আকাশের সব প্রজ্বলন্ত ইঙ্গিত, মৃত্তিকার সমস্ত স্নিগ্ধ শ্যামলতা, জীবনযাত্রার সমস্ত উপরিতলার রুক্ষতা ও রসধারার ফল্গুপ্রবাহ এই মহাকাব্যের আধারে স্বতঃসঞ্চিত হইয়া উহার সমগ্র বহুমুখী সত্তাকে কবিকল্পনার সহজ অনুভববেদ্য রূপ দিয়াছে। কবির কল্পনাশক্তি যেন এখানে সচেতনভাবে ক্রিয়া না করিয়াই জীবনসমুদ্রের অপরিমেয় গভীরতা ও বিস্তৃতিকে এক অগস্ত্য-গণ্ডূষে পান করিয়াছে। হোমার বা ব্যাস-বাল্মীকির আর্টের কথা আমরা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করি না; তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেই এক সুবিশাল পটভূমিকা, এক গৌরবময় সংস্কৃতির সুমহান্ ইতিহাস অনায়াস-প্রতিবিম্বিত। ঋষির মন্ত্রোচ্চারণের মত আদি কবিগোষ্ঠীর সঙ্গীতে যেন সমস্ত অতীত সমুদ্রস্বননের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষে কথা বলিয়া উঠিয়াছে।

আদি যুগের মহাকবিগোষ্ঠী যে ঐতিহ্য-প্রাসাদে স্বচ্ছন্দবিচরণের অধিকার পাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালের মহাকাব্যকারেরা কাব্য-ইন্দ্রজালের বলে সেই প্রাসাদদ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। কাজেই ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের সঙ্গে মিলটন-মধুসূদনের একটা শিল্পগত মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্বতন কবিদের যে স্বভাব-সমুন্নতি, পরবর্তীরা শিল্পবিন্যাসের সচেতন প্রয়োগে, শব্দনির্বাচনে, ধ্বনিগাম্ভীর্যে, ভাষা ও ভাবের অভিজাত-মর্যাদায়, সর্বোপরি এক বিশাল পটভূমিকার সার্থক দ্যোতনায় তাহা অধিগত করিয়াছেন। সুতরাং মিলটন ও মধুসূদনের কবি-কল্পনা আরও গূঢ়ানুপ্রবেশী, আরও ব্যঞ্জনাময় ও বিস্মৃতপ্রায় অতীত-মহিমার উদ্বোধনে আরও কুশলী। ইলিয়াড-রামায়ণ-মহাভারতের রচয়িতাদের কাব্যবর্ণনার সহিত প্রত্যক্ষ সত্যের ব্যবধান অতি সামান্য। তাঁহারা যে সমস্ত ঘটনা ও ভাবের সংঘাত বিবৃত করিয়াছেন তাহারা অতীতের গোধূলিচ্ছায়াস্পৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের নিকট জলন্ত সত্যরূপে বর্তমান ছিল। যে উত্তাপ তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাহা তখনও

প্রাচীন ও আধুনিক মহাকাব্যের তুলনা

অনির্বাণ ইতিহাসের অগ্নিকুণ্ড হইতে সরাসরি কবিকল্পনার দিব্য দীপ্তিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। জীবনের উপাদান আর কাব্যের উদ্বর্তিত রূপান্তর প্রায় অব্যবহিত নৈকট্যে সমন্বিত। গঠনশিল্পের দিক দিয়াও তাঁহাদিগকে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। সমস্ত বিচিত্র ঘটনার পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী বাস্তব জীবনের সূত্রে গ্রথিত ও কবির অমোঘ নীতিবোধের দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া এক অনায়াস-সিদ্ধ নাটকীয় সংহতিতে ঘনবদ্ধ হইয়াছে। রামের জীবনকাহিনী, কুরুপাণ্ডবের ও গ্রীক-ট্রোজানের যুদ্ধবৃত্তান্ত কবির মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বাঁধিয়াছে ও আর্টের মহিমামণ্ডিত হইয়াছে।

যেমন পর্বত অরণ্য প্রভৃতি মহান্ প্রাকৃতিক রূপবিষয়ের মধ্যে মানবকল্পনাতীত এক বিরাট ও জটিল নির্মিতসুষমা লক্ষিত হয়, প্রাচীন মহাকাব্যের শিথিল-গ্রথিত বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যেও তেমনি একটি কবির সহজচেতনাপ্রসূত বিন্যাসপারিপাট্য পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে। পরবর্তীকালের মহাকাব্যকারকে কিন্তু এই অবয়ব-বিশালতা ও পরিবেশ-মহিমা পরিণত শিল্প-কৌশলের সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হয়। চিত্রকর যে ভাবে রেখা ও রংএর দ্বারা অসীম দূরত্বের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন, অর্বাচীন মহাকাব্যরচয়িতাকেও তেমনি পরোক্ষ উল্লেখে, দৃশ্য ও ঘটনার দূরচারিতায় এবং সঙ্কেত ও বর্ণময় শব্দপ্রয়োগে সেই সুদূরের ব্যঞ্জনা প্রক্ষেপ করা প্রয়োজন।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে কল্পনার এইরূপ শক্তির আশ্চর্য উদাহরণ মিলে। অতি পুরাতন রামরাবণের যুদ্ধকাহিনী দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে আমাদের মনে যে বর্ণোজ্জ্বল্য হারাইয়াছিল, যে অভ্যস্ত ভক্তিসংস্কারের প্রলেপে উহার বহ্নিগর্ভ উত্তেজনাকে স্নিগ্ধতার আবরণতলে সমাধি দিয়াছিল, মধুসূদন উহার সেই প্রাণময় জ্বলন্ত সত্তাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণ আদর্শ নরদেবতার প্রশস্তিতে মুখর; রাম সেখানে শাশ্বত ধর্মাদর্শের প্রতীক-রূপেই নিজ মানবিক পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। চৈতন্যধর্মে অনুপ্রাণিত কৃত্তিবাস সেই রামকে যুগোচিত ভক্তিসাধনার পাত্ররূপে, পরমকারুণিক পাপী-তাপী-উদ্ধারকর্তারূপে, ভাগ্যবিড়ম্বনা ও বিরহক্লেশপীড়িত, অশ্রুবিহ্বল প্রেমিকরূপে দেখাইয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের পূর্বসূরীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মধুসূদন ঊনবিংশ শতকের নবজাত স্বাধীনতাস্পৃহাকে তাঁহার মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবপ্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়া ও রামলক্ষ্মণের প্রচলিত প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া দেশাত্মবোধের প্রতীক্ রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে

মহাকাব্যে মধুসূদন

নায়কের মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি মহাকাব্যের দেহমধ্যে নূতন আত্মার সঞ্চার করিয়া উহাকে প্রাচীনের প্রথাবদ্ধ পুনরাবৃত্তি হইতে নবভাবের প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। এই যুগচেতনার বাহন হইয়া মহাকাব্যখানি যুগপ্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় নূতনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই নবতাৎপর্য-আরোপ, সুপ্রাচীন কাব্যরূপের জরাজীর্ণ ধমনীতে নূতনরক্তধারাসঞ্চার মধুসূদন-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কল্পনার এই যুগোপযোগী সঞ্জীবনী শক্তি তাঁহার দ্বারা পাশ্চাত্য প্রভাবের নিগূঢ় স্বীকরণ সূচিত করে। মহাকাব্যের যে হরধনুতে জ্যারোপণ অতি-ব্যবহারের জন্য শিথিল হইয়াছিল, মধুসূদন-প্রতিভা তাহাতে মৌলিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর নূতন জ্যা লাগাইয়া টান করিয়া বাঁধিল ও উহার টঙ্কারনির্ঘোষ ও অস্ত্রক্ষেপণশক্তি নবঅস্ত্রআবিষ্কারের গৌরব লাভ করিল।

মধুসূদনের নানা খণ্ড-আখ্যানসংযোজনার দ্বারা রসবৈচিত্র্যসম্পাদন, তাঁহার যুদ্ধপ্রস্তুতি ও রণক্ষেত্রবর্ণনা, তাঁহার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য-পরিস্ফুটনের উপায়-নির্ণয়, তাঁহার ঘটনাবিন্যাসে পরিমিতিবোধ ও কেন্দ্রসচেতনতা, তাঁহার বীর ও করুণরসের, হিন্দু প্রাচীন ভাবাদর্শের ও আধুনিক মনোবৃত্তির সমন্বয়, তাঁহার রচনার চিত্রধর্মিতা ও সংকেতশীলতা, সর্বোপরি তাঁহার তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র-দ্যোতনা—সবই কবিকল্পনার এক অভিনব লীলাময়তার নিদর্শন। এই কল্পনার স্বরূপপ্রকৃতি উহার অনুষ্ঠেয় উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে আশ্চর্যভাবে উপযোগী। ব্যাস ও হোমারের মত পটভূমিকার ব্যাপকতা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বহুলতা মধুসূদনের নাই—তাঁহার সংক্ষিপ্ততর পরিবেশে কয়েকটি মাত্র চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। সুতরাং মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবপক্ষীয় বা ইলিয়ডের গ্রীক ও ট্রোজানজাতীয় অসংখ্য বীরকুলের সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিত্বদ্যোতক চরিত্রপার্থক্য ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ মধুসূদনের নাই। তথাপি শ্রেণীগত সাধারণ লক্ষণের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপনির্ণয়ে কল্পনাশক্তির যে গূঢ়ানুপ্রবেশের প্রয়োজন তাহা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তাঁহার রাবণ একাধারে চিরকালের স্বেচ্ছাচারী ও দুর্দম-প্রকৃতি, ধর্মসঙ্কোচহীন অনার্য রাজার প্রতিনিধি, আবার অদৃষ্টরহস্যবিড়ম্বিত, বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, অশান্ত আধুনিক মানবেরও প্রতিমূর্তি। যে একসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক; তাহার সত্তার মধ্যে শ্রেণীচেতনার সহিত বর্তমান গোচিত অনির্দেশ্য বিহ্বলতাবোধ, এমন কি তাহার স্রষ্টার পরোক্ষ আত্মপ্রক্ষেপের ছায়াও যে আশ্চর্য সঙ্গতিলাভ করিয়াছে, বিসদৃশ উপাদানের যে যৌগিক ঐক্য নির্মিত হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্য কল্পনারই গূঢ়প্রভাব—

সঞ্জাত। মহাভারতের দুর্যোধন ও ইলিয়ডের ইউলিসিস-চরিত্রেও কতকটা এই ধরনের মানস জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ আরও সূক্ষ্মভাবে সঞ্জীবিত ও কবির প্রাণচেতনাস্পর্শে আরও বিদ্যুৎ-স্পন্দিত। প্রাচীন মহাকাব্য-গুলি লেখা হইবার পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে বেদনাস্মৃতি, যে অপরিহার্য জীবন-যন্ত্রণা মানবচিত্ততলে সঞ্চিত হইয়াছে, যে করুণ রস উদ্বেল হইয়া মানব-জীবনের মহাদেশকে দ্বৈপায়নত্বে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, মধুসূদনের বীররস তাহার সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া বর্বর শক্তিপরীক্ষা হইতে জীবনযন্ত্রণাস্পর্ধী, আত্মিক সংকল্পের দ্যোতনায় অর্থগূঢ় হইয়াছে। মধুসূদন-কল্পনার অভিনব শক্তি স্বল্পপরিসরের মধ্যে বীর ও করুণরসের এই অপূর্ব রাসায়নিক সমন্বয়-সাধনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মেঘগর্জনগম্ভীর ওজস্বিতা ও কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য-সাধন তাঁহার কবিকল্পনার সর্বত্র-প্রসারী, সদাসক্রিয় অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। দেহ ও আত্মার মিলনের এরূপ নয়সর্গব্যাপী, নিখুঁত দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী' একদিকে যেমন নূতন কাব্য-প্রকরণের নিদর্শন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার কল্পনার নব নব নির্মিতি-বৈচিত্র্যেরও পরিচয়বাহী। এই দুই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা বৈপ্লবিক চমক সৃষ্টি না করিলেও শান্তশ্রী মৃদু জ্যোতিতে উহার মৌলিকতাকে প্রকাশ করিয়াছে। কল্পনা কত বিচিত্রগামী ও নবসন্ধানী হইলে নূতন কাব্যাঙ্গিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, নূতন ভাবের উপযোগী দেহবিন্যাস রচনা করে তাহা এখানেই প্রমাণিত হইয়াছে। পত্রকাব্য রোমান কবি অভিড হইতে কত স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে স্থানান্তরিত ও ভারতীয় নারী-চরিত্রের মনোভূমিতে নবপল্লবিত হইয়াছে! আবার যে আত্মলীন ভাব-ভাবনার মৃদু উচ্ছ্বাস সনেটের কায়াদৃঢ়তা ও অনুভূতির সংযমনিবিড়তায় নিজ মূর্তি অঙ্কন করে তাহা মধুসূদনের কবিকল্পনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যমানচিত্রে প্রথম চিহ্নিত হইয়াছে। বাঙালী কবি-হৃদয়ে প্রথম এই ভাবকল্পনা সঞ্চারিত ও উহার উপযোগী রূপচেতনা শিল্পোৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সবই মধুসূদনের কল্পনার প্রেরণা-উৎস ও জীবনপ্রক্রিয়ার বিচিত্রতার সন্ধান দেয়।

মধুসূদনের অপ্রধান কাব্য

৩

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই পাশ্চাত্য প্রভাব আর একটি নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দর্যের দিক দিয়া বিভিন্ন জাতি ও যুগের মধ্যে

একটা রুচিসাম্য আবিষ্কার করা যায়। বিশেষতঃ ঐতিহ্যাশ্রয়ী মহাকাব্যসমূহকে পর্বতশৃঙ্গচূড়া হইতে পরিদৃশ্যমান দিগন্তরেখার ন্যায় পরস্পরসংসক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সহিত তুলনায় বাস্তবজীবননিষ্ঠ গদ্যসাহিত্য জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তীক্ষ্ণ প্রকাশ দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কল্পনাক্রিয়া যেন উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং কাব্য অপেক্ষা উপন্যাস বা প্রবন্ধসাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব স্বভাবতঃই সূক্ষ্মতর ও দুর্লক্ষ্যতর। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির গভীর প্রভাব সত্ত্বেও নিজ জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল নিষ্ঠা পোষণ করিতেন। নিজ প্রতিষ্ঠাভূমিতে দৃঢ়বদ্ধ না থাকিলে, নিজ জাতীয় চেতনার ভাববেষ্টনীতে আত্মরক্ষা না করিতে পারিলে কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে বিদেশীয় প্রভাব আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ বা আচার-আচরণ সহজেই গ্রহণ-বর্জন করা যায়। কিন্তু আত্মার যে গভীরে সৃষ্টিপ্রেরণা গুহাহিত, সেখানে নিজ স্থির জীবনপ্রজ্ঞা ও অধ্যাত্ম সংস্কারের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ছাড়া ঋণ-করা মানস ঐশ্বর্যকে সৃষ্টিশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে প্রথম দুইজন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মন্ত্রদীক্ষিত সাহিত্যস্রষ্টা অতীতে দৃঢ়সংসক্ত থাকিয়াই নূতনকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ ঐতিহ্যরচিত জীবনমধুচক্রে প্রতীচ্য ভাবকল্পনার মধু সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধকে আরও বিচিত্ররসাস্বাদী করিয়া তুলিয়াছেন। উভয়েই আশ্চর্য স্বীকরণ ও সমন্বয়শক্তির ফলস্বরূপ গদ্যে ও পদ্যে, কাব্যকল্পনায় ও জীবনসমীক্ষায়, এক একটি অভিনব তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মহাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব উপকরণে ও অলঙ্করণে, ওজস্বিতায় ও ভাব-মহিমায় সর্বত্র পরিস্ফুট, কোথাও বা মাত্রাসুষমা ছাড়াইয়াও অতিপরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য উপন্যাসে, রোমান্সে ও মননশীল, গূঢ়ানুভূতিমূলক রচনায় ইহা মৃত্তিকাভ্যন্তরপ্রবাহিণী রসধারার ন্যায় সাহিত্যে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া উহাকে এক অসাধারণ প্রাণোচ্ছল লাবণ্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি মোটের উপর পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূলসূত্র-অনুসরণে রচিত। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি উপন্যাসে চরিত্র-কল্পনা, ঘটনাবিন্যাস ও দ্বন্দ্বসমাধান বাঙলার সমাজজীবনের সহিত গ্রথিত ও উহারই ছন্দ ও ভাবপ্রেরণায় গতিশীল। আমরা তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপর স্কটের 'আইভানহো'র প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা

করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের পরিচয় দিয়াছি। সাধারণতঃ ব'র যুগের জীবনাদর্শ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে প্রায় সমপ্রকৃতিক; আর প্রণয়-প্রতিযোগিতায় ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব বর্তমান সমাজজীবনে যতটা দুর্লভ অতীত ক্ষাত্রশৌর্যের কালে ততটা ছিল না। যখন স্বয়ংবরপ্রথা প্রচলিত ছিল ও বীর্যশুল্ক নারীগ্রহণ যখন বিবাহের অন্যতম বৈধ প্রকাররূপে স্বীকৃত হইত, তখন জগৎসিংহ-আয়েষার সম্পর্ক-জটিলতাব পূ'ন-দৃষ্টান্ত খুঁজিতে প্রতী'্য আদর্শের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাহা হইলে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাব রোমান্সকে ভারতের ইতিহাস হইতে বাদ দিযা উহার অস্তিত্বের মূল ইউবোপীয় জীবনকাহিনীতে কল্পনা করিতে হয়। এই দাসমনোবৃত্তির আতিশয্যই আমাদেব বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। জ'ৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার সম্পর্কের সহিত আইভানহো-বোওয়েনা-রেবেকা-সম্পর্কের যে ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে তাহা যে উভয়ত্রই সাধারণ মানবিকবৃ'িসঞ্জাত, প্রত্যক্ষঅনুকবণজাত নয় তাহা জোব করিয়াই বলা যায়। জগৎসিংহের প্রণযোন্মেষে যুদ্ধকালীন সঙ্কটেব আকস্মিকতা আছে, অথচ হিন্দু সমাজনাতিব বাধা-নিষেধও ইহার উপর ক্রিয়াশীল। গড় মান্দাবণের জীবনযাত্রা অনেকটা সংস্কারমুক্ত ও স্ফূতিময় হইলেও, ইহাতে স্ত্রীস্বাধীনতা ও আনন্দোচ্ছলতার অশৃঙ্খলিত প্রাচুর্য থাকিলেও, ইহা সূক্ষ্মভাবে হিন্দু-আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত। ইহাকে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় জীবনছন্দের কৃত্রিম প্রতিচ্ছবি মনে কাবিবার কোন কারণ নাই। হয়ত ইহার ইতিহাস তথ্যবিক্ত ও কল্পনাস্ফীত; সমাজজীবনের উপর ইহার প্রভাবও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহা ব্যক্তিজীবনের খুব ঘনি' সম্পর্কে আসে না; সুদূর দিগন্তে দাঁড়াইয়া উহার উপর কিঞ্চিৎ বর্ণমায়া সংক্রামিত করে; কখনও বা উহার প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে দুই একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া ব্য'ক্তজীবনে ছোট-খাট ক্ষণস্থায়ী বহ্ন্যুৎসবের সৃষ্টি করে। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাসের উৎস পশ্চিমেয় ভাবাকাশ, উহার বস্তুবদ্ধ জীবনঘনতা নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব

বঙ্কিমের অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসও স্বদেশীয় জীবনকল্পনালালিত। 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর,' 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' ও তাঁহার স্বয়ংস্বীকৃত একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'— সকলেরই বহির্বেষ্টনী দেশীয় ইতিহাসরচিত ও অন্তরের সারনির্যাস হিন্দু ভাবাদর্শ-ক্ষরিত। কেবল উভয়ের মধ্যে স যোগসূত্রটি পাশ্চাত্য রীতির বয়নশিল্প হইতে গৃহীত। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্ত,

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

আনন্দমঠের ধর্মসাধনার সহিত অভিন্ন দেশাত্মবোধ, দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম ধর্মদীক্ষা ও সীতারামের অন্তরজীবনসমস্যা—এ সবই ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বিভিন্নমুখী প্রকাশ। কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক ইতিহাসকে এইরূপ সূক্ষ্ম ধর্মানুভূতির পরিপোষক আধাররূপে, ইতিহাসের দাবানলকে যজ্ঞবহ্নির হোমশিখা-রূপে কল্পনা করিতে চাহেন নাই ও চাহিলেও পারিতেন না। এক 'রাজসিংহ' ছাড়া অন্যত্র বঙ্কিম ইতিহাসের উত্তাপকে নিজ আদর্শ-অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতন উদ্দেশ্যে, নূতন তপশ্চর্যার প্রেরণারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। নিজ সংস্কৃতিতে অবিচল থাকিলে বিদেশীয় প্রভাবকেও যে একান্ত আপনার করিয়া লওয়া যায়, ঋণকরা ঐশ্বর্যকেও যে নিজ সনাতন লক্ষ্মীশ্রীর লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমের গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলিতে এই পাশ্চাত্য প্রভাব আরও সূক্ষ্ম ও অন্তরঙ্গ-ভাবে ক্রিয়াশীল। ইতিহাসের রাজবেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাদৃশ্যটি চিনাইয়া দেয়—রাজমহিমা ও শৌর্যাদর্শ, রাষ্ট্রসমস্যা ও যুদ্ধের নির্মম ছন্দ অনেকটা সার্বভৌম পদার্থ, দেশকালভেদে কিছু কিছু ছোটখাট পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণসাম্য সহজেই অনুভব করা যায়। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনেই দেশে দেশে ব্যবধান প্রচুর ও দুরতিক্রম্য, এক দেশের জীবনধারাকে অন্য দেশে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা আমাদের ঔচিত্যবোধ ও সাহিত্য-প্রেরণাকে পীড়িত করে। সেই খানেই বঙ্কিম-প্রতিভা প্রাচ্য জীবনছন্দের সহিত পাশ্চাত্য আবেগোচ্ছলতা ও দুর্দম মনোবৃত্তির তীব্র আত্মদ্বন্দ্বের আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়াছে। ইউরোপীয় জীবন-স্রোতের যে অপ্রতিরোধ্য জোয়ার উনিশ শতকের প্রথম পাদ হইতে তরলমতি, বিলাসপ্রিয় বাবুনন্দনকে সমাজনীতি ও সুরুচির সমস্ত আশ্রয় হইতে ছিন্ন করিয়া সর্বনাশের মরণমোহানায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাই কিছুকাল পরে স্থির ও চিরকালীন বেগ সঞ্চয় করিয়া উন্নততর ও আত্মসংবিদে দৃঢ় ব্যক্তিজীবনেও এক অন্তর্দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানস বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই মুহূর্তে, যখন বাহিরের বিক্ষেপ অন্তরের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মনোলোকের গূঢ় প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তখনই বাঙালীর জীবনসমস্যারূপায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে বাঙালী পরিবার-বিন্যাস, ভারতীয় ধর্মসংস্কার ও জীবনদর্শন ও পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব ও ভাবকল্পনা এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হইয়া বাহ্যঘটনার মধ্যে এক অসাধারণ তাৎপর্যগৌরব সঞ্চার করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য উপন্যাস

তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতেই এই রূপান্তরপ্রক্রিয়ার সমস্ত শিল্পকলা, ভাবগৌরব ও মনস্তত্ত্বনৈপুণ্যের সম্মিলিত শক্তির ধারণা করা যাইবে। ঐ দুই উপন্যাসের নায়কদ্বয় শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান ও চরিত্রবান্ যুবক, কোন বহিরাগত প্রভাব তাঁহাদের ভারসাম্য বিচলিত করিতে পারিবে না। তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষায় কতদূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন, বা সেই শিক্ষা হইতে তাঁহারা কোন নূতন বিপর্যয়কারী জীবনদর্শনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কি না, বঙ্কিম তাহা পাঠককে জানাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁহারা তৎকালোচিত শিক্ষাদীক্ষায় সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাদের সনাতন ধর্মবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠাও এই শিক্ষা দ্বারা কোন অংশে বিচলিত হয় নাই। তাঁহাদের প্রলোভন ও দুর্বলতা অন্তরের ব্যাপার, বাহিরের নয়, কোন নূতন সমাজচেতনাপ্রসূত নয়। এমন কি নগেন্দ্রের বিধবাবিবাহ, কোন সমাজনীতিসম্পর্কিত নয়, তাঁহার ব্যক্তিস্বভাবের দুর্দমনীয় রূপমোহের প্ররোচনা। গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন আধুনিক সমালোচকের ন্যায় তাহার বৈধব্যের প্রতি সমবেদনার জন্য নয়, তাহার জ্বলন্ত রূপবহ্নি ও ভ্রমরের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহার দ্বারা। মধুসূদনের প্রহসন দুইটিতে যেমন নায়কের চরিত্র ও আচরণের মূল তাহাদের বিশেষ সমাজ-প্রতিবেশান্বিত, ভক্তপ্রসাদ যেমন প্রাচীন ভণ্ড ও নবকুমার যেমন আধুনিক যণ্ডের প্রতিনিধি ও তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই, বঙ্কিমচন্দ্রে তাহার অনুরূপ কিছু দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র হয় সমাজ-প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ অবান্তর মনে করিয়াছেন, না হয় অন্তর্জীবনসমস্যার পরিপোষক শক্তিরূপে উহাকে ব্যক্তি-সত্তাকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৌতূহল ব্যক্তিজীবনে কেন্দ্রীভূত ও উহার রহস্যোদ্ভেদে নিয়োজিত।

এই ব্যক্তিজীবনসমস্যারূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জীবনঘটনাকে নিখুঁত ভাবে অনুবর্তন করিয়া উহার প্রবৃত্তিদ্বন্দ্বের শক্তি অসাধারণরূপে বৃদ্ধি ও উহার চরম ফলশ্রুতিকে আশ্চর্যরূপে মহিমান্বিত করিয়াছেন। বাঙালীর সনাতন অদৃষ্টবাদের সহিত পাশ্চাত্য জীবনসমীক্ষার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণশৃঙ্খলিত অমোঘ পরিণতির সংযোগ সাধন করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছেন। বাঙালীর তুচ্ছ, গতানুগতিক, ঘটনাচমকহীন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সংঘাতের তীব্রতা, ভাবের সমুন্নতি ও আদর্শের উত্তুঙ্গ মহিমা নিহিত আছে, এক একটি জীবনে এক সার্বভৌম তাৎপর্য বীজাকারে প্রস্তুত আছে এই শাশ্বত কিন্তু অজ্ঞাত সত্য বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রথম উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। মান-অভিমান,

প্রণয়-কলহ, প্রেমের দ্বৈত আকর্ষণ—এ সবই অতি প্রাচীন কাহিনী। কিন্তু বঙ্কিমের পাশ্চাত্যপ্রভাবপুষ্ট ভাবকল্পনায় এই পুরাতন, মারচা-ধরা উপকরণগুলি এক নূতন দীপ্তিতে ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভোঁতা পারিবারিক অস্ত্রগুলি, মিলন-বিরহ-মনোমালিন্যের স্পর্শসেঁতে, মলিন মানস তৈজসপত্রগুলি অভাবনীয় তীক্ষ্ণতা অর্জন করিয়াছে, মার্জিত, নূতন পাত্রের ন্যায় সূর্যরশ্মিপ্রতিঘাতী ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হইয়াছে। দরিদ্রের জীর্ণ কুটির ও ততোধিক জীর্ণতর গৃহসজ্জা এক মুহূর্তে রাজপ্রাসাদের অভিজাত মহিমায় ও চারু শিল্পসৌন্দর্যে বিকশিত হইয়াছে। এ যেন গৃহের মধ্যে এক অদৃশ্য আলোক-উৎস নিঃশব্দে ক্রিয়াশীল হইয়া যাহা কিছু ম্লান, বিবর্ণ ও উপেক্ষনীয় তাহাকে প্রখর দীপ্তিতে ও সুস্পষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা; যাহা কিছু শিথিল ও প্রথাজীর্ণতায় স্বল্পমূল্য ও ক্ষীণ ঔৎসুক্যের মৃদুতাপবাহী তাহাকে টান দিয়া সতেজ, পরিপূর্ণ উত্তপ্ত প্রাণচেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা; সহস্রের নামহীন জনতায় অবলুপ্ত ব্যক্তিসত্তার পুনরুদ্বোধন ও নব মূল্যায়ন। ভ্রমর, সূর্যমুখী, হীরা, রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল যেন বঙ্কিম-প্রতিভার যাদুদণ্ডস্পর্শে তাহাদের যুগযুগান্তের অর্ধস্তিমিত চেতনা ও অস্ফুটারিত মর্মবেদনা হইতে জাগিয়া এক মুহূর্তে তীক্ষ্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা ও বিস্তারে আমাদের রসবোধকে উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিম পুরাতনকে ত্যাগ করেন নাই বলিয়াই উঁহার মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে পুরাতন-বর্জনকারী তাঁহারা কেবল "দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাস" বিকীর্ণ করিয়াই আমাদিগকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-কল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়া

বঙ্কিমের মননশীল প্রবন্ধেও এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। কিন্তু এখানে যুক্তিবাদ, তথ্যসঞ্চয় ও বক্তব্যের মধ্যে বক্তার স্বরূপাভাস কোন মৌলিক শিল্পরূপান্তর ঘটায় নাই। আমরা ইহাদের সাহিত্যরীতির উৎকর্ষের মধ্যে বঙ্কিমমানসের পরিচয় পাই, তাঁহার বক্তব্যের স্বচ্ছ দর্পণে তাঁহার মুখের ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া অনুভব করি, কিন্তু কোন নূতন শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পাই না। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ মননশীল জীবনসমীক্ষা একটি অপূর্ব রসরূপে উদ্বর্তিত হইয়াছে। এখানে বঙ্কিম নিজেকে অর্ধ-পাগল, আফিং-খোর অথচ দার্শনিক চেতনাবিষ্ট কমলাকান্তরূপে কল্পনা করিয়া সেই তির্যক্ রশ্মিতে নিজ সমস্ত মননঅনুভূতিকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। এই আশ্চর্য রাসায়নিক সমন্বয়ের ইন্দ্রজালশক্তিতে এক অভিনব সৌন্দর্যবোধ ও জীবন-

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাৎপর্যদ্যোতনা রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব, ইউরোপীয় রীতি ও কল্পনা, দেশের বাস্তব সমস্যা ও তাহা হইতে উদ্ভূত এক বিশুদ্ধ ভাবসারগঠিত দেশাত্মবোধ সব মিলিয়া, যেমন জটিল যজ্ঞ-প্রক্রিয়ার পূর্ণাহুতি হইতে এক অভাবনীয় সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, তেমনি এক দিব্য মানসবৃত্তি এক অপূর্ব দ্যুতিময় লাবণ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। বঙ্কিম পাশ্চাত্য সোমরস পান করিয়া এক নূতন সাহিত্যিক অমরতায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কল্পনার ধারা গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকিলেও উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভবগম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া ঐ দুই ধারা পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক অখণ্ড মৌলিক সত্তায় পরিণত হইয়াছে। যেমন শুকতারার কম্পমান দীপ্তির সহিত নবোদ্গত অরুণরাগ নিশ্চিহ্নভাবে মিশাইয়া যায়, তেমনি রবীন্দ্রমানসে ভারতীয় ও প্রতীচ্য ভাবদৃষ্টি ও প্রকাশগূঢ়তা উৎস হইতেই এক হইয়া কবিচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছে, শাব্দিক ও ছান্দসিক-রূপগ্রহণের বহু পূর্বেই অনুভূতির মনোলীন স্তর হইতেই একই রসনির্ঝরে অভিস্নাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও শিল্পসাধনা দ্বৈমাতুর স্তন্যধারায় পুষ্ট হইয়াছে। এক দিকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও অভিব্যক্তিবাদ, একদিকে অসীমচেতনা, অন্যদিকে মানব প্রেমের অতি সুকুমার আকূতি তাঁহার কাব্যানুভূতিতে এমন সহজ ভাবে মিলিত হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে জোড়ের কোন চিহ্ন অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য। তাঁহার মন হইতে এই মিশ্র প্রবাহ অতি স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় ও তাঁহার কল্পনাশক্তির সমীকৃত প্রেরণায় উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার 'মানসী'তে প্রেমকবিতাগুলি উহাদের সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্যে ও সুরমূর্ছনার ভাবানুসারী তারতম্যে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাঁহার 'কচ ও দেবযানী' ও 'গান্ধারীর আবেদন'-এ মহাভারতীয় আবহ ও আধুনিক গীতিময়তা, নাটকীয়তা ও নীতিতত্ত্ব এক অখণ্ড রসসত্তায় মিলিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' মহাভারতীয় কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও পুরাতন বিষয়কে এক নূতন ভাবতাৎপর্যে মণ্ডিত ও এক অভিনব সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতি-অতিসারী, অথচ উচ্চতর নীতিবোধাশ্রয়ী ব্যঞ্জনায় রহস্যময় করিয়াছে। তথাপি ইহাকে আরোপিত

রবীন্দ্রনাথ

প্রাচ্য—প্রতীচ্য ভাব—দৃষ্টির সমন্বয়

পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন বলিয়া মনে হয় না, ইহা যেন মহাভারতীয় কাহিনীরই অন্তর্গূঢ় সৌরভের বাহিরে মুক্তি। তাঁহার 'বলাকা'য় বার্গস-এর আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে ঔপনিষদিক অগ্রগতির অধ্যাত্ম আবেগ ও জড়ের অনুগমনবেগ ও চেতনের জ্যোতিঃ-স্পন্দনের নিগূঢ় মিলন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাহা সৌরমণ্ডলের গতিতত্ত্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে তাহাই প্রাচ্যদেশীয় মহাকবির কাব্যে অধ্যাত্ম চেতনার স্বরূপনির্ণয়ে জ্যোতির্ময় ও আবেগস্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা সবই ভারতীয় অধ্যাত্মপ্রত্যয়প্রসূত। কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে যে নরনারীপ্রেমের আত্মহারা, বাহ্যচেতনালোপী, বিপর্যয়ী আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রাচ্য ভগবৎপ্রেমিকের নজির থাকিলেও ইহাতে যে অন্ততঃ শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্য মরমিয়া কবিদের প্রভাবেরও কিছু স্থান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রভাবের বিমিশ্রতা স্বীকার করিলেও ইহারা কবিচেতনা হইতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতিরূপে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার মনে তত্ত্ব ও ভাবকল্পনা এক আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য অগ্নিতে গলিয়া এক অভিনব সংশ্লেষক্রিয়ায় একীভূত হইয়াছে। ইহার উৎসসন্ধান অপেক্ষা ইহার রসাস্বাদনই আমাদের নিকট অধিকতর স্বাভাবিক মনে হয়। তাঁহার 'উর্বশী'ও পৌরাণিক নারী না কবিকল্পনাসৃষ্টা, অনন্তকাল ও মানব ইতিহাসের সমস্তস্তরব্যাপিনী, সমস্ত নীতিশাসন ও গার্হস্থ্য সম্পর্কের অতীতা, বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং আশাভঙ্গ ও আদর্শচ্যুতির যুগযুগান্তরসঞ্চিত বেদনাবাষ্পে অন্তর্হিতা বঞ্চনাময়ী রূপপ্রতিমা, মানবদুঃখ ও ইতিহাস-প্রমাদের ক্রান্তিবিন্দুচারিণী মহামায়া—এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা মোটেই সহজসাধ্য নয়। উর্বশীর এই পরিকল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের স্বর্ণসূত্রগুলি এমন নিপুণ বয়নশিল্পে একত্র গ্রথিত হইয়াছে যে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না কাটিয়া উহাকে রহস্যসন্ধানী মানবাত্মার সংশয়কণ্টকবৃন্তে বিকশিত একটি পরমরমণীয় আদর্শস্বপ্নপ্রসূনরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত ও শোভন।

যেখানে রবীন্দ্রকাব্য স্পষ্টতঃ প্রাচ্যভাবভাবিত—যেমন তাঁহার মৃত্যুপূর্ব শেষ দশ বৎসরের কাব্য—সেখানেও উহার প্রকাশে পাশ্চাত্য কল্পনারীতি, উহার চিত্রধর্ম, উহারআবেগছন্দ ও শিল্পাদর্শ লইয়া কবির গভীরতম প্রত্যয়কে নবরূপ দিয়াছে। হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব, বর্ণময় মানবিক সত্তার শুভ্র নিরঞ্জন আত্মার জ্যোতিঃপরমাণুতে বিলুপ্তি, মৃত্যুসাগরসঙ্গমে উত্তীর্ণপ্রায় মানবাত্মার নিঃসঙ্গ ভাবশূন্যতা ও আদিম বিশুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন—এসব প্রক্রিয়াই শিল্পরীতির

প্রয়োগকৌশলে পাঠকের উপলব্ধির নিকট প্রত্যক্ষসত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এখানে কবির অন্তরঙ্গতম সংস্কার কাব্যচেতনার কষ্টিপাথরে সুমার্জিত হইয়া স্বর্ণদীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কবির যে মন রূপকল্পনা করে ও যে গঠনশক্তি তাহাকে মূর্তি দেয় এই উভয় উপাদান বিভিন্ন কাল ও সংস্কৃতি-পরিবেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াও এক অপরূপ সৃষ্টিকার্যে সহযোগিতা করিয়াছে। দুই জাতীয় কল্পনা-কল্পতরুর দুই প্রকারের বীজ তাঁহার অন্তরের সৃষ্টির গোপন-গভীর গুহায় এক সঙ্গে পড়িয়া সেই আঁধারের মধ্যেই এক হইয়াছে ও পরিণামে এক অভাবনীয় কল্পবৃক্ষের স্বাদ ও রস একাধারে মিশ্রিত করিয়াছে। ইহাই রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের স্বরূপ।

রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের স্বরূপ

রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যান্য বিভাগে, বিশেষতঃ তাঁহার ছোটগল্পে, একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রমানস অতি সহজেই নিজ দেশের জীবনযাত্রা আঁকিতে গিয়া উহার মধ্যে একটা দেশকালাতীত, সার্বভৌম জীবনাদর্শের নিগূঢ় ছন্দ অনুভব করিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথের কুলীনকুমারী মহামায়া নিজ প্রখর রূপদ্যুতির মধ্যে শ্রাবণনিশীথিনীর সুনিবিড় রহস্য-উদ্ভাস জাগাইয়াছে ও তাহার অনমনীয় কৌলীন্যগর্ব বাঙলার সমাজ বৈশিষ্ট্যের ফল হইলেও ইহারই পিছনে যেন সকল দেশের সমস্ত সুন্দরী নারীর রূপাভিমানের অহঙ্কার ও সংকল্পদার্ঢ্যের প্রতিচ্ছায়া মিলিত হইয়াছে। যে বাঙালী মেয়ে হইয়াও বিশ্বের সুন্দরীসমাজের প্রতিনিধি। সে যখন তাহার বিমূঢ় প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিরুদ্দেশযাত্রায় পা বাড়াইল, তখনই সে বাঙালীর নিজস্ব পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া বিশ্ববাসিনীর অনির্দেশ্যতায় আত্মগোপন করিল। 'অতিথি' গল্পের তারাপদ বাঙালী নিশ্চয়ই, বাঙালী প্রতিবেশে লালিত ও বাঙালীর কলাসংস্কৃতির রসপানে তাহার মন পুষ্ট ও লালিত্যময়। কিন্তু তাহার জীবনের সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পরিধি-বিস্তার অনুধাবন করিলে তাহার বাঙালীত্ব নির্মোকের ন্যায় খসিয়া পড়ে ও তাহার একটি সাঙ্কেতিক, বিশ্বমানবিক পরিচয়ই ধীরে ধীরে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। পৃথিবীর এত বিচিত্র আবেদন স্পর্শ ও শোষণ করিবার এই অগস্ত্য-শক্তি সে কোথা হইতে অর্জন করিল? রবীন্দ্র-কল্পনা এক গৃহকোণে আবদ্ধ বাঙালী তরুণকে, এক ঘর বাঁধিবার কল্পনায় মুগ্ধচিত্ত প্রেমিককে হঠাৎ চলমান ধরিত্রীর আহ্বান শোনাইয়া উহাকে বিশ্বপথিক করিয়া ছাড়িয়াছে। তাঁহার 'ক্ষুধিত পাষাণ'—ইতিহাসপর্বের এক সঙ্কীর্ণ স্মৃতিচর্যাকে অতিপ্রাকৃত আবহতার শাশ্বত বিস্ময়ে রূপান্তরিত করিয়াছে—ভোগমুগ্ধ ইন্দ্রিয়লালসা সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সত্তায় উদ্বর্তিত হইয়া জন্মান্তরীণ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

মোহবিভ্রমরূপে মানবচিত্তে অক্ষয় আসন পাতিয়াছে। 'মনিহারা'-য় বাঙালী পুরুষের স্ত্রৈণ আসক্তি ও বাঙালী নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা এক প্রেতলোকের মায়াজালের ফাঁস বয়ন করিয়াছে—যাহা জীবনে একের কাহিনী ছিল তাহা জীবনান্তের পর সার্বভৌম রূপকসত্তায় পুনর্জীবিত হইয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্তই রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শ ও ভাবচেতনা কিরূপ সূক্ষ্মভাবে মিলিত হইয়া আঞ্চলিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমগ্র বিশ্বজীবনের সুরটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহার চমৎকার নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই দুইটি সুরের মিশ্রণের মধ্যে জোড়াতালি দেওয়ার প্রবণতা কতকটা বিসদৃশভাবে প্রকট হইয়াছে। এমন কি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'-তেও নায়কের ধর্মাচারমূঢ় ও পরদেশবিদ্বেষান্ধ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা উদার বিশ্বমানবিকতায় রূপান্তরিত হইয়াছে সহজ সমীকরণপ্রক্রিয়ার নয়, আকস্মিক রূঢ় ঘটনাভিঘাতে। গোরার এই অতর্কিত রূপান্তর সমস্তজীবনব্যাপী আদর্শের অস্বীকৃতিরূপে একটা নূতন ভাবপ্রবাহের বিপর্যয়কারী শক্তির নিকট হঠাৎ আত্মসমর্পণ বলিয়াই মনে হয়। এখানে দুইটি রসধাবা ধীরে ধীরে দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে একাত্ম হইয়া মিশিয়া যায় নাই, এক অন্যকে বলপূর্বক স্থানচ্যুত করিয়াছে। সুচরিতার সহিত বিবাহের পর গোরা তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়া এই নবার্জিত আদর্শকে কি নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে, উহাকে ঘিরিয়া আর কি অভিনব কল্পনামুগ্ধতার জাল বয়ন করিবে, আর কিরূপ দুর্বার আত্মদ্বন্দ্বে তাহার সমস্ত সত্তা দ্বিধাবিদীর্ণ হইবে আমরা তাহার কোন পূর্বাভাসই পাই না। সুচরিতাকে লইয়া সে যে আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া নবজীবনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পর লছমনিয়ার হাতে একগ্লাস জল খাওয়ার মত তুচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনা করিয়াই তাহার আর কোন কাজ অবশিষ্ট রহিল না। মনে হয় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর মত ক্ষুব্ধ, ব্যর্থকাম, আত্মরোমন্থনরত মানবাত্মার ম্লানচ্ছায়াকে ঘনতর ও দীর্ঘতর করিবার কাজেই উৎসর্গিত হইবে। শেষ মুহূর্তে গলাধঃকৃত খাদ্য জীবনীশক্তি বাড়াইবার প্রয়োজনে লাগিবে না।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

অন্যান্য উপন্যাসের সমস্যাসমূহও ঠিক বাঙালীজীবনকেন্দ্রিক হয় নাই—পশ্চিমের অনভ্যস্ত তীক্ষ্ণতা উহার বৃত্তসম্পূর্ণতাকে বার বার বিদীর্ণ ও ব্যাহত করিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র বিম[illegible], 'চার [illegible]য়'-এর শচীশ-দামিনী, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য-অমিত [illegible]ী-মধুসূদন সকলে মিলিয়া

যে খরধার জীবননদীতে সমস্যাসঙ্কুল ঘূর্ণীচক্র উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও বাঙালী জীবনাদর্শের মগ্নশৈল হয় আবর্তকে আরও জটিল করিয়াছে না হয় বিপরীতমুখী ধারার একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস প্রবর্তন করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর এই তরঙ্গোৎক্ষেপ বাঙালী জীবন-তটের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বহু পরিমাণে উপকূলস্থ ভূভাগকে উৎপ্লাবিত করিবার দিকেই ঝুঁকিয়াছে। কাব্যে ও ছোটগল্পে যেরূপ পরিণত সমীকরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, উপন্যাসক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমই ঘটিয়াছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে উপন্যাস দ্রুত-পরিবর্তনশীল, নানা স্রোতোধারায় খণ্ডিত-বিচ্ছিন্ন জীবনরাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। এখানে অন্তর-আলোড়নের বেগ-পরিমাপ ও বাহিরের রূপরেখার নব নব সীমানির্দেশই বড় কথা। এখানে আগে বস্তুপ্রাচুর্য ও ভাবসংঘাত, পরে রসপরিণতি। এখানে রস কোনও ধ্যানসাধনানির্ভর নয়, বিচিত্রবেগদ্যোতনারই আনুষঙ্গিক সূক্ষ্মতর মন্থননির্যাস। এখানে রসসমুদ্রের সার্বিক বিস্তার নয়। নির্ঝরের চলার ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত, অনিয়মিত, অসমপরিমাণ রসবর্ষণ। কাব্যে ও ছোটগল্পে বিসদৃশ উপাদানের রসসমন্বয়ের পর তবে রূপমূর্তিতে প্রকাশ; উপন্যাসে লেখকের জীবনকল্পনার সমস্ত আকস্মিকতা ও অন্তর্বিরোধকে অসমাহিত রাখিয়াই উহার বৈচিত্র্য-উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। উপন্যাসক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে বা পশ্চিমপ্রভাবিত বাঙলাকে অসংস্কৃত রূপেই আবাহন জানাইয়াছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র। তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াও যে বিক্ষেপ-বিষকে সম্পূর্ণভাবে অমৃতে রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যে সেই বিক্ষেপ-মাদকতা, সেই বৈচিত্র্য-উপভোগের ব্যাধি রস-শোধনের সমস্ত দায়িত্ব এড়াইয়া বাংলা কথাসাহিত্যের সর্বদেহমনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবুকতাময় রচনা ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মনন ও দূরগামী ভাবকল্পনা তাঁহার সমন্বয়শীল মনের পরিচয় বহন করে। প্রাচ্য ও ইউরোপীয় উভয়রূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও রসচেতনার সার্থক মিলনের ফলেই এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইয়াছে।

৫

অতি-সাম্প্রতিক যুগে এই অনুশীলনজাত সমন্বয় আবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। এখন সর্ববিধ বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় ভাবভূমিচ্যুত ও ঐতিহ্যসংস্কারভ্রষ্ট হইয়া

আন্তর্জাতিকতার মনোভূমি হইতে রস-আকর্ষণের কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী। স্বাদেশিকতার শ্যামল ভূমি ছাড়িয়া এখন আমাদের সাহিত্যিকেরা আন্তর্জাতিক মহাকাশে পক্ষ-বিস্তারকামী। বিভিন্ন দেশের মানুষে আর বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যসংস্কারে আর কোন বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইতেছে না। সাহিত্য-সৃষ্টিতে জাতীয়তার সুর এখন অনুদার সংকীর্ণতার লক্ষণরূপে নিন্দিত। সার্বজনীন ভাবপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিলেই এখন সাহিত্যিক অমরতার কূলে পৌঁছান সুনিশ্চিত। বিশ্বমানবিকতা যে বিভিন্নজাতীয় মানবিকতার সম্পূর্ণ উন্মূলনে নয়, উহার রসানুকূল সংশ্লেষে এই সত্য যেন বর্তমানে অস্বীকৃত। সমস্ত বর্ণবৈচিত্র্য মুছিয়া ফেলার দ্বারাই যে শাশ্বত সার্বভৌম সাহিত্য সৃষ্ট হইবে না, পরন্তু প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সূক্ষ্মতর অভিব্যঞ্জনার সাহায্যে এক নিগূঢ় সার্বভৌমতাবোধ উদ্দীপ্ত করাই যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কাজ এ বোধ আমাদের মনে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আকাশের নিঃসীম, উদার বিস্তার আপাততঃ খুব আকর্ষণীয় মনে হয়; কিন্তু উহার অপর নাম শূন্যতা; সেখানে হয়ত মানবচিত্তের উপযোগী রসবস্তু উৎপন্ন করা যায় না। রসবস্তু সৃষ্টি করিতে হইলে বিচিত্রসম্পৎশালিনী, বিশেষজীবনছন্দসমন্বিতা একটি ভৌগোলিক ও মানবিক সীমার মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষকে আবিষ্কার করিতে হইবে—বিশেষবর্জনে যে নির্বিশেষত্ব তাহা দার্শনিক ভাবকুহক, স্বাদযোগ্য সৌন্দর্যসত্তা নয়।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য

বিশেষতঃ সাহিত্যসৃষ্টির ভাষাই এই বায়ুভূত সার্বজনীনতার পরিপন্থী। প্রত্যেক ভাষা এক একটি দেশের বিশেষজীবনরসপুষ্ট, সাহিত্যস্মৃতি লালিত যুগযুগান্তরের অনুশীলনজাতভাবাবহ ও ভাবানুষঙ্গসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে হইলে একটি দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিতেই হইবে। আন্তর্জাতিক ভাববস্তুকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবার প্রস্তুতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজন। নতুবা এক দেশের ভাব অন্য দেশের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে কিছু না কিছু অনতিক্রম্য ব্যবধান পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবেই। অবশ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের নিবিড়তা ও জীবনাদর্শের ক্রমবর্ধমান সাম্যের জন্য তাহাদের সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যেও অনেকটা অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি এখন রুশ বা জার্মান সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদ অনেক সূক্ষ্মরুচি পাঠকের মনেই কিছু না কিছু অতৃপ্তি জাগায়। উনবিংশ শতকের ইংরাজি গল্পশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র

আন্তর্জাতিক ভাববস্তু-গ্রহণের উপায়

কার্লাইলই যেমন জার্মান সাহিত্যের দার্শনিক অতীন্দ্রিয়বাদ ও আত্মসন্ধানের অসহ্য অন্তর্বেদনার দিক্ দিয়া ঐ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর প্রায় সমধর্মী ছিলেন, তেমনি প্রকাশের দিক দিয়াও তাঁহাদের রচনারীতির অমসৃণ বাক্যগঠন ও গভীরতম প্রত্যয়ের অনিবার্য উৎক্ষেপজাত, উচ্ছ্বসিত অতিকথনের দ্বারা মুহুর্মুহু-বিচলিত ভাষণভঙ্গীরও প্রায় নিখুঁত অনুবর্তন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জার্মান আত্মার গূঢ়সঞ্চারী, বিসর্পিত গতিরেখা তাঁহার প্রকাশবৈশিষ্ট্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহাতে ভাবের সহিত ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি প্রমাণিত হয়। সুতরাং বাংলাভাষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কবিগোষ্ঠীর বিশেষত্ব ফুটাইতে হইলে মূল কবিদের ভাষার অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এইরূপ চেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু আত্মসংবিৎহীন, নিজ ঐতিহ্যভূমিবিশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের পক্ষে বৈদেশিক প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া উহাকে নূতন শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও সহজসাধ্য নয়। আত্মার গভীরই অপর আত্মার গভীরকে আকর্ষণ করিতে পারে, এই সত্য মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক বৈদেশিক প্রভাব-গ্রহণের অন্তরায়

সাম্প্রতিক যুগে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিদেশীয়-প্রভাব-স্বীকরণ ফলের দিক দিয়া শুভ হইতেছে না। ইংরাজি সংস্কৃতির সহিত প্রথম পরিচয়ের যুগে আমাদের ভারসাম্য যে কারণে বিচলিত হইয়াছিল, সাম্প্রত সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে। সেকালে আমাদের রক্ষণশীলতাই আমাদের নূতন ভাবধারা গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় ছিল; একালে আমাদের স্থির প্রত্যয়ের আত্যন্তিক অভাব ও বিদেশ হইতে আহরণের অতিলোলুপতাই সেই বাধা ঘটাইতেছে। একালে মাইকেলের কল্পনা ও ছন্দ-স্বাধীনতা ও বঙ্কিমের নারীপ্রেমের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা যেমন আমাদের গোঁড়া মনোবৃত্তিকে বিমুখ করিয়াছিল, একালে তেমনি আমাদের গ্রহণশীলতার নির্বিকার আতিশয্যই সেই একইপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। মাইকেলের রাক্ষসকুলের প্রতি সহানুভূতি ও রামলক্ষ্মণের প্রতি আপেক্ষিক শ্রদ্ধাহীনতা আমাদের ধর্মাসক্ত মনে যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করিয়া তাঁহার প্রতিভার রসাস্বাদনের প্রতি আমাদিগকে অক্ষম করিয়াছিল বা বঙ্কিমের দেবমন্দিরে প্রণয়োন্মেষের কাহিনী, সূর্যমুখীর পতিগৃহত্যাগ ও ভ্রমরের দুরন্ত অভিমান আমাদের লোকাচারপুষ্ট ঔচিত্যবোধের প্রতি যে নিদারুণ আঘাত হানিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রশংসনীয় জীবননিষ্ঠার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত করিয়াছিল তাহা অতীত সমালোচনা-বিভ্রান্তির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সেখানে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি

অন্ধ আনুগত্য আমাদের আধুনিককে অভিনন্দন জানাইবার সহজ শক্তিকে ব্যাহত করিয়াছে। বর্তমানে ইহার ঠিক বিপরীত চিত্র। অতি-আধুনিক যুগের আবিল ভাবপ্লাবন আমাদের রুচিপ্রত্যয়ের সমস্ত দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই প্লাবনকে আত্মসাৎ করা দূরের কথা, উহার তোড়ে আমাদের সুস্থ জীবনবোধ ও শিল্পসুষমা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক কাব্য যেন বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দৃশ্য মনে জাগাইয়া দেয়। ইহাতে কত সাহিত্যের কত ভাঙা-চোরা খণ্ড, কত জ্ঞানভাণ্ডারের কত বিচ্ছিন্ন টুকরা, কত স্মৃতিসঞ্চয় হইতে ভাসিয়া-আসা সংগীতের রেশ ও কল্পনার অসংলগ্ন পুচ্ছাংশ, কত অনির্দেশ্য স্বপ্ন ও অবচেতন মনের উদ্‌গার এক অস্বাভাবিক সমাবেশে স্তূপীকৃত হইয়া প্রকৃতি-বিপর্যয়ের উদ্বেগজনক সাক্ষ্য দিতেছে। উপন্যাস-ছোটগল্পে যে মানুষের সন্ধান মিলে, তাহারা দেশকাল ও পরিবেশের সহিত নিঃসম্পর্ক মানবিক সত্তার এক প্রতীকী ছায়া, তাহাদের চিন্তা ও আচরণের পিছনে কোন সমগ্র সংস্কৃতির ও জীবনদর্শনের বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞানচিহ্ন নাই, তাহাদের ক্ষণিক খেয়ালের বুদ্‌বুদ কোন অভ্যস্ত মানস ক্রিয়ার স্থির প্রভাব নির্দেশ করে না। প্রায়ই গোটা মানুষের বদলে তাহার একটা মানস খণ্ডাংশ, তাহার কোন গূঢ়সঞ্চারী, একক বৃত্তি তাহার এক অকারণ, অমূল কল্পনাবিভ্রম তাহার বায়বী সত্তার গবাক্ষ ইঙ্গিতরূপে উঁকি মারিয়া আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলে। এই সূক্ষ্ম ভাবদ্যোতনা সময় সময় অসাধারণ শিল্পোৎকর্ষের চিহ্ন বহন করে, কিন্তু কোন স্থির জীবনবোধের সহিত অসংশ্লিষ্ট বলিয়া সংশয় জাগে যে সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশ-পটে বর্ণোচ্ছ্বাসের ন্যায় এই সৌন্দর্যমরীচিকা অচিরে আমাদের মানসপট হইতে বিলুপ্ত হইবে। এই অভিমত নিশ্চয় সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় নয়, কিন্তু ইহার প্রেরণায় ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে যে ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ প্রকটতর হইতেছে, যে কেন্দ্রহীন কল্পনাবিকাশের খদ্যোতদীপ্তি উদ্‌ভ্রান্তি জাগাইতেছে সেই মৌলিক দুর্বলতারই ইহা কারণ-নির্দেশ-প্রয়াস। বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া, এই ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে চোখে ধাঁধা লাগাইয়া যে আমরা মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির পথে চলিয়াছি তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। সেই দিক্‌ দিয়া আধুনিক সাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব, যদিও ইহার মধ্যে নানা নূতন সম্ভাবনার বীজ ভবিষ্যৎ উন্মেষের প্রতীক্ষা করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ মহাকবির হাতে নূতন সৌন্দর্যসংশ্লেষের উপাদান যোগাইতে পারে, তথাপি আপাততঃ আমাদের অবিমিশ্র অভিনন্দনের অধিকারী হয় নাই এই সিদ্ধান্তে পৌছানই অনিবার্য মনে হইতেছে।

আধুনিক সাহিত্যের স্বভাব

আদর্শ প্রশ্নাবলী (প্রথম খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

১। বাংলা ভাষায় আর্যপূর্ব তথা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাগত উপাদান কী পরিমাণ আছে তাহা উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। বাংলা ভাষা কোন্ ভাষা হইতে সরাসরি উদ্ভূত? সে ভাষার প্রধান লক্ষণগুলি কী? উদাহরণসহ বিবৃত কর।

৩। প্রাচীন বাংলাভাষার লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৪। মধ্যযুগের (১৩৫০—১৮০০) বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তাহার বিবরণ দাও। প্রাচীন বাংলার লক্ষণই বা কী কী তাহা যতদূর জান লিখ।

৬ বাংলাভাষার আদিযুগের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য কোন্ কোন্ উপাদান গ্রহণ করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে রচিত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে কী কী উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে? এই সকল উপাদানের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

(ক. বি., এম.,এ. ১৯৫৪)

২। প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) সাহিত্যের বিচিত্র ধারা সংকুচিত হইয়া বাংলা দেশে শুধু যে ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যরচনাই প্রাধান্য লাভ করিল ইহার কারণ কী? এই ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সহিত কতটা যোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার হেতু নির্দেশপূর্বক আলোচনা কর।

(ক. বি., এম ,এ., ১৯৫৫)

৩। বাংলা দেশে রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কী কী উপাদান সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কর।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টীকা লিখ—সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, রামচরিত, জয়দেব, গাথাসপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

১। ছন্দ, ভাষা ও কাব্যরীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নিজস্বরূপ বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্য দিয়া কতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যুক্তি ও উদাহরণ সহিত বিশদ ভাবে আলোচনা কর। (ক. বি., এম. এ., ১৯৫৮)

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের স্থান নির্ণয় কর।

৩। বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে বিদ্যাপতির প্রভাবের উদাহরণসহ বিবরণ দাও।

৪। কেউ কেউ মনে করেন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের যা কিছু মূল্য সবই ভাষাতত্ত্বগত, তার সাহিত্যিক মূল্য প্রায় নগণ্য। কিন্তু অন্য মতে, সাহিত্যিক মূল্যের বিচারে এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ'—এ বিষয়ে তোমার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত কর।

৫। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যরচনার আনুমানিক কালের বিচার করিয়া কবি ও তাঁহার কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলিতে কী বোঝ? এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

৭। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—এই তিন কবির রচনার তুলনা করিয়া সংক্ষেপে প্রবন্ধ লেখ।

৮। বাংলা কাব্যসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান কোথায় তাহা নিরূপণ কর।

৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে কোন্ সময়কে প্রাথমিক বলিয়া চিহ্নিত করা যায়? এই প্রাথমিক যুগের সাহিত্যের পরিচয় দাও এবং উহার সাহিত্যিক মূল্য কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা কর।

(ক. বি., এম.এ ১৯৫৬)

পঞ্চম অধ্যায়

১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাল বিষয়ে আলোচনা কর। ইহার কাব্য প্রকাশিত হইবার পর অনেককাল ধরিয়া অন্য কোনো চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই কেন? (ক. বি., ১৯৫৭)

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে? তাহার কাব্যের সাধারণ পরিচয় দাও। (ক. বি., ১৯৫৯)

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিযুগের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে যে কোনও একজনের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৯)

৪। তোমার মতে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাহাকে বলা যাইতে পারে? তাঁহার রচনাকাল ও কাব্যবৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(ক. বি. ১৯৬০)

৫। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠকবি সম্বন্ধে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ কর।

৬। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া মনসামঙ্গলে সেই লক্ষণের দৃষ্টান্ত দাও। (ক. বি. ১৯৬৩)

৭। ধর্মমঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে কোন একজনের জীবনকথা আলোচনা কর। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত তুলনায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

৮। মনসামঙ্গল কাব্যধারার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং ঐ কাব্যধারার সমাজজীবনের যে সাধারণ চিত্র পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ক. বি. অনার্স ১৯ ৩)

৯। মনসামঙ্গল কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত কর এবং এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (ক. বি অনার্স ১৯ ৫)

১০। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট এক রীতির আখ্যানকাব্যকে মঙ্গল এবং পাঁচালী বলা হইত কেন? এই প্রসঙ্গে এ রীতির কাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

১১। 'মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর অন্তরালেই যেন লৌকিক দেবদেবীপূজা প্রবর্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।'—মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া উক্তিটি বিচার কর।

১২। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে শিবায়ন অন্নদামঙ্গল দুর্গামঙ্গল ও কালিকামঙ্গল জাতীয় যে নূতন ধরণের মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যযুগ প্রারম্ভের আদি মঙ্গলকাব্যের ধারা ও আদর্শ কতটা অনুসৃত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর। এই নবতর বিকাশগুলিকে খাঁটি মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা কতদূর সংগত সে বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্তকর। (ক. বি. এ ১৯৫৪)

১৩। বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কোনটির কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা তাহা বিচার কর এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ জাতীয় মঙ্গলকাব্য আধুনিক রুচির বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত কর।

(ক. বি. এম. এ ১৯৫৫)

১৪। টীকা লিখ—

ঘনরাম চক্রবর্তী, ময়ূর ভট্ট, হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যে অনুবাদের স্থান কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৮)

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের কাব্যোৎকর্ষ ও মৌলিক ভাবধারার আলোচনা কর। তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কী তথ্য জানা যায় তাহা বিবৃত কর। (ক. বি. ১৯৬০)

৩। মহাভারত-পাঁচালী রচনার পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বাংলা ভাষার ইহার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ও তাঁহার কাব্যের পরিচয় দাও।

৪। মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদসাহিত্যের বিশদ পরিচয় দাও এবং ওই সাহিত্যের কোনো সাধারণ লক্ষণ ও বিশিষ্টতা আছে কিনা আলোচনা কর।

৫। প্রাচীন রামায়ণ কাব্য মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে কিরূপে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই রূপান্তর বাংলা দেশের রামায়ণ সম্বন্ধে কতটা কার্যকরী হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর।

(ক. বি. এম. এ ১৯৫৩)

৬। টীকা লিখ—

কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস।

সপ্তম অধ্যায়

১। শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত? সপক্ষে ও বিপক্ষে উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তোমার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত কর। (ক. বি. ১৯৫৭)

২। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও—

(ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? (খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি? (গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের দোষগুণ আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৪৮)

৩। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য রচনা করিয়া 'আদিযুগে যে চারিজন কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনাগুলির কালক্রমের নির্দেশ দিয়া এগুলির মধ্যে যেখানি সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে সেখানির আলোচনা কর।

৪। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও এবং বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রথম জীবনীকাব্যের পরিচয় দাও।

৫। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তিনজন চৈতন্য-চরিতকারকে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া চৈতন্যচরিত কাব্যধারার পরিচয় দাও।

৬। বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীর মধ্যে জীবনকাহিনীর বাস্তব বর্ণনা, অলৌকিক ঘটনা ও দার্শনিক তত্ত্বের কিরূপ সমাবেশ হইয়াছে তাহা দেখাও।

৭। বৈষ্ণব যুগের তথাকথিত 'জীবনীসাহিত্যে'র পরিচয় দাও। এই জাতীয় রচনাসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা নির্দেশ কর। আধুনিক যুগের জীবনীসাহিত্যের সহিত উহাদের মূল পার্থক্য কোথায়? এই সাহিত্য বাংলা দেশে কতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা করে নাই, হেতু নির্দেশপূর্বক তাহা নির্ণয় কর। (ক. বি. এম. এ, ১৯৫৩)

৮। ভাগবতের (কৃষ্ণমঙ্গল) অনুবাদ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থকর্তার ও গ্রন্থের একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান কর এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই শাখা অন্যান্য শাখা অপেক্ষা স্বল্প-প্রচলিত বা জনপ্রিয়তায় ন্যূন হইয়া থাকিলে তাহার হেতু নির্দেশ কর। (ক. বি, এম. এ, ১৯৫৪

৯। টীকা লিখ—

মালাধর বসু, গোবিন্দদাসের কড়চা, চৈতন্যভাগবত, লোচনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

অষ্টম অধ্যায়

১। চৈতন্যোত্তর যুগের তিনজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবির কবিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। বৈষ্ণব পদাবলীর অসামান্য মহিমা নির্দেশ করিয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী পদকর্তার বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে নির্দেশ কর।

৩। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য কী? তাঁহাদের রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর।

৪। রূপ ও রসের দিক দিয়া প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর।

৫। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পদাবলীসাহিত্যের রূপ ও ভাবের পরিণতি দেখাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর যে একটি বিভিন্ন যুগে প্রসারিত মূল্য ছিল তাহার বিচার কর।

৭। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণ ও তাঁহাদের রচিত বৈষ্ণব কবিতার পরিচয় দাও। চৈতন্যপরবর্তী কবিগণের ভাবদৃষ্টির সহিত চৈতন্য-সমসাময়িক কবিগণের ভাবদৃষ্টির কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনা কর।

নবম দশম ও একাদশ অধ্যায়

১। শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগীতিকার কে, তাহার প্রসিদ্ধি ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। বাংলা চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের রচনাকাল ও কাব্যধর্মের তুলনামূলক আলোচনা সহকারে ইহাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ও ইহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলে তাহা প্রদর্শন কর।

৩। লোকসাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় কর। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কী কী লোক সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তাহা বিচার কর।

৪। টীকা লিখ :—

গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান,

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। "শুধু আরাকানের নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল।" আলাওলের রচনাবলী আলোচনা করিয়া এই উক্তির সার্থকতা নির্ণয় কর। (ক. বি. ১৯৬০)

২। আলাওলের জীবৎকাল নির্ধারণ করিয়া তাঁহার জীবনী ও রচনাবলীর কথা সংক্ষেপে লিখ।

৩। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। (ক. বি. ১৯২৪)

৪। সপ্তদশ শতকের রোসাঙ অঞ্চলে ইসলামী বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিবৃত কর।

৫। আরাকান ও চট্টগ্রামের কবিগণের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য নির্দেশ কর। (ক. বি. এম. এ. ১৯৫৪)

৬। টীকা লিখ—

দৌলত কাজী, সতী ময়না, আলাওল, ময়মনসিংহ গীতিকা।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়

১। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের স্থান নির্ণয় কর।

২। ভারতচন্দ্রের রচনাতে আধুনিক যুগসুলভ অনেকগুলি লক্ষণের পূর্বাভাস দেখা যায়, কিন্তু রামপ্রসাদের রচনাতে এমন কতকগুলি আধুনিক লক্ষণ সূচিত হয় যা ভারতচন্দ্রের রচনাতেও নেই।" এই মন্তব্যের সত্যতা বিচার কর।

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-ধারায় যে সকল আধুনিকতার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহার উদাহরণ দাও।

৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় কর এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনারীতি ও ভাবাদর্শ কী পরিমাণে পাশ্চাত্য রূপ-ভঙ্গিমা ও চিন্তা গ্রহণ করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর।

৫। টীকা লিখ—

বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, মহারাষ্ট্র পুরাণ।

কাব্য-সঞ্চয়ন

কাব্য-সঞ্চয়ন

[আদি-মধ্যযুগ]

চর্যাগীতি

(১)

রাগ—পটমঞ্জরী

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মো-হিঅহি ণ পইসই ॥ [৭ নং পদ

সরলানুবাদ

আলি-কালিতে বাট রুদ্ধ করিল,
তা দেখিয়া কাহ্নু মন মরা হইল।
কাহ্নু কোথায় গিয়া নিবাস করিবে
যে মনগোচর সে উদাস।
সে তিন, সে তিন, তিন অভিন্ন অথবা তিনই ভিন্ন।
কাহ্নু ভণে—ভব বিনষ্ট।
যেমন যেমন আসিল তেমন তেমন গেল,
আনাগোনায় কাহ্নু মন-মরা হইল।
এই সে, কাহ্নি, নিকটে জিনপুরে বসে।
ভণে কাহ্নু—আমার হৃদয়ে পশে না।

[ডঃ সুকুমার সেন কৃত

(২)

রাগ—দেশাখ

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥ ধ্রু ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥
হালো ডোম্বী তো পুছামি সদভাবে
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ ॥ ধ্রু ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর ন চাঙ্গেড়া
তোহোরি অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া ॥ ধ্রু ॥
তু লো ডোম্বী হাউ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥
সরবর ভঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ ধ্রু ॥ [১০ নং পদ

সরলানুবাদ

নগর বাহিরে, ওরে ডোমনী তোর কুঁড়ে
তোকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় সেই বিজ্ঞ বামুন।
ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে আমার সাঙ্গা করিতে হইবে,
(আমি) কাহ্ন নাঙ্গা কাবাড়ি যোগী।
এক সে পদ্ম, চৌষট্টি পাপড়ি
তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোমনী (ও) বেচারি (কাহ্ন)।
ওলো ডোমনী, তোকে আমি সদভাবে জিজ্ঞাসা করি—
আসিস যাস তুই কাহার নায়ে ?
তাঁত বেচা হয় ডোমনী আর তো চাঙ্গারি
তোর তরে আমি ছাড়িলাম নটসজ্জা।

তুই লো ডোমনী, আমি কাবাড়ি,
তোর তরে আমি লইলাম হাড়ের মালা।
সরোবর ভাঁজিয়া ডোমিনী খাও (অথবা খায়) মৃণাল।
মারি আমি ডোমিনীকে (অথবা ডোমিনী তোকে)৹লই তোর প্রাণ॥

[ডঃ সুকুমার সেন কৃত

(৩)

রাগ—কামোদ

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী
নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী॥ ধ্রু॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ॥ ধ্রু॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল। ধ্রু॥
গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ
নিন্দ বিহুনে সুইণা জইসো॥ ধ্রু॥
চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥ ধ্রু॥

[১৩ নং পদ

সরলানুবাদ

ত্রিশরণ করা হইল আট কামরা নৌকা,
নিজ দেহ (হইল) করুণা, শূন্য মেয়ে-মহল।
তরণ করা গেল সংসার-সাগর যেমন মায়ায় স্বপ্নে।
মাঝ-নৌকায় তরঙ্গ আমি টের পাইলাম।
পঞ্চ তথাগত কেরোয়াল করা হইল।
বেচারা কাহ্ন, কায় (নৌকা) বাহিতেছে মায়াজাল (মধ্যে)।
গন্ধ-স্পর্শ-রস যেমন তেমনই
নিদ্রা বিনে স্বপ্ন যেমন।
চিত্ত কাণ্ডারী (বসিয়া) শূন্যতা-মাঝে।
চলিল কাহ্ন মহাসুখের সাঙ্গায়॥

[ডঃ সুকুমার সেন কৃত

(৪)

রাগ—বলাড্ডি

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ স্থন্দরী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল-বজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাস্থহে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্ক রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাস্থহে কাপুর খাই
স্থন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাস্থহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক্ পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

[২৮ নং পদ

সরলানুবাদ

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা।
ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিত শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা।
উন্মত্ত শবর পাগল শবর, গোল করিও না—দোহাই তোমার।
(তোমার) আপন গৃহিণী (ও), নামে সহজ স্থন্দরী।
নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনেতে ডাল ঠেকিল।
একেলা শবরী এ বন ঢুঁড়ে—কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে বজ্র।
ত্রিধাতুর খাট পড়িল, শবর মহাস্থখের শয্যা পাতিল।
শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল।
হৃদয় তাম্বুল মহাস্থখ কর্পূর খাওয়া হইল,
শূন্য নিরামণিকে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মহাস্থখে রাতি পোহাইল।

গুরু বাক্য-পুচ্ছ (বাণের)। নিজমন বাণে বিদ্ধ কর,
এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর।
অতি রোষে শবর উন্মত্ত।
গিরিবর-শিখর মাটিতে প্রবেশ করিলে শবরকে খোঁজা যাইবে কিসে॥

(৫)

রাগ—পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥ ধ্রু ॥
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥ ধ্রু ॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চোর সোই সাধী ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি ষিআলা ষিহেঁ ষম জুঝঅ
ঢেণ্টণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥ [৩৩ নং পাঠ

সরলানুবাদ

টোলায় মোর ঘর, নাই পড়শী,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য রাতের অতিথি।
বেগে সংসার বহিয়া যায়,
দোহা দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে?
বলদ প্রসব করিল, গাই (রহিল) বন্ধ্যা,
পাত্র দোহা হয় এ তিন সন্ধ্যা।
যে সেই বুদ্ধি সে ধন্য বুদ্ধি,
যে সেই চোর সেই কোটাল।
নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সনে যুঝে
ঢেণ্ঢনপাদের গীত কম লোকে বুঝে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

(১)

কেদার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[বংশীখণ্ড

[বাএ=বাজায়। নই=নদী। আউলাইলোঁ—বিপর্যস্ত করিলাম। বেআকুল=ব্যাকুল। কৈলোঁ=করিলাম। আহ্মার=আমার। সুসর= সুস্বর। নহোঁ= নহি। কুম্ভারের পণী—কুম্ভকারের পোয়ান। যেহ্ন=যেন।]

(২)

ললিত রাগঃ ॥ একতালী ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ।
বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥ কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[আন = অন্য। মনে পড়িহাসে = মনে হয়। বুলী = বলিয়া। পো = পুত্র। নেহা = স্নেহ, প্রেম। গুপতে = গোপনে। বিকাসিলোঁ = প্রকাশ করিলাম। গোআল = গোপ। ননন্দ = ননদ। প্রতি বোল বাছে = প্রতি কথায় দোষ ধরে।]

(৩)

ললিত রাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ূর-পুছে বান্ধি চূড়া কেশ পাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা ।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা ॥ ॥

দূতী ল

তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জাঁয়িতে । আ ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে ।
মাণিক দশন-যুতী গিএ শোভে গজমূতী
জীএ রা'হ তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে ।
নেত পরিধান লাসী হাতে মৌহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোএঁ ত অভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন-দেশে ।
তথাঁত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[কনয়া = স্বর্ণোজ্জ্বল । উয়ে = উদিত হইতেছে । চান্দগোটা = পূর্ণ চন্দ্র । পোঅ = পুত্র । কন্ন = কর্ণ । জীএ = জীবিত হয় । রাহি = রাধা । দশন-যুতী = দন্তজ্যোতি । ঘাঘর = ঘুঙুর । নেতলাসী = বহুমূল্য বস্ত্র । গেলান্ত = গেলেন । মোএঁত = আমি তো । তেঁসি = এই কারণে । তোহ্মার বুধী = তোমার বুদ্ধির সাহায্যে । সুধী = সন্ধান ।]

(৪)

ধানুষী রাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥

মুছিআঁ পেলাইবোঁ [মো] য়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১

দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপনার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্নু ॥ ধ্রু ॥

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥

যবেঁ কাহ্নু না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥

কাহ্নু সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতিসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥

এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্নু একবার ॥ ৩ ॥

মাথে শম্ভুসম খোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্নু গেলান্ত বিদুর ॥

আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞি পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[আসার = অসার। পেলাইবোঁ = ফেলিব। মোএ = আমি। সিসের = সিঁথার। শঙ্খচুর = চূর্ণ। রতিসিধী = রতিসিদ্ধি। এভোহোঁ = এখনও। না মিলিহে = মিলিবে না। দিআর = দাও।]

(৫)

শ্রীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস।
এ ভব যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কতনা সহিব রে কুসুমশর জালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক ॥ ৩ ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী ॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[কদনে=পীড়নে। বঞ্চিবোঁ=যাপন করিব। সেজাত=শয্যাতে। সুতিআঁ=শুইয়া। একসরী=একাকিনী। নিন্দ=নিদ্রা। কাহ্ন সমে কর মেলা=কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা কর। ফুটি=ফাটিয়া। নিবড়ে=শেষ হয়। বারিষী=বর্ষা। কাশী=কাশফুল।]

বিদ্যাপতির পদাবলী

(১)

রূপবর্ণনা

এ সখি কি পেখল এক অপরূপ
শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥ ১ ॥
কমলযুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ ২ ॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা ॥ ৩ ॥
শাখা শিখর সুধাকর-পাঁতি।
তাহি নবপল্লব অরুণক ভাঁতি ॥ ৪ ॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস ॥ ৫ ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড় ॥ ৬ ॥
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিসান।
পুন হেরইতে হমে হরল পরাণ ॥ ৭ ॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভণে।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভল জনে ॥ ৮ ॥

(২)

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখি হে, অপরূব চাতুরী গোরী।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥

তঁহি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি লেল॥
নয়ন-চকোর কাহ্নু-মুখ-শশিবর
কএল অমিয়-রস পান।
দুহুঁ দুহুঁ দরশনে রসহু পসাবল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নবজলধর বিজুরিরেহা
দন্দ পসারিয় গেলি॥ ১॥

ধনী অলপ বয়সি বালা
জনি গাঁথলি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ ন পূরল
রহল মদন জ্বালা॥ ২॥

গোরী কলেবর নূনা
জনি কাজরে উজোর সোনা।
কেশরী জিনি মাঝ ক্ষীণ
দুলহ লোচন কোণা॥ ৩

ঈষত হসনি সঞে
মুঝে হানল নয়নবাণে।
চিরে জীব রহু রূপনারায়ণ
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥ ৪

(৪)

অভিসার

নব অনুরাগিণী রাধা
কছু নাহি মানএ বাধা ॥ ১

একলি কয়ল পয়াণ।
পথ বিপথ নাহি মান ॥ ২

তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥ ৩

কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি ॥ ৪

মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূর হি তেজি চলি যায় ॥ ৫

যামিনী ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ ৬

বিঘিনি বিথারল বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥ ৭

বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐসে ন হেরি আন ॥ ৮

(৫)

রূপানুরাগ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিয়ে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ১ ॥

জনম অবধি হম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥ ২ ॥

কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥ ৩ ॥

কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে ন মিলল এক ॥ ৪ ॥*

(৬)

মাথুর

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥ ১ ॥

ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥ ২ ॥

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ ৩ ॥

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ ৪ ॥

* পদটি বিদ্যাপতির কিনা এই বিষয়ে মতান্তর আছে।

(৭)

মাথুর

অংকুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ই নব যৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সে পিয়া-নেহে॥ ১॥

হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥ ২॥

চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥ ৩॥

শ্রাবণ মাহ যব বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥ ৪॥

(৮)

বিরহ

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কী আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥

আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

(৯)

বিরহ

সুরতরুতল জব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিন ফলে সীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি॥ ১॥

সজনি অব নহি বুঝিএ বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পুরল
রহল জনম দুখ ভাব॥ ২॥

জনম জনম হরগৌরী অরাধলোঁ
সিব ভেল সকতি বিভোর।
কাম ধেনু কত কৌতুকে পূজলোঁ
ন পূরল মনোরথ মোর॥ ৩॥

আসিয়া সরোবরে সাধে সিপায়লোঁ
সংসয় পড়ল পরান।
বিহি বিপরীত কিএ ভেল ঐছন
বিদ্যাপতি পরমান॥ ৪॥

(১০)

বিরহ

অনুখন মাধব মাধব সুমরইতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
আপন গুণ অনুধাই॥ ১

মাধব অপরূপ তোহর সিনেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥ ২

ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধা আধা বাণী ॥ ৩

রাধা সঞো যব পুনতহি মাধব
মাধব সঞো যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥ ৪

দুহু দিস দারু দহনে বৈসে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখী
বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৫

(১১)

ভাব-সম্মিলন

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥ ১ ॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টূটল সবহুঁ সন্দেহা ॥ ২ ॥

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বান হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা ॥ ৩ ॥

অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নবলেহা ॥ ৪

(১২)

প্রার্থনা

মাধব, বহুত মিনতি কর তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ ১

গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥ ২

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ ৩

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৪

(১৩)

প্রার্থনা

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলিমিলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥ ১
এ হরি বন্দো তুয়া পদনায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥ ২
যাবত জনম হম তুয়া পদ ন সেবল
যুবতী মতি সঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল
সম্পদে বিপদ হি ভেলি॥ ৩
ভণই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি
কহলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥ ৪

চণ্ডীদাসের পদাবলী

(১)

পূর্বরাগ

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মনপ্রাণ॥ ১
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥ ২

নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥ ৪

(২)

পূর্ব্বরাগ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥ ১
রাই কেন বা এমন হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥ ২
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥ ৩
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥ ৪
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥ ৫

(৩)
অনুরাগ

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥ ১
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ ২
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥ ৩
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥ ৪
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ ৫
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥ ৬
কি ছার চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥ ৭

(৪)
অভিসার

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ ১
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥ ২
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সংকেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥ ৩

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥ ৪
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীত
শুনিতে জগত সুখী ॥ ৫

(৫)

প্রেমবৈচিত্ত্য

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে ॥ ১
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥ ২
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥ ৩
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥ ৪
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥ ৫
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥ ৬

(৬)

আক্ষেপানুরাগ

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥ ১

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥ ২
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব-তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে ॥ ৩
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥ ৪

(৭)

আক্ষেপানুরাগ

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন। ১
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥ ২
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ ৩
কোন বিধি নিরমিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥ ৪
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ ৫
বাশুলি-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥ ৬

(৮)

রসোদ্গার-নিবেদন

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ ১
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ২
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥ ৩
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায় ॥ ৪
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতিক নাহিক মোর ॥ ৫
আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ ৬

(৯)

রসোদ্গার

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতয়ে তিতিল দে ॥ ১

সই, এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে ॥ ২
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥ ৩
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোক চর্চায় কুল রাখা দায়
জগত ভরিল লাজে ॥ ৪
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ ॥ ৫
এ মতি পিরীতি না জানি কী রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ৬

(১০)

আক্ষেপানুরাগ

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোক লাজে ॥ ১
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥ ২
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥ ৩
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধরে সুধা উগারে গরল ॥ ৪

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥ ৫
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥ ৬

গোবিন্দদাসের পদাবলী

(১)

গৌরপদ

চম্পক শোন-কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ মনোমোহন ভাঙন রে ॥ ১
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে ॥ ২
বিপুল পুলককুল-আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ ৩
নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥ ৪

(২)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥ ১
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমলদল খলই ॥ ২

দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥ ৩
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥ ৪
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥ ৫
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥ ৬
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥ ৭

(৩)

রাধার অনুরাগ

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥ ১
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ॥ ২
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥ ৩
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তঁহি এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস॥ ৪

(৪)

রাধার অনুরাগ

আধক আধ-আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু ঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥ ১
সজনি জানলু বি'হ মোহে বাম '
তুহু ঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥ ২
সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুবি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি॥ ৩
প্রেমবতী প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জীবন মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী-রস-মরিযাদ॥ ৪

(৫)

অভিসার

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি কারি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ ১
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনীজাগি॥ ২

কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু-পাশে॥ ৩
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাস
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৪

(৬)

অভিসার

কুলমরিয়াদ-কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ-সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥ ১
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ২
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥ ৩
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু
তাহে তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥ ৪

(৭)

মাথুর

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখলব ভৈ গেল নৈরাশা ॥ ১
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥ ২
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ ॥ ৩
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিত্তাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পূর।

জ্ঞানদাসের পদাবলী

(১)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ুর-পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥ ১
মল্লিকা মালতী-মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি-শিখর বহিয়া ॥ ২

কালার কপালে চান্দ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিলে ফাগু রঞ্জিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া ॥ ৩
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম-রূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ ৪

(২)

রূপানুরাগ

আলো মুঞি জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥ ১
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ ২
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ ৩
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥ ৪
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া ॥ ৫
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥ ৬
কুলবতী সতী হৈয়া দুকূলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ ৭

(৩)

রূপানুরাগ

মনের মরম কথা তোমারে কহিব এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥ ১
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥ ২
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সঘনে গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে॥ ৩
নয়নে পৈঠল সেহ মরমে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
হেরিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী॥ ৪
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে পায়ে হাত দিই ছলে
আমা কিনি বিকাইলুঁ বোলে॥ ৫
ভূষণ ভূষণ অঙ্গ কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥ ৬
রসাবেশে দিই ক্রোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥ ৭

(৪)

রূপানুরাগ

দেইখ্যা আইলাম তারে সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥ ১
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥ ২
কালিয়া-বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি-কূল নাহি গেল রাখা ॥ ৩
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥ ৪
গৃহকর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥ ৫

(৫)

রসোদগার

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ ২
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ ৩
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে ॥ ৪
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ ৫
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার ॥ ৬
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥ ৭

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ ৮
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি ॥ ৯

(৬)

আত্মনিবেদন

শুন শুন হে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া ॥ ১
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কেমনে আছিলা তুমি ॥ ২
যে ছিল আমার করমেরি দুখ
সকলি করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ ॥ ৩
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর ॥ ৪
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানলোরে ॥

(৭)

আত্মনিবেদন

তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥ ১

অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করে মানি ॥ ২
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥ ৩
নয়ন-অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি যে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি অন্তরে অন্তরে বাঁধা ॥

অন্যান্য বৈষ্ণব কবি

(১)

গোবিন্দ ঘোষ—নিমাই সন্ন্যাস

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥
তো সবাবে কে আর কবিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আব না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় গিলিয়া ॥

(২)

রাধামোহন—গৌরচন্দ্রিকা

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥

(৩)

যাদবেন্দ্র দাস—গোষ্ঠ

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরানের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়॥

(৪)

বলরাম দাস—গোষ্ঠ

চান্দ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণ ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেতকান্তি অনুপাম   আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে   ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙা বেণু   গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলি করি কত ভঙ্গ।
যতেক রাখালগণ   আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গ॥

(৫)

বলরাম দাস—প্রেমবৈচিত্ত্য

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা সিরজিল বিধি॥
বসিয়া দিবসরাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন-সমান॥
যতনে আনিয়ে যদি ছানিয়ে বিজুরি।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়য়ে পুতলি॥
রসের সায়রে যদি করায় সিনান।
তবু তো না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

(৬)

রায় শেখর—অভিসার

গগনে অব ঘন   মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পতন   শব্দ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥

সজ ন আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সংকেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোব॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থবথব কাঁপ।
মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

(৭)

জগদানন্দ—শ্রীরাধার রূপ

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ-শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী॥
ঘন-গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী-ফুল-মাল রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জন-গতিহারী॥
কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গ অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর কঙ্কণ মৃদু
ঝংকৃত মনোহারী॥

নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিয়দমন-দমন-রঙ্গ
সঙ্গিনী সব বঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥
দশন কুন্দ-কুসুম-নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দন-সুখকারী ॥
মণিমাণিক নখে বিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ-
চরণকি বলিহারী ॥

(৮)

বৃন্দাবন দাস—মান

কৈছে চরণে কর পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহি দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মা গো, কিয়ে ইহ জিদ অপার।
কো অছু বীর বীর মহাবল
পাওরী উতারব পার ॥
শ্যামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ
ঝর ঝর নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির ॥

সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহা বিকল
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।
মনমথ দাহ- দহনে মন ধসি গেও
রোখে চলল নিজ বাস॥
অবিরোধি প্রেম- পন্থ তুহুঁ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি ওরে নহি চাহ॥

(৯)

যদুনন্দন দাস—মাথুর

ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরপুর আওল ব্রজরমণা॥
মথুরাবাসিনী এক রমণী
তাকর দূতী পুছে।
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ খ্যাত
কাহার ভবনে আছে॥
শুনি তার বাণী কহয়ে সো ধনি
সো কাহে ইহ আওয়ব।
দেবকীসুত কৃষ্ণখ্যাত কংসঘাতী মাধব॥
সোই সোই কোই কোই
তারি দরশনে মোর আসা।
যদুনন্দন দাসে কহে ঐ যে উচ্চ বাসা॥

রামায়ণ

(১)

কৃত্তিবাস ওঝা

বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশ

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর॥
সেখানে অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই, নাম কল্পতরু॥
দিবা নিশি তথা চন্দ্রসূর্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি।
বীরাসনে আছেন বসিয়া বনমালী॥
মনে মনে প্রভুর হৈল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশ চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥
লক্ষ্মী-মূর্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে॥
ভরত শত্রুঘ্ন তাঁরে ঢুলান চামর।
হনুমান স্তব করে যুড়ি দুই কর॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর॥
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু বিদ্যমান॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে॥
হেন রূপ ধরিলেন কেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন॥
ভাবী ভূত বর্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে॥

এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥
বিধাতাকে লয়ে যান কৈলাস শিখরে।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥
নিরখিয়া দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাদের গোচর ॥
কহ ব্রহ্মা কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত অত্য দেখি কি কারণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব জগন্নাথ ॥
দেখিতাম পূর্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥
ব্রহ্মা বাক্য শুনিয় কহেন কৃত্তিবাস।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥
যেরূপে আছেন হরি গোলোক ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর ॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবী মণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥
দশরথ ঘরে জন্ম নিবে চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া;
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন ॥
মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম নামে সর্বপাপ তরে।
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম গায়।
সংসারসমুদ্র তার বৎসপদ হয় ॥

(২)

রঘুনন্দন

নৃসিংহমূর্তি

চমৎকার রূপ তার অতিঅনুপম।
সিংহাকার অঙ্গ তার মনুষ্যের সম॥
উচ্চতব কলেবর মহাভয়ঙ্কর।
নিশাপতি জ্যোতিঃ জিতি কান্তি মনোহর॥
জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দোলয়।
শম্ভুশিরে শোভাকরে কালসর্পচয়॥
ভূত স্বর্ণ তুল্য বর্ণ তিনটি লোচন।
দেখি ভয় মগ্ন হয় এ তিন ভুবন॥
ভয়ঙ্কর উচ্চতর কুটিল ভ্রূকুটি।
কোপবেগে ঊর্ধ্বভাগে স্থির কর্ণ দুটি॥
শ্বাসে চণ্ড নাসা দণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গুহাপ্রায় মুখ তার দন্ত ঘোরতর॥
সে বদন ঘনে ঘন ঘুরায়্যা রসন।
মুখপ্রান্ত রমাকান্ত চাটেন সঘন॥
গ্রীবাদেশে পরকাশে কত শত জটা।
করিশুণ্ড ভুজদণ্ড সহস্রের ঘটা॥
নখজাল মহাকাল ত্রিশূল সমান।
বক্ষঃদেশ সবিশেষ ক্ষীণ মাঝখান॥
অতিপুরু দুই উরু স্থূল মনোহর।
পের তল সুকোমল কমল সুন্দর॥
চারিপাশে পরকাশে দৈত্য ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ সুদর্শন আদি মূর্তিধর॥

(৩)

কবিচন্দ্র

অঙ্গদ রায়বার

অঙ্গদে দেখিয়া রাবণ মায়াজাল পাতে।
শত শত রাবণ হঞা বসিল সভাতে॥
যে দিগে অঙ্গদ চায় সেদিগে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়িকর বিংশতি লোচন॥
তা দেখি অঙ্গদ বীর করেন ভাবনা।
রাক্ষসের মায়া ফাঁদ পাতিল রাবণা॥
অঙ্গদ বলে কথা কৈব কোন রাবণের সনে।
সব বেটা নি রাবণ হৈল ভেদ নাই কোন জনে॥
সভে মাত্র ইন্দ্রজিত ছিল আপন সাজে।
ত্র হঞা পিতাবেশ ধরিবেক কোন লাজে॥
অতএব বুঝিলা এই খানে মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তাকে করিছে সম্বাদ॥
তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে।
এক কথা শুন্যাছি আমি বিভীষণের স্থানে॥
নিত্য নিকুম্ভিলা করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখ্যাছি তার যজ্ঞশেষ ফোঁটা॥
অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহবে ইন্দ্রজিতা।
এতগুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা॥
(ইহার) কোন রাবণ দিগ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে।
কোন রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে॥
চেড়ী উচ্ছিষ্ট খালেক কোন রাবণ পাতালে।
কোন রাবণ বান্ধা ছিল অর্জুনের অশ্বশালে॥
কোন রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ।
কোন রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে কৈল তৃণ॥
কোন রাবণ ধনুক ভাঙিতে গেছিল মিথিলা।
তুলিতে কৈলাস গিরি কোন রাবণ গেছিলা॥

কোন রাবণ সুরাপানে সদা থাকে মত্ত।
কোন রাবণের ভগ্নী হয়্যা দিলেক মধুদৈত্য॥
(তোরে) একে একে কঞা দিলাঞি সকল রাবণের কথা।
ইহা সভাতে কাজ নাই তো যোগী রাবণটি কোথা॥
শূর্পণখা রাণ্ডী তারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক কাননে সে মাগি খালেক ভিক্ষা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কাণে রক্ত বস্ত্র পরে।
ডম্বুরা বাজাঞা ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে॥
তপস্বীর বেশ ধরে মুখে মাথে ছাই।
ইহা সভাতে কাজ নাই তোর সেই যোগী রাবণটি চাই॥

(৪)

অদ্ভুতাচার্য

সীতার বর প্রার্থনা

জনক আদি করিয়া যতেক রাজগণ।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে লয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
পুরীর ভিতরে লয়া করিল গমন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিলেক আসন॥
নানা মধু দ্রব্য দিয়া করাইল ভোজন।
বিচিত্র শয্যাতে মুনি করিল শয়ন॥
ঘরেতে থাকিয়া আসি জনকনন্দিনী।
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাণি॥
রাম দেখি সীতাদেবী দড়াইল মন।
আর বর নাই মোর এ তিন ভুবন॥
মনে ত ধরিল সীতা রামের চরণ।
মনে মনে কহিতে আছেক মন কথন॥
পৃথিবীতে জনমিয়্‌ অযোনি সম্ভবা হৈয়্‌
বাপে নাম থুইল জানকী।
বাপের প্রতিজ্ঞা বাণী ঘটক হইল মহামুনি
রঘুচন্দ্র পতি হেন দেখি॥

নর রূপে নারায়ণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
কামিনী ধরাইতে নারে চিত্তে।
কমোট কঠোর ধনু রামের কোমল তনু
না পারিবে গুণ চড়াইতে ॥
শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দিত কমলিনী
বিষাদ না ভাবএ চন্দ্রমুখী।
পাইবা উত্তম পতি ত্রিভুবনে তুমি সতী
তোমার ধর্মে ব্রহ্মা দেব সুখী ॥
দেবের শুনিয়া কথা আনন্দিত হৈল সীতা
দেব চক্র বুঝিতে না পারি।
বর দিলা ভগবতী শ্রীরাম হউক পতি
অদ্ভুত মধুর ভারতী ॥

মহাভারত

(১)

সঞ্জয়

যুধিষ্ঠির ও বিরাট রাজার বিতর্ক

শুনিয়া বিরাট রাজা হইল কুপিত।
কঙ্কেরে চাহিয়া রাজা ক্রোধে অতুলিত ॥
ওষ্ঠ থর থর কাঁপে বিরাট রাজার।
ক্রোধদৃষ্টি কঙ্করে নেহালে বার বার ॥
আর বার কহে রাজা পরম পীরিতে।
এক রথে কুরু সৈন্য জিনে মোর পুতে ॥
মোর সম কেহ আছে সংসার ভিতর।
কুরুবংশ মোর পুত্র জিনে একেশ্বর ॥
কঙ্ক বলে সাজে যদি এ তিন ভুবনে।
তথাপি জিনিতে নারে বৃহন্নলা সনে ॥
ইন্দ্র যদি রণে আইসে দেবের সহিত।
বৃহন্নলা সহিতে না পারে কদাচিত ॥

শুনিয়া বিরাট রাজা ক্রোধে অতি জ্বলে।
ত্রিগুণ কুপিয়া রাজা কঙ্ক প্রতি বোলে॥
মোর পুত্র জয় কৈল তাহাকে নিন্দসি।
বৃহন্নলা নপুংসক তাহাকে প্রশংসি॥
মোর কথা হৈল তোহ্মার মনে অনাদর।
কোন গুণে বৃহন্নলা প্রশংস বিস্তর॥
ব্রাহ্মণ না হইতে যদি লইতাম জীবন।
এই বুলি পাশা ক্রোধে করিল ক্ষেপণ॥

(২)

শ্রীকর নন্দী

অশ্বমেধের জন্য অশ্ব আনিবার ব্যবস্থা

ইন্দুকুন্দ সমবর্ণ সেই অশ্ববর।
পীত পুচ্ছ দীর্ঘকর্ণ পরম সুন্দর॥
মাথাতে লিখিব পত্র সুবর্ণের জলে।
এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতূহলে॥
ঘোটক চালক হৈব নিজ সহোদর।
যে রাজার শক্তি থাকে ধরৌক অশ্ববর॥
এই পত্র লিখি বান্ধিব ললাটে ঘোড়ার।
এড়িব ঘোড়া বৎসরেক চরিবার॥
আপনে আরম্ভিব যজ্ঞ অসিপত্র ব্রত।
এড়িব সব ভোগ যত উপগত॥
যজ্ঞের বিধানে এহি কহিল সকল।
পারিবা করিতে সব না হইও বিকল॥
মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।
কিরূপে করিমু কার্য কহ মতিমন্ত॥
হেন অশ্বরত্ন মুঞি কথাতে পাইমু।
ঘোটক চালক মুঞি কারে নিয়োজিমু॥
যে বা ভীমার্জুন সহোদর মোর।
মোর হেতু দুঃখ পাইছে বহুতর॥

তাহাকে পাঠাইতে রণে না হয় যুকতি।
কৃষ্ণ হেন বন্ধু মোর নাহি নিকট সম্প্রতি॥
বহু বিঘ্ন হএ যজ্ঞ করিবারে আশ।
সিদ্ধি না হইলে যজ্ঞ হইব উপহাস॥
এ যজ্ঞ না হএ সাধ্য দেখোম যে বুদ্ধি।
কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি।
ঘোড়ার উদ্দেশ তবে কহে ব্যাসমুনি॥

(৩)

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ

তবে কৃষ্ণ সৈন্যক যে প্রশংসা করন্ত।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুঁই অন্ত॥
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সব কবিমু সংহার।
যুধিষ্ঠিব রাজাক যে দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ।
হাতে চক্র লৈয়া যায় প্রসন্ন বদন॥
রথ ত্যক্ত হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যাএ ত্রিজগত নাথে।
কৃষ্ণের যে পদভরে কাঁপে বসুমতী।
মৃগেন্দ্র ধরিতে যাএ যেন পশুপতি॥
অস্ত্রক লইয়া ভীষ্ম হাতে ধনুঃশরে।
নির্ভয়ে বোলন্ত ভীষ্ম রথের উপরে।
জগতের নাথ আইলা মারিবার মোক।
রথ হোতে পাড় মোক দেখতক লোক॥
তুমি মোক মারিলে তরিমু পরলোক।
ত্রিভুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক॥
দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডুর নন্দন।
রথ হোতে ত্যক্ত হৈয়া ধরিল চরণ॥

দশপদ অন্তরে ধরিল দুই হাতে।
সংহর সংহর কোপ ত্রিভুবন নাথে॥
প্রতিজ্ঞা করিছো মুঞি তোম্মার অগ্রতে।
পুত্র দিব্য যদি ভীষ্ম না পারো মারিতে।
ভীষ্ম মারি কুরু বল করিমু যে ক্ষয়।
তোম্মার প্রসাদে হইব সংগ্রামেতে জয়॥
অর্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্রোধ এড়ি উঠিলেক রথের উপর॥

(৪)

কাশীরাম দাস

উতঙ্কের উপাখ্যান

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরু স্থানে।
কত দিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নহে যেন তোমার গোচরে॥
ব্রাহ্মণ বিদেশে গেল শিষ্য রাখে ঘর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর॥
উতঙ্কের কাজ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে॥
দিবে গুরু দক্ষিণা উতঙ্ক যেই ক্ষণে।
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্নিধানে॥
তবে দ্বিজ জানিল এসব বিবরণ।
তুষ্ট হইয়া উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ॥
যাহ দ্বিজ সর্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি জোড় হাত॥
আজ্ঞা কর গোসাঁই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে তব পাশে কিছু না মাগিব॥
যদি দেবে দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে॥

দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি জোড় পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী॥
পৌষ্য-ভূপ-মহিষীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে॥

এত শুনি উতঙ্ক গুরুকে নিবেদিল।
যাও হে নির্বিঘ্নে দ্বিজ গুরু আজ্ঞা দিল॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ॥
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও হে গোবর॥
গুরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর॥
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপঘর।
মাগিল কুণ্ডলযুগ্ম নৃপতি গোচর॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হইতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রানী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি॥

ভাগবত

(১)

মালাধর বসু

গোষ্ঠলীলা

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে সিঙ্গা বাজাইয়া।
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া॥
একত্র লইযা সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ জলক্রীড়া করে ধীরে ধীরে॥
কোথাহ মর্কটশিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
চিত্র বিচিত্র গড়ি ময়ূরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥
কতি হো কোকিল পাখী সুস্বর নাদ পূরে।
তাহার সঙ্গে রা কাড়ে রাম দামোদরে॥
কতি হো পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া।
তার ছায়া সঙ্গে বুলে দুই ভাই ফিরিয়া॥
কোথাহ বুলে ফুল তুলিয়া মুরারি।
কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি॥
তেন মতে বৃন্দাবনে বিহার গোপাল।
শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল॥

(২)

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

শ্রীকৃষ্ণরূপ ও বেণুনিনাদ

বেণু নাদে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতিসুখ তেজিয়া সেবয়ে যদুমণি॥
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত দয়া।
হেন প্রভু বিহরে গোপাল রূপ হঞা॥

কুন্দ কুসুমদাম সুললিত বেশ।
ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষিকেশ॥
যখনে তোমার পুত্র ক'রয়া বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার॥
যখনে মলয় বায়ু বহে সুশীতল।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব কিন্নর॥
কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায়॥
দেবকী জঠরে দ্বিজরাজ উৎপন্ন।
ওহি গোপকুলে আসি হইলা উৎপন্ন।
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
কনক কুণ্ডলগলে দোলে বনমাল॥
বয়ান কমলবর পূর্ণ শশধর।
গোকুলের দীন তাপ হরিল সকল॥
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণ গুণ গায়।
গীত অনুবন্ধ করি দিবস গোঙায়॥
কৃষ্ণবিনে গোপী সবে না দেখিল আন।
গোপীনাথে নিবেদিল তনু মন প্রাণ॥
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
ক্ষণ এক যুগ মত কৃষ্ণ বিনে হয়॥
এই গোপী গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেম ভক্তি বাঢ়ে তার পুণ্য দিনে দিনে॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

(৩)

মাধবাচার্য

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ

শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরষিত।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত॥
বলভদ্র আদ্য করি সব সহচর।
যশোদার ঠাঞি গিয়া কহিল সত্বর॥

শুনিঞা যশোদা পুত্রে আনে করে ধরি।
আঁখি পাকল করি বাক্য বলে ক্রোধ করি॥
আরে কানু কি লাগিয়া মৃত্তিকা খাইলে।
দধি দুগ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে॥
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ সভয় নয়ন।
মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোনজন॥
রানী বলে তোমার যতেক সঙ্গ ভাই।
আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই॥
এবোল শুনিয়া ত্রাসে বলে গোবিন্দাই।
মিথ্যা বাদ দেয় আমি মাটি নাই খাই॥
কই মাটি খাইল হের মুখ দেখ মা।
রানী বলে সত্য যদি তুমি কর হাঁ॥
বদন মেলিল প্রভু জগত আধার।
তথির ভিতরে রানী দেখিল সংসার॥

মনসামঙ্গল

(১)

বিজয় গুপ্ত

অষ্টনাগ বন্দী

তক্ষকে বলে মা করিলাম অঙ্গীকার।
আমি দংশিয়া দিব চাঁদের কুমার॥
এই কার্য করিলে যদি তোমার দুঃখ খণ্ডে।
লখীন্দর দংশিয়া দিব এই দণ্ডে॥
এতেক বলিয়া নাগ হস্ত করে জোড়া।
বায়ুরূপ ধরি নাগ আকাশে পরে উড়া॥
পাতলা সরিষা নাগ পক্ষী হেন উড়ে।
আচম্বিত গিয়া নাগ বাসরঘরে পড়ে॥
সাহের কুমারী বেহুলা নানা মায়া জানে।
বাহিরে আসিছে নাগ জানে অনুমানে॥

বেহুলা বলে কেন ভাই বাহিরে কেন বস।
কপাট খুলিয়া দেই ঘরের মধ্যে আইস ॥
মোর দরশনে যদি পলাইয়া যাও।
দোহাই ধর্মের তুমি দেবীর মাথা খাও ॥
বেহুলা বলে নাগ তোমার ব্রহ্মবংশজন্ম।
ব্রহ্মবংশ জন্মাইয়া কর চণ্ডালের কর্ম ॥
তুমি কিনা জান নাগ আমি ছোটজন।
গুরু মোরে দিছেন মন্ত্র ভুজঙ্গ দলন ॥
সেই মন্ত্র জপি যদি আপন হৃদয়।
বড় বড় নাগের বিষ তবে পায় ক্ষয় ॥
বন্ধুজন দেখিলে খণ্ডে মনের ব্যথা।
তোমার ঠাঁই কহি কিছু ছার বিয়ার কথা ॥
বেহুলার অনুরোধ এড়াইতে নারি।
দ্বারে আসিয়া নাগ দিল গড়াগড়ি ॥
বুদ্ধিতে আগল বেহুলা সাহের কুমারী।
আথে ব্যথে বেহুলা ছিল দ্বার ছাড়ি ॥
দুগ্ধ কলা দিয়া সম্মুখে দিল পূজা।
চতুর্দিকে নেহালিয়া চাহে নাগরাজা ॥
দুগ্ধ কলা বেহুলা ঘন ঘন নাড়ে।
খাও খাও বলিয়া নাগেরে ডাক পাড়ে ॥
স্বভাবে দুখিত নাগ বায়ু খাইয়া জে।
মধুর স্বাদ পাইয়া আথে ব্যথে পে ॥
আগেতে চিন্তিল বেহুলা কি হইবে পাছে।
সোনার সিন্দুক বেহুলা আনিলেক কাছে।
পূজা খেয়ে নাগরাজ মাথা হেঁট করে।
সোনার সাঁড়াশি দিয়া পেট চাপি ধরে ॥
তক্ষক বলে মোর কি হবে উপায়।
নড়িতে না পারে নাগ ঘন মোড়া যায় ॥
সাহের কুমারী বেহুলা কার্য জানে ভাল।
সিন্দুকে থুইয়া নাগ কপাটে দিল খিল ॥

বেহুলা বলে নাগ তুই বড়ই বর্বর।
সিন্দুকে থুইয়া মুই পূজিলাম বিস্তর।
ক্ষুধায় আকুল বড় দুগ্ধ কলা খাও।
সোনার সিন্দুক মধ্যে শুইয়া নিদ্রা যাও॥
নানা মায়া জানে বেহুলা কার্যের জানে ফন্দি।
এইরূপে অষ্ট নাগ করিল সব বন্দী॥

(২)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

লখীন্দরের মৃত্যু

প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।
ঘর হৈতে শুনে তাহা সনকা বেণ্যানী॥
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥
বেহুলা নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈঃস্বরে।
দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে॥
দেখিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে বহে পানি।
মরা পুত্র কোলে লৈয়া কান্দেন বেণ্যানী॥
পুত্রশোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল।
দুর্লভ লখাই মোর না জানি কি কৈল॥
হাপুতের পুত্র মোর বাছা লখীন্দর।
তোমা লাগি গড়াইল লোহার বাসর॥
কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি।
বংশে কেহ না রহিল দিতে তিলাঞ্জলি॥
সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলায় গালি।
সিথায় সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি॥

খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরল দাঁতি।
বিভাদিনে পতি মৈল না পোহাল রাতি॥

নাড়া গিয়া ধাইয়া কয় শুন সদাগর।
লোহার বাসরে মৈল বালক লখীন্দর॥
শুনিয়া যে চাঁদ বাণ্যা হরষিত হৈল।
কান্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল, আর কি বিষাদ।
কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ॥
ক্রোধ হৈয়া নাড়াবে বলিছে চাঁদ বাণ্যা।
কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্যা॥
ঝাট কর্যা কাট নাড়া, রামকলার পাত।
মৎস্য পোড়া দিয়া আজি খাব পান্তা ভাত॥
মনসার হটে তার মরে সাত পো।
নিষ্ঠুর শরীরে তার নাহি মায়া গো॥
ক্ষেমানন্দ বলে "এত মনসার মায়া।
কর গো করুণাময়ী, নায়কেরে দয়া॥"

(৩)

নারায়ণ দেব

বেহুলার পরীক্ষা

পরীক্ষা লয় বিপুলা সুন্দরী।
দুই ভাগ করি কেশ নাহি জানি পাপ লেশ
সাক্ষী হইও জয় বিষহরি॥
বোলিলেক চন্দ্রধর "সর্পে পরীক্ষা কর"
পরীক্ষা লয় সাহের নন্দিনী।
পরম কৌতুক করি সাপের মুখেতে ধরি
কাড়ি লইল মাথার যে মণি॥

বোলে বেউলা শ্বশুর গোচর।
"সর্প পরীক্ষা জিনি কাড়ি লইল মাথার মণি
আর পরীক্ষা দেয় ত সত্বর ॥"
চান্দে বলে "শুন মাও কুশাঙ্কুরে হাঁটি যাও
যশ হউক ভুবন ভরিয়া। -
কুশাঙ্কুরে ক্ষুরের ধার হাঁটিয়া যাইবা পার
আর লইবা অযুত কাঞ্চনে।
যদি লইবা পরীক্ষা তবে হইব সত্যরক্ষা
যশ রইব এ তিন ভুবনে ॥"
মিলিয়া যত পণ্ডিত সুধিল কাঞ্চন যত
পরীক্ষিতে করি অগ্নি জ্বালা।
অঙ্গুরী ফেলিল তাত তার মধ্যে দিল হাত
ছানিয়া যে তুলিল বিপুলা ॥
হরষিত বিপুলা সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে দেবগণ দেখিয়া কৌতুক মন
পদ্মা হাসে রথে ভর করি ॥
চন্দ্রধরে বোলে হাসি "কহিতে শঙ্কা বাসি
আর এক পরীক্ষা লইবার।
বান্ধি চারি হাত পায় সাগরে হাঁটিয়া যায়
ভাসে বেউলা জলের উপর ॥"
শুক্ক পাটের গোণ ছান্দি চারি হাত পাও বান্ধি
নামে বেউলা সায়রের ঘরে।
বিপুলারে না দেখিয়া লখাই কান্দে উঠিয়া
দুই চক্ষুর জল পড়ে ধারে ॥
দুই ভাগ হইল জল বিপুলা যে নহে তল
ছুটিলেক সকল বন্ধন।
জলের উপর হাঁট পুনি পাএত না ছোঁয় পানি
তটেত উঠিল ততক্ষণ ॥

চণ্ডীমঙ্গল

(১)

মাধবাচার্য

ফুল্লরার বারমাস্যা

জ্যৈষ্ঠ মাসে:তে শুন যত মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥
প্রচণ্ড ববিব তাপে দহে কলেবরে।
ললাটেব ঘর্ম মোর পড়ে ভূমি 'পরে ॥
সবিনয় বাক্য মোব শুনলো সুন্দরি।
কোন সুখেব লাগি হইবা ব্যাধেব নারী ॥
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায় আকুল হইয়া লোটাই আমি ক্ষিতি
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি চারিদিকে চাই।
হেন সাধ করে মনে অন্য বনে যাই ॥
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থু:তে ঠাই নাই ঘরে হাঁটু পানি ॥
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পত্র মাথে দিয়া বঞ্চি দুই জনে ॥
ভাদ্রমাসেতে কন্যা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেনকালে যাই আমি মাথাতে পসার ॥
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার।
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি অর্কের কুমার ॥
আশ্বিন মাসেতে কন্যা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় ॥
বীণা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত।
অন্নের কারণে প্রভু সদায় চিন্তিত ॥
গিরি-সুতা-সুত মাসে শুন মোর দুঃখ।
পাড়াতে পড়শী নাই কহিবারে দুঃখ ॥

উঠিয়া দাণ্ডাইতে মোর গায়ে নাই বল।
ক্ষুধায় আকুল হয়্যা খাই বনফল॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে শীত অতিশয়।
জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ তনু শরীরে না সয়॥
শয়ন মৃগের চর্মে চর্মের বসন।
শীতেতে কাঁপিয়া ঘরে বঞ্চি দুই জন॥
পৌষ মাসেতে কন্যা হেমন্ত দুস্তর।
শীতভয়ে প্রাণ কাঁপে নাহিক অম্বর॥
অধর সহিতে ওষ্ঠ কাঁপে ঘনে ঘন।
অরণ্যের কাঠ আনি পোহাই হুতাশন॥
মাঘ মাসেতে কন্যা গুরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে বিন্ধে শীত শোষয়ে শোণিত॥
খৈয়া বাস পরিধানে থাকি নিশাকালে।
রজনীর শীত মোব খণ্ডে রবিজালে॥
ফাগুন মাসেতে সাজি আইল রতিপতি।
নিজ পারবার লয়্যা সখার সঙ্গতি॥
কামিনী করয়ে কেলি প্রভু লয়্যা পাশে।
হেন সমে যায় বীর অরণ্য প্রবাসে॥
মধুমাসেতে কন্যা শুন মোর কথা।
রবির উত্তাপে মোর দগধয়ে মাথা॥
দুঃখিত যে বীরমণি অন্তরে কি সুখ।
ভিন্ন রমণীর বীর নাহি চাহে সুখ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে।
উত্তর না দিলা দুর্গা ফুল্লরা বচনে॥*

(২)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কাননে কালকেতুর খেদ

অপরূপ মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।
গুণহীন কৈলা ধনু সম্বরিলা তীর॥

* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন) হইতে সংগৃহীত।

কংসনদীর জলে বীর কৈলা স্নান।
তৃষাতে আকুল বীর করে জল পান।
পথে যাত্যে মহাবীর খায় বনফল।
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল॥
দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি-আশে।
কি বলিয়া দণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে॥
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর-ঘরের ধান্য ধাবি দেড় আড়ি॥
কিরাত-পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার॥
বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে॥
এথাই নরক-স্বর্গ বলে ভাগবতে।
নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে॥
সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ-হেতু।
নরক ভুঞ্জিতে ক্ষিতি-তলে কালকেতু॥
ধড়ার আঁচলে মোছে লোচনের নীর।
সুবর্ণ গোধিকা পুন দেখে মহাবীর॥
কালকেতু মহাবীর করিছে তর্জন।
তোমাকে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষণ॥
যাত্রার সময় দেখি গেনু তোর মুখ।
বনে বনে বেড়ায়্যা পাইনু বড় দুখ॥
যত দুঃখ পাইনু অরণ্যে বেড়াইয়া।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া॥
এমন বিচার বীর মনেতে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল-দড়ি দিয়া॥
চারি পদে বান্ধি বীর ফেলিল ধনুকে।
অভয়া লম্বিত ঊর্ধ্ব-পুচ্ছ হেট-মুখে॥
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।
ঘরকে চলিল বীর বিষাদ ভাবিয়া॥

সুশীলার বারমাসিয়া

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড-তপন-তাপ তনু নাহি সয় ॥
চন্দনাদি তৈল দিব হয়্যা সহচরী।
সামলী গামছা দিব সুবাসিত বারি ॥
পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া পূরিব দ্বিজের অভিলাষ ॥
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
খাওয়াব তোমাকে হে নবাত আম্ররসে ॥
শীতল চন্দন দিয়া করিব বাতাস।
আমার মন্দিরে প্রভু করিবে আয়াস ॥
চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া।
হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া ॥
শুন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ।
নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত ॥
আষাঢ়ে গর্জায় মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নবজলে মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর ॥
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ রায়।
সাল্য অন্ন ক্ষীর খাদ্য ভুঞ্জব তোমায় ॥
আষাঢ় সুখ-হেতু, হে আষাঢ় সুখ-হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একা তিন ধাতু ॥
সংকট সময় নাথ ধারা শ্রাবণ।
সাধ লাগে দিতে অঙ্গে রবির কিরণ ॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ এক-ই না জানি ॥
বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে বড় আশে।
কামিনী কেমতে ছাড়ি যাবে নিজ দেশে ॥
প্রভু ঘরে কর বাস, প্রভু ঘরে কর বাস ?
আর না করিও প্রভু বাণিজ্যের আশ ॥

শুন মোর নিবেদন, শুন মোব নিবেদন।
বিষাদ না কর প্রভু স্থির কর মন ॥

ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিকে জল ॥
ডাঁস মশা নিবারিতে দিব হে মশারি ।৷
চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচরী ॥
সুন্দর মন্দিরে তব করাইব বাসা।
আর না করিহ দূর বাণিজ্যের আশা ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে।
ষোল উপচারে মেষ ছাগল মহিষে ॥
যত চাহ ধন দিব কর ভূমি দান।
সিংহলের লোক যত সাধিব সম্মান ॥
নানা বেশ করিব সকল সহচরী।
নাট্য গীতে গোঙাইব দিব বিভাবরী ॥
আমি বুঝাইব রাজায় আমি বুঝাইব রাজায় ।৷
আনাইব তোমার জননী বিমাতায় ॥

বরষা টুটিয়া নাথ আইলে কার্তিক মাস।
দিবসে দিবসে হবে হিমের প্রকাশ ॥
তুলি পাটী পাছুড়ি করাব নিয়োজিত।
অর্ধ রাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত ॥
পুণ্য কার্তিক মাস পুণ্য কাতিক মাস।
দান দিয়া পূরিবে দ্বিজের অভিলাষ ॥
সকল নতুন শস্য হবে এই মাসে।
ধান চাল্য মুগ মাস পূরিবে আত্তাসে ॥
রাজাকে বলিয়া দিব শতেক থামার।
ধরাইব রাজপদ কি দুঃখ তোমার ॥
পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস ।৷
বিফল জনম তার যার নাই চাষ ॥

পৌষ মাসেতে শীত যদি করে পীড়া।
তুলি পাটি দিব আর পাটের পাছড়া॥
গোঙাইব শীত প্রস্থ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধু মূলা নানা উপহারে॥
সুখে গোঙাইব হিম সুখে গোঙাইব হিম।
উজানি নগরকে বাসিবে যেন নিম॥

মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নানদান।
সুপাঠক আন্যা দিব শুনিতে পুরাণ॥
মিষ্ট পিষ্ট যোগাইব দিবসে দিবসে।
আনন্দে গোঙাইব নাথ মাঘ নিরামিষে॥
মাঘ মাসে কুতূহলে, মাঘ মাসে কুতূহলে।
সিতল যোগাব আমি বিহানে বিকালে॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোল মঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
ফাগু দোলে আনন্দে গোঙাব নিত নিত॥
সখীগণ মেলিয়া আমরা গাব গীত।
আনন্দ হইয়া শুনে কৃষ্ণের চরিত॥
মধুমাসে মালয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতির মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে।
মধু মাসে আমোদিত গোঙাব দুজনে॥
মোহন চৈত্রমাসে, মোহন চৈত্রমাসে।
মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে॥
সুশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর।
হেঁট মুখে শ্রীপতি দিলেন উত্তর॥
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।
বারমাস্যা গান দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধর্মমঙ্গল

(১)

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

মেঘ বর্ণন

আজ্ঞা পেয়ে শর্মী হয়ে সমীরণ মেঘং।
চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগং॥
গুড় গুড় হুড় হুড় করে কুল কুলং।
চারি মেঘ চৌদিকে বরিষয়ে জলং॥
শিলকণা ঝনঝনা পড়ে অনিবারং।
ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং॥
অবিরল সদাক্ষণ তড়িৎ প্রকাশং।
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ঘোষ নিষ্পেষং॥
ত্রিজগৎ চমকিত ভয়ে ভীত লোকং।
সবে কয় বুঝি প্রায় হইল বিপাকং॥
ভূশবার একাকার নদনদী খাতং।
মেঘসব করে রব সুখোচিত চিতং॥
হৃদি মাঝ ধর্মরাজ পদ পুণ্ডরীকং।
সদা ভনে ভাবি মনে দ্বিজ মানিকং॥

(২)

ঘনরাম চক্রবর্তী

ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রা

ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারে মালসাট।
সাজে শত্রু সমরে সাক্ষাৎ যমরাট॥
বিরাট সমরে যেন সুশর্মার রণ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ।
সেই রূপ সাজন করিছে তড়বড়ি।
দড়বড় কোমর কষিছে কড়াকড়ি॥

পেটি আঁটি বাঁধিল বত্রিশ বেড় পাগে।
কষিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে॥
ডান পাশে বান্ধিল যুগল যমধর।
খরতর যোড়া খাঁড়া নামে দুই থর॥
বাম দিকে যুগল টাঙ্গী যম অবতার।
চকো ছুরি কাটরি কুটিল হীরা ধার॥
কষে বাঁধি কাঁকালে কালিকা করি জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ্ দপ্॥
তার কাছে তূণে বান্ধে তেরশত তীর।
চক্ চক্ চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির॥
শিরেতে সোনার টোপ টয়ে বান্ধা তায়।
রাতুল বরণ রুচি বীর মাটি গায়॥
তড়িত জড়িত যেন জলধর জ্যোতি।
হীরামণি হার গলে কানে গজমতি॥
ধনুক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিল ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্তিমান কাল॥
বর্ণ শিঙ্গা কাড়াপড়া টনক টেমাই।
শ্যামারূপা পদ ভাবি চলিল ইছাই॥
ঘাঘব ঘুঙ্গর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কানে কত রব শুনি॥
ঢাল মুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥

অন্নদামঙ্গল

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট্ সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধক ধ্বক্ ধক্ ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তি ছালা ॥
পচা চর্ম-ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিণাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী-উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্র সহস্র চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্প ফণা ॥
বুড়া বলি তোমা সনে কই নাহি কিছু।
তুমি সে ব্যথিত হয়ে বুল পিছু পিছু ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাখিনী পেত্নিনী মুক্ত কেশে ॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

শিবায়ন

রামেশ্বর চক্রবর্তী

বাগ্দিনীর পরিচয়

কি নাম তোমার কহ কোন গাঁয়ে ঘর।
বল বল বাগ্দিনী নাহি বাস ডর ॥

মা বাপের নাম বল বল কার বেটি।
স্বামীর বয়স কত ছেলে পুলে কটি॥
ভাতারের ভাব যত জানা গেল তা।
সে হলে এমন কেন শুধু হাত পা॥
তুয়া চাঁদ মুখ চেয়ে বুক যায় ফেটে।
কীশ তেঁই হেন হাতে পরায়েছে মেঠে॥
তোমার ভাতার বুড়া বুঝিনু নিশ্চয়।
যুবা নাকি এমন যুবতী ছাড়ি রয়॥
বাগ্দিনী বলে তুমি বাসে চাও চলে
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত দেহ ঢেলে॥
বুড়ার বিদ্রূপে মোর মূর্তি হৈল কালী।
বুড়া রাক্ষস্ বুড়া বোকস্ বুড়া দেখে জ্বলি॥
শিব বলে আমি যে ব্যথিত বলে জান।
দয়া করে দুটি কথা কও নাই কেন॥
দেহ পরিচয় রামা দেহ পরিচয়।
বুড়ার ব্যগ্রতা শুনি বাগ্দিনী কয়॥
বঙ্গদেশে নিবাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দরিদ্র দোলই দিগম্বর॥
বাপের নাম হেমু দোলই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী॥
বুড়াটি বিদেশে বনিতায় নাই রুচি।
মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচি॥
অল্প দিনে দুটি বেটা দিয়াছে গোঁসাই।
বহিন বিহীন পুত্র কার্তিক গণাই॥
পার্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু।
আ ঃরে অজ্ঞান হৈলা জ্ঞানময় প্রভু॥
মায়ার মহিমা মদনের পরাক্রম।
জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পাইল ভ্রম।
তরুণীর বোলে ত্রিলোচন তৃপ্ত হৈলা।
সই সই বলে সেই সেই নাম বল্যা॥

নামে নামে তামে তামে হৈল বরাবর।
সয়াকে সইয়ের দয়া চাই অতঃপর॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বৃন্দাবন দাস

নবদ্বীপ কেন্দ্র

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচর্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম কর্ম লে:ক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল

লোচন দাস

নিমাই সন্ন্যাসে শচীর শোক

পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায়।
শুনি শচী দেবী আউদর চুলি ধায়॥
আমার নিমাই কোথা থুয়্যা আইলা তুমি।
কেমনে মুণ্ডাইলা মাথা কোন্ দেশভূমি॥
কোন ছাড় সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ।
গোরাচাঁদে মন্ত্র দিতে না হৈল করুণ॥
অনুমতি দিল কেমনে মুণ্ডাইতে মাথা।
এ হেন সন্ন্যাসী যে তাহার ঘর কোথা॥
সে হেন সুন্দর কেশ লাবণ্য দেখিয়া।
কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া॥
কেমন পাপিষ্ঠ সে কেশে দিল ক্ষুর।
কেমনে বা জীব সেই হৃদয় নিষ্ঠুর॥
আমার নিমাই কার ঘরে ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুণ্ডায়্যা পুত্র কেমন বা হৈল॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার হইল ঘোর সকল সংসার॥
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে হেন সুন্দর অঙ্গে নাহি দিব হাত॥
সুন্দর বদনে চুম্ব নাহি দিব আর।
ক্ষুধার সময় কেবা জানিবে তোমার॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের তরজা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

এই মত মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে।
উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রি দিবসে॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥
নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার॥
কহিও মাতাবে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিন অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস
বাতুল হইয়া কৈল নিজ ধর্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে॥
গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠায় তাহা পুরীর বচনে॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক পাঠায় আর ভক্তগণে॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥
আচার্যাদি ভক্তে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঁই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥
আচার্যের ঠাঁই গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য গোঁসাই প্রভুকে সন্দেশ কহিল॥

তরজা প্রহেলি আচার্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কাব।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমাব॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা॥
তবজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেই দিন হৈতে প্রভুব আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী

ভবানী দাস

চারি রানীর দুঃখ বর্ণনা

রাগ পয়ার ছন্দ

কান্দএ অদুনা নারী কান্দএ পদুনা।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চা সোনা॥
অদুনার কান্দনে গাবীব গাব ছাড়ে।
পদুনার কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে॥
রতনমালার কান্দনে প্রাণী নহে স্থির।
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যায় চির॥
চারি নারী কান্দে রাজার গলাএ ধরিয়া।
মৈনামতি বোলে তুমি জাবে যোগী হৈয়া॥
যে দেশে জাইবা প্রিয়া সে দেশে জাইব।
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব॥
তুমি সে যোগিআ রাজা আমি ত যোগিনী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনী॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্ধি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোমা শুন প্রাণনাথ॥
এক সন্ধ্যা রান্ধি ভাত দুই সন্ধ্যা খিলাএমু।
হাটিতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু॥
রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া জাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা॥
খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর।
তোমা আগে মৈলে হইব সাফল্য মোহর॥
জেদিন আছিলু শিশু বাপ মাএর ঘরে।
সেদিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশান্তরে॥
[অখন] যৌবন হৈল তোমা বিগুমান।
তুমি যোগী হইলে প্রভু তেজিব জীবন॥
জখনে বাপের বাড়ী জাইতে চাইল আমি।
চুলে ধরি মারিবারে মোরে চাইলা তুমি।

জে [দিন] অহুনার মাথে ছোট ছিল চুল।
সেদিন তোমার মাএ নিল পান ফুল॥
এক বৎসরের কালে নিত্য আইল গেল।
পঞ্চ বৎসরের কালে দেখি জোড়া দিল॥
সপ্ত বৎসরের কালে আসি বিভা কৈলা।
নব বৎসরের কালে মন্দিরেতে নিলা॥
তুমি সাত আমি পাঁচ এমত কালে বিয়া।
হীরামন মাণিক্য মুক্তা লক্ষ দান দিয়া॥
মোর বৈন পহুনাবে পাইল বেভার।
ধনরত্ন মোর বাপে যাচিল অপার॥
সকল ছাড়িয়া আইল ভগ্নীএ আমাব।
ছোটকালের বন্ধু মোবা জানিয় তোমাব॥
আপনাব হস্তে প্রভু তৈল গিলা দিলা।
আবেব কংই দিয়া কেশ বিলাসিলা॥
লক্ষ টাকার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার।
লক্ষ টাকার খোপা দোলে পিষ্টেব উপর॥
পিন্ধিবারে দিলা প্রভু মেঘনাল সাড়ি।
জেই সাড়িব মূল্য ছিল বাইশ কাহন কৌড়ি॥
পাএতে পিন্ধাএলে বাজা সোনার নেপুর।
হাটিতে চলিতে বাজে ঝামুর জুমুর॥
নিজ হস্তে কাম সিন্দুব কপালে ভরি দিলা।
জোড় মন্দির ঘরে নিয়া রূপ রঙ্গ চাএলা॥
এ হেন দয়ায় বন্ধু কি দোষে ছাড়িলা।
হেন প্রিয়া ছাড়ি কেন বিদেশে চলিলা॥
তোমায় আগায় নষ্ট কৈল জেই জন।
নষ্ট করুক তার প্রভু নিরঞ্জন॥
আহে প্রভু গুণনিধি কি বুলিলা বাণী।
স্থনিতে বিদরে বুক না রহে পরাণি॥
বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাড়ি।
প্রেমের কারণে কাকে কেহ না জাএ ছাড়ি॥

সর্ব দিন চরা করে বনের ভিতর।
সন্ধ্যা কালে চলি জাএ আপনা বাসর॥
হরিণা জাএ আগে আগে হরিণী জএে পাছে।
সর্ব দুঃখ পাসরএ স্বামী থাকে কাছে॥
সেই পশুব বুদ্ধি নাই তুহ্মি রাজার ঠাঁই।
এত বারে আহ্মি নারী রাজা তোহ্মাবে বুঝাই
আঠাব বৎসর হৈল তুমি অধিকারী।
এ বার বৎসর হৈল মোরা চাবি নারী॥
এ বুলিয়া চারি বধূ পুবী প্রবেশিল।
ঘরে গিয়া চারি বধূ যুক্তি বিমর্শিল॥
অদুনাএ বোলে বৈন গো পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতেব বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর॥
নানা বর্ণে চারি বৈনে করিয়া সাজন।
রাজা ভেটিবারে চলে সহৃষ মন॥
সুনহে রসিক জন এক চিত্ত মন।
কহেন ভবানী দাস অপূর্ব কথন॥

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

সুকুর মামুদ

চারি রানীর রাজা সম্ভাষণ

বসিয়াছে গোপীচন্দ্র সুবর্ণ পালঙ্কে।
চারি রানী সম্মুখে দাঁড়ায় রঙ্গ ভঙ্গে॥
রানীকে দেখিয়া রাজা না তুলিল মুখ।
অন্তরে ভাবিয়া রানী মনে পাল্য দুখ॥
চারি রানীর মধ্যে অদুনা প্রধান।
যোড় হাতে কহে কথা স্বামী বিদ্যমান॥
অদুনা বলেন শুন প্রভূ গুণমণি।
স্ত্রী লোকের স্বামী বিনে বিফল জীবনী॥
নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্র বিনে দেখে যেন অন্ধকার রাতি॥

জল বিনে মৎস্যের জীবনের নাহি আশ।
স্বামী বিনে নারীকুলের সকলি বিনাশ॥
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপায়।
স্বামী বিনে নারীর যে মিথ্যারূপ হয়॥
এই চারি যুবতী ছাড়ি যাউবে সন্ন্যাসে।
স্বামী বিনে নারীর দুঃখ শুন বার মাসে॥
শোন শোন ওরে স্বামী নারীর দুঃখের কথা।
স্বামী বিনে নারীগণের যতেক অবস্থা॥
কাতিক মাসেতে স্বামী নির্মল রয় রাতি।
দিবা নিশি মিলে যারা ঘরে লয়ে পতি॥
যৌবনকালেতে নারী ভাবে রাত্র দিন।
স্বামী বিনে নারীগণের সদাই মলিন॥
অঘ্রাণ মাসেতে স্বামী হেমন্তের ধান।
যাহার স্বামী ঘরে তার যৌবনের গুমান॥
নানা উপহারে স্বামী খায় পঞ্চ গ্রাস।
যার স্বামী ঘরে তার যৌবনের বিলাস॥
পৌষ মাসেতে স্বামী পৌষা আন্ধারি।
স্বামী ও যুবতীর যৌবন হয় মহা ভারি॥
যার স্বামী ঘরে তার মদন বিলাসী।
আন্ধার ঘরে দেখি যেন পূর্ণিমার শশী॥
মাঘ মাসেতে স্বামী অতিশয় শীত।
স্বামীর কারণে নারী সদাই চিন্তিত॥
লেপ লিয়ালি আর যত আভরণ।
স্বামী বিনে নাহি নারীর শীতের উড়ন॥
ফাগুন মাসেতে স্বামী কোকিলের রব করে।
স্বামীর কারণে নারী ফাফর খায়ে মরে॥
পশু পক্ষ কাকাতুয়া আর ময়না শুক।
স্বামীকে পাইয়া করে নানান্ কৌতুক।
চৈত্র মাসেতে স্বামী লিত নিবারিণী।
স্বামী আসে স্নান করে নারী সোহাগিনী॥

স্বামী বিনে নারীগণের কিসের গঙ্গাস্নান।
যুবতীর সংগল নারী আর নাহি ধন॥
বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ ঘরণী।
নারীর যৌবন জ্বলে বিরহ অগণি॥
ধন সম্পৎ নারীর মনে নাহি লয়।
শৃঙ্গার বিনে নারীর বাধিছে হৃদয়॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে স্বামী কৃষাণের ধান।
ইন্দ্রার জল বিনে জমি থাকেন হুখান॥
স্ত্রী পুরুষে ঘর করে বিধির সৃজন।
স্বামী বিনে নারীর যৌবন সব অকারণ॥
আষাঢ় মাসে স্বামী নিসাড়ে পোহায় রাতি
স্বামীর কোলে থাকে নারী বড় ভাগ্যবতী॥
ভাগ্যবতী নারী যার স্বামী আছে ঘরে।
কমলেত মধুপান করেত ভ্রমরে॥
শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ।
গঙ্গা ও সাগর হুহে হয় এক সঙ্গ॥
সংসারে তরিব স্বামী বরষার জলে।
যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে॥
ভাদ্র মাসেতে স্বামী পাকিয়া পড়ে তাল।
স্বামী বিনা যুবতীর যৌবন মহাকাল॥
যুবতীর যৌবন প্রভু তরল সাঁতার।
স্বামী থাকিলে বিরহ সাগর করে পার॥
আশ্বিন মাসেতে স্বামী চণ্ডিকার পূজা।
যার স্বামী ঘরে সেই নারী চতুর্ভুজা॥
স্বামীর কারণে সবে পূজে চণ্ডিকারে।
অভাগীর স্বামী তুমি যাবে দূরান্তরে॥
নব যৌবন প্রভু নিবেদেয় কালে।
যুগী হয় প্রাণের নাথ এই ছিল কপালে॥
স্বামীর নিকটে রানী এই কথা বলি।
ফেলায় গায়ের বসন বুকের কাচুলি॥

সুখী হবে প্রাণের নাথ কি ধন পাবে নিধি।
এ সুখ সম্পদ তোমার বঞ্চিত হইল বিধি।
কান্দিয়া অহুনা কহে রাজার চরণে।
নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে
পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল।
তাঁতির বাড়ীর কাপড় নয় যে ধুবির বাড়ী দিব।
ধুবির বাড়ীর কাপড় নয় যে ভাজিয়া পরিব॥
অন্ন ব্যঞ্জন নয় যে খাইব বসিয়া।
ধানের বাড়ীর সেন্দুর নয় যে রাখিব কৌটায় পুরিয়া॥
অষ্ট অলঙ্কার নয় যে পেটারি ভরিব।
ধন সম্পদ নয় যে মোহর বান্ধিব॥
স্বামী বিনা নারীর যৌবন কি দিয়া রাখিব।
এ রূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব॥
কার বাড়ীতে যাব আমরা যাব কার বাড়ী।
স্বামী থাকিতে আমরা জীয়ন্তে হব আঁড়ী॥
এতেক সুনিয়া রাজা বদন তুলিল।
অহুনার গায়ে রাজা নিজ বস্ত্র দিল॥

আরাকানের মুসলমান কবির কাব্য

আলাওল

(১)

পদ্মাবতী

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত॥
সুগন্ধী শ্যামল-ভার ধরণী ছুঁইল।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল॥
কিম্বা মেঘারম্ভ-যোগে হইল অন্ধকার।
বিধুন্তুদ আসিল না চন্দ্র গ্রাসিবার॥
দিবস সহিতে সূর্য হইল গোপন।

চন্দ্র তারা লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন ॥
ভাবিয়া চকোর-আঁখি পড়ি গেল ধন্ধ।
জীমূত সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥
হাস্য সৌদামিনী-তুল্য কোকিল-বচন।
ভুরু যুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন ॥
নয়ন খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে ॥
সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ-পরশন-হেতু করয় লহরী ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তূরী সৌরভ।
মোহ অন্ধকার মন-দৃষ্টি পরাভব ॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কার বহে সমসর ॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন-মোহন।
এক গুণে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরাজিত কুসুম-গ্রথিত মুক্তা-হার।
সজল জলদ-মধ্যে তারকা-সঞ্চার ॥
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য-মধ্যে মহাশুদ্ধ পথ ॥
সেই পন্থে বাটওয়ার বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলকা-পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন ॥
কিবা কবরীর মাঝে স্বর্ণ-রেখাকার।
যমুনার মাঝে যেন সুরেশ্বরী-ধার ॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা-সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত ॥
কিবা মুখচন্দ্র আঁখি-অরুণে দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থ যাইবার।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার ॥
কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য-আশে।

মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥
ভাগ্যের উদয়-স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালক চন্দ্রিমা অল্প বাড়ে দিনে দিন।
মোহন ললাট অতি ভাগ্য-বিধি-চিন ॥
কি মতে বলিব ভাল তুলনা সে অঙ্গ।
সকল অঙ্ক চন্দ্রমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কুহু রাহু করে চন্দ্রে আলোক-গরাস।
মোহন ললাটে চন্দ্র সদত প্রকাশ ॥
ক্ষণেক আলোক চন্দ্র ক্ষণেক বিদিত।
প্রশস্ত ললাটে চন্দ্র সদা প্রকাশিত ॥
মৃগমদ তিলক সুন্দর চারিপাশ।
চন্দ্রমা উপরে রাহু মিহির গরাস ॥
স্বেদ বিন্দু কপালতে উদয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সম্ভাষণ ॥
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটে ত হইব সংযোগ নিশ্চয় ॥

কামের কোদণ্ড ভুরু অলকা সন্ধান।
যাহারে হানয়ে বালা লয় যে পরাণ ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম শরধনু ॥
ভুরু চাপে গুণাঞ্জন বাণকটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য
কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরু-ভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ তনু ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥

(২)

সতী ময়নাবতী বা লোরচন্দ্রাণী

দৌলত কাজী

(ক)

ময়নাবতী ও মালিনী দূতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি—

মালিনীর উক্তি :

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম,
বোলে ছুরি দেও বাণী।
মালতী ভোমরা যেন সমাগম,
চারু ছৈলা দেওঁ আনি॥ ধ্রু ॥
দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ়,
চৌদিকে সাজে গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিতে পন্থিক
আইসএ নিজ মন্দির॥
যায় ঘরে কান্ত, সব সোহাগিনী
পূরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী-রজনী,
নির্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতকে নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুণিতে শ্রবণে বিরহিণী
ছোহএ মনে মদন॥
যাবতে বয়স কেলিকলারস
পূরএ মনোরথ জানি।
হঠ-পরিপাট মান উপরোধ
চাতুরী তেজ কামিনী॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী,
ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি॥

হরি মধুপতি মান রসবতী
মতি-ভোর তোর ছাঞি।
অবধি অন্তর ফিরি না পুছল
আর তোর কি বড়াই ॥
শুনহ উকতি, করহুঁ ভকতি
মানহ স্মরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেও,
রাধার কোলে কানাই ॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ
না ত্যজে যাবৎ প্রাণ।
নস্কর নায়ক রস বাণিজার
শ্রীযুত আশরফ খান ॥

ময়নাবতীর উত্তর :
আএ ধাঞি কুজনি কি মোক শুনাঅসি,
বেদ-উকতি নহে পাঠ।
লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ
যো বিধিলিখন ললাট ॥
মালিনী বোলসি অনুচিত বাণী।
ধরম ন ছোঅতি, তেজিআ সৎমতি
লোর-প্রেম করা আসি হানি ॥ ধ্রু ॥
মোহোর সুনাঅর গুণের সায়র
মধুর মুরতি বেশ।
সো মধু তেজিয়ে কৈছে বিখ পানাও
ভাল ধাঞি কহ উপদেশ ॥
তুহি বর পাপিনী পাপ শুনাঅসি,
ধরম করাঅসি বাম।
পাতক ঘাতক ধাঞি মোর চিন্তসি,
জাতিকুল করহ নির্নাম ॥

দুরন্ত দুরতি দূতীপনা দূর করু
চিন্তহ মোহোর কল্যাণ।
কাজী দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খান॥

(খ)

শ্রাবণ মাসের বিরহ :

মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোব না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
থরকএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোব-সমতুল॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময়-কীট কোথায় মধুপ॥
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন এ কালভুজঙ্গ॥
তাহা সনে পালএ যে প্রেমের অঙ্কুর।
থির নহে জাতি পিরীতি দুহুঁ কুল॥
তেঞি ঋতু মানিএ আওএ লোর।
ন তু জীবন যে মরণ-সম মোর॥
তছু পএ সাজএ শাওন রস-আশ।
অবিরত কান্তা ন ছোড়ে কান্ত-পাশ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী জয়পতি নাহা।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ-গাহা॥

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

(১)

নদেরচাঁদ ও মহুয়া

কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে ॥
"জলভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥"
"শুন শুন ভিনদেশী কুমার বলি তোমার ঠাঁই।
কাইল বা কইছিলা কথা আমার মনে নাই ॥"
"নবীন যৈবন কইন্যা ভুলা তোমার মন।
এক রাত্তিরে এই কথাটা হইলা বিস্মরণ ॥"
"তুমি ত ভিনদেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি ॥"
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসিমুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলা কোথা ॥"
"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইরা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥"
ঠাকুর বলে—"কইন্যা তোমার স্থানে বান্ধা হিয়া।"
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ॥"
"কঠিন তোমার পিতামাতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এই যইবন তোমার যায় অকারণ ॥

কঠিন তোমার পিতা মাতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবনকালে নাহি দিছে বিয়া ॥"
"কঠিন আমার পিতা মাতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥"
"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥"
"কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥"

—মহুয়া গীতিকা

(২)

মলুয়ার বিদায়

ঘাটেতে আছিল বান্ধা মনপবনের নাও।
দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও ॥
ঝলকে উঠে ভাঙা নাও সে পানি।
কতদূরে পাতাল পুরী আমি নাহি জানি ॥
উঠুক উঠুক আরো জল নায়ের বাতা বাইয়া।
বিনোদের ভগ্নী আইল জলের ঘাঠে ধাইয়া ॥
"শুন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তরে।
ভাঙা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে ॥"
"না যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী।
তোমার সবের মুখ দেইখ্যা ফাটিছে পরানী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙা নাও।
জন্মের মত মলুয়ারে একবার দেইখ্যা যাও ॥"
দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও পাগলিনী বেশ ॥
"শুনগো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে ॥

ভাঙা ঘরে চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরে বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবা রাতি॥"
"উঠুম উঠুক উঠুক পানী ডুবুক ভাঙা নাও।
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও॥"
ভাঙা নায়ে উঠল পানি করি কলকল।
পারে কান্দে হাউড়ী নাও অর্ধেক হইল তল
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ সোদর ভাই।
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখা জোখা নাই॥
পঞ্চ ভাই যে ডাইক্যা কয় সোনা বইনের কাছে।
"ভাঙা নায়ে উইঠ্যা বইন কোন কার্য আছে॥
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ কও সত্য করিয়া।
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পানসী দিয়া॥"
"না যাইবাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী।
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্দরী॥
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙা নাও।
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও॥"
বাতা বইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙা নাও।
"দৌইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাও॥"
দৌইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া।
"এমন কইর‍্যা জলে ডুবে আমার নয়ন তারা॥
চান্দ সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতিবন্ধু জনে আমি আর ত না চাই॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখ চাইয়া প্রাণের বেদন কও॥
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্মের দোহাই॥"

—মলুয়া গীতিকা

শাক্তপদাবলী

১

র মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা।
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে?
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্রসূর্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিব নাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালী?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥

—রামপ্রসাদ সেন

২

কেবল আশার আসা ভবে আসা আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ও মা মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥
মা খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো।
এবার সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে কোলে নিয়ে চলো॥

—রামপ্রসাদ সেন

৩

মা আমায় ঘুরাবে কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা আমি কি ছাড়া জগত?

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

—রামপ্রসাদ সেন

৪

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
দুখে দুখে জনম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই॥

—রামপ্রসাদ সেন

৫

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জীবন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা॥
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা বাজাপ্ত হবে জান না
এখন আপন ভেবে (মনরে আমার) যতন করে
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

—রামপ্রসাদ সেন

৬

মজিল মোর মন ভ্রমরা, কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালা, কালোয় কালো মিশে গেল,
দেখ সুখ দুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ সাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে
দেখ, পঞ্চতত্ত্ব প্রধানমত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৭

দোষ কারো নয় গো মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড় রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।
সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল, কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি ত্রিগুণধারিণি
বিগুণ করেছি স্বগুণে ;
কিসে এ বারি নিবারি
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে।
বারি ছিল চক্ষে ক্রমে এল বক্ষে
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে
তবে তরি, চরণ তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি করি ক্ষমা ॥

—দাশরথি রায়

৮

কালীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল,
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল
মায়া-কান্না হল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারা-সুত কলের দড়ি, ফাঁসি লেগে ফেঁসে গেল।

জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে
মাথা নেই সে আর কি উড়ে ? সঙ্গের ছ'জন জয়ী হলো।
ভক্তিডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগলো ধাঁধা
নরেশচন্দ্রের কাঁদা হাসা, না আসা এক ছিল ভাল

—নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আগমনী

১

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে ?
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে ॥
মনের তিমির নাশি উদয় হইল আসি
বিতরে অমৃত রাশি স্খলিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে
ধৈরয না ধরে মম জীবনে ॥
আর শুন অসম্ভব—চারদিকে শিবারব হে,
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥
কমলাকান্তের বাণী পুণ্যবতী গিরিরাণী গো,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে।
ও পদপঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গো
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে ॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

বিজয়া

১০

ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত,
আপনি হইয়ে হত বধ রে পরের প্রাণ ॥

প্রফুল্ল কমলবরে সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান ॥
মোরে হৈয়ে শুভোদয় নাশ দিনমণি ভয়,
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন বাণ ॥
হেরিয়ে তনয়া মুখ, পাসরিলাম সব দুঃখ
আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরানি
লুকায়ে রাখ না মাকে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

পাঁচালী

দাশরথি রায়

১

এক বিশ্ব-নিন্দুকের বিবরণ

বিশ্ব নিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্র বাঁধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে গমন করেন পথে ॥
তারে দেখি যত্ন করে এক জন জিজ্ঞাসা করে
ভোজনের কেমন পারিপাট্য।
শুনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস
বস্ত্র না'ক করেছেন পট্ট ॥
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয়
তারি কর্মে তা রূপ—ও মোর দশা।
সংসারটা ভারি আঁটা মহা প্রেত সে গিরি বেটা
মিন্‌সে হতে মাগী দ্বিগুণ কসা ॥
করেছে একটা কর্ম সাড়া বামুনে দেন সোনার ঘড়া
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা।
আঠার পোয়া করে ওজন গড়ে তাতে ক সের বা জল ধরে
সুপ্‌ড়ো সোনা—তাই বা কোন পাকা ॥

বাহিরে চটক খরচ হাল্‌কি ভোজেও বেটার ভোজের ভেল্‌কি
যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের।
পাকী হল বড় মান্য পাক করেছেন পরমান্ন
আধ পোয়া চাল দুগ্ধ ষোল সের ॥
ফলার করেছেন পাকা কলাগুলা তার আধ পাকা
একটা নাই বর্তমান সবগুলো কুলপুত।
তিন পোয়া বেড় করেছে লুচি না করিলে ত্রিশ কুচি
আহার করিতে নাই ঘৃত ॥
সন্দেশগুলো সব মিছরি পাকে তাতে কখন মিষ্টি থাকে
দ'লো না দিলে জলো হয়ে যায়।
চিনিগুলো সব ফুট সাদা খড়ি মিশান বুঝি আধা
এত ফরসা চিনি কোথায় পায় ॥
মোণ্ডাগুলো সব ফাটা ফাটা ক্ষীর গুলো আটা আটা
খির কিচ বাধায় ক্ষীর খেতে।
সকল দ্রব্যই ফাঁকিতে কেনা ধেনো গরুর দুধের ছানা
বড় দুঃখ পেয়েছি পাত পেতে ॥
দেখিলাম বেটার সকলি ফাঁকি বামুন বড় ষাটি লক্ষি
ইহার বাড়া হয় যদি কান কাটি।
সকলি বিষয়ে ন্যূনকল্প কেবল পাহাড়ে গল্প
মেটে জাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি ॥

—শিববিবাহ

২

স্বভাবগুণ

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব চিরকাল পরদ্রব্যে দৃষ্টি ॥
মানীর স্বভাব, নিজ দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথায় কান্না ॥
নারীর স্বভাব গুপ্তকথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্ট চায় ॥

দাতার স্বভাব 'নাই' বাক্য নাহি মুখে।
হিংস্রকের স্বভাব পর সুখে মরে মনোদুঃখে॥
কৃপণের স্বভাব ক্ষুদ্র দৃষ্টি খুদটি ধরে টানে।
বালকের স্বভাব খাদ্য দ্রব্য দেবতারে না মানে॥
বাতুলের স্বভাব মিছে কথায় চারিদণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে॥
জলের স্বভাব নীচবিনে উর্ধ্বগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব শরীরে কভু দয়ামায়া রয় না॥

—আগমনী (১)

৩

চুপে চুপে কর্ম্ম করার দোষ

দেখ চুপে চুপে রাবণ করল রামের সীতা হরণ।
একেবারে হইল তার সবংশে মরণ॥
চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়া গৌতমের স্ত্রী হরে।
সহস্র লোচন হইল কত দুঃখের পরে॥
চুপে চুপে চন্দ্র হতে বুধ ঠাকুরের জন্ম।
দেশ জুড়ে কলঙ্ক হইল করিয়া কুকর্ম॥
চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনুমান।
গলায় আঁটি লেগে রইল যায় যায় প্রাণ॥
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ উষা হরণ করে।
বন্ধন দশায় ছিলেন পড়ে বানের কারাগারে॥
চুপে চুপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেটে।
অশ্বত্থামা অপমান হইল অর্জুন নিকটে॥
চুপে চুপে রঘুনাথ বালি রাজারে বধে।
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙ্গদে॥
চুপে চুপে সূর্যদেবে দিয়া আলিঙ্গন।
কুন্তী দেবী দিয়াছেন পুত্রবিসর্জন॥
চুপে চুপে রাবণের মূর্তি লিখে ভূমে।
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে রামে॥

চুপে চুপে কচ গেলেন বিদ্যা শিক্ষা করতে।
মেরে তার মাংস খেল মিলি সব দৈত্যে॥
চুপি চুপি কোম্পানীর নোট জাল করে।
রাজ কিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে॥
চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে।
শেষে আর দখল পান না আছেন ভেকো হয়ে॥

—বামন ভিক্ষা

কবিগান

১

অক্রুর সংবাদ

মহড়া। একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে॥
অক্রুর সহিত কৃষ্ণ কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে।
রাধারে চরণে ত্যজিলে
রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে॥
খাদ। শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্যভাব শুন হে মাধব
তোমার প্রেমের প্রয়াসী॥
১ চিতেন। নিশাভাগ নিশি যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে॥
পড়েন। দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে॥
ফুঁকা। এতেই হলাম দোষী তাই তোমায় জিজ্ঞাসি,
মেলতা। এই দোষে কি হে ত্যজিলে॥

অন্তরা। শ্যাম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার হাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও॥
২ চিতেন। জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি
হেরিছে নয়নে শ্রীহরি।
পড়েন। আর হেরিব আশা না করি॥
ফুঁকা। হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার,
মেলতা। হৃদে বজ্র হানি চলিলে॥

—হরু ঠাকুর

২

বিরহ

মহড়া। সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়॥
সুহৃদ-ভঞ্জন, লোক গঞ্জন
কলঙ্ক ভাজন হ'তে হয়॥
১ চিতেন। এমন পীরিতি করি যাতে তরি, দুদিক।
ঐহিক আর পারত্রিক।
শ্রীনন্দ-নন্দন দুঃখ রঞ্জন,
সদা রাখি মন তাঁরি পায়।
অন্তরা। অমিয় ত্যজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণ হতে অধিক॥
২ চিতেন। হৃদয় মন্দির মাঝে, রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে
কলঙ্ক বিচ্ছেদ নাহি ভয়॥
৩ চিতেন। ধ্বজ বজ্রাংকুশ পদ সে নীরদ হইতে
জাহ্নবী হলেন যাহাতে।
সেই কৃপা জলে মন ডুবালে
কালেরে করিব পরাজয়॥

অন্তরা। কমলজ জন সেবিত ধন অরুণ চরণ।
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণ॥
৪ চিতেন। হৃদে আছে শতদল সে কমল লুটিবে।
প্রেম পীযূষ ঘটিবে॥
মনোমধুব্রত হ'য়ে যেন রত সেই নামামৃত সুধা খায়।
অন্তরা। অমিয় আর গরল দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা দেখিয়ে ভক্ষিতে॥
ত্যজিবে সে সুধা রস কেন বিষ ভক্ষিবো।
কলুষ-কূপে ডুবিব॥
থাকিতে নয়ন অন্ধ যেই জন
পেয়ে প্রেমধন সে হারায়॥

—রাম বসু

বাউল গান

১

এ দেশেতে এই সুখ হোলো আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কার বা আমি কে বা আমার,
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি॥
আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চাঁদের দয়া হবে,
কতদিন এই হালে যাবে
বহিয়ে পাপের তরণী॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে,
হীন হয়েছি ভজন গুণে,
লালন বলে কতদিনে
পাব সাঁইএর চরণ দুখানি॥

—লালন ফকির

২

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে॥
নামটি না-শরিকালা
সবার শরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি যায় ডুবে॥
ত্রি জগতে যে বায় রাঞা
তার দেখি ঘর মনে ভাঙা
হায়রে মজার আজব রঙা
দেখায় ধনি কেনে ভাবে।
আপনে চোরা আপন বাড়ী
আপনে সে লয় আপন বেড়ী
লালন বলে এ লাচাড়ি
কই না, আজি চুপে চাপে॥

—লালন ফকির

৩

কথা কয়রে
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
একি বিষম ভুলে ভ্রমি—
আমি কোন্ জন সে কোন্ জন।
রাম রহিম সে কোন জন,
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষ।
মূর্খ দেখে কেউ বলে না॥

হাতের কাছে হয়না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর,
সিরজ সাঁই কয়, লালনরে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না ॥

—লালন ফকির

৪

সে বড় আজব কুদরতি।
আঠার মোকামের মাঝে
ওর জ্বলছে একাই রূপের বাতি।
কে বোঝে কুদরতি খেলা—
জলের মধ্যে অগ্নিজ্বালা
জানতে হয় সেই নিরালা
ওরে নীরেক্ষীরে আছেন জ্যোতি।
চুনিমণি লাল জহরা
সেই বাতি রয়েছে ঘেরা
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে
যে জানে সে মহারতি ॥
থাকতে বাতি উজলময়,
দেখনা যায় বাসনা হৃদয়
লালন বলে, কখন কোন সময়
ওর অন্ধকার হয় বসতি ॥

—লালন ফকির

৫

অনুরাগে গাছ কাটলেই কি গাছি হওয়া যায়।
ও যে ঘোলা রসে বীজ মরে না,
গাছি রাগ করে রস ঢেলে ফেলায় ॥
প্রেমের গাছি হয় যেজন
ও সে মনদড়া দিয়ে গাছ করে বন্ধন ;

তীক্ষ্ণ দায়ে
হৃদয় ভেদিয়ে
ফটিক রসের বহায় প্লাবন।
ও সে মনের সুখে রস জ্বালায়ে মিছরি বানায়॥
অধম যাদুবিন্দু কয়, কুবীর গোঁসাই সে রস পায়।
আমার ভাঁড়ের ঘোলা রস যে
ওঠে গেঁজে
ও সে রসে বীজ মরে না, মিছরি হয়না,
ঘুটতে ঘুঁটতে জীবন যায়॥

—যাদুবিন্দু

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

প্রথম খণ্ড ঃ প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ

১

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে "অ-নাস," "খর্ব" ও কৃষ্ণকায় জাতি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ আরও দক্ষিণে সঞ্চরণ কবিতে করিতে ভারতের পূর্বভাগ হইতে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহারই নাম হয় অষ্ট্রিক বা দক্ষিণী জাতি। ইহারই ভারতস্থিত শাখার নাম কোল বা মুণ্ডা। ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে আবার ইহার নাম প্রাগ্‌-দ্রাবিড়-প্রাগার্য জাতি। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে ভারতের পূর্বদিকের প্রদেশগুলিতে প্রাচীন আর্যভাষার অনুপ্রবেশের পূর্বে এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর নানা উপভাষা প্রচলিত ছিল। এখনকার বাঙলাদেশ তখন যে-সকল অঞ্চলে বিভক্ত ছিল সেই অঞ্চলগুলি সেই নামের উপভাষার প্রচলন-ক্ষেত্র ছিল। এই আঞ্চলিক নামগুলি ছিল, "রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, পুণ্ড, বঙ্গ" ও "ডবাক" ইত্যাদি। আর্যগণ ইহাদেরই "দাস, দস্যু, নিষাদ" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার ইহাদের "ব্রাত্য" ও "ব্রাত্যক্ষত্রিয়" আখ্যাও হইয়াছিল।

প্রাগার্য উপাদান

১। বাংলা ভাষা নবীন ভারতীয় আর্য-ভাষা হইলেও ইহার শতকরা চুয়াল্লিশটি শব্দ এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর। বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম-কর্ম,

আচার-ব্যবহার, সমাজ-ও সংস্কৃতি-বাচক বহু শব্দই মূলতঃ এই ভাষাগোষ্ঠীর। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কিছু শব্দ, ধাতু ও প্রত্যয়াদির উল্লেখ করা যাইতেছে—

[ক] শব্দ—তম্+বল>তাম্বূল, কলা, কদলী, ডাব, বাঁশ, জঙ্গল, জাঙ্গাল, জাং, ডাগর, ডাক, ডানা, ডাল, চাল, গণ্ডা, বুড়ি, টাক, ডোবা, খোকা, খুকী, টাট, ঠোঙা, ঝুড়ি, ঝাঁকা, ঝুল, ঝুলি, আড়া, আড়ি, মাল ইত্যাদি।

[খ] ধাতু—√টল্, √ডুব্, √পার্, √শুদ্>শুধ্, √টান্, √কাঁড়্, √ঝুল্ ইত্যাদি।

[গ] প্রত্যয়[১]—উপসর্গ[২]—"নে"—নেতড়া, নেকড়া, নেকড়ে; "নি"—নিগুন্ত, নিকষা; "আই—আঈ"—আইমা, বড়াই—বড়াঈ; "আড়—আড়া"—আড়বাঁশী, আড়ক্ষেপা ইত্যাদি।

[ঘ] প্রত্যয়—অনুসর্গ[৩]—"টী—টি"—বধূটী>বউটী—বউড়ী, হাবাটী—হাউড়ী, দুহিতাটী>ঝী-আড়ী, শ্বশ্রূটী>শ্বাশুড়ী—শাউড়ী, পিচ্ছোভিকা>পিচ্ছোভী> পিঁচুটি; "চী—চি"— বেঙাচি, শাক্‌চী, কচি, কঞ্চি, কুর্‌চি>গুলচী; "অরু—আরু" —গোরু, শজারু, সাঁতারু, সরু, বোমারু; "অড়া—আড়া"—হাবড়া, সোমড়া, নেতড়া; "অড়—আড়"—ভাঙ্গড়, খাদাড়, বাদাড়; "অরা—রা"—তোমরা, আমরা; "অক—ওক"—দিব্বোক, রুদ্রোক, কুম্ভক; "অল—আল"—দঙ্গল, জঙ্গল, বঙ্গাল ইত্যাদি।

[ঙ] শব্দের ও বাক্যের মাত্রা—"টা—টি"—ঘটিটা, বাটিটা; "না"—"বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।" (রবীন্দ্রনাথ); "খন"—যাব'খন, দেব'খন ইত্যাদি।

কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর শাখাগোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী মন্—খ্মের ভাষা-গোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় রহিয়া গিয়াছে। কম্বল-এর কম্, তম্‌লুক্-এর তম্ অংশ; লুঙ্গি, ডাবৈ, আমুই ইত্যাদি শব্দ।

২। বাংলা ভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি "দার্জিলিঙ্, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ভোট, চটী, লামা" ইত্যাদি।

৩। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়-উপাদান খুব অল্প নহে। সংস্কৃতের মধ্য দিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দ্রাবিড়-বর্গের কয়েকটি ভাষার শব্দসমূহ বাংলা ভাষায় আসিয়া গিয়াছে। "মীন, নীর, মলয়, নারায়ণ, নারিকেল" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত হইয়া বাংলায়

১ নূতন শব্দগঠনের জন্য মূল শব্দের প্রতি যে সমস্ত particles বা খণ্ড-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে ব্যাপক অর্থে প্রত্যয় বলা হইয়াছে।

২-৩ Pater Schmidt কর্তৃক ব্যবহৃত Prefix ও Postfix-এর অনুবাদ রূপে যথাক্রমে 'উপসর্গ' ও 'অনুসর্গ' ব্যবহার করা হইয়াছে।

আসিয়াছে; আর, "উলু, কুড়বা, পিলে, মোট, মুটিয়া" প্রভৃতি শব্দ প্রত্যক্ষ-ভাবে বাংলায় আসিয়া গিয়াছে। স্থানীয় নামের শেষে যে "জোল" (নাড়াজোল), "গুড়ি" (ময়নাগুড়ি), "ভিটা" (বালুভিটা>বাল-হিটা> বালুটে), "কুণ্ড—কুণ্ডা" (সীতাকুণ্ড, মানকুণ্ড) প্রভৃতি দেখা যায়, সেগুলিও দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোষ্ঠীর।

২

আর্য প্রভাবের তিনটি ধারা

(১) প্রথম, খ্রীঃ পূঃ ১০ম—৯ম শতক

৪। এইরূপ কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর দ্রাবিড়ীয় ও তিব্বত-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর সহিত বিমিশ্র অবস্থায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম-৯ম শতকে আর্য দিগ্বিজয়-কারী ও উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের দ্বারা আর্য-ভাষা প্রথম বাঙলা দেশে আসে। মহাভারতের সভাপর্বে (৩০শ অধ্যায়) ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়কার আর্যভাষার (উদীচ্যাব) প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ পাই, "স্থন্দরবন" (<স্থমুন্দ্‌রবন<সমুন্দরবন<সমুদ্রবন), "তমলুক" (<তমোলুক, তমুলুক<তম্মলক্ক<তম্মলপ্প<তম্মলপ্ত<তাম্রলিপ্ত), "পুণ্ড্র—পৌণ্ড্র-বর্ধন", "বঙ্গ", "একচাকা" (<একচক্রা) ইত্যাদি শব্দ। ইহাদের মধ্যে যে "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় উহা অঞ্চল- বা প্রদেশ-বাচক। ঐতরেয় আরণ্যকেও প্রজা-অর্থে "বঙ্গা"[১] শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে—এতদ্দেশের আদিম উপনিবেশস্থাপনকারী অষ্ট্রিক বা দক্ষিণী জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতির নাম ছিল "ম্‌্যঅঙ্‌"। আর্যভাষায় উক্ত "ম্‌্যঅঙ্‌" শব্দটি "বঙ্গ" রূপ লইয়াছিল। "বঙ্গ" শব্দ প্রদেশ- বা অঞ্চল-বাচক ছিল এবং প্রজা বা জন বুঝাইতে "বঙ্গাঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইত। সেন-বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল পর্যন্ত "বঙ্গ" শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। মুসলমান রাজত্বকালে—আল+আ =আলা প্রত্যয় যোগে "বঙ্গালা" ("বঙ্গালহ্‌") ও আল+ঈ=আলী প্রত্যয় যোগে "বঙ্গালী" শব্দ দেশ ও জাতি বুঝাইতে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে।[২] আধুনিক "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী" শব্দ উহাদের বিস্তারিত রূপ।

১। "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের পাদাঃ"—ঐতরেয় আরণ্যক—২-১-১-৫।

২। সংকীর্ণ বা অব্যাপক অর্থে "বঙ্গল—বঙ্গাল" শব্দ কিছু পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল।

আর, "বাঙলা, বাংলা, বাঙালী" আবার "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী" শব্দের হ্রস্বরূপ।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে বাঙলায় আর্যভাষার দ্বিতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। এই দ্বিতীয় প্রবাহ মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে পূর্ব-ভারতে যে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত বা আর্য-মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। আয়রঙ্গসুত্ত হইতে জানা যায় যে মহাবীর জিন রাঢ়-সুহ্মে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে প্রব্রজ্যা ও ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ এদেশে আসেন ও থাকেন। ফলে এতদ্দেশে কালক্রমে জৈন ধর্ম ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। "বর্ধমানপুরী, রাঢ়াপুরী, সুব্‌ভভূমি, বজ্‌জভূমি" প্রভৃতি জৈনদের স্মৃতিচিহ্ন। বাংলা ভাষায়—স্খলিত হ্-ধ্বনি (এথা—হেথা, ওথা—হোথা), শতকিয়ায় ও অন্যত্র (বাহাল্লিশ>বেয়াল্লিশ, বাহান্ন, বাহাত্তর ইত্যাদি); স্খলিত ব-ধ্বনি ও স্খলিত য়-ধ্বনি (খা+আ=খাওয়া, যা+অ=যায়) অর্ধ-মাগধীর প্রভাবের নিদর্শন। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ল-স্থানে ড় (পয়লা—পয়ড়া, নকুল—নকুড়, অর্গল—আগড়, কুল্যবাপ—কুড়বা), র-স্থানে ল (রাঢ়—লাঢ়—"অহো দুচ্চর লাঢ়ম্—", রণ্ডা—লণ্ডা, রেখ—লেখ), শ ও ষ-স্থানে স, ক্ষ-স্থানে ক্‌খ> খ্‌খ, ন-স্থানে ণ (ক্রোষ—কোস, শৃগাল—সিগাল—সিয়াল, বক্ষ—বক্‌খ—বখ্‌খ, ফেন—ফেণ—ফেণা ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। বাংলা নেঙটো—নেঙটা (<নেঙ্গট<নেঙ্‌গুঠ<নেগ্‌গণ্ঠ<নিগ্‌গণ্ঠ<নির্গ্রন্থ), গোমড়া (<গম্মড়া<গম্বড়া<গম্বরা<দিগম্বর), গম্ভীর (<গম্বীর<গম্বর<দিগম্বর), ডেক্‌রা (<ডেগরা<ডেগ্‌গর<ডিগগঁর<ডিগ্‌গঅঁর<দিগম্বর), ছন্ন (যথা—পাগলছন্ন, মতিচ্ছন্ন), খনা (খঅনআ<খবনই<ক্ষপণক) প্রভৃতি শব্দ জৈনদের অর্ধ-মাগধীরই স্মৃতি। বাঙলার নাথধর্মে কৃচ্ছ্রকায়সাধনের স্থান প্রকৃত পক্ষে জৈন ধর্মেরই দান। "নাথ" শব্দটিও "নিগ্‌গণ্ঠ নাতপুত্ত" বা "নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃক-পুত্রে"রই স্মৃতি।

(২) দ্বিতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৫ম শতক

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাঙলায় আর্য-ভাষার তৃতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। ইহাই আর্য-ভাষার শেষ প্রবাহ। এই প্রবাহকে মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। সম্ভবতঃ ইহা রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে এতদ্দেশে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) তৃতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৩য়—২য় শতক

৫। অতঃপর এই দুই প্রাকৃতের এক মিশ্র রূপ, যাহাতে কোল বা মুণ্ডা

গোষ্ঠীর, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ও তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর শব্দ প্রচুর ছিল, তাহাই প্রচলিত হয়। অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের সহিত মাগধী প্রাকৃতের সৌসাদৃশ্য যেমন যথেষ্ট ছিল, তেমনি বৈসাদৃশ্যও কিছু-কিছু ছিল। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে ষ ও স-স্থানে শ-এর ব্যবহার, ড়-স্থানে ল-এর, ণ-স্থানে ন-এর ও কর্তা-কারকের প্রথমায় এ-বিভক্তির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। বাঙলায় এই সম্মিলিত বা মিশ্র প্রাকৃতের পাথুরে প্রমাণ বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়-শিলালিপি। ইহার পাঠ :—

(৫) বিমিশ্র প্রাকৃত, খ্রীঃ পূঃ ৩য়—২য় হইতে খ্রীঃ অঃ ৪র্থ শতক ও খ্রীঃ অঃ ৪র্থ—৮ম শতক

"—নেন সংবগীয়ানং গলদনস দুমদিন
মহামাতে সুলখিতে পুডনগলতে এতম্
নিবহিপয়িসতি। সংবংগীয়ানং চ দিনে তথা
ধানিয়ং। নিবহিসতি দংগাতিয়ায়িকে দেবাতিয়ায়িকসি।
সুঅতিয়ায়িকসি পি গংডকেহি ধানিয়িকেহি
এস কোঠাগালে কোসং ভরণীয়ে।"[১]

এই বিমিশ্র প্রাকৃতের প্রচলনেব প্রথম পর্বকাল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ বা তৃতীয় পর্বের স্থিতিকাল। অপভ্রংশ-পর্বে ব্যাকরণের চরম বিপর্যয় ও শব্দের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটে। ফলে অক্ষর-প্রকরণে স্বেচ্ছাচারিতার বন্যা বহিয়া যায়। শব্দমধ্যে ও শব্দশেষে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপে স্বরধ্বনির প্রাদুর্ভাব, খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ—মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির হ-এ পরিণাম, বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ধ্বনিগুলির একাকারত্ব ও (তাড়িত) ড়, ঢ়-ধ্বনির বিকাশ অপভ্রংশ-পর্বের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ভাষামধ্যে এই একাকারত্ব বা নৈরাজ্যের প্রতিরোধকল্পে দেশের সুধী ও সাহিত্যিকগণ প্রাকৃতের ২য় ও ১ম স্তরের ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অপভ্রংশ স্তরের "সূঅ"-কে "সূজ" ও "সূজ্জ"-রূপে লিখিতে থাকেন। আবার সংস্কৃত-প্রাকৃতজ্ঞগণ অর্থাৎ

(৬) অপভ্রংশ (খ্রীঃ ৮ম—১২শ)

১ এতদ্দারা সমস্ত বঙ্গবাসীর করগ্রহণকারী দুমদিন মহামাত্য সুরক্ষিত পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা নির্বাহ করিবেন। উহাদিগকে সেখানে ধান্য দেওয়া হইল। আর্থিক অভাব ইহা দ্বারা দূর হইবে। সচ্ছল হইলে এই কোষাগারের কোষ পুনরায় ধান্য ও অর্থের দ্বারা যেন পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

উভয়-ভাষা-ব্যবহারকারী পণ্ডিতেরা "সুজ্জ"-কে "সূর্জ্জ" রূপে উচ্চারণ করিতে ও "সূর্য্য" লিখিতে শুরু করেন। ফলে নবীন অক্ষরপ্রকরণ ও উচ্চারণ-পদ্ধতি সৃষ্ট হইল। ভাষা সংশ্লিতিমূলক হওয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষমূলক হইয়া দাঁড়াইল। ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাব ও কাল বুঝাইতে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগে মূল ক্রিয়ারূপ যাহা গঠিত হইতে লাগিল তাহা বিস্তারিত হইল (Periphrastic)। অবশ্য, কাল ও ভাব-রূপ সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি, হয় এক হইয়া গেল, নয়ত লুপ্ত হইয়া গিয়া নূতন চিহ্ন বা শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি এক হইয়া গেল। এইভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্ব-শাখার উত্থান ঘটিল। প্রকৃতপক্ষে যে দুইটি উপশাখায় উপবিভক্ত হইয়া এই পূর্ব-শাখা প্রকাশ পাইল সে দুইটি উপশাখা যথাক্রমে—(১) বিহারী ও (২) বঙ্গীয়। বিহারী উপশাখায় তিনটি উপভাষাগত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল, ফলে, যে তিনটি উপভাষা ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল তাহাদের পরিচয় হইল ব্রজপুবী বা ব্রজপুরীয়, যাহা পরবর্তীকালে ভোজপুরী বা ভোজপুরিয়ায় পরিণত হয়, মাগধী, যাহা পরে মগহীতে পরিণত হয়, এবং মৈথিলী। বঙ্গীয় উপশাখাও অনুরূপভাবে তিনটি ভাষার লক্ষণ সমেত প্রকাশ পাইল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যে এই তিনটি ভাষা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের প্রথমটির পরিচয় অহমীয়া বা অচমীয়া, দ্বিতীয়টির পরিচয় ওড়িয়া ও তৃতীয়টির আখ্যা হয় গৌড়ী। পরবর্তীকালে অহমীয়া বা অচমীয়া আসামীতে পরিণত হয় এবং গৌড়ী বাংলায় পরিবর্তিত হয়।

(৭) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা রূপে পূর্ব ভাষার উদ্ভব (খ্রীঃ ১২শ—১৪শ শতক)

৩

বাংলা ভাষার আদিযুগ লিখিত প্রমাণ অনুযায়ী ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নিহিত। এই যুগের প্রথম দিকের প্রমাণ ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী কর্তৃক অমরকোষের "টীকাসর্বস্ব" নামক টীকায় উদ্ধৃত কিঞ্চিদধিক তিনশত প্রাচীন বাংলা শব্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি; যথা—অম্বাড়>আমড়া, কানাজুঞ্জি>কেন্নু, কিঞ্চোহি>কেঁচো, খষ্>খোস, খড়কি>খিড়কি, খলি>খইল, খোল, চবড়ি>চটি, খোট>ঠোঁট,

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিশিষ্ট লক্ষণ—আদিযুগ

ভাঞ্জি>হাঁচি, পিচ্ছোড়ি>পিঁচুটি, পিম্পড়ী>পিঁপড়া, বাদিয়া>বেদে, হেণ্ট>হেঁট, বেঙ্গ>বেঙ, বহেড়ী—বহড়ী>বয়ড়া (কৃঃ-কীঃ—বহড়া), চাতিপন্ন>ছাতিম (কৃঃ-কীঃ—ছাতীঅন, ছাঞ্জিঅঁণ), ডহুআ—ডহু>ডা'ক (পাখি) (কৃঃ-কীঃ—ডোঁহাকু), নেবালী—নেআরী—নবমালিকা (কৃঃ-কীঃ—নেআলী) ইত্যাদি। এই যুগের শেষদিকের লিখিত প্রমাণ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ইহার ভাষা যেমন এক দিকে আসামী ও ওড়িয়ার নিকটবর্তী, তেমনি আবার ভাষাগত পুরাতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রাচীন বাংলার সর্ববিধ লক্ষণযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য স্খলিত হ-ধ্বনি স্খলিত য়-ধ্বনি ও স্খলিত ব-ধ্বনি (যথা, তেঁহে, তেঁহো, চিআয়িলী, হয়িলী, আইসে ইত্যাদি), ক-প্রবণতা, ট-প্রবণতা, আ-প্রবণতা, অনুনাসিক-প্রবণতা (যথা—করিবে—করিবেক, পাশক, তাক, তাহাক, তাহাকো, ডোঁহাকু, নদীকের, লক্ষকের, বাটত, ঘাটিয়াল, নান্দ, আজ্ঞ, আঞ্চল, আতিশয়, দহেঁ, হৈতেঁ, তথাঁ, দেখিআঁ ইত্যাদি), ল স্থানে ন (নিব, নিবারেঁ), র ও ড় স্থানে ল (লাচ্ছ, লাঙ্গট), বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণস্বরূপ গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের লোপ ইত্যাদি। বাংলা বাক্যের মাত্রা, "না" "খন", শব্দশেষের (মাত্রা) ক; পার্ ধাতু, ডাক্ ধাতু, কাঢ়্ ধাতু, এড়্ ধাতু, শুধ্ ধাতু, ডুব্ ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। আবার কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দও, যথা, "নারাজ, কামান, মজুর, আফার" ইত্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া কাব্যখানি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তুর্কী আক্রমণের কালের সহিত কাব্যখানির রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ হইতে একশত বৎসরের মধ্যেই, নতুবা, আরবী-ফারসী শব্দ আরও অধিক পাওয়া যাইত। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ওড়িয়ার মত স্বরান্ত উচ্চারণের পরিচয় ও লিঙ্গানুসারী বাক্য গঠনের উদ্দেশ পাওয়া যায় ("মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে", "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ")। এ ছাড়া কাব্যের ভাষায়—আনুরূপ্য, বিপর্যয়, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, সমাক্ষর-লোপ (গোআল, রাখোআল, পরকার, বেআকুল, পরচার, তিরী, পড়াইল) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনও দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগ। এই যুগের প্রথম দিকের সাহিত্যিক নিদর্শন গুণরাজখান বা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরামমঙ্গল পাঁচালী, বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসাবিজয় প্রভৃতি। মধ্যকার সাহিত্যিক নিদর্শন ব্রজবুলী সাহিত্য, চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রভৃতি। শেষদিকের সাহিত্যিক নিদর্শন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডী-মঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি।

মধ্য-যুগ

এই যুগে বাঙলার স্বরান্ত উচ্চারণ স্থলে-স্থলে উঠিয়া গেল, ফলে হসন্ত উচ্চারণ আসিয়া গেল। আদিযুগের অল্প-স্বল্প সন্ধিরূপ বজায় রহিল ও লিঙ্গানুসারী বাক্য-গ্রন্থন-রীতি শ্লথ হইয়া পড়িল। আদিযুগে একাবলীছন্দের পাশাপাশি দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, মিশ্র ও অমিশ্র পয়ার ছন্দের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। মধ্য-যুগে বিবিধ পয়ারের পাশাপাশি ব্রজবুলীর মাত্রা-মূলক ছন্দ প্রবেশ করিল। ধ্বনি-পরিবর্তন বলিতে র-স্থানে অ ও অ-স্থানে র (রাম —আম ; উপকথা—রূপকথা) ধ্বনি দেখা দিল। সাধারণতঃ শব্দের প্রথমাক্ষরে স্বরাঘাত পড়ার রীতি দেখা দিল। স্বরাগম (পোগণ্ড—অপোগণ্ড, স্পর্ধা—আস্পর্ধা, স্ত্রী—ইস্তিরী), অন্যোন্য, প্রগত ও পরাগত সমীভবন (লিপ্তক>লিত্তঅ>লেতা> নেতা, মৌক্তিক>মোত্তিঅ>মোতী), আদিস্বরলোপ (অরিষ্ট—রিষ্টি, উপানহ —পানই), স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (বিশোয়াস, পতিআই), বিপর্যয় (মুকুট—মটুক), স্বরসংগতি (দেখিয়া—দেখে), অপিনিহিতি বা অপিনিধান (দেখিয়া —দেইখ্যা), আনুরূপ্য (ব্রাহ্মণী, গোয়ালনী, সাপিনী, প্রেতিনী), ধ্বনি-সাঙ্কর্ষ বা সঙ্করধ্বনি (আগা-গোড়া, ছেলে-পিলে) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তন দেখা দিল। বহুস্থলে যুক্ত-ব্যঞ্জন একক-ব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিণত হইল (আহ্মি>আমি, তুহ্মে>তুমি, কাহ্ন>কান, জেহ্ন>যেন, চিহ্ন>চেন, চিন ইত্যাদি)। শব্দ-মধ্যের ও শব্দান্তের যুগ্মব্যঞ্জনে ম-ধ্বনি থাকিলে তাহা অনুনাসিক ঁ(চন্দ্রবিন্দু)তে পরিণত হইল ; যথা, বাগ্মী>বাগ্ গী, লক্ষ্মী>লক্‌খী, লক্ষ্মণ>লক্‌খঁন ইত্যাদি।

বিশিষ্ট লক্ষণ

মধ্যযুগে বাঙলার উপভাষা ছিল সম্ভবতঃ চারটি, যথা : (১) রাঢ়ী, (২) মধ্যা, (৩) বরেন্দ্রী ও (৪) বঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে আবার রাঢ়ী, মধ্যা ও বঙ্গালীতেই অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

এই যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতদ্দেশে ব্রজবুলী সাহিত্যের চর্চা। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্য লইয়া জোর মাতামাতি চলিয়াছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বগামী পদকর্তাদের অনুসরণে ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বগামীদের মধ্যে নরহরি সরকার, নরহরি চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ দাস, শেখর দাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সার্থকনামা পদকর্তা। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্রজবুলী চিরদিন অটুট-অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। ইহার প্রকৃতি বাংলার দিকে অবনমিত হইয়া বাংলা-বিমিশ্র হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচুর বাংলা প্রয়োগ ভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, ব্রজবুলী বাংলায় কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াই আবদ্ধ ছিল।

বাংলায় ব্রজবুলী সাহিত্য

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, বিদ্যাপতি ঠাকুর, উমাপতি মিশ্র প্রভৃতির ব্রজবুলীর ভিত্তি ছিল কিন্তু ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষার উপর অবহট্টের চটক্। বিদ্যাপতি ঠাকুরেব শেষ দিকের পদাবলীতে মৈথিলীর ঈষৎ মিশ্রণ অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন—"গমায়লুঁ"—স্থানে—"গোঙায়লুঁ" —ইত্যাদি), কিন্তু তাহাই বড় কথা নহে। আর, তাঁহার গোড়ার দিকের রচনা "পুরুষ-পরীক্ষা", "কীতিলতা", কীর্তিপতাকা"-য় অবহট্ট-খচিত যে উপভাষার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লিঙ্গানুসারী বাক্যগঠন ও লিঙ্গপ্রভাবিত ক্রিয়ারূপ দেখিলে তাহাকে পূর্বীহিন্দী-প্রভাবিত ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষা বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে যে-সকল বাঙালী ছাত্র মিথিলায় স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্র শিখিতে যাইতেন তাঁহারা মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলায় বহিয়া লইয়া আসেন এবং বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া দেন। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাপতির পদাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং লোক-মুখে পদাবলীর অংশ-বিশেষ যেমন বিকৃত হইয়া পড়ে তেমনি ভাষার আখ্যাটিও বিকৃতি লাভ করে—অর্থাৎ "ব্রজপুরী"-র "পুরী"-অংশটি "বুলী" হইয়া দাঁড়ায় (পু=বু, রী=লী)।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ শুরু হইয়াছে। এই যুগের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্য রচনার সহিত বাংলা সাহিত্যে নব ভাবধারার উন্মেষ। আরবী-ফারসী ভাষার দীর্ঘকালীন সংস্পর্শের ফলে বাংলা ভাষায় "ৎস্" ও "জ্" (Z)-ধ্বনি (গা(ছ)-স্তলা, বাজে্) দেখা দেয়। আবার, ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার প্রভাবে তালব্য "অ" ও "অ্যা" (a) ধ্বনি বাংলায় দেখা দেয় (রাম, কাল, খেলা, একা)। সর্বত্র অনুনাসিক ধ্বনির প্রভাব প্রচণ্ড হইয়া ওঠে (হাসি—হাঁসি, প্রাচীর—পাঁচীল, ইট—ইঁট, কাচ—কাঁচ, পুথী—পুঁথি ইত্যাদি)। শব্দমধ্যের ও শব্দশেষের মহাপ্রাণধ্বনি সন্নিকৃষ্ট অল্পপ্রাণধ্বনিতে সাধারণভাবে পরিবর্তিত হইতেছে (বাঘ—বাগ, গাধা—গাদা, বহা—বআ, সহ—সও ইত্যাদি)। প্রচুরভাবে এ যুগে বিচিত্র সঙ্কর-শব্দ প্রচলিত হইয়াছে (হেড-পণ্ডিত, রাজা-উজীর, পুলিসসাহেব ইত্যাদি)। এ ছাড়া, আধুনিক বাংলায় প্রচুর জোড়কলম শব্দ (মিনতি), শব্দমিশ্রণ (আনারস), লোকনিরুক্তি (উর্ণনাভ, মনোরথ, ইংরাজী, আনারস), বিষমচ্ছেদ (সধবা, অবিধ্য), যুগ্ম-প্রয়োগ (collocation), দ্বিরুক্ত শব্দ (কলিকাতা), পর-সংগঠন (back-formaticn—শুনগুনানি), সংক্ষেপিত শব্দ (omnibus—বাস) পাওয়া যায়। আবার, পূর্বী ও বাঙালী উপভাষায় অপিনিহিত স্বরধ্বনি উভশ্রুত (umlaut)-রূপে উচ্চারিত হইতেছে, যথা, রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখ্যা, লক্ষ>লৈখ্খ>লোখ্খ>লোখ্খো ইত্যাদি। এদিকে প্রান্তিক, রাঢ়ী ও মধ্যায় সমানুপাতে স্বরসংগতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, দেখিয়া>দেখে, মাছুয়া—মেছুয়া>মেছো ইত্যাদি। সমাক্ষরলোপও কিছু কিছু দেখা যায়; যেমন, বানানি—বানি ইত্যাদি।

আধুনিক যুগ—নূতন শব্দ-গঠন ও বিদেশীয় প্রভাব

বাংলাভাষায় শব্দভাণ্ডার আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগে বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আদি যুগে প্রাচীন ইরানীয় ও গ্রীক ঋণাত্মক শব্দগুলি ("মুচী, পুঁথি, দাম, কোণ, কাবেথ, সুড়ঙ্গ") উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে আরবী, ফারসী, তুর্কী, তাতারী ও হিন্দী ঋণাত্মক শব্দগুলি অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা হইতে—যথা, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজী এবং বিশ্বের অন্যান্য বহু ভাষা হইতে—গৃহীত উপযোগী বহু শব্দ বাংলাভাষাকে প্রচুর সমৃদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক বাংলা ভাষায় ৬৭টি উপভাষা লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চর্যাপদ

'চর্যাপদাবলী' বা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'আশ্চর্য চর্যাচয়' বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন অথবা বাংলা ভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রূপ, অপভ্রংশের উদাহরণরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাদের রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের অন্তর্বর্তী কালে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই চর্যাগুলিতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজযান নামে এক বিশেষ তান্ত্রিক যোগসাধনার কথা বিবৃত হইয়াছে। এই মতবাদের সারাংশ হইল যে, চিত্তের সহিত বিষয়-সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ও সমস্ত ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া উহাকে 'শূন্যতা'-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই শূন্যতা-বোধের সহিত সমদর্শিতা হেতু করুণার সংযোগ হইলে চিত্ত নির্বাণ লাভ করে ও নির্বাণের মধ্য দিয়া এক মহাসুখের গভীরতায় বিলীন হয়। মোটামুটি হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তবে ইহার পারিভাষিক শব্দগুলি—শূন্যতা, করুণা, মহাসুখ—প্রভৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। এই উপাদান ও অনুভূতিগুলি হিন্দু দর্শনেও আছে, তবে বৌদ্ধ দর্শনে ইহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও ইহাদিগকে একটা বিশেষ সম্পর্ক-সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সাধনার প্রতি, বেদ ও উপনিষদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করা হইলেও ও উহারা যে প্রকৃত সিদ্ধির নির্দেশ দিতে পারে না এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইলেও, হিন্দু সাধন-প্রক্রিয়ার সহিত ইহাদের ধর্মমতের কোন মৌলিক প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। চর্যাপদে গুরুবাদের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে, এবং ভগবান ও তাঁহার প্রতি ভক্তির কোন উল্লেখ নাই। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও মহানন্দ-অনুভব যে প্রকৃত সিদ্ধির একমাত্র উপায় এই সিদ্ধান্তই পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষার আদিম রূপ: সহজবাদের কাব্য-প্রয়োগ

এই চর্যাপদগুলির দার্শনিক মতবাদ ইহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা নয়; ইহাদের ধর্মমত যেরূপ সার্থক উপমা- ও রূপক-প্রয়োগে এবং সঙ্কেতময় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেই ইহাদের কাব্য-মূল্য নিহিত। অন্যূন তেইশজন পদকর্তা প্রায় পঞ্চাশটি পদ রচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্ত্বের অনুভূতির মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য দেখা যায়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে

বাংলা ভাষার আদিম যুগে এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজযান সমাজমধ্যে এত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল যে দুই শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্থান ও কালের বহু কবি ইহাকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ঐক্যবদ্ধ সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মনে হয় যেন উহাদের রচনার যুগে বাঙলার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অভিজাত সমাজে প্রচলিত থাকিলেও এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহার আলোচনা হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়াযানই সর্বপ্রথম দেশীয় ভাষাতে জনচিত্তের নিকট আবেদন জানায়। ইহাতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সাধনার গোপনতত্ত্ব অনেকটা হেঁয়ালির রীতিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে 'সন্ধ্যাভাষা' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ভাষা-প্রয়োগের উদ্দেশ্য অদীক্ষিত লোকের নিকট যাহাতে ইহার গূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটিত না হয়; এবং পরবর্তী যুগের সহজিয়া-তত্ত্বে অভিজ্ঞ টীকাকার ও চর্যাগুলির তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে সাহায্য না পাইলে উহাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা আধুনিক যুগে প্রায় অসম্ভবই হইত। তথাপি মনে হয় যে উপমা ও সন্ধ্যাভাষার দ্বারা এই তত্ত্বের উপর আলোকপাত করা ও উহাকে সাধারণ জীবনযাত্রার ও নরনারীর প্রেমের রূপকে ব্যাখ্যা করিয়া রসিক পাঠকচিত্তের নিকট বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলাও চর্যাকারদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। চর্যাপদসমূহ ধাঁধার আকারে লেখা হইলেও উহার মধ্যেই উহাদের অর্থবোধের গোপন সঙ্কেত নিহিত আছে।

সন্ধ্যাভাষা

এই পদগুলিতে উপমা ও তত্ত্বালোচনার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে সমাজ-জীবনের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই যুগের জীবনযাত্রার কিছুটা ধারণা করা যায়। চর্যাকারগণ তান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নিজেদের নামকরণ করিয়াছেন; যথা, কাহ্নুপাদ, কুক্কুরীপাদ, ডোম্বীপাদ, শবরপাদ ইত্যাদি। তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ নীচ, অন্ত্যজজাতীয় সমাজ হইতেই উপমার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। শুঁড়ি, ব্যাধ বা শবর, ডোম, জাতি-ছাড়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরাই নির্বাণ-আনন্দ ও ধর্ম-সাধনার রূপক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের একটা করিয়া অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—যেমন অস্পৃশ্যা ডোম্বী ইন্দ্রিয়াতীত মহাসুখেরই প্রতীক। তথাপি চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় হিন্দু সমাজের নীচ-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের রূপক-প্রয়োগে ইহাই অনুমান করা যায় যে এই ধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা হারাইয়া প্রাকৃত জনসাধারণের

নিম্নতম সমাজের পরিচয় ও প্রাধান্য

মধ্যেই প্রচলিত ছিল—হিন্দু সমাজে যাহাদের আসন যত নীচে, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মে তাহাদেরই মর্যাদা তত বেশী। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ চর্যাকারদের নিকট একেবারেই অগ্রাহ্য, উহার বদ্ধমূল সংস্কারকে আঘাত করিয়াই ইহারা নিজ ধর্মমতের পার্থক্য ঘোষণা করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সংকলনে সংগৃহীত পদগুলি সম্ভবতঃ পাল-রাজত্বের শেষের দিকে ও সেন-বংশের প্রতিষ্ঠার কালে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিতে পারে। অবশ্য এই জাতীয় কবিতার ধারা হয়ত আরও দুই শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, অন্যথা ইহাদের ভাবগত ঐক্য ও বহুল বিস্তৃতি সম্ভব হইত না।

শব্দ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য

ইহাদের শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। বহুপ্রচলিত শব্দসমূহেব উপর বিশিষ্ট রূপক-অর্থ আরোপিত হইয়া সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ রূপে দেখানো হইয়াছে। 'কুম্ভীর' 'কুম্ভকযোগ' অর্থে, 'শাশুড়ী-বধূ' 'সাধারণ শ্বাসক্রিয়া ও নৈরাত্মা' অর্থে, 'ননন্দ' 'শালী' 'ইন্দ্রিয়বোধ ও ইহার বোধ' অর্থে, 'মন্ত্রী ও ঠাকুর' দাবা খেলায় মন্ত্রী ও রাজা, 'প্রজ্ঞা ও বিষয়ানুরত বোধিচিত্ত' অর্থে, 'সোনা ও রূপা' 'শূন্যতা ও রূপানুভূতি' অর্থে, 'মুসা বা মূষিক' 'চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ' অর্থে, 'বেঙ্গ বা ব্যাং' 'অবযবহীন শূন্যতা' অর্থে, 'বলদ ও গাই' 'রূপজগতের স্রষ্টা মন ও নৈরাত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এ ছাড়া বঙ্গ ও বঙ্গাল শব্দকে এক অদ্ভুত ও কৌতূহল-পূর্ণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গে জায়া নিলেমি' (৩৯ নং পদ), 'অদঅ বঙ্গালে ক্লেশে লুড়িউ' ও 'আজ্জ ভুসু বঙ্গালী ভইলী, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী'—এই বাক্যগুলিতে বঙ্গালের কোন বিশেষ ভৌগোলিক অর্থ আছে কি না তাহা অনিশ্চিত, তবে বঙ্গালের রূপক-অর্থ যে অদ্বয়-জ্ঞান, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের অভেদ সম্বন্ধে সহজ প্রতীতি, ইহা টীকাকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙলা দেশ এই অভেদ সাধনার লীলাভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল ও সাধক-জীবনের উন্নততম পরিণতির সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে এইরূপ ধারণাই আমাদের জন্মে। সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ চণ্ডালীকে নিজ পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত জগতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া যে বাঙালী হইয়াছেন অর্থাৎ সাধনমার্গের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এই প্রশংসাসূচক উক্তিই লেখকের উদ্দেশ্য। চর্যাপদ বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম রচনা কি না, অথবা সিদ্ধাচার্যেরা সকলেই বাঙালী ছিলেন কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ করা হইয়াছে। এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে এই

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় বাঙলা দেশের প্রতি একটি সম্মানজনক আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

চর্যাপদের মধ্যে অনেক প্রবচন-জাতীয় সংক্ষিপ্ত, শাণিত ও মানব-অভিজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি মেলে। এইগুলি ষোল আনা বাঙালী-জীবন-সম্পর্কিত কি না তাহা ঠিক বলা যায় না, না গেলেও বাঙালী জীবনযাত্রার মোটামুটি ইঙ্গিত যে ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

চর্যাপদে প্রযুক্ত প্রবচন

'নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক' (৩২নং পদ) প্রবচনে লঙ্কা যে দূরবর্তী স্থানের প্রতীক তাহা বোঝা যায়, এবং সত্য মানুষের অন্তরেই বাস করে, উহাকে খুঁজিতে দূর-দূরান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' (৬নং পদ) বাক্যটির মধ্যে অতীত মৃগয়া-যুগের একটি জীবনসত্য প্রতিফলিত—হরিণ নিরীহ প্রাণী হইয়াও কেবল নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য সমস্ত জগতের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়' (৩৩নং পদ) উক্তিতে সাধনার দ্বারা যে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র জীবন আবার যে নিজ উৎসে ফিরিয়া বিশ্বজীবনে লীন হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত মিলে। 'বলদ বিআঅল গবিয়া বাঁঝে' (৩৩নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম সত্য যে প্রাকৃতিক সত্যের বিপরীত তাহা একটি আপাত অসম্ভব উক্তির মধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে; অবশ্য এখানে 'বলদ' ও 'গাভী' রূপক-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'বর শূন গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে' (৩৯নং পদ) 'দুষ্ট বলদ হইতে বরং শূন্য গোয়াল ভাল' কৃষিনির্ভর জীবনের এই অভিজ্ঞতাজাত সত্য এক গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব নির্দেশ করিতেছে। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাগর' (৪০নং পদ) উক্তিতে ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়ে সমগ্র জীবন-স্রোতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, বহিঃ-প্রকৃতির দৃষ্টান্তে এই সত্যের সমর্থন করা হইয়াছে। 'দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই' (৪২নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম সত্য যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত তাহা বোঝানো হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চর্যাকারগণ সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেও বহির্জীবনের মূল সত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন ও জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যগুলিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা তৎকালীন সমাজের যে একটি আংশিক ছবি প্রত্যক্ষ করি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তখন বাঙলা দেশের ভৌগোলিক পরিধি পরবর্তী যুগের দেশসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত ছিল, সুতরাং

উড়িষ্যা, আসাম ও মগধ অঞ্চলের কোন কোন সমাজদৃশ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। পদ্মার খালে নৌকা বাহার চিত্র হয়ত নদীমাতৃক বাঙলা দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু উঁচু পর্বত ও পর্বতের গায়ে নিবিড় জঙ্গল আসাম অঞ্চলেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি বৃহত্তর বঙ্গেরই একটা জীবনযাত্রার ছবি চর্যাপদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছের তেঁতুল ফল বাঙলার অতি প্রিয় খাদ্য; শাশুড়ীর ঘুমাইয়া যাওয়া ও বধূর জাগিয়া থাকা হয়ত বাঙালী পরিবার ছাড়াও অন্যত্র দ্রষ্টব্য। শুঁড়িনীর চিকন কাপড়ে মদ বাঁধা, মোহতরুকে ফাড়িয়া পাটি জোড়া, সাঁকোর সাহায্যে খরবেগ নদী পার হওয়া, মৃগয়ার জন্য হরিণ খোঁজা ও উহাকে বাণে বিদ্ধ করা, নৌকা বাহিবার পূর্বে উহার খুঁটি উপড়ানো ও কাছি খুলিয়া দেওয়া, ও নৌকার খোলে জল সিঁচিয়া ফেলা, মদমত্ত হস্তীর মদজল বর্ষণ করিয়া নলিনী বনে প্রবেশ, ডোমনীর বাঁশের তাঁত ও চুপড়ি তৈয়ার করা, তুলা ধুনিয়া উহার আঁশকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করা, বটুয়া ও করণ্ডকের মধ্যে বড়ি লুকাইয়া রাখার অভ্যাস, শবর-শবরীর বন্যফল খাইয়া মাতামাতি—ইত্যাদি বাঙালী-জীবনের অনেক সুপরিচিত বৃত্তি, প্রথা ও আমোদের কথা এই কবিতাগুলিতে আমরা খুঁজিয়া পাই। তাহা ব্যতীত দাবা খেলা, তারের বাদ্যযন্ত্রের সুর বাজানো, বিবাহের বাদ্যভাণ্ড ও উৎসব, এমন কি নৃত্যগীত-নাটকাভিনয়, অভিনয়সজ্জার পোশাক-পরিচ্ছদের পেটিকা ও বুদ্ধনাটক বা বুদ্ধলীলাসম্পর্কীয় নাট্যগীতির প্রচলন সম্বন্ধেও উল্লেখ আমরা ইহাদের মধ্যে আবিষ্কার করি। চর্যাপদবর্ণিত সমাজ যে ব্যবসায়, খেলাধূলা ও ললিতকলার চর্চার দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন চর্যাপদ হইতে সহজেই আহরণ করা যায়।

চর্যাপদে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর পরিচয়

সর্বশেষে চর্যাপদগুলির কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। এগুলি যদিও আদিম যুগের রচনা, তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মার্জিত কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি সূক্ষ্ম সাধনতত্ত্ব আলোচনায় এই কবি-গোষ্ঠী যে তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ মন ও সার্থক উপমা-প্রয়োগের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করার নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহা উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন। তাঁহারা যদিও পাণ্ডিত্যহীন, সহজ-অনুভূতি-নির্ভর যোগী-রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ও নিম্নস্তরের সামাজিক শ্রেণীর সহিত মেলামেশায় অভ্যস্ত এইরূপ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যে হিন্দুদর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও নিজ মত-প্রতিষ্ঠায় সুনিপুণ ছিলেন

চর্যাপদের কাব্যোৎকর্ষ

তাহা তাঁহাদের রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহাদের রচনারীতি এত অর্থগূঢ় ও সংক্ষিপ্ত যে তাঁহাদের যুক্তিধারা অনুসরণ করাই দুরূহ। নিজ সাধনাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা এতই মর্মজ্ঞ, তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা-কল্পনা ইহারই অনুভূতিতে এতই তন্ময় যে নানা বিচিত্র উপমা ও যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদের গভীর উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্মবোধ শুধু যুক্তিতর্কের ব্যাপার নহে; ইহা আবেগ ও কবি-কল্পনার স্তরেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের অনুভূতির কথা বলিতে বলিতে আবেগে আত্মহারা হইয়া যান; তত্ত্ববিচার আবেগময়তা ও সংগীত-ধর্মিতায় পরিণত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বের কাব্যে রূপান্তরই ইহাদের বিশেষ গৌরব। আমরা বৌদ্ধতত্ত্ব অস্বীকার করিয়াছি, কিন্তু চর্যাকারদের কবিত্বশক্তি, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের অসীম আগ্রহ ও তন্ময়তাপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস এই তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাকে আমাদের চির-আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। চর্যাপদের ভাব, ভাষা ও কল্পনাশক্তির নিদর্শনরূপে দুইটি পদ ব্যাখ্যা সমেত উদ্ধৃত হইল:

(১)

রাগ বলাড্ডি—শবরপাদানাম্

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত্তো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল-বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে·

ভাবানুবাদ

উচা পাহাড়েতে বসতি করিছে
শবরী নামেতে বালা।
ময়ূরের পাখ করি পরিধান
গলেতে গুঞ্জার মালা ॥
পাগল শবর না করিও ভুল
তোমারে বিনয় করি।
নিজের গৃহিণী সহজ সুন্দরী
আমি যে তোমার নারী ॥
কায়াতরু নানা- ভাবে মুকুলিল
ডাল গগনের কোণে।
একেলা শবরী এ বনে বিহরে
কুণ্ডলাদি ধরি কানে ॥
ত্রিধাতুতে খাট পারিলা শবর
সুখেতে শেজ বিছায়।
শবর ভুজঙ্গ নৈরাত্মা দারীর
পীরিতে রাতি পোহায় ॥
হৃদয় তাম্বুল কর্পূর সহিত
মহাসুখে সে যে খায়।
নৈরাত্মা শূন্যেরে কণ্ঠেতে লইয়া
সুখেতে রাতি পোহায় ॥
গুরুবাক্য ধনু নিজমন বাণ
উভয়ের সমাবেশে।
পরম নির্বাণ লভ এক শরে
বিন্ধিয়া অবিদ্যা ক্লেশে ॥
উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে
জ্ঞানানন্দে থাকি মজি।
গিরি-শিখরের সান্ধতে প্রবেশে
তাঁহারে কিরূপে খুঁজি ॥*

* মণীন্দ্রমোহন বসুর পদ্যানুবাদ

(২)

রাগ পটমঞ্জরী—ঢেণ্টনপাদানাম্

টালত মোব ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু দি বেণ্টে ষামাঅ॥
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী শো নিবুধী।
জো ষো চোর সোই সাধী॥
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ
ঢেণ্টন পাএর গীত বিবলে বুঝঅ॥

ভাবানুবাদ

টিলাতে আমার ঘর নাহি প্রতিবেশী।
হাঁড়ীতে নাহিক ভাত, নিত্যই প্রবেশি॥
এ বেঙ্গ সংসার মোর বাড়িয়াই যায়।
দোহা দুধ কি আশ্চর্য বাঁটেতে সামায়॥
বলদ যে বিয়াইল গাভী হয় বন্ধ্যা।
পীঠকে দোহন করি এই তিন সন্ধ্যা॥
বালকের যাহা বুদ্ধি জ্ঞানীর তা নয়।
যেই চিত্ত চোর সেই পুনঃ সাধু হয়॥
নিতি নিতি শিয়াল যে সিংহ সনে যুঝে।
ঢেণ্টন পাদের গীত কেহ কেহ বুঝে॥*

* মণীন্দ্রমোহন বসুর পদ্যানুবাদ

তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পটভূমি

১

তুর্কী আক্রমণ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কিরূপ বিপর্যয় ঘটে, তাহার যথার্থ তথ্যমূলক বিবরণ দেওয়া কঠিন। বৈদেশিক অধিকারের প্রভাবে অন্যান্য জাতির জীবনে যে অধঃপতন ও অবসাদ আসে, বাঙলার ক্ষেত্রেও সেই সুপরিচিত ইতিহাস-সম্মত পরিবর্তন সাধিত হয় ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক। তবে বাঙলা দেশের ইতিহাসে দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার জন্য হয়তো ফলের কিছু তারতম্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রথম, বিজেতা তুর্কী জাতির ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা; আর দ্বিতীয়, বাঙালী জাতির রাজনৈতিক চেতনার অভাব ও কূর্মবৃত্তি। এই দুইটি কারণকে অনুধাবন করিলে মনে হইবে যে তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা বাঙলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে গুরুতর আঘাত হানিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বিজিত দেশে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বাঙলাতেও সেই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ-বিহারের মধ্যে একটা ব্যাপক ধ্বংস-অভিযান চলিয়াছিল, এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ হয় তুর্কী বিজয়ের পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্য রচনার আর কোন নিদর্শন মিলে না। মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই অন্তর্বর্তীকালের সমস্ত বাংলা রচনাও এই বিনাশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। সেইজন্য চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ।

তুর্কী আক্রমণে বাঙালী-জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়

তবে কিন্তু এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয় নাই—অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়, ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'গাথাসপ্তশতী' প্রভৃতি সংস্কৃত খণ্ড কবিতার সংকলনগ্রন্থ ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুসরণে রচিত সংস্কৃত কাব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে বাঙালীর কবি-প্রতিভা বাংলা ভাষার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেও কাব্যানুশীলন পরিত্যাগ করে নাই।

তুর্কী-আমলে সংস্কৃত-অনুশীলন

এই যুগে বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংরক্ষণ এই সন্দেহ জাগায় যে হয়তো এই ধ্বংসের জন্য বিদেশী আক্রমণকারীকেই একমাত্র দায়ী করা ঠিক হইবে না। মনে হয় যেন বহির্বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এক অন্তর্বিপ্লবও চলিয়াছিল ও হিন্দু ও বৌদ্ধের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্মম উচ্ছেদ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বাঙলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। প্রায় দুই শতাব্দীর নীরবতাব পর যখন বাংলা সাহিত্যের পুনরাবির্ভাব ঘটিল, তখন দেখা গেল যে ইহাতে পৌরাণিক চেতনা ও সংস্কৃত প্রভাবের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে ও বৌদ্ধভাব-প্রভাবিত ও প্রাকৃত অপভ্রংশে লেখা সাহিত্য চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই সংস্কৃত-প্রভাবিত নূতন ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিযোগিতা

বাঙালী-হিন্দু জাতি মুসলমান-বিজয়ের ফলে কতখানি বিপর্যস্ত হইয়াছিল ও আত্মরক্ষার উদ্যমে কিরূপ আত্মবিশুদ্ধি ও প্রতিরোধ-শক্তির প্রেরণা পাইয়াছিল তাহাও ঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সহজ নহে। হিন্দুর রাজনৈতিক চেতনা যে অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল তাহা তুর্কী বিজয়ের দ্রুত অগ্রগতি ও সহজসাধ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতা অপেক্ষা ধর্মের প্রতি হিন্দুর আগ্রহ অনেক বেশী ছিল; সুতরাং সে যে রাজনৈতিক প্রতিরোধ অপেক্ষা সমাজ-সংরক্ষণের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুসলমানকে ঠেকানোর ব্যাপারে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল না, কিন্তু নিজের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি যাহাতে যুগোচিত শক্তি অর্জন করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ ও অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল। সুতরাং এই যুগে স্মৃতির নূতন নূতন বিধান রচিত হইয়া সমস্ত আচার-আচরণের শিথিলতা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে—সমাজ-বিধি-উল্লঙ্ঘনের শাস্তি আরও কঠোর হইয়াছে। আধুনিক যুগে হিন্দু ধর্মের অনুদার সংকীর্ণতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়, তাহার মূল নিহিত আছে অপর ধর্মের অভিভব হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তাহা ছাড়া এই যুগে পৌরাণিক ধর্ম ও ভক্তিবাদের প্রভাব জনচিত্তে দৃঢ়তর করিবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে। বিবিধ দেবদেবী, বিশেষত দুর্গাপূজার প্রবর্তনের দ্বারা জাতীয় চিত্তে ধর্মের প্রতি প্রবল

এই যুগের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারে হিন্দুর আত্মরক্ষার নানা প্রচেষ্টা

অনুরাগ জাগানো হইয়াছে। এমন কি মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি অনার্য দেব-দেবীকেও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ও তাহাদের উপর সুপরিচিত হিন্দু দেবতার গুণ আরোপ করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকেও উচ্চবর্ণের সহিত সমসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য অনার্য দেবতার হিন্দু-দেবমণ্ডলীতে এই উন্নয়নেরই ইতিহাস। ইহার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিরোধ নহে, সমাজ ও ধর্ম সংগঠনের প্রয়াসই পরিস্ফুট। সুতরাং হিন্দু সমাজের উপর মুসলমান বিজয়ের প্রভাব প্রধানত পৌরাণিক চেতনার উন্মেষ ও সমাজ-সংহতির দৃঢ়ীকরণ এই দুই দিকে লক্ষিত হয়।

২

ভাষার প্রাচীনত্বের দিক দিয়া চর্যাপদের পরেই বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে পরিচিত কাব্যের নাম করা যাইতে পারে। এই কাব্যের রচনাকাল ঠিক জানা যায় নাই। হয়তো কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (যদি কবির আত্মজীবন-মূলক অংশটি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়) ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু কৃত্তিবাস ও মালাধরের রচনা এত জনপ্রিয় ছিল এবং পরবর্তী কবি ও নকলকারকদের হাতে ইহাদের ভাবে ও ভাষায় এত রূপান্তর-সাধন হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া আর কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ও ভাষার আধুনিকত্ব ইহাদের মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে ইহাদের ভাষাগত আদিমরূপ ও রচনাকালোচিত ভাববৈশিষ্ট্যের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী ও তাহার কাছাকাছি সময়ে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল তাহা এক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এই অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে অবশ্য কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে ইহার ভাষাতে পশ্চিম রাঢ়ের আঞ্চলিক উপ-ভাষার বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে প্রাচীনত্বেরই নিদর্শন তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস অমার্জিত-রুচি পল্লী-অঞ্চলের কবি হইলেও তিনি যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার যে

কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কোন কোন স্থলে পৌরাণিক আদর্শ হইতে বিভিন্ন। তাঁহার রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতার রূপে বর্ণিত হইলেও উহাদের প্রেমকাহিনী গোড়ার দিকে কোন উন্নত ভাবাদর্শ অনুসরণ না করিয়া গ্রামবাসী তরুণ-তরুণীর স্থূল, রুচিবিগর্হিত লালসার চিত্ররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ আইহনপত্নী একাদশবর্ষীয়া বালিকা রাধার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণয়িনীরূপে প্রার্থনা করিয়াছে ও রাধার দৃঢ় অসম্মতি সত্ত্বেও ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। বড়াইবুড়ী কৃষ্ণের দূতীরূপে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও উভয়ের মিলনের নানা উপলক্ষ্য ঘটাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রণয়লীলায় নিজের অসীম ক্ষমতা ও ঐশী শক্তি সম্বন্ধে আস্ফালন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নায়ক ইন্দ্রজাল-প্রয়োগে নায়িকাকে সম্মোহিত করিয়া তাহাকে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়াছে। এই ঘটনার পরে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নায়ক নায়িকার উপর হইতে চিত্ত সংহরণ করিয়া যোগ-সাধনায় রত হইয়াছে ও নায়িকার উন্মুখ প্রেম ও ব্যাকুল আত্মনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নায়িকা বহু বিলম্বে প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করিয়া নায়কের জন্য বিলাপ ও আক্ষেপে সময় কাটাইয়াছে। পুঁথি এইখানেই আকস্মিকভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণপ্রেমের এই কাহিনী পুরাণ-প্রচলিত ও পরবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলীতে কীর্তিত কাহিনী হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহাতে শেষের দিক ছাড়া অন্য কোথায়ও অধ্যাত্ম রূপক ও উন্নত ভাবাদর্শের বিশেষ কোন লক্ষণ নাই। কবি এইরূপ আখ্যান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা জানা নাই। সম্ভবত কোন কোন পল্লী-অঞ্চলে অমার্জিত-রুচি প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের এইরূপ একটি গ্রাম্যতাদুষ্ট কাহিনী প্রচলিত ছিল এবং বড়ু চণ্ডীদাস ইহাকেই নিজ কাব্যের বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস নিজে যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ ও জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'-এর ভাবানুবাদ হইতে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। পুরাণবর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মহিমা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। তথাপি কেন যে তিনি ভাগবত ও পুরাণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া কুরুচিপূর্ণ গ্রাম্য আখ্যান গ্রহণ করিলেন তাহার কারণ দুর্বোধ্য।

পৌরাণিক ও গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সহিত পার্থক্য

(তাঁহার রাধাকৃষ্ণ কেহই আদর্শপদবাচ্য নহে) তাঁহার কৃষ্ণ রূপমোহে অন্ধ, নীতি ও সংযমের শাসন মানে না, নিজ অলৌকিক শক্তি ও ভগবত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে দারুণ অভিমানী—রাধা তাহার দূতীকে অপমান করিয়াছিল ও তাহাকে দিয়া ভার বহাইয়াছিল ইহা সে মুহূর্তের জন্যও ভোলে না। সে রাধাকে বশীভূত করিয়া তারপর তাহার নির্মম প্রত্যাখ্যানের দ্বারা তাহার পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে, প্রেমিকের কোমল, আত্মভোলা মনোভাব তাহার একেবারেই নাই। রাধা প্রথম দিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার মত, প্রেম-নিবেদন বুঝিবার মত অনুভূতি তাহার নাই—কৃষ্ণের নিকট আত্মদান করিয়াও সে খুঁটিনাটি লইয়া তাহার সহিত কলহ করে ও তাহাকে অপদস্থ করিবার ফিকির খোঁজে। (তাহার প্রথম দিকের যে পরিচয় আমাদের মনে প্রধান হইয়া উঠে তাহা এক কলহপরায়ণা, কথাকাটাকাটিতে পটু, একগুঁয়ে গ্রাম্য নারীর) শেষের দিকে অবশ্য প্রেমের অনুভূতি ও বিরহের অন্তর্দাহে তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে—সে বিরহসন্তপ্তা, প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে পরিণত হইয়াছে। (রাধা-চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্রাঙ্কণের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও কৃষ্ণ

কিন্তু এই স্থূল, শালীনতাহীন কাহিনীর মধ্যে যে কবিত্বশক্তি ও জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর।) তীক্ষ্ণ চটুল সংলাপের দ্বারা নাটকীয় রসসৃষ্টি করিতেও কবি সুনিপুণ। নবজাত বাংলা ভাষা এই কবির হাতে যে কিরূপ সাবলীল ও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় কাব্যের প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই পরিস্ফুট। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিরহের বেদনা ও অন্যান্য মনোভাবের বিচিত্র প্রকাশ গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের হেতু। বিষয়ের স্থূলতা ও রুচির গ্রাম্যতা সত্ত্বেও লেখকের কল্পনাশক্তি ও গভীর জীবনবোধ ইহাতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। একদিকে কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সরস চিত্র কবির রচনায় সার্থকভাবে মিলিয়াছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ বহু প্রবাদ-বাক্য রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে সাধারণের নিকট উপভোগ্য করিয়াছে। নারদ ও বড়াই-এর বার্ধক্যজনিত দেহ-বিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গীর সরস বর্ণনায় কবি কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র-পরিকল্পনায় সর্বত্র সংগতিরক্ষা হইয়াছে ও ইহাতে কবির মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ

ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়াও কবি কম কৃতিত্বের অধিকারী নহেন। কাব্যখানিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়াও অনেক নূতন ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়—এই ছন্দোবৈচিত্র্য বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে আরও পরিণত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। চর্যাপদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অধিকতর সংস্কৃতানুসারী—মনে হয় পঞ্চদশ শতকে বাংলা ভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আবার সংস্কৃতের আদর্শে ফিরিয়া আসিয়াছে। জনসমাজে পৌরাণিক চেতনা বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষাও সংস্কৃত শব্দচয়ন ও প্রয়োগরীতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাব ক্রিয়া সর্বনাম পদ, নানা সংস্কৃত-বহির্ভূত আঞ্চলিক লৌকিক শব্দ ও বাগ্‌ধারা (idiom), সংলাপরীতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ইহার প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তার লক্ষণগুলিও এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে ও লেখকের মৌলিকতার পরিচয় দিতেছে। 'চর্যাপদ'-এ বাঙালীর বিশিষ্ট জাতিলক্ষণ সব সময় ধরা পড়ে না—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কিন্তু বাঙালীর মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়, বাঙালী ভাবচেতনা ও জীবনরসবোধের ইহা প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দ

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কাহিনীতে বড়ু চণ্ডীদাস কতকগুলি নূতন আখ্যান যোগ করিয়াছেন—নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড এই দুই লীলার প্রথম প্রবর্তক তিনিই। প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। চৈতন্যভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের টীকায় ইহাদের স্রষ্টা যে চণ্ডীদাস তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেমলীলা যতই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিল, ততই নানা নূতন আখ্যান যোগ করিয়া ইহার বৈচিত্র্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল ও জনগণের জীবনযাত্রার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টা হইল। সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শুল্ক দেওয়া ও নদী পার হইতে নাবিককে মজুরি দেওয়া লোকের জীবনযাত্রার একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; এবং এই অতিপরিচিত প্রথাগুলিও ক্রমশঃ রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার অঙ্গীভূত হইল। অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এই শুল্ক আদায়ের উৎপীড়নমূলক দিকটাই দেখানো হইয়াছে—ইহার কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তখনও আরোপিত হয় নাই। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে ইহাদিগকে সূক্ষ্মতর রূপক-অর্থ-মণ্ডিত করা হইয়াছে। ভগবানের নিকট ভক্ত তাহার সর্বস্ব নিবেদন করিলেই ভবের হাটে তাহার বেচা-কেনা সার্থক হইবে ও সংসারসমুদ্র সে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। বড়ুর ইঙ্গিত পরবর্তী যুগে পূর্ণতর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নূতন আখ্যান ও আধ্যাত্মিকতা

৩

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে সংকলিত উদাহরণ

(১)

কেদার রাগঃ॥ রূপকং॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীব শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন॥ ১॥

কে না বাঁশী বাএ বডায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥ ধ্রু॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
অঝর ঝরএ মোব নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥ ২॥

আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ৩॥

বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
অন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে;
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

[বাএ=বাজায়। নই=নদী। বেআকুল=ব্যাকুল। কৈলোঁ=করিলাম আহ্মার=আমার। সুসর=সুস্বর। নহোঁ=নহি। যেহ্ন=যেন।]

(২)

ললিত রাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ূর-পুচ্ছে বান্ধি চূড়া কেশ পাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল-মেঘ-ছটা গন্ধ-চন্দনেব ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা ॥ ১ ॥

দূতা ল তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জাঁয়িতে। আল।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতে নান্দের পোঁঅ
হাঁসিতে এ বাঁশী বোলালিতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন-যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥

চন্দন-চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দবশনে।
নেত পবিধান লাসী হাতে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥

মোঞ ত অভিমানী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞি
এবেঁ তাক চাহি বন-দেশে।
তথাঁত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মাব বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

(৩)

ললিত রাগঃ ॥ একতালী ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে।
হেন মনে পরিহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥

বড়ায়ি গো
কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোব সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদাব পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥

সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥

এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[আন=অন্য। পো=পুত্র। বিকাসিলোঁ=প্রকাশ করিলাম। গোআল =গোপ। নেহা=স্নেহ, প্রেম। ননন্দ=ননদ।]

বিদ্যাপতি

৪

বিদ্যাপতি মিথিলা রাজসভার কবি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা, রাজমহিষী ও মন্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার পদাবলীর ভণিতায় সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজাদের শাসনকাল হইতে বিদ্যাপতির জীবনকালের একটা নিশ্চিত ধারণা করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির জীবন ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এইরূপ অনুমান নির্ভরযোগ্য।

বিদ্যাপতির কাল

বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ লেখা মৈথিলী ও অবহট্ট বা অপভ্রংশ-মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায়। ব্রজবুলি কোন প্রাদেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা ছিল না—ইহা রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুর-রস-প্রকাশোপযোগী, পদের লালিত্য ও ধ্বনির ঝঙ্কার-বিশিষ্ট, কবি-সৃষ্ট কাব্য-ভাষা। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতিই এই ভাষার আদি স্রষ্টা। বৈষ্ণব ভাবধারা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা উড়িষ্যা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ও বাংলা দেশে বৈষ্ণবপদ-রচনায় ইহা বাংলা ভাষার সহিত প্রায় সমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ব্রজবুলি

সে-যুগে মিথিলা ও বঙ্গদেশ একই সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের দ্বারা ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক সাহিত্যিক-গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। বিশেষত বিদ্যাপতি পদাবলী-সাহিত্যের আদি রচয়িতা রূপে বাংলা কাব্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কান্বিত; বাংলার প্রধানতম ভাবধারার উৎস রূপে তিনি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল প্রেরণার আধার। তিনি নিজ দেশ হইতে বাঙলা দেশেই অধিকতর আদৃত এবং সাধক কবি ও মহাজন পদকর্তা রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। সুতরাং জয়দেব যেমন সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ লিখিয়াও বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য, সেইরূপ বিদ্যাপতিও মৈথিলী, অপভ্রংশ (অবহট্ট) ও ব্রজবুলিতে রচনা করিয়াও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্য ও বিদ্যাপতি

কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু বৈষ্ণবপদ রচনাই করেন নাই—তাঁহার রুচি ও মনীষা এত বিচিত্র ও বহুমুখী ছিল যে উহা পঞ্চদশ শতকের লেখকের পক্ষে বিস্ময়কর।

তিনি কেবল কবি ছিলেন না, একটি বিদগ্ধ ও অনুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুইখানি ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহমূলক কাব্য, স্মৃতি ও পুরাণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, শিব, দুর্গা ও গঙ্গাস্তুতিবিষয়ক কিছু গ্রন্থ ও 'পুরুষপরীক্ষা' নামে আখ্যানগ্রন্থ অপভ্রংশ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর মধ্যে হরগৌরী, কালী, গঙ্গা প্রভৃতি শাক্ত দেবদেবীর স্তুতিমূলক পদও আছে। তিনি যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী রাধাকৃষ্ণ-উপাসক ছিলেন তাহাও মনে হয় না—তিনি বৈষ্ণবশক্তিনির্বিশেষে বহু দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন। তাছাড়া রাজসভার সহিত দীর্ঘকাল নিবিড় সংস্রব ও রাজকার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি ছিল তাহাও তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট। তিনি বহুভাষাবিদ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। মোট কথা বিদ্যাপতি সে-যুগের পক্ষে যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ও নানাবিষয়ক পাণ্ডিত্য-সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন ও সাধারণ ভাবসর্বস্ব কবি হইতে জীবনের সকল দিকের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

বিদ্যাপতির বহুমুখী-প্রতিভা ও রচনা-বৈচিত্র্য

৫

তথাপি বৈষ্ণব পদকর্তারূপেই বিদ্যাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি বৈষ্ণব ভাব-সাধনার স্বর্ণসূত্রেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁহার পদে তিনি যে বিভিন্ন রসের প্রবর্তন করিলেন ও ভক্তি ও রূপমুগ্ধতার সুর যোজনা করিলেন, চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে তিনি পরিণতির নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা করিলেন ও ইহারই মধ্যে অধ্যাত্ম তাৎপর্য আরোপ করিলেন। তাঁহারই পদের অনুসরণে পরবর্তী কবি ও আলঙ্কারিকেরা এই প্রেমকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, মাথুর-বিরহ ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্যস্ত করিয়া ইহাকে একটি সুনির্দিষ্ট রসপরিণতি দিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কেবল মিলন ও বিরহ ছাড়া আর কোন রসের নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং তাঁহার কাব্য মুখ্যত আখ্যায়িকা-কাব্য বলিয়া পদের আঙ্গিকও সেখানে স্থিরীকৃত হয় নাই।

বৈষ্ণব পদাবলী ও বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতিই প্রথম এক একটি ভাবের উচ্ছ্বাসকে কয়েকটি পংক্তির মধ্যে গাঢ়বদ্ধ রূপ দিয়া ও শেষে ভণিতার মধ্যে কবির নিজ মন্তব্য যোগ করিয়া পদের অবয়বটি নির্মাণ করিলেন।

চণ্ডীদাস যেমন রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে গ্রাম্য ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি দিয়া দৈবী লীলাকে মানবিক রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাপতিও তেমনি ইহার সহিত উচ্চতর জীবনচর্চার, রাজসভাব বিদগ্ধ রস ও রুচির সংস্পর্শ ঘটাইয়া ইহার রমণীয়তা ও মানবিক আবেদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করিলেন। তিনি রাধাকে ভাবমুগ্ধা কিশোরীরূপে আঁকিয়া ও তাহার অন্তরে বয়ঃসন্ধিসুলভ প্রেমেব উন্মেষ দেখাইয়া তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধার সখীমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া ও তাহাদিগকে নায়ক-নায়িকার মিলনে ও প্রেমের দৌত্যে নিয়োগ করিয়া ইহার চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ হাস্যপরিহাসপ্রীতিপূর্ণ যৌবনাবেশের আবহাওয়া রচনা করিয়াছেন। মানঅভিমানের সুষ্ঠু কল্পনার দ্বারা তিনি প্রেমের বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তা বাড়াইয়াছেন, ইহার কুটিল গতি, রহস্যময় প্রকৃতিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশেষতঃ অভিসাব-পরিকল্পনা বিদ্যাপতির মৌলিকতার একটি অপূর্ব নিদর্শন। অবশ্য চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের মধ্যে অভিসারের প্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল; কেনা-বেচার লৌকিক প্রয়োজনের অন্তরালে নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠাই লু॰ . আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি এই ছলনার পরদা সরাইয়া সোজাসুজি নায়িকার সমস্ত বাঁধভাঙা, উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসই দেখাইয়াছেন। আর এই অভিসারকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি দুর্গম পথের সমস্ত বাধা, বর্ষার দুর্যোগময়ী প্রকৃতি, বজ্র ও বিদ্যুতের হানাহানি, বনপথের আঁধারে মগ্ন পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন ও ইহাতে সাধনের দুরূহতার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বিদ্যাপতির মৌলিক ভাবকল্পনা

বিরহপর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি উদার আত্মবিসর্জন ও গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার নূতন সুর লাগাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিরহ-বর্ণনা একটা আলঙ্কারিক প্রথার মতই ব্যবহৃত হইয়াছে—উহাতে নায়িকার অন্তরবেদনা খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এমন কি কালিদাসের 'মেঘদূত'-এও আমরা রমণীয় চিত্রপরম্পরা যতটা পাই, ততটা অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ পাই না। বড়ু চণ্ডীদাসে রাধার বিরহবেদনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই; কিন্তু উহাতে নায়িকার চিত্তবিশুদ্ধি বা দেহাতীত আকর্ষণের বিশেষ পরিচয় মিলে না। বিদ্যাপতির পদে আলঙ্কারিক

বিদ্যাপতির বিরহ ও ভাব-সম্মিলনের পদ

প্রথার সঙ্গে ক্ষমাস্নিগ্ধ, আত্মসংযমপূত মনোভাবের মিলন দেখা যায়। বিশেষত মাথুর বিরহের পদগুলিতে আর্তির যে করুণ রস, প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দৈব ও কর্মফলকে দায়ী করার যে প্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উদারতা ও মাধুর্য উহাদের ভাবোৎকর্ষের কারণ। ভাবসম্মিলনের পদগুলিও বিদ্যাপতিব উন্নত ভাবকল্পনার পরিচয়। তিনি কোনও পুরাণ অনুসরণ না কবিয়া কেবল নিজ কবিমনের সহজ অনুভূতির জন্য রাধাকৃষ্ণের বিরহের পর পুনর্মিলন ঘটাইয়াছেন; এই পদগুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না; চৈতন্যপূর্ববর্তী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুভূতিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা যে রসমাধুর্য ও ধর্মসাধনারূপে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে চৈতন্যধর্মতত্ত্ব না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্তেব সংস্কারের বলেই বহুপদে বৈষ্ণবধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছেন।

অবশ্য বিদ্যাপতির সব পদই এই উচ্চ ভাবের স্তরে পৌছে নাই। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন ও রাজা ও রাজসভাসদ্‌বর্গেব রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচনা করিতেন। তাঁহাব অনেক পদে রাজসভার যে প্রেমে সৌন্দর্যবিলাসের আদর্শ প্রচলিত ছিল ও যাহাতে কুরুচির স্পর্শ ছিল সেই দরবারী প্রেমেরই ছবি অঁাকা হইয়াছে। তাঁহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত, দেহ-সৌন্দর্যপিয়াসী নায়ক; তাঁহার রাধা কখনও আদর্শ ভক্ত, কখনও বা প্রণয়তত্ত্বে অভিজ্ঞা, সুচতুরা নায়িকা, যিনি নায়ককে গোঁয়ার বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। তাঁহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের তন্ময়তা ফোটে নাই, রাজানুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি শোনা যায়। তিনি এমন কি রাজা শিবসিংহকে একাদশ অবতাররূপে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে ভগবত্তার মর্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন—কোনও ভক্ত বৈষ্ণব কবি আরাধ্যদেবতার এরূপ মর্যাদা-হানি কখনই করিতেন না। সময় সময় তাঁহার পদে তাঁহার সংসারজ্ঞান, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্য ও কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিতের নিদর্শন মিলে। মিথিলার গ্রাম্যজীবনযাত্রা, স্থূল হাস্যপরিহাস, সামাজিক রীতিনীতির ছাপও তাঁহার রচনাকে চিহ্নিত করিয়াছে। মোটকথা বিদ্যাপতি গোড়া হইতেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন না; তিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ধারা-অনুসরণে লৌকিক প্রেমের কবিতা লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহার মধ্যে ভক্তির ও ভাবুকতার সুর মিশাইলেন ও দিব্য প্রেমের চেতনা তাঁহার অন্তরে ধীরে

বিদ্যাপতির প্রেমের আদর্শ ও ক্রম-বিকাশ

ধীরে স্ফুরিত হইল। তাঁহার পদে এই ভাবপরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাপতির সার্বভৌম ধর্মচেতনা

বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের উর্ধ্বে যে একটি সার্বভৌম ধর্মচেতনা আছে তাহারই মহিমান্বিত প্রকাশ। এই পদগুলিতে তিনি ভগবানকে কোন পৌরাণিক দেবদেবীরূপে কল্পনা করেন নাই, তাঁহার নিখিলবিশ্বব্যাপী রূপটিই অনুভব করিয়াছেন ও কোন সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া সোজাসুজি বিশুদ্ধ ভক্তির আবেগে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সেইরূপ দুই একটি পদে সমস্ত খণ্ড-সৌন্দর্যের পিছনে, সমস্ত আংশিক প্রেমের অন্তরালে যে একটি অনুভূতির অতীত, অখণ্ড প্রেমসৌন্দর্যের আদর্শ বিরাজমান তাহার চিরসীমাহীন সত্য রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই দুই জাতীয় পদের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে। ইহারা প্রমাণ করে যে বিদ্যাপতি শুধু মিথিলার রাজসভার কবি নহেন, শুধু বৈষ্ণব ভক্ত কবি নহেন; তিনি স্থানকালেব গণ্ডী ছাডাইয়া যে সার্বভৌম অনুভূতির উচ্চশিখরে সর্বদেশেব সর্বকালের কয়েকটি মহাকবি আসীন সেখানেই স্থান পাইবাব অধিকারী।

৬

বিদ্যাপতি হইতে সংকলিত পদ

(১)

বয়ঃসন্ধি

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণচপলতা লোচন লেল ॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ ॥
অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহ নত কয় মাথ ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥

হম অবধারল শুন বর কান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

(২)

রূপবর্ণনা

এ সখি কি পেখল এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি সপন সরূপ॥
কমলযুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি-লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর-পাঁতি।
তাহি নবপল্লব অরুণক ভাঁতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন-যোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিসান।
পুন হেরইতে হমে হরল পরাণ॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভণে।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভল জনে॥

(৩)

আক্ষেপানুরাগ

অংকুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ই নব যৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সে পিয়া-নেহে॥

হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ যব বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥

(৪)

ভাব-সম্মিলন

আজু রজনী হম ভাগে গমাওঁলু
পেখলুঁ পিয়ামুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয় নবনেহা॥

(৫)

প্রার্থনা

মাধব, বহুত মিনতি কর তোয় ।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিল,
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার ।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ ।
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

(৬)

রূপানুরাগ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিয়ে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল ।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শূনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥

কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
　　ন বুঝল কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
　　তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
　　অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
　　লাখে ন মিলল এক॥

চতুর্থ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

১

(সুরের ঝংকারের মধ্যে একটা মাদকতা আছে।) চিরচঞ্চল শিশুদের উদ্দাম মনকেও সুরের চুম্বক সজোরে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনে, নিবিষ্ট ও একনিষ্ঠ করিয়া তোলে। এই সুর-সঙ্গীতের প্রথম ও প্রবল প্রকাশটি দেখা যায় মায়েদের মুখে ঘুম-পাড়ানী গানের মধ্যে। শিশুকালের এই সুরপ্রীতি-ই হয়ত উত্তরকালে সঙ্গীতানুরাগ ও কাব্যসাধনার অন্যতম অনুপ্রেরণা ও প্রযোজক কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গীত কিংবা সুর-সমন্বিত কাব্য যে সকল দেশের সাহিত্যেরই আদিমরূপ, তাহার মূলেও হয়ত মানুষের কানের বা সুরের নেশার খানিকটা প্রভাব আছে। বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম রূপ চর্যাপদ, মূলতঃ গীত-সুরসমন্বিত কাব্য। কিন্তু শিশুমনও শুধু সুরে খুশী হয় না—তাহার সঙ্গে একটি কাহিনীর ছায়া,—তাহা যতই অর্থহীন ও অস্পষ্ট হউক—একটা প্রাণ-চঞ্চল ঘটনা-প্রবাহ দেখিতে চাহে। ইহার জন্যই রূপকথা ছোটদের এত প্রিয়। এই কারণেই গীতের পরে বা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকল সাহিত্যেই কাহিনী-কাব্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনী-কাব্য, পাঁচালী-কাব্য হইতেছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যও পালা হিসাবে গান করা হইত। তবে, ইহাতে সুর হইতে কাহিনীর প্রাধান্য বেশী। এখন আমরা সুর-বর্জিত মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পাঠ করিয়া উহার ভাব-প্রেরণাটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি।

মঙ্গলকাব্যের আদি ভাব-প্রেরণা

মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে কল্যাণ। যে কাব্যের কাহিনী শ্রবণ করিলে সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ হয়, তাহাকেই মোটামুটি মঙ্গলকাব্য বলা হয়। এই মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয় এক একটি দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তন। এই দেবতাদের মধ্যে আবার স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য বেশী। মনসা ও চণ্ডী-ই মঙ্গলকাব্যের প্রধান স্ত্রীদেবতা। ধর্মঠাকুর পুরুষদেবতা। শিবঠাকুরকেও ব্যাপকার্থে মঙ্গলকাব্যের বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে প্রাগ্‌ইসলাম যুগকে আদিযুগ, মুসলমান আমলকে মধ্য যুগ, আর ইংরাজ আমল ও পরবর্তী কালকে আধুনিক যুগ বলা যায়। মঙ্গলকাব্য এই মধ্য যুগের কাব্য। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, সমুন্নতি ও অন্ত্য-পরিণতি মধ্য যুগের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাঙলা দেশে তুর্কী আক্রমণ হইল হিন্দু সেন রাজত্বের সময়ে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে। কেন সেন-রাজারা এই লঘু আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেন না সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। রাজশক্তির পশ্চাতে জনসমর্থন না থাকিলে, অন্ততঃ রাজশক্তির সহিত প্রজাসাধারণের একটা মৈত্রী-সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা কদাচ শক্তিশালী হইতে পারে না। মনে হয় যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজারা মাত্র স্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত বাঙালী-সাধারণ বৈদেশিক আক্রমণের সময় হয় রাজবিরোধী কিংবা উদাসীন ছিল। ক্ষমতাচ্যুত বৌদ্ধেরা হয়ত আক্রমণকারীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মনে হয়, হয়ত তাহারা অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

বাঙলা মূলতঃ অনার্য-অধ্যুষিত দেশ এবং বাঙালী জাতি মিশ্র জাতি। উন্নততর আর্যধর্ম ও সভ্যতার হাজার বৎসরের প্রচণ্ড চাপে বাঙালী আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্লাবন মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হইবার পর সমগ্র ভারতে যখন আবার বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তখনও উচ্চবর্ণের বাঙালী ব্যতীত সাধারণ বাঙালীর মধ্যে আর্যধর্মের উন্নত আদর্শবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার হয় নাই। তাহারা নিজেদের লৌকিক দেবতার সহিত পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণ ঘটাইয়া নূতন ধর্মের ও নূতন দেবতার সৃষ্টি করিয়া খিড়কি দরজা দিয়া আর্যধর্মে প্রবেশ করিল। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা বাঙলার মাটিতে সৃষ্ট এই নূতন দেবতা।

এই লৌকিক দেবতা-ব্যূহে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্য সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। বৈদিক ধর্মে স্ত্রীদেবতার আসন একান্ত ভাবেই গৌণ। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবতা নারীরূপা এবং তন্ত্রের পুণ্যভূমি হইতেছে বাঙলা দেশ। কাজেই এইখানে নারী-দেবতার প্রাধান্য যদিও অনার্য উৎস হইতে আসিয়া থাকে, তথাপি আর্যধর্মনির্দিষ্ট তন্ত্রসাধনার প্রভাবেই উহা জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল

হইয়াছে। পরে বৈদিক, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, হিন্দু-তান্ত্রিক, পৌরাণিক ভাবাদর্শের মিশ্রণে এবং বাঙালীর নিজের সমাজ ও পরিবার জীবনের নারী-প্রাধান্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই নারীদেবতা সমগ্র বাঙালী জাতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন।

কিন্তু এই পরিণতি তুর্কী আক্রমণের পূর্বে আসে নাই। ইহার আগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের পূর্বাগত প্রথানুসারে পথে-প্রান্তরে, গাছে-পাথরে এই লৌকিক দেবদেবীর পূজা করিত, তৈল-সিন্দুর-পান দিয়া উলুধ্বনি করিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিত। এই লৌকিক দেবতারা একাধারে ভয়ংকর ও ভক্তবৎসল ছিলেন। প্রসন্ন হইলে একদিকে যেমন ইঁহারা ভক্তের জন্য যে-কোন কঠিন কাজ করিয়া দিতেন, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ হইলে চরম সর্বনাশ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। মনসা, চণ্ডী এবং খানিকটা ধর্মঠাকুর—এই তিনটি প্রধান গণদেবতার মধ্যে এই বিশিষ্টতা অধিকভাবে পরিস্ফুট।

আর একটা বিষয় লক্ষণীয়। এই সব মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা প্রধানতঃ বণিক সম্প্রদায় ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চশ্রেণীর প্রাধান্য এই সময়ে অপেক্ষাকৃত গৌণ। প্রাচীন কালে, বৌদ্ধ রাজাদের আমলে বাঙালী সওদাগর সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গার বহর লইয়া বিভিন্ন পট্টনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাঁহাদের এই সাড়ম্বর দুঃসাহসিক অভিযান লইয়া কিছু কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই সব কাহিনীই হয়ত কোন কোন মঙ্গলকাব্যের মূল আখ্যায়িকার অস্থিকংকালরূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। ইহা দ্বারাও অনুমান করা যায় যে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি মূলতঃ বাঙালীর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের উপাদানে রচিত।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিধর্মী রাজশক্তির চাপে বাঙালী উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে ঘুচিতে লাগিল। ভক্তি-বাদের মূল কথাই হইল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ও দৈবানুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। উচ্চবর্ণের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা যতই পরিস্ফুট হইল, দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য যতই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মধ্যে দেবতার নিকট এই আত্মসমর্পণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার উপর রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আরও ঘনীভূত করিল। এই পরিস্থিতিতে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরাও লৌকিক দেবদেবীর দৈবী শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল ও উভয়

শ্রেণীর মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য গড়িয়া উঠিল। দেবতার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপরই মানুষের শুভাশুভ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নির্ভর করে; পুরুষকার নহে, দৈবই সর্বশক্তির আধার—এই বিশ্বাস উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও প্রসারিত হইল। তখনই শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর কবিগণ চিরাগত মূল আখ্যায়িকার খড়-কুটার কাঠামোর উপরে শাস্ত্র-পুরাণের মাটির প্রলেপ দিয়া, বৈদিক-তান্ত্রিক কল্পনার রঙ ফলাইয়া যে মঙ্গলমূর্তি রচনা করিলেন—তাহাই বাঙলার নিজস্ব কাহিনীকাব্য মঙ্গলকাব্য রূপে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বাঙালীর চিত্তবিনোদন করিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মোটামুটি এই জাতীয় রচনা চারিটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশে বন্দনা। এই অংশে নানা দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। এই বন্দনা একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে শুধু যে ইষ্ট দেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর বন্দনাই হইত তাহা নহে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উপাস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ

দ্বিতীয় অংশ—গ্রন্থ-রচনার কারণ-বর্ণনা। ইহার মধ্যে কবির আত্মপরিচয় থাকিত। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই যে স্বপ্নাদেশে বা দৈবনির্দেশে রচিত হইয়াছে—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশ—দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ-স্থাপনই ইহার মূল কথা। এই অংশে শিবের সম্বন্ধ ও প্রাধান্য লক্ষণীয়।

চতুর্থ অংশ—নরখণ্ড এবং মূল আখ্যায়িকার বর্ণনা। দেবতার পূজা-প্রচারের জন্য কোন কোন দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ নীলাম্বর ও মায়া; মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দর ঊষা-অনিরুদ্ধ।

এই নরখণ্ড-বর্ণনার মধ্যে আরও কয়েকটি আঙ্গিক আছে। মুখ্যতঃ নায়িকাদের বারমাসের সুখদুঃখের কাহিনীর বর্ণনামূলক 'বারমাস্যা'-অংশ এই আঙ্গিকের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত চৌতিশা অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক-নায়িকাকর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষর যোগে ইষ্টের স্তুতি, নায়িকার সজ্জা ও রন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২

মঙ্গলকাব্যের ব্যাপ্তিকাল চৈতন্য-পূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারিশত বৎসর ধরা চলে। ইহার মধ্যে বাঙালী সমাজের নানা পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠানশাহীর অবসানে তখন মোগল সাম্রাজ্য বাঙলার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়াছিল। কিন্তু পল্লীপ্রধান বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘটা সাময়িক ছায়াপাত করিলেও কোন বাত্যাচঞ্চল দ্রুত পরিবর্তনের প্লাবন আনিতে পারে নাই। স্বাভাবিক ভাবে শম্বুক-গতিতে জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল এবং যে পরিবর্তনের পথে সমাজ চলিতেছিল তাহার গতিও ছিল মন্থর। এই কারণে, কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা ওলট-পালট না হওয়াতে, এই চারিশত বৎসরের সামাজিক অবস্থা মোটামুটি অতীতানুসারী ছিল এবং মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য হইতে এই ধীর রূপান্তর-প্রক্রিয়ার একটা নক্‌শা পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিরের আক্রমণের বেগ খুব বেশী না হইলেও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রভাব বাঙালী-সমাজকে শুধু ধর্ম-জীবনে নহে, সামাজিক-জীবনেও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল এবং এই গতির প্রবলতাকে অনেকে সমাজ-বিপ্লব বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যে সমাজ-জীবনের ছবি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তখন সবে শুরু হইয়াছে। কিন্তু ইহা চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত নবাব, রাজা, জমিদারের আশ্রয় ছাড়া স্বাধীন বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কবিগণ ‘গুণরাজ খাঁ’ ‘কবিকংকণ’ প্রমুখ নানা খেতাব পাইতেন।

বেশভূষা-অলংকারের মধ্যেও এই সময়ে সুরুচি ও উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের পোশাক—“একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।” মেয়েরা পশ্চিমাদের মত কাঁচুলি পরিতেন, বিশেষতঃ উৎসব-সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। মেঘডম্বুর আদি নানা রকমারি শাড়ীর নাম পাওয়া যায়। নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পরিত “খুঞার বসন।” শাঁখা স্বর্ণালংকারের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গহনার প্রতিও আগ্রহ দেখা যায়। পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুণ্ডল থাকিত। লম্বা চুল রাখা পুরুষগণেরও সৌন্দর্যবর্ধক ছিল। “পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথায় চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কূল॥” নাগর জীবন সম্বন্ধে কবিকংকণ

মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—"নগরে নাগরজনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন পরিধান।" কানাড়ী প্রভৃতি নানা ছন্দে খোঁপা বাঁধিতেন মেয়েরা।

বিদ্যাচর্চা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোলের অধ্যাপক ব্রাহ্মণই হইতেন এবং উঁহাদের ব্যাকরণ-প্রীতি অধিক ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন বেশী ছিল না। তবে কেহ কেহ সামান্য কিছু জানিতেন।

দেশে বণিকদিগের খানিকটা খ্যাতি ছিল। সমুদ্রযাত্রার যে সব বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা শোনা-কথা বলিয়াই মনে হয়, বাণিজ্য-বহর নৌকাতে চলিলেও তাহা সমুদ্রপার হইয়াছে বর্ণনা দ্বারা তাহা বোঝা যায় না। দ্রব্যবিনিময় হইত। কড়ি দিয়া সাধারণতঃ কেনা-বেচার রীতি ছিল। পণ্য-মূল্যের তালিকা দেখিয়া জিনিসপত্র অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের বর্ণনা যেগুলি পাওয়া যায় তাহা অনেকখানি কৃত্রিম। যথার্থ বীরত্ব তাহার মধ্যে নাই। বাঙালী সৈনিক ছিল এবং নানা জাতির মধ্য হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইত। বড় রকমের যুদ্ধের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে নাই। ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধগুলি অতিপ্রাকৃত-প্রভাবপুষ্ট বর্ণনা।

রাজনৈতিক পরিবেশে যে একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি বা ব্যাপক মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল তাহা মনে করিবার কারণ নাই। মুসলমান ডিহিদার ও নবাবগণ ক্ষেত্রবিশেষে বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করিতেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তাহার আভাস আছে। কিন্তু তাহা কদাচ অরাজকতা সৃষ্টি করে নাই—স্থানীয় ও সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। কবিকংকণ মুকুন্দরাম কালকেতুর নগর-পত্তন-পালার যে নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রার ছবি দিয়াছেন, তাহাতে একটা নূতন সমাজ-সংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের এক সুনিশ্চিত আভাস মিলে। ইংরেজ যুগ পর্যন্ত যে সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত ছিল তাহার যে প্রথম ভিত্তি-পত্তন ষোড়শ শতকে হয়, মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্য হইতে আমাদের এই প্রতীতিই জন্মে। ঘরগৃহস্থালির কথা, বহুবিবাহের বিষয়, সতীনের জ্বালা, বশীকরণের ঔষধ করিবার চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্র বিবরণ আছে। ভারতচন্দ্রের আমলে আসিয়া গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাসিতার রুচি দ্বারা অভিভূত হইয়াছে দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে এই কারণে ভারতচন্দ্রের কাব্য অনেকখানি অভিজাত। তাহা হইলেও বাঙালী জাতির সাধারণ

অন্তরের কথাটি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষা পাইয়াছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" অর্থাৎ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের প্রাচুর্যপূর্ণ সহজ সরল জীবনই তখন অনভিজাত সমাজের প্রধান কাম্য ছিল।

৩

মনসামঙ্গল

সর্পকুলাধিষ্ঠাত্রী শিবকন্যা মনসার সহিত সৎ-মা চণ্ডীর বিরোধ ছিল। এই বিরোধে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মনসার স্বামীর নাম জরৎকারু।

কাহিনী

মনসাপুত্র আস্তিক জন্মেজয়েব সর্পযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সর্পকুলকে বক্ষা করিয়াছিলেন।

মনসা নিজের পূজা প্রচারেব জন্য মূল অবলম্বনরূপে নির্বাচন করিলেন পরম-শৈব চম্পকনগবেব শ্রেষ্ঠ বণিক চাঁদ সদাগরকে। কিন্তু চাঁদ মনসাকে দেবী বলিয়া গ্রাহ্যই করিলেন না; মনসাব দেখানো সকল লোভ ও ভয়-ই চাঁদ উপেক্ষা কবিলেন। তখন রুষ্টা মনসা চাঁদেব সর্বনাশে বদ্ধপবিকর হইলেন। চাঁদের মহাজ্ঞান হৃত হইল, বন্ধু ধন্বন্তরি ও ছয় পুত্র সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করিল। বাণিজ্যগামী চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকব ডুবিয়া গেল। বহু লাঞ্ছনার পর চাঁদ স্বদেশ-প্রত্যাগত হইয়া নবজাত তরুণ পুত্র লখীন্দরকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। যথাকালে সায়বেনের রূপবতী কন্যা বেহুলার সহিত লখীন্দরের বিবাহ হইল। মনসাব আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চাঁদ সান্তালি পর্বত-উপবে লোহাব বাসর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাব মধ্যেও সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু হইল। স্বামীর মৃতদেহ লইয়া কিশোবী বেহুলা ভাসিয়া চলিলেন এবং দেবলোকে গিয়া দেবতাদিগকে নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট করিয়া, মনসাব প্রীতিবিধান করিয়া, স্বামী, ছয় ভাশুর, ডুবানো সপ্তডিঙ্গা মধুকর সব লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বেহুলার অনুরোধে চাঁদ এইবার মনসার পূজা না করিয়া পারিলেন না।

মনসামঙ্গল বাঙালীর অন্যতম প্রধান জাতীয় কাব্য। চাঁদ সদাগরের প্রচণ্ড পৌরুষ, বেহুলার বিদ্যুদ্দীপ্ত নারীত্বের মহিমা—এই কাহিনীটিকে মানবীয় রসে

মনসামঙ্গলের কবি

সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়া ইহা অতি জনপ্রিয় হইয়াছিল। শত শত কবি মনসামঙ্গল কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইহার মধ্যে মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় মাত্র দিব।

মনসামঙ্গলের আদি কবি বলা হয় **কানা হরি দত্তকে**। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন—"প্রথমে রচিল গান কানা হরি দত্ত।" তাঁহার বিশদ বিবরণ জানা যায় নাই। অনুমান ত্রয়োদশ শতকে তিনি পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জিলাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জিলাতেই **নারায়ণ দেব** নামে বড় একজন মনসা-মঙ্গলের কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক সময়ে রাঢ় হইতে আসাম পর্যন্ত তাঁহার রচনা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। নারায়ণ দেব সংস্কৃতজ্ঞ ও করুণরস-সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত কবি ছিলেন। বসিরহাট মহকুমার ব্রাহ্মণ কবি **বিপ্রদাস পিপিলাই** অলংকৃত সরল ভাষায় মনসামঙ্গল রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম দিকের মনসামঙ্গলকারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **বিজয় গুপ্ত**। পূর্ববঙ্গে বরিশাল জিলার ফুল্লশ্রী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এখনও ফুল্লশ্রীতে বিজয় গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত মনসা অর্চিত হইতেছেন। হুসেনশাহের আমলে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় মনসামঙ্গল রচনা করেন। বিজয় গুপ্তের পাঁচালীতে বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। নানা সামাজিক আচার-আচরণ ও দ্রব্যাদির নানা বিবরণে বিজয় গুপ্তের পাঁচালী সমৃদ্ধ।

বিজয় গুপ্তের রচনা-বৈচিত্র্যের কিছুটা নমুনা দেওয়া হইল :

(১)

সোনেকার রন্ধন

মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাচ গাচ।
মাজ-কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা।
তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙড়ীর মাথা॥

বিজয় গুপ্তের করুণরসের বর্ণনাও সরল ও আন্তরিক।

(২)

বেহুলার লোহার বাসরে বিলাপ

বাও নাই বাতাস নাই লোহার ঘরে বাস।
কোন নাগিনী আসি প্রভুরে কৈল নাশ॥

এ নব যৌবন আমার গেল ছারখার।
কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর ॥
ঢলিয়া পড়িল প্রভু চৈতন্য নাই।
বাসর শূন্য আজু মোর করিলা গোসাঞি ॥

হাস্যরস সৃষ্টিতেও বিজয় গুপ্ত নিপুণ ছিলেন।

(৩)

গোদার বর্ণনা

সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি।
দারুণ জ্বর পাইলে ছাড়ে ভাত পানি ॥
চট ভুটি মুড়ি দিয়া রৌদ্রে পড়ে থাকে।
অতি বড় কম্প হইলে মাউগেরে মা ডাকে।
ডুমুরিয়া গোদা যেন ছোড়া নায়ের বড়া
চারিদিকে নামিয়াছে পর্বতের ঝরা ॥

চৈতন্যোত্তর যুগে বহু কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহট্ট অধিবাসী **ষষ্ঠীবর দত্ত** গুণরাজ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জের **দ্বিজ বংশী** পাঁচালীকার ও গায়েন ছিলেন। বংশীদাস রামায়ণের কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। প্রবাদ যে, নরঘাতক দস্যু কেনারাম বংশী-দাসের ভাসান শুনিয়া দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া কবির তল্পিবাহক হইয়াছিল। পশ্চিম-বঙ্গে এই কালে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মনসামঙ্গলের কবি ছিলেন **কেতকাদাস ক্ষমানন্দ**। কবির আসল নাম ক্ষমানন্দ। মনসার এক নাম কেতকা বলিয়া কবি নিজেকে কেতকাদাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। সপ্তদশ শতকে বর্ধমান জিলার কাঁদড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রচনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অংশ ছাড়াও তাঁহার মনসামঙ্গল বহু সমসাময়িক বিবরণ ও ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ। এই সব কবি ব্যতীত কালিদাস, রামজীবন, সীতারাম, বাণেশ্বর, উত্তরবঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুই স্বতন্ত্র আখ্যানে বিভক্ত। প্রথমটি "আখেটিক-খণ্ড", কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ; দ্বিতীয়টি বণিক-খণ্ড, শ্রীমন্তোপাখ্যান।

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর চণ্ডীব ছলনায় অভিশপ্ত হইয়া ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর-পত্নী ছায়াও সঞ্জয় ব্যাধের কন্যা ফুল্লরা হইয়া জন্মিলেন। যথাকালে কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ হইয়া গেল। কালকেতুর অত্যাচারে পশুগণ দেবী চণ্ডীর কাছে নালিশ জানাইল। চণ্ডী গোধিকারূপে কালকেতু দ্বাবা ধৃত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিলেন। তারপব দেবী নিজমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া কালকেতুকে বহু ধন দিলেন। কালকেতু দেবীব উপদেশে জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইলেন। ভাঁড়ুদত্ত নামে এক ধূর্ত লোক কালকেতুব আশ্রয়ে থাকিয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে, কালকেতু তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ ভাঁড়ু দত্ত নালিশ জানাইল কলিঙ্গ রাজার কাছে। কালকেতু ও কলিঙ্গ রাজার যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কিন্তু চণ্ডীর প্রসাদে অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি ঘটিল। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পুত্রকে সিংহাসন দিয়া কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গে গেলেন।

কালকেতুর কাহিনী

উজানী নগরের সমৃদ্ধ বণিক ধনপতি শ্যালিকা-সম্পর্কিত খুল্লনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী লহনা নিঃসন্তানা ছিলেন। ধনপতি বাণিজ্যে গেলে লহনা সতীনের উপর নানা অকথ্য অত্যাচার করিত, একা বনে ছাগল চরাইতে পাঠাইয়া দিত। খুল্লনা পূর্বজন্মে ছিল রত্নমালা নামে অপ্সরা, অভিশপ্ত হইয়া মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবী চণ্ডী এক বিদ্যাধরীকে পাঠাইয়া খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া দিলেন। ইহার পর ধনপতি বাড়িতে ফিরিয়া কয়েকদিন থাকিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করিলেন। পথে কালীদহে এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল। পদ্মের উপর বসিয়া একটি সুন্দরী তরুণী একটি বৃহদাকার হস্তী ধরিয়া গিলিতেছে আর উদ্গিরণ করিতেছে। সিংহলে পৌঁছিয়া ধনপতি রাজাকে এই কাহিনী বলিলেন কিন্তু রাজাকে আনিয়া দেখাইতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধ রাজা ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দেবী চণ্ডী ধনপতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ সিংহলে আসিবার পূর্বে ধনপতি খুল্লনার চণ্ডীর ঘট ভাঙিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ত-উপাখ্যান

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র হইল, নাম শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহল চলিলেন। কালীদহে শ্রীমন্ত-ও কমলেকামিনী দেখিলেন কিন্তু ধনপতির মত তিনিও সিংহলরাজকে তাহা দেখাইতে পারিলেন না। রাজা শ্রীমন্তের মৃত্যু-দণ্ড দিলেন। শ্রীমন্তের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। পিতা ধনপতির সহিত শ্রীমন্তের মিলন হইল। সিংহল-রাজ শ্রীমন্তের সহিত নিজ কন্যা সুশীলাব বিবাহ দিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ ও বিপুল ধনরত্ন সহ ধনপতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

নানা কবি চণ্ডী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। সকলেই কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গল' নামটি গ্রহণ করেন নাই। দ্বিজ মাধব তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন সারদামঙ্গল, কৃষ্ণজীবন দুর্গামঙ্গল, মুক্তারাম সেন সারদামঙ্গল। অন্যান্য নামও আছে। কালিকামঙ্গল কি অন্নদামঙ্গলও দেবী-মহিমাখ্যাপক গ্রন্থ। কিন্তু বিষয়বস্তু ও মেজাজ উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পরে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া ধরা হয় **মানিক দত্তকে**। মানিক দত্ত মালদহ জিলায় ভুলুয়া অঞ্চলের মানুষ এবং চৈতন্য-পূর্ব কবি। তাঁহার রচনা সরস ও বাস্তবতাপূর্ণ। ষোড়শ শতকেব শেষার্ধে **দ্বিজ মাধব** চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস সপ্তগ্রামে কি চট্টগ্রামে ইহা লইয়া মতানৈক্য আছে। তবে কবির সবগুলি পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিজ মাধবের রচনা বাস্তবতাগুণ-সমৃদ্ধ এবং তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহা ছাড়া বলরাম কবিকংকণ, দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ রামদেব, দ্বিজ হরিরাম, মুক্তারাম সেন, রামানন্দ যতি, জয়নারায়ণ দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীমঙ্গলের, তথা মধ্যযুগের যাবতীয় মঙ্গলকাব্যের কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **কবিকংকণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী**। ষোড়শ শতকের শেষভাগে মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে। এইখানে নিরুপদ্রব সরল জীবন-যাত্রার মধ্যে একদা মহা অনর্থ আসিয়া দেখা দিল। মানসিংহ তখন বাঙলার সুবাদার। তাঁহার অধীনে মামুদ সরিপ নামে একজন ডিহিদার ঐ অঞ্চলের মালিক হইয়া আসিলেন। অত্যাচারী মামুদের তাড়নায় বহু নর-নারী বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। মুকুন্দরামও একরাত্রে স্ত্রী পুত্র ভ্রাতাকে লইয়া গোপনে দেশ ত্যাগ করিলেন। পথে অকথ্য দুঃখকষ্ট, অনাহার অনিদ্রা ভোগ করিয়া শেষে আসিয়া পৌছিলেন

মেদিনীপুর জিলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে। আসিবার পথে স্বপ্নে মুকুন্দরাম দেবী চণ্ডীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে। মুকুন্দরাম বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হইলেন। এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। বাঁকুড়া রায় স্বর্গলাভ করিলেন, পুত্র রঘুনাথ রাজা হইলেন। তখন রঘুনাথেব আগ্রহে দীর্ঘকাল পর মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে তদানীন্তন বাঙালী-সমাজ নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু এই বাস্তব-চিত্র-চিত্রণ-ই মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ গুণ নহে, বাস্তব রসকে জীবন-রসের সহিত মিশাইয়া তিনি অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে অখণ্ড জীবন-রসের আস্বাদ লাভ করা যায়। জীবনের প্রত্যক্ষরূপের, স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-রস-রসিকতার প্রাচুর্যের যে প্রকাশ মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় তাহা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। বস্তু-সঞ্চয় ও বাস্তব রসেব পরিবেশন-নৈপুণ্য —দুই দিক দিয়াই মুকুন্দবাম মধ্যযুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শব্দ সংগ্রহে ও যোজনায়, অলংকারের নিপুণ পরিবেশনে, বর্ণনার অকপটতায় তাঁহার রচনা সর্বত্রই সমৃদ্ধ। আমরা কযেকটি অংশ উদ্ধার করিয়া নমুনা দেখাইতেছি :

(১)

ফুল্লরার দুঃখের বারমাস্যা

সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তাপন।
রবিকরে করে সর্ব শরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খায়্যা করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব-মেঘ-জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লইয়া ঘুরি ঘরে ঘরে।
কিছু ক্ষুদ কুড়া পাই উদর না ভরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী॥

(২)

সুশীলার সুখের বারমাস্যা

নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
শীতলচন্দন দিব চামরের বায়।
বিনোদ-মন্দিরে থাক না চলিহ রায়॥
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
পূরিবে উদর নাথ পাকা আম্র রসে॥
আকাশে গর্জায় মেঘ নাচায় ময়ূর।
নবজলে মদমত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ দূর।
শালি অন্ন দধিখণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর॥
আষাঢ় সুখের হেতু আষাঢ় সুখের হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু॥

(৩)

লহনাকে দুর্বলার কুপরামর্শ

দু সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে হইল তার কালকূট-জ্বালা॥
যেই ঘরে দু সতীনে না হয় কোন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥

* * *

"শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা।
এবে কি করিলে নাশ আপনি আপনা॥
ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ॥
সাপিনী, বাঘিনী, সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥

সম্প্রতি ডাঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক আবিষ্কৃত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল (রচনাকাল ১৬৫০ খ্রীঃ অঃ) আমাদের

একজন নূতন চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার সন্ধান দিয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন ও দ্বিজ মাধবের ন্যায় আখ্যানভাগের মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে গীতিকবিতা সন্নিবেশ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হইলেও ইঁহার কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয় ছিল। আঞ্চলিক জীবনধারা ও রীতি-নীতির উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার কাব্যে প্রচুর।

৫

ধর্মমঙ্গল

পার্বতীর কৃপায় সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ গৌড়েশ্বরের আশ্রিত সামন্তরাজ ত্রিষষ্ঠিগড়ের কর্ণসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই রাজা হইয়া বসেন এবং নূতন গড় বানাইয়া তাহার নাম রাখেন ঢেকুর। গৌড়েশ্বর সসৈন্যে আক্রমণ করিয়াও দেবীর কৃপাপুষ্ট ইছাইঘোষকে পরাভূত করিতে পারেন না। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়টি পুত্র-ই নিহত হয়, পুত্রবধূরা সহমৃতা হন এবং কর্ণসেনের পত্নীও শোকে প্রাণত্যাগ করেন। গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ অমাত্যের এই দুর্দশা দেখিয়া রানীর সহিত পরামর্শ করিয়া তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করেন। রাজার শ্যালক মহাপাত্র মহামদ ইহাতে বাধা দেন কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে বিবাহ দিয়া গৌড়েশ্বর কর্ণসেন-রঞ্জাবতীকে ময়নাপুরে পাঠাইয়া দেন। মহামদ রঞ্জাবতীকে উপহাস করেন বন্ধ্যা বলিয়া। কুমারী-জীবনে রঞ্জাবতী বর্ষীয়সী সহচরী সামুলার সঙ্গে ধর্ম-উপাসনা শিখিয়াছিলেন, এখন সামুলার পরামর্শে শালে ভর দিয়া ধর্মের অনুগ্রহে লাউসেন নামে একটি পুত্র লাভ করেন। লাউসেনের খেলার সাথী রূপে কর্পূরসেন নামে আর একটি পুত্র ধর্ম রঞ্জাকে দান করিলেন। হনুমান ধর্মের নির্দেশে উহাদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

কাহিনী

মহামদ লাউসেনের সর্বনাশ করিবার নানা চেষ্টা করিতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত দুই ভাই গৌড়ে যাত্রা করিলেন। দেবী পার্বতী পথেই লাউসেনের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া জয়খড়্গ দান করেন। গৌড়-যাত্রার পথে কামদল বাঘ ও তারা-দীঘির কুম্ভীর বধ করিয়া, গোলাঘাটে গণিকার ছলনা অতিক্রম করিয়া দুই ভাই গৌড়ে পৌঁছিলে সেখানেও মহামদের চক্রান্তে লাউসেন বন্দী হন এবং শেষে

ধর্মের অনুগ্রহে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন। মহামদ অতঃপর লাউসেনকে কামরূপ রাজ্য জয় করিতে পাঠান। লাউসেন কালুডোমের সাহায্যে কামরূপ জয় করিয়া রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। পরে সিমুলের রাজকন্যা কানাড়াকেও লোহগণ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া বিবাহ করেন লাউসেন। মহামদ ইহার পর লাউসেনকে পাঠাইলেন দেবীকৃপাপুষ্ট ইছাইঘোষকে দমন করিতে এবং লাউসেন ইছাইকে ধর্মের অনুগ্রহে বধ করেন। শেষবার লাউসেনকে জব্দ করিতে মহামদ তাঁহাকে পশ্চিমে সূর্যোদয় করাইতে আদেশ করেন। লাউসেন দুশ্চর তপস্যা করিয়া, নিজের মাথা কাটিয়া হোম করিয়া ধর্মকে সন্তুষ্ট করেন এবং পশ্চিমোদয় দেখান। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মহামদ লাউসেনের রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিলেন কিন্তু ধর্মের কৃপায় সকলে বাঁচিয়া উঠিল ও সব দিক দিয়া পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসে। তারপর সুখে রাজত্ব করিয়া পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্যভার দিয়া লাউসেন সপরিবারে স্বর্গে গমন করেন।

ধর্মঠাকুরের অধিকারসীমা ব্যাপ্ত ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীর হইতে ছোটনাগপুর পর্যন্ত অর্থাৎ ইহা মুখ্যতঃ রাঢ়-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের মত ইহা সমগ্র বাঙলা ও বাঙালীজাতির কাব্য হইয়া উঠে নাই। উক্ত নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমার বাহিরে ধর্মমঙ্গলের কবি ও কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাঢ়ের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার মধ্যে সমধিক পরিস্ফুট বলিয়া কেহ কেহ ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। তাছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় কাহিনীর বিবৃতি, বিন্যাস, চরিত্র-বর্ণনাদি বিষয়ে ধর্মমঙ্গল অধিকতর স্থূল ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। বোধ হয় ধর্মঠাকুরের আর্যীকরণ অর্থাৎ সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে স্বীকৃতি বিষয়ে অন্যান্য মঙ্গল-দেবতা অপেক্ষা অধিকতর সময় লাগিয়াছে।

রাঢ়ের জাতীয় কাব্য

ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ছাড়া কৈবর্ত ও সুঁড়িরও সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি **ময়ূরভট্ট** সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। **রূপরাম চক্রবর্তী**কেই ধর্মমঙ্গলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি বলিয়া ধরা হইয়াছে। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ধমান জিলায় কায়তি শ্রীপুর গ্রামে। ধর্মঠাকুরের উপাসক বলিয়া রূপরাম সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ঘোর মতানৈক্য আছে। ডাঃ সুকুমার সেন রূপরামকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি এবং যোগেশচন্দ্র

ধর্মমঙ্গলের কবি

বিত্তানিধি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের লোক বলিয়া অনুমান করেন। ইহার পর ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্যাম পণ্ডিত, রামদাস আঁদক, সীতারাম দাস, খেলারাম, ঘনরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, শংকব চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধর্মমঙ্গলেব শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন **ঘনরাম চক্রবর্তী**। তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন অষ্টাদশ শতকেব প্রথম দিকে। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের তীরে কৃষ্ণপুব গ্রামে ছিল ঘনবামেব নিবাসস্থল। তিনি বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ঘনবামেব কাব্যেব প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা। অলংকারেব প্রয়োগে, প্রধানতঃ অনুপ্রাসাদির প্রাচুর্যে, কাব্যখানি শ্রুতিমধুব হইয়াছে।

গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রা

বঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দুভি বাজই
ঘনঘোর গাজই দামা ;
রজপুত মজপুত যৈছন যমদূত
সমযুত যুঝে খানসামা ॥
দাদালী দলবল মহী মাঝে মাতল
মনের মহিমা মহা দম্ভে।
ধব ধর বলে ঘন ধাইছে দানাগণ
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥

রামায়ণ,মহাভারতের কাহিনী-সম্পর্কিত মানবিক আবেগের স্বাভাবিক বর্ণনার দৃষ্টান্তও আছে অনেক। কালু ডোমেব প্রতি লখা ডুমনীর বাক্য—

কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥
রণে মলো অভিমন্যু অর্জুনের পো।
প্রাণপণ ব রে ত্যজে সংসারের মো ॥
পুত্রশোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জুন।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ ॥
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজে রাজ দশরথ।
সকলি মজিল নাথ রাজধর্মপথ ॥

ঘনরাম সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কাব্য মধ্যেও তাহাব প্রচুর সাক্ষ্য আছে। হবিহরের স্তব-অংশ নমুনা স্বরূপ দেখানো হইল—

শিরসি সহস্রদলে ধ্যান করি যোগবলে
জ্যোতির্ম্ময় জগত-আধান।
বাহ্য বুদ্ধি পরিহবি মানসিক পূজা কবি
স্তুতি করি হয়ে নতমান॥
প্রেমে অঙ্গ গদ গদ প্রমাদে প্রভুব পদ
পঙ্কজ পবম পবিসব।
সেবিয়া সোনার কায় ধ্যান কবি ধর্ম্মরায়
ধরাতলে ধূলায় ধূসব॥

৬

অন্নদামঙ্গল

পুবাণে চণ্ডী, কালিকা, অন্নপূর্ণা, অন্নদা একই মহাদেবীব নামান্তর হইলেও মঙ্গলকাব্যে তাঁহাদেব রূপ ও মহিমা স্বতন্ত্র। কাজেই একই চণ্ডীমঙ্গল-ধারার পরিণতি হইলেও অন্নদামঙ্গলেব সহিত চণ্ডীমঙ্গলেব পার্থক্য উৎসমুখ হইতে উৎসারিতা তীব্রস্রোতা, ক্ষীণকায়া উপল-প্রতিহতা নির্ঝরিণীর সহিত সমতলে প্রবহমাণা, বিপুলাকাবা শ্লথস্রোতা সমুদ্র-সন্নিহিতা স্রোতস্বিনীর স্বাতন্ত্র্যের মত গভীর ও ব্যাপক। দেবী-কল্পনায়, কাহিনীর সংগঠনে, কাব্যের মেজাজে ও উদ্দেশ্যে সব দিক দিয়াই চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান। পূজা আদায় করিবাব জন্য সেই হিংস্রতা, ভয়ংকরত্ব ত্যাগ করিয়া চণ্ডীমঙ্গলের কোপনা চণ্ডী অন্নদামঙ্গলে অভয়া, অন্নপূর্ণা, বরদা হইয়াছেন। কালিকার বাম করের নরমুণ্ড খড়্গাই যেন ছিল চণ্ডীর আসল রূপ, চণ্ডীমঙ্গলে তিনি বামা; কিন্তু অন্নদামঙ্গলে দেবীর দাক্ষিণ্য বরাভয়ের মধ্যে মাতার স্নেহ গলিয়া পড়িয়াছে। তিন শত বৎসরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, জগন্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য-যুগের প্রান্তসীমায় ভারতচন্দ্র এই মাতৃমূর্তির বন্দনা গাহিয়াছেন। কাহিনী-রচনা কোন দৈবাদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশকেই শিরোধার্য

করিয়াছে। দেবীর সন্তুষ্টিবিধান বা মঙ্গল-কামনা অপেক্ষা এইখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টি ও রাজপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়াছে। বস্তুত একটি রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত দৈবী মহিমার কাহিনী মিশাইয়া, নাগর-সংস্কৃতিসুলভ একটি আদিরস-প্রধান প্রণয়োপাখ্যান যুক্ত করিয়া—বিদগ্ধ ভাষা-ছন্দের অভূতপূর্ব ঝংকারে যে মিশ্র-কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই অন্নদামঙ্গল, অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি খণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড—শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল; তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল।

প্রথম উপাখ্যানের মূল কাহিনী পৌরাণিক। সতীর দেহত্যাগ, পার্বতী-পরিণয়, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্নপূর্ণা-মূর্তি গ্রহণের বর্ণনা আছে।

কাহিনী

ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে হরিহোড়ের লৌকিক কাহিনী। দেবী হরিহোড়কে ছাড়িয়া অন্নপূর্ণার ঝাঁপি লইয়া কি ভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ ভবানন্দের পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন —সেই কাহিনী। দ্বিতীয় অংশটি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান। ভবানন্দের জবানী উপাখ্যানটি মানসিংহ শুনিয়াছেন। কালিকার উপাসনা করিয়া কি ভাবে সুন্দর বিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে মশান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন—ইহাই উহার মূল কথা। তৃতীয় অংশটি অনেকখানি ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ আসিয়া কি ভাবে ভবানন্দের সাহায্য পান এবং প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং কি ভাবে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে 'রাজা-ই ফরমান' লাভ করেন, তাহাই এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর **ভারতচন্দ্র**। ভারতচন্দ্রের জীবন অতি বিচিত্র। তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন

অন্নদামঙ্গলের কবি

বর্তমান হাওড়া জিলার সীমান্তে ভুরশুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে। ভারতচন্দ্রের পিতা জমিদার ছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হন। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া ভারতচন্দ্র অবশেষে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন এবং মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সভাকবি পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব লাভ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধের

তিন বৎসর পর তাঁহাব মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্র ছিলেন শব্দকুশলী কবি, সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বহু সংস্কৃত ছন্দ সার্থক ভাবে বাংলায় প্রয়োগ করিয়া এবং তদানীন্তন যাবনী-মিশাল নাগরিক বাংলা ভাষা ব্যবহাব করিয়া তিনি তাঁহাব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রে দেব-চরিত্রেব মহিমা অপেক্ষা মনুষ্য-চবিত্রেব জীবন্ত রূপায়ন অধিকতর স্পষ্ট। বচনাভঙ্গি শানিত হইলেও সর্বত্র মার্জিত রুচিব পরিচয় নাই।

ভারতচন্দ্রের রচনার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল।

প্রথমটিব মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, দ্বিতীয়টির মধ্যে দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দেব বা শ্লেষালংকাবেব সুন্দর ব্যবহাব হইয়াছে।

(১)

মহাদেবের ভৈরব মূর্তি

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোব বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফনাফন ফনাফন ফনীফন্ন সাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক ধ্বক ধক ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম মহাশব্দ গালে॥

(২)

অন্নদার আত্মপরিচয়

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
সতত আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥

মঙ্গলকাব্যের ধারা অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রে পৌঁছিয়া নিঃশেষিত হইবার পূর্বে নূতন সমাজ-চেতনা ও সরস বাগ্‌ভঙ্গীব দ্বারা মণ্ডিত হইয়া বাঙালী জীবনে আধুনিক মনোভাবের উন্মেষেব পরিচয় দেয়। বাঙালীর দীর্ঘদিনপুষ্ট ভক্তিবাদ ও অলৌকিক জীবনে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এক প্রখর যুক্তিবাদ ও শিল্প-সচেতনতায় পরিণতি লাভ কবিয়া বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ভূমিকা রচনা করিয়াছে। পলাশীব যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ ভারতচন্দ্রে নাই। কিন্তু মনে হয় ইতিহাস-বিপর্যয়ের এই অনুভূতি, যুগধর্মের এই পূর্বাভাস তাঁহার রচনারীতি ও মানস আদর্শের উপব চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্ত মাত্র এক পদেব অন্তবে স্থিত ও মধুসূদনেব সহিত তাঁহাব ব্যবধানও দুর্লঙ্ঘ্য নহে।

৭

শিবায়ন

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যেব দুইটি অংশ। একটি পৌবাণিক, অপরটি লৌকিক। শিবেব মহিমা-প্রকাশক বলিয়াই কেবল শিবায়নকে মঙ্গল-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবা হয়। তাহা নহিলে মঙ্গলকাব্যেব দেবদেবীদের মত নিজের মহিমা প্রকাশ করিবাব কোন উৎসাহ শিবেব মধ্যে নাই। অধিকন্তু কি পৌরাণিকাংশে কি লৌকিকাংশে সদানন্দ ভোলানাথের যে উদাস মধুর চরিত্র পাওয়া যায়, তাহার সহিত রূপে ও ভাবে কোনও দিক দিয়াই চণ্ডী, মনসা বা ধর্ম ঠাকুরের কোন সাদৃশ্য নাই।

কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী শিবায়ন কাব্যের মূল অংশেব অনেকটা ভূমিকার মত। দক্ষ-শিবের বিরোধ, সতীর দেহত্যাগ ও পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ, শিব-পার্বতী পরিণয়, হরগৌরীর কোন্দল এবং শিবের মুখে স্বীয় মাহাত্ম্য-প্রকাশক শবর-উপাখ্যান, রুক্মিণীহরণ-বৃত্তান্ত, বান রাজার আখ্যান, বৃকাসুরের কাহিনী, শিবরাত্রির ব্রত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি এই অংশে বিবৃত হইয়াছে। লৌকিক কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে দরিদ্র শিবের অচল সংসারের বৃত্তান্ত লইয়া। চাষী শিব পার্বতীর পরামর্শে বিশ্বকর্মাকে দিয়া লাঙ্গল বানাইয়া, ইন্দ্রের কাছ হইতে জমি পাট্টা লইয়া, কুবেরের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া, হালুয়া ভীমের সাহায্যে জমি চষিলেন, প্রচুর ফসল হইল।

নারদের ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাউল হইল। ভোলানাথ কিন্তু কৈলাসের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন পার্বতী মশক, মাছি, ডাঁশ পাঠাইয়া শিবকে উত্ত্যক্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু গায়ে ঘৃত মাখিয়া ভোলানাথ তাহা এড়াইলেন। পোকায় শস্য খাইয়া ফেলিল, কিন্তু সদানন্দের বিকার নাই। তখন বাগ্দিনী রূপ ধরিয়া পার্বতী শিবকে মোহিত করিয়া কৈলাসে আনিলেন এবং এক জোড়া শঙ্খ চাহিলেন। শিব তাহা দিতে পারিলেন না, পার্বতী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। নিরুপায় শিব শাঁখারীর বেশ ধরিয়া দেবীকে শঙ্খ পরাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং হরগৌরীর মিলন হইল।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে হরগৌরী-কাহিনী কেবল আখ্যানের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। একবার মূল কাহিনী আরম্ভ হইলে এই দেব-দম্পতি যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। শিবায়নে কিন্তু ইঁহারা প্রধান চরিত্র, নায়ক-নায়িকা। শিবের পৌরাণিক মহত্ত্ব যেরূপ অতিপল্লবিত হইয়াছে, তাঁহার লৌকিক দুর্গতি-লাঞ্ছনাও সেইরূপ অতিরিক্ত হীন বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। মনে হয় শিবায়নকাব্য দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মহিমা ও নীচরাস্থলভ ধূলাকাদাঘাঁটা চরিত্রবিকৃতি যেন একই সূত্রে বিধৃত হইয়া পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের সমন্বয় সাধন করিয়াছে। সব শ্রেণীর লোকেই শিবের মধ্যে নিজ ভক্তিবৃত্তির সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

পৌরাণিক ও লৌকিক শিব

শিবায়নের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে **রতিদেব** বোধ হয় প্রথম। তাঁহার রচিত **মৃগলুব্ধ** কাব্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। মৃগলুব্ধের মধ্যে পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পর রামরাজা, কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, দ্বিজ শঙ্কর প্রভৃতি কবির শিবায়ন কাব্য পাওয়া গিয়াছে। শিবায়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি **রামেশ্বর চক্রবর্তী** শিবায়ন রচনা করেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে। কবির আদি নিবাস ছিল মেদিনীপুর জিলার বরদাবাটি পরগণার যদুপুরে। পরে কবি অযোধ্যা নগরে গিয়া বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর পণ্ডিত লোক ছিলেন। শব্দসম্পদে, অলংকারপ্রাচুর্যে, সরসতত্ত্ব-পরিবেশনে তাঁহার কাব্য হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থজীবনের নানা ঘটনা, কলহ, বস্তুবিবরণাদিও ইহাতে অনেক আছে।

শিবায়নের কবি

(১)

শিবের কৃষি-কার্য

আড়ি তুলি ধাবে ধারে ধবাইল ধান।
হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বাবর্চে ববাটে চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি।
গুলামুখি পাতি মারে পুঁতে যায় নড়ি॥
দল দূর্বা শোনা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুব।
গড়গড় নানা খড় উপাড়ে দূর দূব॥
খর খব খুঁজিযা খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলিধরি ধাইল ধান্যের ধরি ঝাড॥

(২)

পার্বতীর শঙ্খ-পরিধান

গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরী ধুয়ে হাত।
শঙ্খ নিল স্মরণ করিয়া নিজ নাথ॥
কতক কড়ের শঙ্খ কবে দিতে তুলে।
ঝলকিল বদন মদন গেল ভুলে॥
চন্দ্রচূড় চঞ্চল চাহিয়া চাঁদমুখ।
সমুদ্রে সম্বরে নাই শংকবের সুখ॥
ত্রিভাগ পরায়ে ত্রিলোচন বপু-হারা।
চণ্ডী পানে চায় চিত্ত পুত্তলির পারা॥

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ

বাঙলার জাতীয়-কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা শ্রীরামপাঁচালী রচিত হইয়াছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা করিয়া শুধু যে নিজে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে, শত শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়ে যে পরিমাণ আনন্দ-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন বাঙালী কবির ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার প্রপৌত্র বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা। মাতা মালিনীর গর্ভে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

মালিনী নামেতে মাতা বাবা বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী॥

নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবির উক্তি—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

বার বৎসরে কৃত্তিবাস পদ্মানদী পার হইয়া পড়াশুনা করিতে যান এবং যথাকালে গৌড়ে আসিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তিতে গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া আসন-পুষ্পমাল্যাদি পুরস্কার লাভ করেন। এই ভাবে রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়া কৃত্তিবাস শ্রীরামপাঁচালী রচনা শেষ করেন।

আত্মপরিচয়ে কৃত্তিবাস যে রাজা ও রাজসভার কথা বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ সেই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকালনির্ণয়ে কতকগুলি বিশেষ পূর্বধারণার প্রভাবে গবেষকদিগকে পরস্পরবিরোধী কাল-পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত সামঞ্জস্যবিধান প্রয়াসের সম্মুখীন হইতে হওয়ায় মীমাংসা জটিলতর হইয়াছে। শ্রীমান্ সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে এই বিষয় সংক্রান্ত নানা তথ্য ও অনুমান আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে।

অবশ্য কোন যুক্তিই একেবারে চূড়ান্তরূপে সংশয়-নিরসক নহে। তথাপি রাজা ও রাজসভা প্রতিবেশ সম্বন্ধে নানা প্রমাণের, বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির পরস্পর পোষকতার জন্য ইহা যে সত্যাভিমুখী তাহা নিঃসংশয়। এই যুক্তিপরম্পরার অনুসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্মসময়কে মোটামুটি ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীঃ অঃ এই কাল পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতন্য-পূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তাঁহাকে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার যে অনুমান আমাদের অতিরিক্ত প্রাচীনত্ব-প্রীতির পরিচয় দেয় তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রচনায় যে ভাষারূপ ও লেখকের মানস সংস্থিতি প্রতিফলিত তাহা অতিপ্রাচীনত্বের বিরোধী ও তাঁহার চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বযুগে অবস্থিতির অনুকূল।

কৃত্তিবাসের কালবিচার

তাঁহার চৈতন্যপূর্বতা সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন নাই। অথচ আভ্যন্তরীণ বিষয় প্রমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালিক কোন গ্রন্থে তাঁহার অনুল্লেখ দর্শনে কেহ কেহ কৃত্তিবাসকে চৈতন্যোত্তর বলিয়াও মনে করেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া নবদ্বীপ-শান্তিপুরের অতি সন্নিহিত ও উহাদের ভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যদি চৈতন্যদেবের পূর্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিত তবে নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য এই ভক্তিসমুদ্রে অবগাহন করিতেন। জয়ানন্দের ‘চৈতন্য-মঙ্গল’-এ কৃত্তিবাসের উল্লেখ অন্ততঃ চৈতন্যগোষ্ঠীর নিকট তিনি যে অপরিচিত ছিলেন না তাহা প্রমাণ করে।

কৃত্তিবাসের চৈতন্য-পূর্বতা বিচার

যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমরা এখন পাঠ করি তাহার ভাষার মধ্যে কৃত্তিবাসের নিজের ও তৎকালের ভাষা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে বলা কঠিন। কারণ প্রভূত জনপ্রিয়তার ফলে অসংখ্য পাঠক ও গায়কের মুখে মুখে স্বাভাবিক ভাবেই উহার বিপুল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষা যে কারণে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল—কৃত্তিবাসের ভাষাও সেই কারণে উহার প্রাচীনত্বের প্রায় সমস্ত লক্ষণ বিসর্জন দিয়া বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের ভাষা

শুধু ভাষায় নহে, বিষয়-বস্তুতেও প্রক্ষিপ্ত অংশ কম অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ কৃত্তিবাস করেন নাই এবং বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি বিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলে বাল্মীকির চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত বাঙালী-জীবনের

কৃত্তিবাসের বাঙালী দৃষ্টি

কমনীয়তা মিশিয়া কাব্যখানি একটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের বামায়ণের আসল রূপ পাওয়া যায় নাই, বহুল প্রচারেব জন্য তাহার ভাষা পরিবাতত হইয়াছে। যদি ইহা চৈতন্যপূর্ববর্তী রচনাও হয়, তথাপি ইহার মধ্যে যে প্রেমধর্মের ও ভক্তিবসেব প্রচুব অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহাতে ইহাব বর্তমান রূপ যে বিশেষভাবে চৈতন্যপ্রভাবিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রচলিত রামায়ণ হইতে কিছুটা নমুনা দেওয়া হইল।

(১)

রামের প্রতি বালি

এক দিঠি করি বাম নেহালিছে বালি।
দন্ত কডমডায়্যা কোপে কবে গালাগালি ॥
নিষেধিল তাবা মোকে বিবিধ বিধানে।
তোমা হেন ধার্মিক চণ্ডালে প্রতীত গেলাঙ বেনে ॥
নির্দোষ বনেব পশু বাম মাইলে কোন কার্যে।
অধার্মিক বাজাকে বাজ্য নাঞি সাজে ॥
কোন্ দেশ পোড়াবুঁ তোমাব মাইলুঁ কোন্ থান।
কোন্ অপরাধে মোর লইল পরাণ ॥

(২)

সীতার সজ্জা

সুবর্ণ চিরুণী করি আঁচুড়িলা কেশ।
নানা ছাঁদে কবরী বান্ধি বানাইলা বেশ ॥
কিবা শোভা পায় তায় সুবর্ণের সিঁথি।
গজমুক্তা তাহে দিলেন পাঁতি পাঁতি ॥
নয়নে কাজল-রেখা সিঁথায় সিন্দুর।
দিনমণি দীপ্ত যেন শোভে কর্ণপুর ॥
মাথার উপরে দিল কনকের চাঁপা।
পীঠের মাঝে দোলে বেণী তায় কনকের ঝাঁপা ॥

বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু ৫১ জন রামায়ণ-লেখকের নাম করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে **অদ্ভুতাচার্যের** নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি তাঁহাব রামায়ণের কাহিনী শুধু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে সংগ্রহ না করিয়া অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলেব কবি বংশীদাসের কন্যা **চন্দ্রাবতী**—রামায়ণ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন কবিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ-গীতিকায় চন্দ্রাবতীর কাব্যময় জীবনেব কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাছাড়া কৈলাস বসু, রামশংকর দত্ত, ভবানী দাস, দ্বিজলক্ষ্মণ, রামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, শেষের দিকের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের রামায়ণের কবিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন **রঘুনন্দন গোস্বামী**। তাঁহার বচিত রামবসায়ন সুলিখিত বিবাট গ্রন্থ।

অন্যান্য কবি

২

মহাভারত

বাংলা মহাভারত রচিত হইয়াছিল রামায়ণের পরে। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর কাছে অবিদিত ছিল না। মোটামুটি মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কাহিনীও হয়ত জনসাধারণের পরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু অনুবাদ কার্যের স্থির প্রমাণ **কবীন্দ্র পরমেশ্বরের** পূর্বে আর পাওয়া যায় না। অবশ্য আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন **সঞ্জয়** নামক কবিকে কবীন্দ্রপরমেশ্বরের পূর্ববর্তী বলিয়া স্থান দিয়াছেন। মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হয় ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে। হুসেনের পরাগল খাঁ নামে একজন লস্কর চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই উৎসাহে ও আদেশে কবীন্দ্রপরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এই জন্য এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারতও বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই। মুখ্যতঃ যুদ্ধকাহিনীই বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল—পাণ্ডব-বিজয়। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় **শ্রীকরনন্দী** বিস্তৃতাকারে মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

মহাভারতের কবি

ইহাব পর কোন বিশেষ পর্ব বা সমগ্র মহাভারত বচনা করিয়াছেন রামচন্দ্র খান, রঘুনাথ, অনিরুদ্ধ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, কাশীরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি।

ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন **কাশীরাম দাস**। কাশীবাম দাস জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জিলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে। সপ্তদশ শতকের সুরুতেই তিনি মহাভাবত রচনা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীদাসী মহাভাবতকেও প্রচারবাহুল্য ও জনপ্রিয়তার জন্য বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনিও মহাভারতেব কোন আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই এবং বাঙলাদেশেব বহুপ্রচলিত কাহিনীকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া মহাভাবতের ঘটনা ও চরিত্রেব নবরূপায়ণ কবিয়াছেন। কাশীবাম দাসেব আসল ভাষা হয়ত জনপ্রিয়তার স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তবু বর্তমান কাঠামো দেখিয়া শব্দের বাঁধুনি ও ভাষার লালিত্য সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। বিভিন্ন মহাভারত হইতে তিনটি নমুনা দিতেছি

(১)

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ

তবে কৃষ্ণ সৈন্যক যে প্রশংসা কবন্ত।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুই অন্ত॥
ধৃতবাষ্ট্রেব সব পুত্র করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির রাজাকে দিমু রাজ্য ভার॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ।
হাতে চক্র লৈয়া যাএ প্রসন্ন-বদন॥ (কবীন্দ্র পরমেশ্বর)

(২)

অশ্বমেধ যজ্ঞ

অনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন-হৃদয়।
সভা-খণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ-ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চরৌক কীর্তি মোর জগৎ-সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে করিয়া।
শ্রীকরণে কহিলেক পয়ার রচিয়া॥ (শ্রীকরনন্দী)

(৩)

হর ও হরির মিলন

আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্ধ শশি-শুক্ল শ্যাম হইলা অর্ধেক॥
অর্ধ জটাজূট ভেল অর্ধ চিকুব।
অর্ধ কিরীট অর্ধ ফণী-দণ্ড-ধব॥
কৌস্তভ তিলক অর্ধ অর্ধ শশিকলা।
অর্ধগলে হাড়মালা অর্ধ বনমালা॥
মকব-কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি কুণ্ডল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্ধ শোভিত গবল॥ (কাশীবাম দাস)

রামায়ণ ও মহাভাবত এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে বামায়ণ বচনার দিক দিয়া অগ্রবর্তী। ইহার শান্ত বস ও পাবিবাবিক জীবন বাঙালী জীবনাদর্শেব সহিত এমন সহজ-সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেবণা বলেই লেখা হইয়াছিল। কৃত্তিবাস রাজসভায় অভিনন্দিত হইলেও তিনি যে বাজাদেশে বামায়ণ বচনা করেন এমন কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণ-কাহিনী একজন আদর্শ পুরুষ বা অবতাবের জীবন-কথা; ইহাব বস গভীর কিন্তু একমুখী; আখ্যায়িকার বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু মহাভারতে যদিও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী নহে; শ্রীকৃষ্ণ ইহার মধ্যে প্রধান চরিত্র নহেন। তিনি যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারথি ও নেপথ্যেব অন্তরালে কূট-কৌশলী উপদেষ্টা, তেমনি মহাভারতেব কাহিনীতে তিনি পাণ্ডব-সখারূপে গৌণ অংশে অবতীর্ণ। মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য ও রসেব বিভিন্নতা রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত আখ্যায়িকা-বিন্যাস অনেক বেশী কৌতূহল উদ্রেক করে। বিশেষত ইহার যুদ্ধবর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ-পাথর ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎসরসপ্রধান শক্তি-আস্ফালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহ-নির্মাণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কূট ষড়যন্ত্র ও মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্য। ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি ও ধর্মনীতির সূক্ষ্ম আলোচনা অনেক স্থান অধিকার করে। মোটের উপর মহাভারতে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও পরস্পর বিবদমান রাজশক্তির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহার পাঠান আমলের ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কেন আমাদের তুর্কী-শাসকেরা রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও মহাভারত-কাহিনীকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রমুখ শাসকেরা রামায়ণে হিন্দু ধর্মের গুণগান ও হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনের অতিরিক্ত আর কিছু আকর্ষণীয় বস্তু দেখিতে পান নাই। রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মকেন্দ্রিক গ্রন্থ ও পরিবার-জীবনেব করুণ ইতিহাস বলিয়া অন্যধর্মাবলম্বী পাঠক যে ইহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিবেন না ইহা স্বাভাবিক। মহা-ভারতে ধর্মের একাধিপত্য নাই। ইহাতে ধর্ম রাজনীতি, সমাজনীতি ও ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া বাস্তব কৌতূহল ও আখ্যান-রসের আনুষঙ্গিক উপাদান রূপে বর্তমান। হিন্দু ধর্মে অবিশ্বাসীও ইহার বস্তুরস আস্বাদন করিতে উন্মুখ হইবেন। ইহার মানবিক আবেদনই ইহার সার্বভৌম জনপ্রিয়তার মূলে। পক্ষান্তরে হিন্দু অধ্যাত্মরুচি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত-লীলা-আস্বাদনেই চরিতার্থ; মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার প্রতি ইহা অপেক্ষাকৃত উদাসীন। কাশীরাম দাসের অনুবাদের পূর্বে হিন্দু ধর্মের যে উদার ও ব্যাপক রূপ মহাভারতে পরিস্ফুট তাহার রসাস্বাদনে হিন্দু প্রাকৃত জনসাধারণ খুব বেশী উৎসাহী ছিল না। সেই জন্যই রামায়ণ-অনুবাদের প্রেরণা আসিয়াছে অন্তর হইতে; আর মহাভাবতের অনুবাদ-প্রেরণা আসে বিজাতীয় শাসকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য। অবশ্য পরিচয়ের ফলে ক্রমশঃ মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছে। তথাপি এখন পর্যন্ত রামায়ণের সহজ, সরল ধর্মাদর্শের প্রভাব জাতীয় অনুভূতিতে যতটা সর্বস্তরব্যাপী—মহাভারতের সূক্ষ্ম ও জটিলতর ধর্মবোধ ততটা প্রসারিত হইতে পারে নাই। আমরা রামায়ণকে জানি ইহার একমুখীন রসের সমগ্রতায়; মহাভারতকে জানি ইহার খণ্ড খণ্ড বিচিত্র-রসবাহী আখ্যানে।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবিত্বশক্তি-ও এই কাব্যদ্বয়ের স্বরূপ-পার্থক্যের অনুসারী। কৃত্তিবাস স্বল্প পরিসরের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস উদ্রেক ও বাল্মীকির অনুসরণে প্রকৃতি-বর্ণনায় নিপুণ; এই সীমার বাহিরে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় না। রামায়ণে যে সমস্ত পরিহাস-রসিকতার উদাহরণ আছে তাহা অধিকাংশই অন্য কবির রচনা, পরবর্তী যুগে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতকারের পরিসর আরও বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র-রসাপ্লুত। কাশীরাম দাসের বর্ণনা ও রস-সৃষ্টি আরও বিবিধ ও বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত, এবং তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি আরও জটিলতর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বাভাস যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এই রচনাগুলিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার নিম্নলিখিত তত্ত্ব, আখ্যান ও কাব্যরূপ দেখা যায়:—(১) এই লীলার সূচনা হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস; (২) এক সৌন্দর্যময় বাস্তব পরিবেশে, গ্রাম্য বা নাগরিক জীবনের পটভূমিকায়, ইহার একটি উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ-পূর্ণ ও কবিত্ব-রসসমৃদ্ধ বর্ণনা; (৩) ক্রমপরিণতির পর্যায়-বিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ক্রমানুসারী পালাগানের আকারে ইহার বিন্যাস; (৪) ঈষৎ-উন্মেষিত ভক্তিরসের স্পর্শে, মানবিক প্রেমকাহিনীর রূপকে, ইহার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র সম্পর্কের ব্যঞ্জনা-আরোপ। এই রচনাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা ভক্তিমিশ্র রূপমুগ্ধ আগ্রহ জাগিয়াছিল ও অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ভীতিসঞ্জাত ও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মধুররস-পুষ্ট ভক্তির কাহিনীও বাঙালীর চেতনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ও প্রেমধর্ম-প্রচারে, তাঁহার জীবনলীলার প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার জাতীয় ধর্ম-রূপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ধর্মানুভূতি একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য-রূপে জনসাধারণের মনে প্রতিভাত হইল।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার তত্ত্বকথা ও পীঠভূমি

(শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোন ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূর-প্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৈতন্যধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙালী জাতি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবন-যাত্রায়, তাহার কর্মে ও মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আদর্শ-সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালবাসার আত্মীয়তা-বোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত

শ্রীচৈতন্য-জীবন বাঙ্গালীর বহুমুখী আত্মপ্রকাশের অক্ষয় উৎস

নির্ঝর, অলঙ্কার, দর্শন ও বিধি-রচনার এমন আশ্চর্য মনন-শক্তি, ধর্ম-চেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাঙ্গলীলা যেমন একদিকে আমাদের সমস্ত জীবনকে উর্ধ্বায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব চেতনা ও ইতিহাস-বোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের দিনলিপি (diary), জীবনী (biography) প্রভৃতি নানা নূতন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করিতেও প্রেরণা দিয়াছে। তাহা ছাড়া, চৈতন্য-যুগে যত অধিকসংখ্যক কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি ও সমাজ-কল্যাণ-সাধনের যত নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। দুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কণ্ঠে যত গান ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংগঠনে যত উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহার মনন-শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তর-ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে এমন আব কখনও হয় নাই। সুতবাং চৈতন্যোত্তর যুগকে বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ-জীবনেব স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।)

যে মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য ও জীবনের শুষ্ক তরু ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার বহির্জীবন ঘটনা-বিরল, কিন্তু অন্তর্জীবন বিচিত্র ভাব ও লীলারসে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার জীবনে বিবৃতির অবসর কম, কিন্তু রস-আস্বাদনের অবসর প্রচুর ও অফুরন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্ম নবদ্বীপ নগবে, ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। এই দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যা-কালে চন্দ্রগ্রহণের সময়, যখন, গঙ্গাতীর ও নবদ্বীপ নগর তুমুল হরিধ্বনিতে ও নাম-সঙ্কীর্তনে মুখরিত, তখনই শ্রীচৈতন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র ও ডাকনাম নিমাই। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার শৈশব-চাপল্যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী জ্বালাতন হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার শাস্ত্রাচারে উপেক্ষার জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনে তাঁহার এই দুরন্তপনার মধ্য দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-লীলার ছায়াপাত হইয়াছিল। শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি টোল খুলিলেন ও তাঁহার অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার জন্য শীঘ্রই প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের একখানি

শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা : কৈশোর-লীলা

টীকা রচনা করেন ; কিন্তু তাঁহার বন্ধু নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণির টীকা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, বন্ধুর যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি স্বরচিত টীকাখানি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে প্রথম যৌবনেই তিনি কীর্তিলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতার প্রমাণ দেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম লক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে ও তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সকলেই আশা করিয়াছিল যে এই তরুণ মেধাবী যুবক সংসার-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিবেন ও বাঙলা দেশে প্রচলিত পাণ্ডিত্যের মানকে বর্ধিত করিয়া এই জ্ঞানানুশীলনের রাজ্যেই স্মরণীয়তা লাভ করিবেন।

কিন্তু পূর্ণযৌবনে তাঁহার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসিল তাহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। এই সময় তিনি পিতৃকৃত্য করিতে গয়াধামে যান ও সেখানে প্রথিতনামা বৈষ্ণব ভাবসাধক শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার ফল-স্বরূপ তাঁহার জীবনে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায় ও ক্রমশঃ ভগবৎ-সাধনা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া ধ্যানতন্ময়, দিব্যভাববিভোর হইয়া পড়িলেন ও ঐশী লীলার স্ফুরণ তাঁহার বাস্তব চেতনাকেও অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ-লীলার বিচিত্র বিকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন ও সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট এই লীলারসে অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস-জীবন-গ্রহণের সঙ্কল্পে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সমস্ত জগতের পাপ-তাপ দূর করিয়া ভগবৎ-প্রেম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নূতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই তিনি বৈষ্ণব-জগতে পরিচিত।

মধ্য-লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণ

তাঁহার জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর তিনি প্রধানতঃ নীলাচলে (পুরীধামে) অবস্থান করিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবনধাম পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রেমধর্ম-প্রচারে ও শিষ্যসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এই চব্বিশ বৎসরের ইতিহাস একেবারে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জীবনের নিগূঢ় অনুভূতির

কাহিনী। এই সময় তিনি নিজেকে কখনও রাধা, কখনও কৃষ্ণরূপে কল্পনা করিয়া উঁহাদের পারস্পরিক প্রেমলীলা নিজের মধ্যেই অনুভব করিতেন। দিব্যদম্পতীর মনে পরস্পরের অপ্রাপ্তি ও অদর্শনের জন্য যে মর্মান্তিক খেদ ও আকৃতি জাগিত তাহাই চৈতন্য-দেবের নিজের আচরণে অনুকৃত হইত। এই বাস্তবচেতনাহীনতার অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ আখ্যায় অভিহিত করা হইত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত নামক চৈতন্য-জীবনীতে এই দিব্যোন্মাদের নানা ভাব-বৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত ও আলোচিত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যের শেষের জীবন-কাহিনী কেবল ভাবজীবনেরই বিবরণ। তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধেও একটা রহস্যের আবরণ এখনও রহিয়া গিয়াছে। ১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ আষাঢ় মাসে কাহারও মতে তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের মধ্যেই লীন হন; কেহ কেহ বা বলেন যে তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় সমুদ্রে অবগাহন করিয়া সমুদ্রগর্ভেই দেহ বিসর্জন করেন।

অন্ত্যলীলা

২

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কেবল কাব্যক্ষেত্রেই নবসৃষ্টি-প্রেরণা জাগায় নাই; নূতন দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কার প্রণয়নের দ্বারা ও জীবনাদর্শ-প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংগঠনের উৎসাহ উদ্রেক করিয়া বাঙালীর মনীষা ও কর্মশক্তির মধ্যেও এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্য নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও ধর্মতত্ত্বের আদর্শ-বিচারে নবধর্ম-প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। কিন্তু মনে হয় যে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ নির্ণয় ছাড়া ইহার সাংগঠনিক প্রয়াসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তিনি বিশুদ্ধ দিব্য অনুভূতির খাঁটি সোনা অপর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাইয়াছিলেন কিন্তু সমাজবিধির যে টাঁকশালে এই স্বর্ণ দেশ-প্রচলিত মুদ্রার আকার ধারণ করে সেই টাঁকশালের কর্মাধ্যক্ষগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। তিনি কেবল পদাবলী-সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দীপনা-সঞ্চার, নামকীর্তন-প্রবর্তন ও তাঁহার ভাবধারায় ও চরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্যমণ্ডলী-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর বিশেষ সৌভাগ্য যে তাঁহার

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

তিরোভাবের পর তাঁহার ধর্ম একদল অতি সুনিপুণ তত্ত্বব্যাখ্যাতা ও প্রচারক-মণ্ডলীর সহযোগিতায় সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয় ও লীলাকীর্তনের মধ্য দিয়া জাতির মর্মস্থলে অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার যেরূপ গুরুত্ব, তাঁহার অনুচরবৃন্দেরও প্রায় সেই প্রকারেরই প্রধান অংশ; কারণ চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সাধনা ও কর্মোদ্যম ব্যতীত এই প্রেমধর্ম বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইতে পারিত না।)

চৈতন্যধর্ম-সংগঠকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রায় চৈতন্যের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সমাজে ও কীর্তনিয়াদের কণ্ঠে গৌর-নিতাই এই যুগ্ম নাম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। কৃষ্ণ-বলরামের সাদৃশ্য রক্ষা করিবার জন্যও এই উভয় মহাপুরুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ কল্পিত ও আরোপিত হয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বৈত আচার্য, যিনি চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রেমধর্মের প্রথম বাঙালী সাধক, শ্রীবাস পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, গঙ্গাধর পণ্ডিত, নরহরি ঠাকুর ও পরবর্তী যুগের শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বাঙলা দেশে চৈতন্যধর্ম-বিস্তারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর চৈতন্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদকেই বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন ও বৈষ্ণব সাধনার উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ-সূত্র রচনা করেন।

চৈতন্য-ধর্মের সংগঠক-মণ্ডলী

তত্ত্বানুশীলনের দিক দিয়া বৃন্দাবনের ষড়্‌-গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী—নূতন বৈষ্ণব দর্শন রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যে অবতারশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং ভগবান এবং কৃষ্ণলীলা যে ভগবানের সর্বোত্তম লীলা ইহাই শাস্ত্রবাক্য-উদ্ধার ও প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিপাদন করেন ও শ্রীচৈতন্য যে রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বের মিলিত বিগ্রহ ও নিজ জীবনে রাধাকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য-প্রকটনকারী ইহাও দেখাইয়া—প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি চৈতন্য-জীবনের আলোকে আলোচনা করিয়া চৈতন্য-লীলা ও কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্যের অস্তিত্ব অনুপম মনীষা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদের সাহায্যে প্রচারিত করেন।

ষড় গোস্বামী ও বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা

৩

জীবনী কাব্য ও কৃষ্ণমঙ্গল

(এই যুগের যে দুইটি প্রধান কাব্যধারা—মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী—ইহারা পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ও একের রীতি-বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্যের, বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতারা—যেমন দ্বিজ মাধব ও রামদেব—কৃষ্ণলীলার কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করেন ও সুযোগ পাইলেই আখ্যায়িকার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে গীতি-কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রবেশ করাইয়াছেন—সেইরূপ মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ ও ভাগবতের অনুবাদসমূহকে কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় ও কৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশই যে ইহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য তাহা ঘোষিত হয়। চৈতন্যলীলা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই লীলার যে মূল উৎস ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী—তাহার প্রতি বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, ও ভাগবতের অনুবাদ চৈতন্য-প্রেমধর্মের পরিপোষকরূপে অধিক-সংখ্যায় রচিত হইতে থাকে।) মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল এই অনুবাদ-প্রবণতার উদাহরণ। ভাগবতের তত্ত্ব ও কাহিনী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া এই লেখকগোষ্ঠী শুধু যে দেশে পৌরাণিক চেতনা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কৃষ্ণলীলার ব্যাপক পরিচয়ের মধ্য দিয়া পদাবলীর রসাস্বাদনে সহায়ক হইয়াছিলেন এবং কাহিনীর সূক্ষ্ম ও বাঙালী-রুচিসম্মত রূপান্তরের দ্বারা বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসানুভূতির দৃঢ়ীকরণও সাধন করিয়াছিলেন।

ভাগবতের অনুবাদ

অবশ্য ভাগবতের প্রথম অনুবাদ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) প্রাক্-চৈতন্য যুগের রচনা। চৈতন্যদেব এই গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে তাঁহার যে আদর্শ ও অনুভূতি ছিল তাহার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ও ইহার একটি পংক্তির—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের গ্রামবাসী সমস্ত ব্যক্তিকেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। চৈতন্যযুগের পূর্বে কোনও ভক্তের পক্ষে রাধিকা-ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের বিগ্রহ রূপে উপলব্ধি

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

করা ও তাঁহাকে দয়িত সম্বোধন করা এতই অসাধারণ ছিল যে, চৈতন্যদেব ইহার দ্বারা অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্য ও কৈশোর লীলা বর্ণিত আছে, যাহার মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় গুণেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার আক্ষরিক নহে, ভাবানুবাদ। অবশ্য যে আকারে এই গ্রন্থটি আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে চৈতন্যোত্তর যুগের প্রচুর ভাব-প্রক্ষেপ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ কীর্তন-মাহাত্ম্যের যে সুবিস্তৃত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায় তাহা চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভক্তিবাদের যথাযথ প্রকাশ বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই যে ভাগবতের অনুবাদের সূচনা হয় ইহাতে প্রমাণিত হয় যে জয়দেব-বিদ্যাপতির মধুব পদাবলীর প্রেরণাতেই লৌকিকভাষায় ভাগবততত্ত্ব ও কাহিনী জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল—ফলের রসমাধুর্য হইতেই রসবাহী মূলের পরিচয়-গ্রহণের কৌতূহল জাগিয়াছিল।

(চৈতন্য-প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুস্মৃতি ও ইতিহাস-চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্য ও দিব্যলীলা-প্রকটনের দ্বারা জাতির মনে এরূপ গভীর রেখাপাত করেন যে এযাবৎ ইতিহাস-বিমুখ বাঙালী তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অনুভূতি-সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণা লাভ করে। অবশ্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে—বেদ, উপনিষদ ও পুরাণগুলিতে—প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন যে পাওয়া যায় তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মগত উদ্দেশ্যের এত প্রাধান্য, ধর্ম-চেতনার প্রলেপ এত ঘন, ও এই আখ্যানগুলি সূত্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ একক ভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে যে ইহারা যুগের ব্যাপক পরিচয় বহন করে না। সেই জন্য বলা যায় যে চৈতন্য ও তাঁহার মুখ্য পরিকরবৃন্দের জীবন-চরিতই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কনের প্রথম প্রয়াস। অবশ্য সে যুগের ইতিহাসবোধকে বর্তমান যুগের আদর্শে বিচার করা চলে না। চৈতন্য-জীবনীকারদের নিকট চৈতন্যের অলৌকিক লীলাবিলাস ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষাও অধিক বাস্তব ছিল এবং এইগুলির বর্ণনার সময় তাঁহাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস ও কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ বাস্তব সীমার মর্যাদারক্ষার প্রয়োজনকে একেবারেই স্বীকার করে নাই। তা ছাড়া

চৈতন্য-জীবনীতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্দেশ

ভক্তের মনোভূমিতে যাহা স্ফুরিত হয় তাহা যে বাস্তব সংঘটনের অপেক্ষা অধিক সত্য, এ বিষয়ে তাঁহাদের সংশয়াতীত প্রতীতি ছিল। সেইজন্য চৈতন্য-জীবনী-কারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-বচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে যে সমস্ত তত্ত্বালোচনা আরোপ করিয়াছেন তাহা সব সময় বস্তুগত তথ্য হয় নাই, কিন্তু উচ্চতর ভাবসত্যের অনুসরণ করিয়াছে। প্রেমধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়-ব্যাপারে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের যে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল—যাহা সাধ্যসাধন-তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়াছে—তাহা সত্য সত্যই গ্রন্থবর্ণিত পদ্ধতিতে ও কালে ঘটিয়াছিল, অথবা উহা সুবিদিত চৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব-বিচারের একটা ভক্তকল্পনা-প্রসূত বিবরণ ও অনেক দিন ধরিয়া যে টুকরা টুকরা তর্ক চলিয়া-ছিল তাহারই একটি সুসংবদ্ধ সার-সঙ্কলন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে যেটুকু নিশ্চিত সত্য তাহা এই যে রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই প্রেমধর্মের রহস্য জানিতেন ও চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট নিজ অনুভূতির শেষ সীমা উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার পূর্বজ্ঞানকে দৃঢ়তর করিলেন ও তাঁহাকে সাধন-পথে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করিলেন। সেইরূপ চৈতন্যের কণ্ঠে যে সমস্ত গান আরোপিত হইয়াছে সেগুলি হয়ত তাঁহার সময় রচিতই হয় নাই, কিন্তু তাঁহার তদানীন্তন ভাব-প্রকাশের সুষ্ঠু উপায়স্বরূপই নির্বাচিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রেমধর্মের অনুকূল প্রতিবেশ-রূপেই গ্রহীতব্য। তাহাতে হয়ত সমাজের সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না, কিন্তু যুগের ধর্মপিপাসার স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়। এইরূপ বিচারের মানদণ্ডে চরিত কাব্যগুলির ঐতিহাসিকতা ও তথ্যগত ভিত্তি নিরূপণ করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের যে কয়খানি জীবনী লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপূরের মহাকাব্য চৈতন্যচরিতামৃত (১৫৪২) ও নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৫৭২) উল্লেখযোগ্য। মুরারিগুপ্ত বোধ হয় চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই ও কবি কর্ণপূর তাঁহার তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের চরিতগ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনী

সমসাময়িক সুহৃদ্‌ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিকরের দ্বারা লিখিত হইলেও এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত রীতির অনুবর্তনের জন্য চৈতন্যের মানবিক জীবনের বস্তুরস-প্রধান পরিচয় দেয় না; বরং তাঁহার অবতারত্ব-প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহে ইহারা অলৌকিক উপাদানেই পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব এত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহার নিকটতম

প্রতিবেশীরাও তাঁহাকে ঠিক মানুষ হিসাবে দেখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার জীবনের বাস্তব তথ্য নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাও তাঁহারা পূর্ণ করেন নাই। ইঁহারা প্রধানতঃ চৈতন্য-জীবনে কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্য আরোপ করিতে উন্মুখ ছিলেন এবং তাঁহাদের মহাকাব্যকে যতদূর সম্ভব ভাগবতের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। বরং তাঁহাব বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীগুলিতে অলৌকিকের দিব্য জ্যোতির অন্তরালে তাঁহার মানবিক পরিচয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা ভাষা দেব-ভাষার ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্যকে একেবারে আবৃত কবিতে পাবে নাই। তবে মুবারিগুপ্ত ও কর্ণপূব যে ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকারদের পথপ্রদর্শক ও তাঁহাদেব বর্ণনাভঙ্গী ও মনোভাব অনেক পরিমাণে নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ।

বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বৃন্দাবনদাসেব চৈতন্য-ভাগবত। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনেব প্রথমার্ধ ভক্তিরস, কাব্যকুশলতা ও তথ্য-প্রাচুর্যের সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে চৈতন্য-জীবনীব সন্ন্যাসোত্তব অংশ, তাঁহার নীলাচল-লীলার অপরূপ দিব্যোন্মাদ-কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যভাগবত প্রধানতঃ সরস আখ্যায়িকা-মূলক—ইহাতে চৈতন্য-ধর্মতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মজীবন ও সমাজযাত্রার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক তথ্যরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলো-দ্দীপক। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

চৈতন্যভাগবত

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও পূজাপদ্ধতি প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল ও নানা অনার্য ভৌতিক দেবতা-সমূহের আরাধনাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক হিন্দু উৎপীড়নের চিত্রও তাঁহার চরিতগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এগুলি চৈতন্যপূর্ব যুগের বাঙলার যে যথাযথ অবস্থার পরিচয় সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদৃত এবং তাঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব—এই গৌরবময় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পদকর্তা লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই বৃন্দাবন দাসের পরে "চৈতন্যমঙ্গল" নামে জীবনী-কাব্য রচনা করেন। লোচনের কাব্য পাঁচালী-গীত রূপে গীত হইত ও লঘু সুরে রচিত বলিয়া সমাজের নিম্নতর স্তরে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। জয়ানন্দের গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদর্শনের সহিত সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই বলিয়া ইহার প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে।

চৈতন্যমঙ্গল

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে অভিহিত গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য কিছু কিছু আধুনিক-কল্পনা-প্রসূত বচনাকে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তথ্যমূলক বিবৃতিরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যেব জীবনেব যে অংশ প্রামাণ্য চরিত-গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেই ফাঁক পূবণের জন্য এই জাতীয় কাল্পনিক গ্রন্থ রচিত হয়। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই তথ্য অবলম্বনে তাহার নামে এই ভ্রমণেব একটি সুখপাঠ্য ও তথ্য-বহুল বৃত্তান্ত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থরূপে উনবিংশ শতকে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে চৈতন্যভাবপরিমণ্ডল ও তাঁহার ভাববিভোর লীলাভিনয়ের যথাযথ অনুস্মৃতি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক আধুনিক স্থানের উল্লেখ ও পরবর্তী যুগেব ভাব-প্রক্ষেপ ইহার প্রামাণ্যতাকে সন্দেহভাজন করিয়াছে। সেইরূপ অদ্বৈত আচার্যের ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ও বিষ্ণুদাস আচার্যের সীতাগুণকদম্ব—তথ্য ও কল্পনায় মিশ্রিত, শিষ্য কর্তৃক নিজ গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অতিরঞ্জনে স্ফীত, অনুকরণপ্রয়াসী রচনাপদ্ধতি ও মনোভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

গোবিন্দদাসের কড়চার ঐতিহাসিকতা

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য-চরিতামৃত-এব রচয়িত কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই গ্রন্থখানি চৈতন্যলীলার বাঙ্ময় বিগ্রহরূপে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবসমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর জীবনের শেষার্ধ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কেবল ঘটনামূলক তথ্যসঙ্কলন নহে। ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কাব্যকুশলতার এরূপ আশ্চর্য সমন্বয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল। কৃষ্ণদাস তাঁহার বিষয়-গৌরবের দ্বারা এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে তিনি সচেতনভাবে কাব্য-সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে একেবারেই মনোযোগ দেন নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত

বাংলা পয়ারের শিথিল অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে ও এই অচিরজাত ভাষার অপরীক্ষিত শক্তি-প্রয়োগে, তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে ও নিজ মতবাদপ্রতিষ্ঠায় এরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন যে ইহা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। শ্রুতিকর্কশ পারিভাষিক শব্দসমূহ তিনি এমন অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়েব বেগবান স্রোতে এই ওজনে ভারী কথাগুলি এমন স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া গিয়াছে, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন বিসদৃশতা আছে তাহা আমাদের লক্ষ্যগোচরই হয় না। মনে হয় যে তাঁহার প্রকৃতি-ধর্ম কবিত্বের অনুকূল ছিল না; কিন্তু যে দৈবী কৃপা মূককে বাচাল করে, তাহার প্রতি একান্ত-নির্ভর আত্মসমর্পণই তাঁহাব অন্তর্লীন কবিত্বকে স্ফুরিত করিয়াছে। চৈতন্যদেবের যে প্রেমবিহ্বল, ভাবতন্ময় রূপটি এই মহাগ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই ভক্ত ও কাব্যরসিকেব অনুভূতিতে চিবকালের জন্য যেন পাষাণরেখাঙ্কিত হইয়াছে। কাব্যের চকিত বিকাশ, ভক্তির ক্ষণিক উচ্ছ্বাস দার্শনিকতার এই স্থির আধারে চিরন্তন আশ্রয় লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্মেব আবেদনকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব ভাবধারার কাব্য-প্রকাশ পদাবলীর মাধ্যমে। কয়েকটি ক্ষুদ্র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ খণ্ড-কবিতার মালা গাঁথিয়া রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য-লীলার বিভিন্ন ভাবপর্যায় ও ঘটনা-পরিণতি এই পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উপস্থাপনারীতির চরম বিকাশ ও রস-পরিপূর্ণতা পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-রচয়িতারা কৃষ্ণলীলা অনুভব করিয়াছেন চৈতন্যদেবের দিব্য অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের নির্দেশ তাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অলঙ্কার ও মীমাংসা গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে তাহাই পদাবলী-সাহিত্যের ঘটনা-বিন্যাস ও ভাবধারাকে নিয়মিত করিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য

বিদ্যাপতির পদে লৌকিক রসেরই প্রাধান্য, উহারই মাঝে মাঝে অধ্যাত্ম তাৎপর্যের স্ফুরণ অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। বিদ্যাপতি অধিকাংশ স্থলেই রাজসভার বিদগ্ধ কবি। কোথাও কোথাও তিনি সাধক ও ভক্ত কবি। তাঁহার প্রেমলীলা-বর্ণনা সর্বদা অধ্যাত্ম অনুশাসনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের সমস্ত বৈষ্ণব কবি দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত; তাঁহাদের সমস্ত কল্পনা-বিলাস ও রূপানুরাগের পিছনে এই সদা-জাগ্রত অধ্যাত্ম চেতনার নিয়ন্ত্রণ। তাঁহাদের ভণিতায় বা অন্তিম মন্তব্যে তাঁহারা কোনও না কোনও রূপে দিব্য লীলার সহায়ক রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কেহ বা সখীরূপে, কেহ বা দূতীরূপে, কেহ বা সহানুভূতিশীল দর্শক বা সেবকরূপে প্রেমপরিপুষ্টির কার্যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ভণিতায় কেবল তাঁহার বাগ্-বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবির ভণিতায় তাঁহার ভক্তরূপ, সমস্ত প্রাকৃত বর্ণনার পিছনে প্রচ্ছন্ন ধর্মের ইঙ্গিতের প্রতি তাঁহার সচেতনতা পরিস্ফুট। পদাবলী-সাহিত্যে সমস্ত প্রকৃতি-সৌন্দর্য, মানবিক প্রেমের সমস্ত সুকুমার ভাব-বিলাস কেবল এক অলৌকিক রস-স্ফুরণের, এক অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম রহস্যের পরিস্ফুটনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী

পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণ-লীলার যে কোন পালাগানের পূর্বে চৈতন্য-জীবনে তাহার সূচক বা অনুরূপ

ভাবকে গৌরচন্দ্রিকারূপে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নবদ্বীপ-লীলা যে বৃন্দাবনলীলারই পুনরভিনয়, কৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ভাবসমূহ যে শ্রীচৈতন্য-জীবনে নবরূপায়ন লাভ করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে এই অভিন্নত্ববোধই গৌরচন্দ্রিকায় ব্যঞ্জিত হয়। কাজেই চৈতন্যোত্তর কবির চক্ষে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনার সময় চৈতন্য-লীলা সর্বদাই প্রকট থাকে। চৈতন্যের ভাব-বিহ্বলতা, রস-আস্বাদন-পদ্ধতি, কীর্তনোল্লাস, ও প্রেমধর্ম-সাধনার উজ্জ্বল স্মৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইঁহারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রহস্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। যেমন চৈতন্যের মধ্যে ইঁহারা রাধাকৃষ্ণ-দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি কৃষ্ণ-লীলাতেও চৈতন্য-লীলাভিনয় আরোপিত হয়। বৈষ্ণব কবির মুগ্ধ অনুভূতিতে যেন দুই জ্যোতিষ্কের আলোক এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই পদাবলীর আক্ষরিক অর্থের পিছনে একটা গভীরতর ভাব-ব্যঞ্জনা সর্বদা অনুভূত হয়।

গৌরচন্দ্রিকা

পদাবলী-সাহিত্য বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি, বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধতম কাব্যময় প্রকাশ। বাঙালীর সমস্ত মধুর ও কোমল অনুভূতি, তাহার রূপমুগ্ধতা ও ভাবতন্ময়তা, তাহার জীবন-দর্শনের স্নিগ্ধ, ভক্তিনির্ভর কমনীয়তা, তাহার ভালবাসার আগ্রহ এই পদগুলির ক্ষুদ্র পরিসরে এক অপরূপ প্রকাশ-সুষমা লাভ করিয়াছে। মনে হয় বাঙালী-হৃদয়ের সবটুকু মধু, উহার অন্তরের সমস্ত সুবাস যেন এই পদ-গুলির মধ্যে কবিরা ঢালিয়া দিয়াছেন। হয়ত ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও বৈচিত্র্যের অভাব, একই সুরের পুনরাবৃত্তি আছে; হয়ত জীবন-জটিলতার সম্পূর্ণ পরিচয় ইহাদের মধ্যে মেলে না; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের প্রেমময় মূর্তিতে বিশ্বাসী বা মধুর আত্মনিবেদনেই সমস্ত জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পান, তাঁহাদের নিকট পদাবলী-সাহিত্য মানবজীবনের পরম পরিণতি, ভক্তি-সাধনার শেষফলরূপে প্রতিভাত হয়।

বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধ কাব্যময় প্রকাশ পদাবলী

পদাবলী-রচয়িতা-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তী ছিলেন তাঁহারা প্রায়ই চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সহচর এবং প্রধানতঃ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। নরহরি সরকার, বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ এই তিন ভ্রাতা, বংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রামানন্দ বসু ও মুরারি গুপ্ত—ইঁহারা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। মনে হয় যে গৌরাঙ্গের মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়দ্রাবী ভাববিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রথম পর্যায়ের কবিরা

চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তাগণ

নূতন করিয়া বিদ্যাপতির অনুকরণে পদরচনার প্রেরণা পান, এবং কিছু পরেই চৈতন্যলীলার সীমা অতিক্রম করিয়া উহার ভাব-প্রেরণা যে উৎস হইতে আসে সেই বৃন্দাবন-লীলার প্রতি ইঁহারা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হন। নরহরি সরকার এই নব-পর্যায়ের পদরচনার আদি স্রষ্টা বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনিই প্রথম গৌরাঙ্গ দেবের লীলা-মাধুরী পদাবলীর মাধ্যমে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বয়সেও বোধ হয় ইনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

দ্বিতীয় যুগে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। এই যুগে বৈষ্ণবধর্ম সাধারণের মধ্যে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে ও প্রেমধর্ম জীবন-সাধনার অঙ্গীভূত হয়।

চৈতন্যোত্তর পদাবলীর মূলতত্ত্ব

প্রথম যুগে বৈষ্ণব তত্ত্ব কতকটা প্রতিপাদনের বিষয় ছিল এবং এই তত্ত্বের গন্ধ মাঝেমধ্যে উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। চৈতন্যের অবতারত্ব ও তাঁহার তাত্ত্বিক রূপনির্ণয়ও কিছু পরিমাণে অনিশ্চয়তাগ্রস্ত ছিল এবং সর্বসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগে যে পদাবলী রচিত হয়, তাহাতে চৈতন্যের দেবত্ব এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার অভিন্নত্ব একটা সুগভীর স্বতঃস্ফূর্ত অধ্যাত্মপ্রত্যয়ে দাঁড়াইয়াছে এবং লেখকের অনুভূতিতে ও লেখনীমুখে সহজ-উৎসারিত রসধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে—রস-চেতনার এই পূর্ণ-বিকশিত পুষ্প আর তত্ত্বের কণ্টকবিদ্ধ নহে। এখানে কবিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস, রূপ ও অরূপ চেতনা, মানবিক প্রেম ও ঐশী ব্যঞ্জনা অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতায় একীভূত হইয়াছে।

বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিও এই যুগে আবির্ভূত হইয়া এই লীলা-কাহিনীকে অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীখণ্ড-গোষ্ঠীর কবিরঞ্জন (বাঙালী বিদ্যাপতি), কবিশেখর বা শেখর রায় ও লোচন দাস (চৈতন্য-

চৈতন্যোত্তর শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তাগণ

জীবনীকার), নিত্যানন্দ-শাখার জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস, সহজিয়া মতবাদের পুষ্টিকর্তা ও পরকীয়া প্রেমের সাধক চণ্ডী-দাস ও শাক্তধর্ম হইতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত, ভাষা ও ভাবের আলঙ্কারিক প্রয়োগে ঐশ্বর্যময়, বিদ্যাপতি-রীতি-প্রভাবিত গোবিন্দ দাস। ইঁহাদের রচনায় গোষ্ঠীর সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তি-বিশেষত্বের সন্ধান মিলে। কবিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্যাপতির সুর ও রচনা-রীতি বৈষ্ণবতত্ত্বে জারিত হইয়া এক অভিনব প্রকাশোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ইঁহার বাঙালী বাগ্‌ভঙ্গী-মিশ্রিত (idiom) ব্রজবুলিতে রচিত বহু পদ বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কবিশেখর গোবিন্দদাসের সহিত অভিসার-বর্ণনার শ্রেষ্ঠ কবি। লোচন

দাস হালকা সুরে ও লঘু বাচনভঙ্গীতে (ধামালীপদ) কৃষ্ণলীলার বর্ণনাকে সাধারণ পাঠকের তরল রুচির নিকট আস্বাদনীয় করিয়াছেন—ইনি গৌরাঙ্গকেও কৃষ্ণের অনুসরণে নবদ্বীপে প্রেমলীলার নায়করূপে এক বিসদৃশ ভূমিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। বলরাম দাসের পদগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-সম্বন্ধীয় ও বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ।

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস পদাবলী-সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠতম কবি। গোবিন্দদাসের পদে গভীর ভাবাবেগের সহিত যুক্তি-শৃঙ্খলার অনুবর্তন ও অলঙ্কার-বহুল, ঝঙ্কার-প্রধান, মর্যাদাপূর্ণ ভাষা-প্রয়োগের চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইনি অভিসার ও নায়িকার আত্মবিস্মৃত প্রণয়াবেগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। মান ও ভাব-সম্মিলনের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদও ইঁহার আছে। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কাব্য-গগনের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক—বৈষ্ণব-ভাব-রাজ্যের উন্নততম মহিমা ও কারুণ্য ইঁহাদের রচনায় উদাহৃত। নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অন্তর্দাহ ও প্রেমের প্রকৃতি-দুর্বোধ্যতার স্বরূপ-নির্ণয়, বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ও পুনর্মিলনের সংযত-গম্ভীর আনন্দ-নিবিড়তা—প্রভৃতি সর্ববিধ ভাব-প্রকাশে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ও অতুলনীয়। ইঁহাদের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর ও ব্যঞ্জনাশক্তির বিকিরণে দীপ্তিময়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা অনুমাত্র প্রভাবিত না হইয়াও বাংলা ভাষা আত্মশক্তিতে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে কিরূপ আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে, বাঙালী ধর্ম ও সমাজের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ইহা কিরূপে অভ্রান্ত লক্ষ্যে মর্মের গভীরতম অনুভূতিকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম, এই কবিদ্বয় তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্থল। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের কবিধর্মের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে, ইঁহাদের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পদের রচয়িতা যে কে তাহা আভ্যন্তরীণ বিচারে নির্ণয় করা অসম্ভব। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু'—এই বিখ্যাত পদটি কোন কোন পুঁথিতে জ্ঞানদাস ও আর কয়েকটি পুঁথিতে চণ্ডীদাসে আরোপিত হইয়াছে এবং উভয় শ্রেণীর পুঁথির সংখ্যাগণনা ছাড়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত-গঠনের কোন উপায় নাই। জ্ঞানদাস সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা এই মাত্র যে বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে তাঁহার আশ্রম ছিল ও তিনি খেতুরি বৈষ্ণব-সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্জীবন বা বহির্জীবন সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ও তিনি বৈষ্ণব-ভাব-সাধনার মূর্ত

তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস

প্রতীকরূপে বৈষ্ণব কবিকুলের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া আমাদের জ্ঞানে না হউক কল্পনায় বিরাজিত। তিনি যে পরকীয়া প্রেমের জন্য অনেক সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, প্রেমের রহস্যময় অলিতে গলিতে বিচরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে তাঁহার ছিল ও এই প্রেমই যে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনায় প্রধান মন্ত্র ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের এই কাহিনী জনশ্রুতির পথ বাহিয়া আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। ইহা লৌকিক তথ্য না হইলেও যে ভাবসত্য তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রেমতত্ত্ববিষয়ক পদগুলি, যাহাতে প্রেমের গভীর অন্তর্বেদনা ও বিপরীতধর্মী প্রকৃতি-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহারা চণ্ডীদাসেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাব্য-প্রকাশ ও প্রধানতঃ তাঁরই রচনা। জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রে এরূপ সমর্থক প্রমাণের অভাব; তবে কবি-প্রতিভার সহজ সংস্কারের বলে তিনি যে প্রেমরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস

জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে বা অলঙ্কার-শাস্ত্রে নায়কের রূপের কোনো আদর্শ নাই—সুতরাং জ্ঞানদাস অনেকটা স্বাধীন-ভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপ-কল্পনায় শুধু অলঙ্কার-সজ্জা-বর্ণনা বা বাঁধা-ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতরঙ্গের সচল প্রবাহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা-তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র-প্রতিবিম্বের সহিত ও উহার রক্ত-চন্দন-চর্চিত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো জবা-পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার-বর্জিত ও মর্মস্পর্শী; জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব ও আধুনিক অন্তর্দৃষ্টিশীল কল্পনা —মননের কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই মানব-জীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের ঊর্ধলোকে বিচরণ করিয়াছেন। ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অনুভূতি-গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। পদাবলী-সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই দুই মহাকবির রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।

পদাবলী সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পরই বৈষ্ণবভাবপ্রবাহের জোয়ার শেষ হইয়া ভাটা

আরম্ভ হইল। কল্পনার সরসতা প্রথাগত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইল—ভাবের গাঢ়তা কমিয়া বাক্‌চাতুর্য, কষ্ট-কল্পনা ও আখ্যানের পল্লবিত বিস্তার দেখা দিল। বৈষ্ণব ধর্ম জাতীয় ভাবধারার সর্বব্যাপী মানস-প্রসার হারাইয়া সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত হইল। জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল, জাতির মর্মানুভূতি হইতে ইহা দূরে সরিয়া আসিয়া আদর্শ কল্পনার রূপ গ্রহণ করিল। সমাজের বাস্তব অবস্থা আর এই প্রেম-ধর্মের অনুকূল রহিল না। স্মৃতির অনুশাসন, মঙ্গল-কাব্য ও শাক্ত পদাবলীর মাধ্যমে মাতৃ-চেতনার প্রসার, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি, অনাচার ও দলাদলির আবির্ভাব, সমাজ-জীবনে প্রেমের পরিবর্তে শক্তির প্রতিষ্ঠা—এই সব কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্য ধীরে ধীরে শুষ্ক ও প্রাণহীন হইয়া উঠিল। তথাপি সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছুদিন পর্যন্ত পদাবলী-সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। এই সময় ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, পদরস-সার ও পদরত্নাকর প্রভৃতি পদাবলীর সংকলন-গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। নূতন পদ-রচনা বন্ধ হইয়া পুরাতন পদের সংগ্রহ ও শ্রেণী-বিভাগ চলিতে লাগিল। জীবনের ধারা প্রবহমাণ নদীর রূপ ত্যাগ করিয়া সরোবরের তটবন্ধনে স্থির ও গতিহীন হইল।

পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ ও সংকলন-গ্রন্থ-প্রকাশ

এই অবক্ষয়ের যুগে যে সমস্ত কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলা লইয়া এক বিরাট গীতি-আখ্যান রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁহার যত পদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির মধ্যে একটিও নাই—সুতরাং তিনি যে স্বতন্ত্র কবি ও পরবর্তী যুগের কবি এই সিদ্ধান্তে আপাতত পৌঁছিতে হয়। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি মাঝামাঝি ধরনের—ভাবস্ফুরণ অপেক্ষা আখ্যানের ধারাবাহিকতাই তাঁহার লক্ষ্য। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে যত কাহিনী পল্লবিত হইয়াছিল তাঁহার কাব্যের বিরাট পরিধিতে তিনি সে সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মনে হয় যে পদাবলী সাহিত্যের যে প্রকৃত আদর্শ ও নির্দিষ্ট রূপ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গীতি-কবিতার সাহায্যে লীলারস-বিকাশ—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের আখ্যান-প্রাধান্যের রীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ রাঢ়ের লোক ছিলেন।

দীন চণ্ডীদাস

এই যুগে কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়। ইঁহারা প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা লইয়া কবিতা লেখেন ও বাৎসল্যরসেরই বিশেষ অনুশীলন

করেন। মুসলমান কবিগোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সবটা গ্রহণ না করিয়া ও নিজেদের লীলাভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মনে না করিয়া, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবধান রক্ষা করিয়াছেন ও তাঁহাদের ভণিতায় কেবল সর্বধর্মসাধারণ মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিগোষ্ঠীর অভ্যুদয় বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী জাতীয়তারই নিদর্শন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কতটা ধর্মসমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহাও প্রমাণ করে। হিন্দু যেমন মুসলমানের সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ আখ্যা দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানও তেমনি ভগবানের রসময় ও আনন্দময় মূতির নিকট কাব্যশ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে দ্বিধা করে নাই।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ

নমুনাস্বরূপ কয়েকটি পদের উল্লেখ করা হইল :

(১)

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
ত্বরা কবি বাড়া আসি শাশুড়ীবে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরানী॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে, নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

(২)

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি তো-সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাংকুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাংকুর আগে রাঙ্গাপায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

(৩)

দেইখ্যা আইলাম তারে—
সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক সঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥

(৪)

চম্পক শোন কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবনি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে॥

জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কাল-ভুজগভয়-খণ্ডন রে ॥
বিপুল-পুলক-কুল-আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥

(৫)

যত নিবারিয়ে চাই নিবার যায় রে।
আন পথে যাই সে কানুপথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছাড় নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভালভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥

(৬)

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলী-খুরলী গান রি।

প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলী শাঙলী আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি ॥
বয়সে কিশোর মোহন-ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রিগুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি ॥
আগম-নিগম-বেদ-সার
লীলায় করত গোঠ-বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি ॥

অষ্টম অধ্যায়

শাক্ত পদাবলী

সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি বাঙালীর মানস চেতনায় বৈষ্ণব ভাব-প্লাবন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল ও তাহার ভক্তিরস-ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা জাতীয় জীবনে ইহার পূর্বপ্রভাব হারাইল ও উহার পরিবর্তে মাতৃদেবতার পূজা প্রাধান্য লাভ করিল। ভক্তিস্রোতের এই পরিবর্তনের কাবণ সমাজ চেতনা ও জীবনাদর্শের রূপান্তবের মধ্যেই নিহিত আছে। বৃন্দাবন-লীলাব অখণ্ড মধুব রস ক্রমশঃ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া অপার্থিব কল্পনাবিলাসেব রূপ ধারণ করিল। ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, মোগল শাসনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পৌনে এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে মোটামুটি একটা নিববচ্ছিন্ন শান্তির যুগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ততঃ কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ের দ্বারা ইহার জীবনেব ভারসাম্য বিচলিত হয় নাই। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে যে প্রজা-উৎপীড়নের চিত্র পাই, তাহা শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্তনের অনিবার্য সাময়িক ওলট-পালট বলিয়াই মনে হয়। টোডরমল-মানসিংহের সময় হইতে সুজা-সায়েস্তার সময় পর্যন্ত বাঙলা দেশে যে শক্তি, প্রাচুর্য ও আদর্শ-গত আত্মস্থতার যুগ ছিল সেই পরিবেশেই বৈষ্ণবীয় প্রেম-মাধুর্য-পরিপূর্ণ রস-বিকাশের সুযোগ পাইয়াছিল ও জাতীয় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

মোগল আমলের শান্তিময় পরিবেশ ও বৈষ্ণব সাহিত্য

কিন্তু এই সুখশান্তি বেশী দিন রহিল না—দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া বাচলার তটভূমে আঘাত করিল ও উহার জীবনধারায় ঘূর্ণী-বেগের সঞ্চার করিল। প্রেমের পরিবর্তে শক্তি, মধুর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে দুর্দমনীয় জিগীষা ও আত্মরক্ষার অনিবার্য প্রেরণা সমাজ-পরিবেশে অনস্বীকার্য সত্যরূপে দেখা দিল। অবশ্য মঙ্গল-কাব্যে এই শক্তিপূজার প্রবণতা পূর্ব হইতেই ছিল, কিন্তু সেখানে অশান্তি আসিয়াছে কোন বহিঃশক্তির অভিভবে নয়, দেবতারই জোর করিয়া পূজা-আদায়-চেষ্টায়। কিন্তু দেশে যখন সত্য সত্যই দুর্দৈব ঘনাইয়া আসিল, যখন বাস্তব জীবনের

রাষ্ট্র বিপ্লবের দিনে শক্তি-সাধনার প্রবণতা

সহিত প্রেমসাধনার আদর্শের সামঞ্জস্য রহিল না, যখন বৈষয়িক অনিশ্চয়তার নূতন জটিল পরিস্থিতিতে বৈষ্ণবধর্মের রসমাধুর্য অপ্রযোজ্য হইল, তখন দেশের চিত্ত মোড় ঘুরিয়া মাতৃশক্তি-উপাসনাকেই আশ্রয় করিল। শাক্ত পদাবলীর কবিদের মধ্যে অনেকেই রাজা, জমিদার বা রাজবংশাশ্রিত সাধক ছিলেন—ইঁহারা যুগের বিপর্যয়, ধনদৌলতের অনিত্যতা, সংসারের ক্রূর বঞ্চনা প্রভৃতি ভাব তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনুভব করিয়া এই মায়ার ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতার নিকট কাতর আবেদন জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগোষ্ঠী সংসার-বিমুখ ছিলেন—শাক্ত সাধকেরা কিন্তু বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; তাঁহাদের এই অবস্থা-বৈষম্য হইতে তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতি ও আত্মনিবেদনের সুরের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য উদ্ভূত হইয়াছে।

এই পরিবর্তনের মধ্যে কেবল বহির্জীবন নয়, অন্তর্জীবনেরও প্রভাব লক্ষণীয়। শাস্ত্রবিধিশাসিত, স্মৃতিব্যবস্থা-প্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক হৃদয়বৃত্তি যে বিশেষ প্রশ্রয় পাইবে না ইহা স্বাভাবিক; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে সমাজের বুকে অবৈধ প্রণয়াভিনয় সমাজ-চেতনায় ক্রমশ ক্ষীণ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ, কঠোরনীতি-নিয়ন্ত্রিত সমাজে মাতার প্রভাব বাড়িতে লাগিল, ও ধীরে ধীরে মাতা প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত করিয়া পরিবার-জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জননীর এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবার ও সমাজ হইতে স্বভাবতই অধ্যাত্ম জীবনে সম্প্রসারিত হইল। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—বৈষ্ণবধর্মের এই উন্নত অধ্যাত্মতত্ত্ব বাঙলার বাস্তব জীবনে এক অপরিচিত অনুভূতি-লোকের বার্তা বহন করিয়া আনিল ও প্রাকৃত গণচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটি ভাববিলাসরূপে প্রতিভাত হইল। পক্ষান্তরে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহ-ভক্তি-মমতা, পারস্পরিক আদর-আবদার, মান-অভিমান প্রাত্যহিক জীবনে এমন একটা উজ্জ্বল সত্য ও সার্বভৌম অভিজ্ঞতা যে অধ্যাত্ম জীবনে এই সুর স্বতই ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাজেই বাংলা গীতি-কবিতা মাতার জয়গানে, মাতার প্রতি একান্ত আত্মনিবেদনে, দুরন্ত শিশুর স্নেহানুযোগে, প্রতিদিনকার গার্হস্থ্য-জীবনের শত কল-কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিল।

অন্তর-জীবনে মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য

অনেকে মনে করেন যে কাব্যে এই মাতৃপ্রাধান্য অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতে আর্যধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। এই অনুমান যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঋগ্‌বেদে দেবী-সূক্তে বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও নারীদেবতার অমিত পরাক্রম, তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির কিছুটা ছায়া দেখা যায় ও ইহাদের উচ্চবর্ণের পূজামণ্ডপে প্রবেশের বিরুদ্ধে মৃদু বা দৃঢ় প্রতিবাদ শোনা যায়। কিন্তু তথাপি ইহারা মাতৃ-সত্তার প্রতীকরূপেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিরুদ্ধতা জয় করিয়া ভক্তের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। মনসাপূজায় ভক্তির সহিত প্রচুর ভীতি মিশিয়াছে; চণ্ডীপূজায় দেবী তাঁহার উগ্রচণ্ডা মূর্তি ত্যাগ করিয়া প্রায় অবিমিশ্র স্নেহময়ী, ভক্তবৎসলা জননীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। মনে হয় মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করিয়া চৌতিশায় যে স্তব-স্তুতি ও আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই শাক্ত-পদাবলীতে আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদে উদ্বর্তিত হইয়া বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত ও প্রভাব-ও সুরের এই বিশুদ্ধীকরণে সহায়তা করিয়াছে। মায়ের ভালবাসা যেমন সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত থাকিয়া নিজ অনাবিল, অকৃত্রিম ভাব-মাধুর্য বিকিরণ করে, তেমনি মাতৃনির্ভর অধ্যাত্ম সাধনা-ও সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ও কেবল মুক্তি কামনা করিয়া অপার্থিব ভক্তিরসকেই ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।

শাক্ত পদাবলীর উৎস

যে মাতৃশক্তি শাক্ত পদাবলীতে বন্দিত হইয়াছে তাহা ভয়াবহ কালীমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কালীমূর্তি তন্ত্রসাধনার ফলেই ভক্ত-চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে। তন্ত্রে যে দেবীর আরাধনা করা হইয়াছে তিনি শ্মশানচারিণী, নরকঙ্কাল-শোভিতা, নৃমুণ্ডমালিনী ও রক্তাপ্লুতদেহা। তন্ত্র-উপাসনা-পদ্ধতিও নানা জটিল ও দুরূহ ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ। বাঙালী সমাজে তন্ত্রসাধনা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই কালীমূর্তি ভক্তসাধক ও কবির মনে অন্য সমস্ত দেব-দেবীর উপরে প্রাধান্য লাভ করিল। হয়ত এই বীভৎস-ভীষণ রূপের আরাধনার পিছনে সে যুগের বাস্তব সমাজ-চেতনা, দেশের দুর্বিষহ, বিপদ-সঙ্কুল অবস্থাও ক্রিয়াশীল ছিল। মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙলা দেশে যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়িতে ও করভারবৃদ্ধিতে জমিদারবর্গের অবস্থা শোচনীয় ও অত্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হইল ও তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইল। আজিকার রাজা

তন্ত্রের ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রভাব

কালিকার ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। এই যুগে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাবের হাতে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সময় বিষয়-সম্পদের অনিত্যতা, নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার বিপর্যয়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্মম নিষ্পেষণ ও ক্রূর চক্রান্ত সমস্ত জাতির চিত্তকে এক ভীতি-বিহ্বল সংশয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং ভক্ত কবির গানে ইহাই বিশ্বমাতার প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ, বিষয়-বৈরাগ্য ও সংসার-বিমুখতার সুরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতায় সংসার কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার বাধারূপে কল্পিত হইয়াছে—"ঘরে পরিজন, ননদী দারুণ"—ইহারাই সমাজ বিরুদ্ধতার একমাত্র নিদর্শন। এমন কি অত্যাচারী রাজা কংসও পদাবলী-সাহিত্যে উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার ন্যায় এক অস্পষ্ট কল্পনার জালের অন্তরালে আত্ম-গোপনশীল। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে সংসার উহার সমস্ত ক্রূরতা, বঞ্চনশীলতা ও অত্যাচার-উৎপীড়নের দারুণ বোঝা লইয়া অতি স্থূলরূপে প্রকট। পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখে-ইঙ্গিতে-তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিস্‌মিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রকরণকে রূপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি; বহু-বিবাহ-বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীন, বিমাতৃশাসিত পিতার ঔদাসীন্যের খবর পাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে এক প্রেমমধুর, সৌন্দর্যসার কল্পলোক বাস্তব জীবনকে আবৃত করিয়াছে; এমন কি অধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিত মানবিক প্রেমের রূপকান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। শাক্ত পদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্লানি-কুশ্রীতা, দারিদ্র্যরিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট; ও ইহার সাধনা-ক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত, উহার মধ্যে কোন নিগূঢ় ব্যঞ্জনা নাই। ইহাতে কোন রূপমুগ্ধতার আতিশয্য নাই। কালীর রূপবর্ণনা আছে, তবে উহা একেবারে শাস্ত্রবর্ণিত প্রতিমার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, উহাতে কবিকল্পনার বিশেষ অনুরঞ্জন লক্ষিত হয় না। রূপবর্ণনায় যে ভাবোচ্ছ্বাস আছে তাহা ভক্তিমূলক, সংযত ও প্রেমকল্পনার অতিরেক-বর্জিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালীর মনের কথা যেন বেনামীতে ব্যক্ত হয়; শাক্তপদাবলীতে উহার একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেই জন্য মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকে বাঙালীর সংসার ও ভাব-জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাই

শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী

তাহার ভক্তি-সাধনার নূতন রীতিতে ও কাব্যপ্রকাশের নূতন ভঙ্গীতে স্বতই প্রতিফলিত হইয়াছে।

শাক্তগীতির প্রথম রচয়িতা বোধ হয় রামপ্রসাদ সেন—কেননা ইহার পূর্বে এই ধরনের ভক্তিরসপূর্ণ শ্যামা-সঙ্গীতের কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। তাঁহার এই গান এত জনপ্রিয় হয় যে ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধক-গোষ্ঠী ছাড়াইয়া অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে ও রামপ্রসাদী সুরের সরল বৈরাগ্য-ময় ব্যঞ্জনার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়। যাহারা বৈষ্ণব ধর্মের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না তাহারাও মাতা পুত্রের এই সহজ সম্বন্ধটি অনুভব করিয়া এই মাতৃসাধনার পথেই ভগবানের নিকট তাহাদের কাতর প্রার্থনা পৌঁছাইয়া দিল। আজকালও সুদূর পল্লীতে শ্যামাসঙ্গীত যত অধিক সংখ্যায় গীত হয়, মানুষের কণ্ঠে যত আবেগ-মূর্ছনা ফুটাইয়া তোলে, এমন আর কোন জাতীয় ভক্তি-সঙ্গীত-সম্বন্ধে বলা যায় না। রামপ্রসাদ আবার তাঁহার কালী-স্তুতির সহিত দুর্গার বাল্য ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃ-কল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর দুর্বোধ্য, ভয়-দেখানো আচরণের সহিত উমার বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত, স্নেহের দুলালী কন্যামূর্তি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমল রূপ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গেল—শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের পরিচিত স্নেহ-আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয়া গেল। মহামায়া দুহিতা-রূপে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বাঁধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই সুপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতির মধ্যেই মাতৃশক্তির যুগ্মরূপের সমন্বয়ের কল্পনা নিহিত আছে।

রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদের রীতি অনুসরণে কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, নন্দকুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামা-সঙ্গীতের ধারা কবিওয়ালা, পাঁচালীকার দাশরথি রায় প্রভৃতি রচয়িতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া শেষ পর্যন্ত অতি আধুনিক কবি নজরুল ইসলামে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। শেষ প্রাচীনপন্থী কবি দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয়মূলক অনেকগুলি গানের দর্শন পাওয়া যায় ও ভক্তিরসপ্রবাহের দুইটি ধারা এক হইয়া মিশিবার নিদর্শন মিলে।

অন্যান্য শাক্ত কবি

শাক্ত পদাবলীর কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল।—

(১)

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত॥
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত॥
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি' পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলাম হত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দেখা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত॥

(২)

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

(৩)

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো কামাদি-কুসুমসকলে॥
চরণ কাল, ভ্রমর কাল, কাল কালোয় মিশে গেল,
দেখ সুখ দুখ সমান হলো আনন্দ সাগর উথলে॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে।
দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥

নবম অধ্যায়

বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত

সমাজ-বহির্ভূত সাধনার ধারা বাংলা দেশে সুদূর অতীত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; চর্যাপদাবলীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যগণের এই সাধনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। তারপর আর্যীকরণের ক্রমপরিণতি ও পৌরাণিক চেতনার অগ্রগতির ফলে অধিকাংশ অনার্য ও বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অ-হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে বিবৃত অনার্য দেব-দেবীর উপাসনা এইরূপে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লাভ করিয়া অকৃত্রিম হিন্দু ধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আর্যীকরণ-প্রক্রিয়া সত্ত্বেও কতকগুলি ধর্মমত হিন্দুধর্মের প্রধান শাখাগুলির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনা-সমূহও শাস্ত্রীয় সাধনার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি হিন্দু-ধর্মের অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া ইহার সীমান্তে সংলগ্ন হইয়াছে।

লোকসঙ্গীতের উৎস ও পরিচয়

শাস্ত্রীয় ধর্মের অন্তরালে বাঙলার লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের নিজস্ব সাধনা ও সঙ্গীতের ধারা-ও ফল্গুর মত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বাউল, কর্তাভজা, মারফতী, গুরুসত্য প্রভৃতি গান এই ধরনের সাধন-সঙ্গীত। উহা ছাড়া কবি, পাঁচালী, তর্জা, বোলান, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি নানা লোক-সঙ্গীত-ও মুখ্যতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত হইয়া হিন্দু ধর্মের প্রধান ধারাগুলির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া, হিন্দু দর্শন ও অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, ইহাদের পাশাপাশি নিম্নশ্রেণীর লোকের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

এই সব সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল সঙ্গীতই প্রধান। 'বাউল' কথাটি খুব সম্ভবতঃ বাতুল শব্দ হইতে আসিয়াছে। সংসার-সমাজের বিধিসম্মত সকল নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া এই সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমান ধর্মের কড়াকড়ি নিয়মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বিশিষ্ট সাধনার পথে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের কান্ত-কান্তার মধুর সম্পর্কটি ইহাতে 'মনের মানুষ' নামে অভিহিত এক প্রেমের ঠাকুরের প্রতি আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হইয়াছে। চর্যাপদের ও সহজিয়াদের মতই বাউল সঙ্গীতগুলি খানিকটা হেঁয়ালীপূর্ণ

বাউল গান

সন্ধ্যা ভাষায় রচিত। ইহা প্রচলিত দেহতত্ত্বাশ্রয়ী হইলেও এবং ইহার মধ্যে দেহ-

সাধনার প্রাধান্য থাকিলেও বাউল গীতের গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ভাবাবেগ ইহাকে আধুনিক চিত্তের উপযোগী করিয়াছে। বাউল গীতের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের দিকে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব সাধনার পরকীয়া তত্ত্ব ও সহজ সাধনার সহিত স্বূফী ধর্মমতের অপূর্ব মিশ্রণে বাউল সাধনা সমৃদ্ধ হইয়াছে। আউল-চাঁদকে এই বাউল সম্প্রদায়ের আদি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতকারদিগের মধ্যে লালন ফকিরের নাম বিখ্যাত। ইহা ছাড়া গঙ্গারাম বাউল, জগা কৈবর্ত, পদ্মলোচন প্রভৃতি অনেক বাউল সাধক ও সঙ্গীতকার আছেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে অনেক শিক্ষিত লোকও বাউল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুইটি গানের নমুনা দিতেছি।

(১)

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখীর পায়॥
চিরদিন পুষলেম পাখী, বুঝলেম না তার ফাঁকি জুকি।
দুধ কলা দিই খায়রে পাখী তবু ভোলে না তায়॥

(২)

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
আমি হারায়ে সেই মানুষে
ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে॥

মুর্শিদী-মারফতী গানের সহিত বাউল গানের মূলতঃ পার্থক্য কম। মুসলমানী সাধনার পরিবেশে এই গানগুলি রচিত হইয়াছে।

কবি-পাঁচালী-তর্জা প্রমুখ সঙ্গীতগুলি কোন সাধন-সঙ্গীত নহে—সাধারণ ভাবেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। কবিগানকে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর লৌকিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের উন্নত মধুর রসের সাধনা ও মাতৃ-শক্তির ঐকান্তিক, ভক্তি-বিহ্বল অনুভূতি কবিগানে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের স্থূল রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে ও ইহার গাঢ়তা অনেক পরিমাণে ফিকে ও

অকৃত্রিমতা ইতর ভাবের সংস্পর্শে অনেকটা ঘোলা হইয়া পড়িয়াছে। কবিগান বোধ হয় অষ্টাদশ শতকে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের মোহানায় উহা বাঙলা দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। রাস্থনৃসিংহ, হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই বৈরাগী, এনটুনীফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালবৃন্দ সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। ভবানী-বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ—এই ভাবে শ্যামা, শ্যাম ও মানবীয় প্রেমের সঙ্গীত—এই তিনটি স্তরে কবি-সঙ্গীত গীত হইত। ইহাদের প্রধান মৌলিক দান হইতেছে ধর্মসম্পর্কহীন প্রেমসঙ্গীতের সৃষ্টি। ইহাই পরবর্তী-যুগে উন্নত ধরনের প্রণয়-গীতির প্রেরণা দিয়াছে। কবির টপ্পাগুলি সাধারণতঃ স্থূল ও অশ্লীল হইত। হরু ঠাকুরের সখীসংবাদের একটি উদাহরণ দিতেছি।—

কবিগান

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও
হেরি চিকণ কালোবরণ তিলেক দাঁড়াও
এ অধীনীর মনের বাসনা পূরাও।
সাধ মম বহুদিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটি বাজাও॥
নির্জনে এমন পাবনা দরশন
যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ
ও বংশীর গুণ কত বিশেষ শুনাও॥

পাঁচালী গান গাওয়া হইত পালার আকারে। খানিকটা আবৃত্তি, খানিক ছড়া, খানিক গান হইত। কৃষ্ণবিষয়ক, রামবিষয়ক, শিববিষয়ক পালা ছাড়াও লৌকিক পালা—বিরহ, বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা ইত্যাদি বিষয় লইয়া পাঁচালী রচিত হইত। সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার হইতেছেন দাশরথি রায়। রসিক রায়, ব্রজ রায়, নন্দ রায় প্রভৃতি পাঁচালীকারের পাঁচালীও মুদ্রিত হইয়াছিল।

পাঁচালী

ইহা ছাড়া সারি, ভাটিয়ালী, জারি, তর্জা ও নানা পল্লী-সঙ্গীত এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই গানগুলির বৈচিত্র্য বাঙালী কবিচিত্তের সরসতা ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার নিদর্শন বহন করে।

দশম অধ্যায়

নাথ-সাহিত্য

নাথ-সাহিত্য ভাবের দিক্ দিয়া চর্যাপদের সহিত সম্পর্কিত ; উভয় ধারাতেই সিদ্ধদিগের কয়েকটি সাধারণ নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে উভয়ে বর্ণিত সাধনাক্রম একই উৎস হইতে উদ্ভূত। চর্যাপদে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা আছে তাহা উন্নত ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, অনেকটা উপনিষদ ও প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত যোগ-সাধনার বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রতিরূপ। ইহার প্রধান কথা হইল চিত্তবৃত্তির উন্মূলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শূন্যতা-বিধান—পরম সত্যচেতনার মধ্যে উহার বিলয়। নাথসাহিত্যে এই তত্ত্বকে প্রাকৃত উদ্ভট কল্পনার সহিত মিশাইয়া, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের আদিম বিস্ময়বোধ ও অন্ধ আজগুবিপ্রীতির স্তরে নামানো হইয়াছে। আর ইহার সাধনার রহস্যকে প্রধানতঃ কায়-সাধনার দ্বারা ঐহিক অমরতা ও অসাধ্য-সাধন-শক্তি-লাভের উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস-গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য মৃত্যুজয়ের দ্বারা ভোগের পথকে নিষ্কণ্টক করা। সুতরাং ইহার আধ্যাত্মিক আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। প্রাকৃত মন যে অবাধ ভোগসুখের জন্য লালায়িত যোগ-বিভূতির দ্বারা তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায়াসলভ্য করাই ইহার আসল কাম্য। নাথসাহিত্য সম্বন্ধে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা উনবিংশ শতকের পূর্বে লিখিত রূপ ধারণ করে নাই। রংপুর-কুচবিহার অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখে মুখে ইহার আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ইহার কাহিনী পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—লোকমুখে গীত হইয়া লৌকিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল।

নাথসাহিত্যের উৎস ও স্বরূপ

এই কাহিনীর দুইটি প্রধান শাখা—মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান। প্রথমটিতে সিদ্ধাচার্য মীননাথের কদলীপত্তনের নারীদের মোহে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান-বিস্মৃতি ও শেষ পর্যন্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধার-সাধন। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে গোরক্ষনাথ-শিষ্যা ও তত্ত্বজ্ঞা ময়নামতীর নির্দেশে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সংসারত্যাগ ও দীক্ষাগ্রহণ।

দ্বিতীয় আখ্যানটিতে তরুণী রাজমহিষীদ্বয় অদুনা-পদুনার স্বামিবিচ্ছেদ-বেদনার মর্মান্তিক খেদের বর্ণনা থাকার জন্ত ইহা জনসাধারণের মনের গভীরে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। প্রথমটিতে কেবল দুরূহ সাধনতত্ত্বের রূপক-ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহা সাধারণের দুর্বোধ্য। ইহার কবি বা রচয়িতার মধ্যে দুর্লভ মল্লিক, ভীমসেন রায়, শেখ ফয়জুল্লা, ভবানী দাস ও আবদুল স্কুর মহম্মদের নাম করা যায়; কিন্তু বিভিন্ন গাথাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয় যে ইহার রচয়িতারা একই আখ্যান-আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন ও মাঝে মধ্যে, রচনার অভিন্নতার মধ্যে বর্ণনার এক-আধটুকু পরিবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কে যে আদি কবি আর কে যে নকল-কারক শুধু ভণিতার মধ্যে নিজ নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাহার যথার্থ অবধারণ অসম্ভব।

নাথসাহিত্যের কাহিনীদ্বয়

ইহাদের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে কিছু যোগ রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর যে চিত্র এখানে পাই, তাহা লৌকিক কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও সময় সময় হাস্যাস্পদ। দুর্গা সিদ্ধাদের চরিত্রবল-পরীক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অশোভন ও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মহিমাবিরোধী। যমের সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর যে শক্তিপরীক্ষার বোঝাপড়া তাহাতে প্রাকৃতরুচিসম্মত উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ, পরস্পরকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ আজগুবি কৌশল-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইহাদের পারলৌকিক পরিকল্পনার মধ্যেও ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধাদের মধ্যে অনেককেই হীন-বৃত্তিধারী ও স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রকটনে অতিব্যগ্র রূপে দেখানো হইয়াছে। এমন কি ময়নামতী, গোবিন্দ-চন্দ্র ও রাণী অদুনা-পদুনার মধ্যেও অভিজাত-সুলভ আচার-আচরণের বিশেষ নিদর্শন নাই—সকলেই যেন ছেলে-মানুষের মত অস্থির, খামখেয়ালী ও নিরঙ্কুশ কল্পনার মূর্ত বিকাশ। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণে রাণীদের খেদ মর্মস্পর্শী করুণ রসে অভিষিক্ত হইলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু-নারীর অধ্যাত্ম-আদর্শের স্পর্শহীন। এ যেন ছোটমেয়েদের পুতুল-ভাঙার জন্ত শোকোচ্ছ্বাসের একটু উন্নততর সংস্করণ। এই সমস্ত হইতে এই ধারণাই জন্মে যে সমস্ত আখ্যানটি আদিম দেব-কল্পনার একটা অর্ধবিকশিত রূপ এবং আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। কবিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতাও এই ধর্মসংস্কারের

হিন্দুধর্মাদর্শ ও নাথসাহিত্য

প্রাগ্-আর্য প্রাচীনত্বের আরও একটি প্রমাণ—উভয়ধর্মাবলম্বী আদিম জাতিরা যখন ধর্মগত বিভেদের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই, সেই সুদূর অতীতের স্মৃতিবাহী।

মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় পুঁথিতে গুরু মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়া সেখানকার নারীদের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া সাধনামার্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন ও সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সুখপ্রধান জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অধঃপতনের কাহিনী জানিতে পারিয়া নর্তকীর ছদ্মবেশে কদলী-নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্কেতে গুরুকে তাঁহার বিস্মৃত মহাজ্ঞানের তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলেন। শিষ্য গুরুকে তত্ত্বকথা শোনাইতে শোনাইতে গুরুর চৈতন্যোদয় হইল ও তিনি হীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন ত্যাগ করিয়া সাধনা-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানারূপ হেঁয়ালি ছড়া ও রূপক-প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ত্ব-প্রতিপাদনই আখ্যানের প্রধান উপজীব্য। এই আপাত-অসম্ভব উক্তি-সমাবেশ ও রূপকের মাধ্যমে তত্ত্বের আভাসদান—চর্যাপদের সঙ্গে নাথ-গীতিকার মিলের নিদর্শন। এই গভীরার্থক হেঁয়ালি-রচনার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। (ডুবে)
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥
ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন।
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন॥

এইরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় বাঙলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বরহস্য একই সঙ্গে আবৃত ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সহজিয়া, বাউল ও তন্ত্রসাধনাতেও এই বিপরীত ভাবের রহস্যময় সমাবেশ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান-এ তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্য। ময়নামতী তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্য ছেলেকে কায়সাধনার রহস্য শোনাইয়াছেন ও হাড়ির ছদ্মবেশে অবস্থিত সিদ্ধযোগী হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুত্র নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে এই হীনবর্ণের গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে সম্মত হইল, কিন্তু গুরুর প্রতি তাহার প্রকৃত ভক্তি বোধ হয় কোন

াদনই জন্মে নাই। গুরুও শিষ্যকে নানা অবাঞ্ছিত ও অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়া তাহার ধর্মবোধের দৃঢ়তার পরীক্ষা লইয়াছে। এই সমস্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে যে সমাজ-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রুচিবোধ, সংস্কৃতির মান ও ধর্মচেতনার বিচারে কোন সমুন্নত উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না। পুত্র মাতার পরীক্ষাব জন্য যে সমস্ত নৃশংস ও রূঢ় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে হয়ত ময়নামতীর যোগৈশ্বর্য বিস্ময়করভাবে ফুটিয়াছে, কিন্তু মাতা-পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহমমতাময় সম্পর্কটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। গুরুকে মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখার মধ্যে গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধটি উহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়াছে। গোবিন্দ-চন্দ্রেব যোগসাধনা যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সে যে তত্ত্বজ্ঞানেব পূর্ণ অধিকারী হইয়াছে, তাহার সংসার-জীবনে ব্যগ্র প্রত্যাবর্তনে ও রাণীদের তরল প্রমোদপূর্ণ সঙ্গলিপ্সায় তাহার কোন প্রমাণ মিলে না। শেষ পর্যন্ত শিষ্য চিরসন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুর অনুগমন করিয়াছে—এই ঘটনা-নির্দেশের মধ্যেই আখ্যানের পরিসমাপ্তি। যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনীটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র, ক্রূব, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্ছ্বাসে, অসংবৃত ভোগলালসায়, শৈশব-সুলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপরিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। এই অশিক্ষিত, আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত, যথাযথ ভাবপ্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়। গোপীচন্দ্রের গান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধার করা হইল।—

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান

(১)

সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু গোপীচন্দ্রের প্রতি পদুনা

জে দেশে জাইবা প্রিয় সে দেশে জাইব।
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব॥
তুমি সে যোগিআ রাজা আমিত যোগিনী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনী॥

ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয় বান্ধি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোমা শোন প্রাণনাথ॥
এক সন্ধ্যা বান্ধি ভাত দুই সন্ধ্যা খিলাএমু।
হাটিতে নারিলে বাজা কোলে করি লইমু॥

(২

ময়নামতীর প্রতি অদুনা-পদুনা

তা শুনিয়া চারি বধূ বুকে মারে হাত।
সুন গ শাশুড়ি মোরা কহি চাবি বাত॥
ছাবে-খারে জায় গ বুড়া মোর গ বালাই লই।
সকল দেশের বুড়া মরে তোমাব মবণ নাই॥
অবশ্য মরিবা তুমি আমবাব বাসবে।
সপ্ত দিনেব বাসি মরা কবিব তোমাবে॥
গলে দড়ি দিয়া ফেলাবে দক্ষিণ পাত্যবে।
পাত্যরে খাইব তোবে শৃগাল কুকুবে॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আধুনিক যুগ।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের অনুশীলন

১

কোন দেশের সাহিত্যে বা সমাজ-চেতনায় আধুনিকতার উন্মেষ-মুহূর্ত ঠিক-ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সকল যুগেই এমন এক একজন ব্যতিক্রমধর্মী লেখক থাকেন, যাঁহারা সমসাময়িক প্রচলিত আদর্শের সুরে সুর মিলান না—তাঁহাদের লেখায় ও মনোভঙ্গীতে ইহার বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়। হিন্দুদর্শনের যুগে বৌদ্ধমতবাদ, এমন কি চার্বাকদর্শনও এই প্রতিবাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন।

প্রাচীন সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বীজ

মঙ্গলকাব্য-ধারার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতারা দেবমহিমা-কীর্তনের অন্তরালে মানবজীবনের রসকে প্রাধান্য দিয়া এক নূতন বাস্তবতা ও সমাজ-সচেতনতার প্রবর্তন করিয়াছেন। জনজীবনের প্রতি কৌতূহল, দেব-নির্ভরতা-মুক্ত মনের স্বচ্ছন্দলীলা, সমাজের অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ব্যঙ্গশরক্ষেপ—এ সবই আধুনিক মনোভঙ্গীর নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। অন্যান্য ধারার মঙ্গলকাব্যেও বারমাস্যা-বর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্দা ও ভোজ্য দ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা দৈবনির্ভরশীল সমাজে বাস্তব রসের ফল্গুধারার পরিচয় দেয়। কৃত্তিবাস-কাশী-দাসের রামায়ণ-মহাভারত ও বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলীর ভক্তিরসপ্রধান কাব্যের মধ্যেও বাস্তব জীবনের খণ্ডাংশ আবিষ্কার করা যায়। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় অনার্য-সংস্কৃতির সহিত মিশ্রিত, প্রবল জীবনবেগ-চঞ্চল, এক দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি চিত্রিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বীজ যে আদি যুগ হইতেই কাব্যরচনার তলার মাটিতে উপ্ত ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু যেমন দুই একটি কোকিলের বিচ্ছিন্ন ডাক বসন্তের আবির্ভাবের প্রমাণ দেয় না, তেমনি ব্যতিক্রমধর্মী দুই একটি কবির অস্তিত্বই যুগচেতনায় বাস্তবতার

প্রসারের নিদর্শনরূপে লওয়া যায় না। মনে হয় যে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র এই দুইজন কবির বাস্তবতার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল এবং উভয়েই রাজসভার আবেষ্টনের মধ্যে—অন্ততঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের চোখে বাস্তব জীবন যে ভাবে প্রতিভাত হইত, তাহার যথার্থ প্রতিচ্ছবি আঁকিয়াছেন। উভয়েরই মনোভঙ্গী বস্তুধর্মী ও ব্যঙ্গপ্রবণ ছিল; কিন্তু তাঁহাদের যুগপ্রচলিত কাব্যপ্রথা ও মানস সংস্কার এই বস্তুচেতনার পূর্ণ পরিণতিকে বাধা দিয়াছে। বিদ্যাপতির যুগে ভক্তিবাদের প্রথম উচ্ছ্বাস আধুনিক জীবনবোধকে প্লাবিত করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের যুগে এই ভক্তির নিঃশেষিত-প্রায় ভাবধারা এই জীবন-চেতনার স্বচ্ছন্দ বিকাশকে বাধা দিয়াছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই —ইহার জন্য বস্তুচেতনাসমৃদ্ধ বিদেশী জাতি ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের জন্য ইহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাই ইংরেজ আগমনের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল।

বিদেশী-সংযোগে আধুনিকতার স্ফূর্তি

আধুনিকতার আবির্ভাবের পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া উহার আগমনের জন্য মানস প্রস্তুতি চলিতে থাকে। সেই জন্য যদিও অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে জাতীয় চেতনাতে ও উনবিংশ শতকের প্রথমেই সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের স্থির সঞ্চার লক্ষিত হয়, তথাপি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার পূর্বাভাস ও অনিশ্চিত পদ-চারণা জীবনবোধের মধ্যে এই পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদ কুলি খাঁ-র দ্বারা বাঙলার সিংহাসন-অধিকার একটি নূতন যুগের প্রারম্ভরূপে গৃহীত হইতে পারে। মুরশিদ কুলি খাঁ দেশে যে নূতন শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব-নীতির প্রবর্তন করিলেন, তাহার ফলে বাঙলা দেশ কার্যতঃ দিল্লীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শাসনে সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের পরিবর্তে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনীতির প্রাধান্যই মূললক্ষ্যরূপে দেখা দিল। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিরোধ, মোগল সাম্রাজ্যের জোর-করিয়া চাপানো কেন্দ্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থা, বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হঠাৎ গৌণ ও তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িল। নূতন নবাবের আমলে হিন্দুরা গুণানুসারে শাসন ও রাজস্বসংগ্রহ-বিভাগের উচ্চতর পদসমূহে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন; রাজানুগ্রহের সমান অংশীদাররূপে হিন্দু-মুসলমান অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ অনেকটা লুপ্ত হইল। মুরশিদ কুলি খাঁ যেমন মোগল দরবারে নির্ধারিত রাজস্ব

১৭০০ খ্রীঃ মুরশিদ কুলি খাঁর সিংহাসন লাভে নূতন যুগের সূচনা

দাখিল করিয়াই স্বাধীন রাজার সমস্ত অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন, তেমনি তাঁহার অধীনস্থ হিন্দু জমিদারেরাও হিসাবমত খাজনা দিয়া নিজ নিজ এলাকায় অবারিত ক্ষমতায় আসীন হইলেন। নবাব কেবল দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি না হইয়া স্বাধীন বাঙলার রাজারূপে দেশবাসীর নিকট প্রতিভাত হইলেন। বাঙলা দেশ কেবল দিল্লীর বাদসাহীর অঙ্গমাত্র না হইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন আদর্শেব অনুগামী, নিজ অভিরুচি অনুসারে নিজ জীবনযাত্রা-নির্বাহের অধিকারী রাষ্ট্ররূপে নবজন্ম লাভ করিল। মুরশিদ কুলি খাঁ-র শাসনে যে অত্যাচার-উৎপীড়ন ছিল না তাহা নয়; বরং কোন কোন বিষয়ে দিল্লীর সুদূর-পরিচালিত, শিথিল শাসনব্যবস্থা হইতে আরও কড়াকড়ি ও প্রশ্রয়হীন নিয়মকানুন প্রচলিত হইল। বিশেষতঃ রাজস্ব-আদায় সম্বন্ধে কোনও রূপ চুক্তিভঙ্গ অমার্জনীয় অপরাধরূপে গণ্য হইয়া কঠোর শাস্তির বিষয় হইত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অপরাধে 'বৈকুণ্ঠ'-বাস করিতে ও অকথ্য অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই উৎপীড়নেব মূলে খামখেয়ালি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না, ছিল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অপরাধের জন্য মাত্রাতিরিক্ত নৃশংসতা।

মুরশিদ কুলি খাঁ-র উত্তরাধিকারী আলিবর্দি খাঁ-র আমলেও এই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। তাঁহাব আমলে বর্গী-আক্রমণের জন্য বাঙলা দেশের কোন কোন অংশে যে ব্যাপক লুণ্ঠন ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাব স্মৃতি বাঙলাব পল্লীছড়ায় এখনও রক্ষিত আছে। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেও মায়ের মন বর্গীর অত্যাচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ও একদিকে যেমন বর্গীর লুণ্ঠন, অন্যদিকে তেমনি খাজনা দিবার অসামর্থ্য—এই উভয় বিষয়েই সে সমান উদ্বেগ অনুভব করিয়াছে। এই ছড়া অন্ততঃ ইহাই প্রমাণ করে যে, দেশের সাধারণ গৃহস্থের চিন্তা অর্থনীতিপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

আলিবর্দি খাঁর আমলের রীতি

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন-চ্যুতির ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী-গোষ্ঠী একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ ঈর্ষ্যা বা দ্বন্দ্বপ্রসূত নহে—ইহা মূলতঃ নেতৃস্থানীয় প্রজাশক্তির গোপন বিদ্রোহ। মনে হয় ইংরেজ বণিক ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সংসর্গের প্রভাবেই এই চক্রান্ত পাশ্চাত্ত্যদেশসুলভ রাষ্ট্রনৈতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজের কূটনীতি ও চক্রান্ত-কৌশল

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে আধুনিক যুগ-লক্ষণ প্রকাশ

যে ক্রমশঃ প্রাচ্য রাষ্ট্রজগতে অনুপ্রবেশ করিতেছিল ও ইহাব প্রাচীন ধর্মকে পরিবর্তিত করিয়া ইহাকে আধুনিকতাব সূক্ষ্মতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিতেছিল, সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তাহার প্রমাণ মিলে। ইহাব শুধু ফল নহে, ইহাব পবিকল্পনা ও প্রস্তুতিও অনেকটা আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত।

আধুনিক মনোভাবের দ্বিতীয় নিদর্শন : পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যনীতির সহিত বাঙালী সমাজের পরিচয়

আধুনিক মনোভাবেব দ্বিতীয় নিদর্শন হইতেছে পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যনীতি ও দ্রব্যবিনিময়-প্রথার সহিত বাঙালী ব্যবসায়ী-সমাজের পবিচয়। অবশ্য প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগেও বাঙলা দেশেব বহির্বাণিজ্য উৎকর্ষে ও পরিমাণে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। বাঙলার সূক্ষ্মশিল্পেব চাহিদা দেশের মধ্যেও প্রচুব ছিল। কিন্তু এই বাণিজ্যের-প্রসাব ও গতি ছিল মন্থব ও স্বাভাবিক নিয়মানুগ—দুর্ভিক্ষ বা অবাজকতা না থাকিলে ইহাব মধ্যে কোন অতর্কিত হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যাইত না। ইহা একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণেব নিযমিত কক্ষপথেই আবর্তিত হইত। শিল্পী তাহাব বিক্রয় ও লাভেব পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রত্যাশা কবিত, তাহা প্রায়ই নির্ভুল হইত। কিন্তু ইউরোপীয় বাণিজ্যেব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-স্থাপনের ফলে এই ব্যবসায়ের মধ্যে এমন একটা অনিশ্চিত ও দ্রুতক্রিয়াশীল প্রভাবের সংযোগ হইল, যাহাতে ইহাব সম্বন্ধে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা-সমর্থিত পূর্বধারণা হঠাৎ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। এ যেন বানেব জল ঢুকিয়া পুষ্করিণীব জল বাহির করিয়া লইয়া গেল—প্রচুর উৎপাদনের মধ্যে এক কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণজাত অভাবের সৃষ্টি কবিল। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ইংবেজ প্রকৃত রাজশক্তিব অধিকাবী হইল, তখন সে সর্ববিধ উপায় অবলম্বন কবিয়া দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিল। বস্ত্রশিল্পী, নীলচাষী হতবুদ্ধি হইয়া আবিষ্কাব করিল যে, তাহাদের পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেন কোন ভোজবাজিব দ্বারা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হইল। এই শিল্প-উৎসাদন-ব্যাপারে কয়েকজন বাঙালী দালাল—যাহাদিগকে কোম্পানির বেনিয়ান নামে অভিহিত করা হইত—ব্যবসায়ের সমস্ত অন্ধি-সন্ধির সন্ধান দিয়া ও জোর করিয়া দাদন গছাইয়া—সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল ও কোম্পানির ধনসম্পত্তির কিছু অংশ পাইয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া কলিকাতার নব অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইল। এই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি-রহস্যের সহিত পরিচয় বাঙালীর আধুনিক মনোভাবকে দৃঢ়ীভূত করিতে সাহায্য করিল।

তৃতীয়তঃ ইংরেজ শাসনব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার ফলে শাসন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা

ক্রমশঃ জনসমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ইংরেজের বিচাবালয়, রাজস্বনির্ধারণ, দশশালা ও চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত কিছু পরিমাণে পুরাতন ব্যবস্থাব অনুসৃতি হইলেও অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শের ও নীতিব পবিচয় বহন করিল। বাঙলাব জনসাধারণ ধীরে ধীবে এই শাসন-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিল ও তাহাদের বৈষয়িক জীবনে আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাব অনুভব করিল। সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে ইংরেজদেব সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ও পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার তাহাদের মনকে নূতনের দিকে আকর্ষণ করিল। তখনও রীতিমত ইংরেজী শিক্ষাব আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সমাজ-জীবনে মেলা-মেশার জন্য ইংবেজী সাহিত্যকে জানিবাব আকাঙ্ক্ষা ধীবে ধীরে প্রসাবিত হইল। দেশীয় বাজনীতিবিদেরা গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির মর্ম অনুধাবন কবিতে লাগিলেন। মহাবাজা নন্দকুমাব ব্রিটিশ শাসনেব আদিযুগেব সর্বপ্রথম অর্থনীতি-বিশারদ ও তিনিই প্রথম ইংবেজ-শক্তিব বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিবোধিতার পথপ্রদর্শক। মহাবাজা নবকৃষ্ণ দেব, রাজা বামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি হিন্দু সমাজেব নেতৃবৃন্দ ইংবেজী শিক্ষা-প্রবর্তনেব পূর্বেই ইহা কিছু কিছু আয়ত্ত কবিযাছিলেন ও ইহার হিতকব প্রভাব ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সুতবাং যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চাব ফলে বাংলা সাহিত্যেব উপর আধুনিক মনন ও অনুভূতির প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করিল তখন দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তিবৃন্দ উহাকে সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানাইতে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন ও এই আগ্রহপূর্ণ সহযোগিতার জন্যই আধুনিকতার অগ্রগতি এত দ্রুতবেগে সাধিত হইল।

তৃতীয় নিদর্শন: ইংরেজের শাসন-সম্বন্ধীয় আধুনিক ধারণাদির পরিচয়

২

গদ্যের উদ্ভব

প্রাগ্-আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—ইহার মধ্যে গদ্যের একান্ত অভাব। এতাবৎকাল বাংলা ভাষা ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবেব ন্যায় কেবল ছন্দোবদ্ধ, নৃত্যশীল পদক্ষেপেই অভ্যস্ত ছিল। গীতিধর্মী, সুরের ছোঁয়াচ-লাগা ধ্বনিপ্রবাহের সাহায্যেই সে সাহিত্যের বিচিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে

—ইহারই মাধ্যমে সে যুক্তিতর্ক করিয়াছে, গল্প বলিয়াছে, জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় বাঙালীর সমস্ত মনন ও তথ্য-জ্ঞান এক অবিচ্ছিন্ন কাব্যময়, আবেগপ্রধান মনোভাবের মধ্যেই বিধৃত ছিল। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ জাগিয়া উঠিলেও তাহা যেমন সমুদ্রেরই অংশ, তেমনি ঊর্ধ্বলোকচারী কল্পনা মাঝে মধ্যে ভূমি স্পর্শ করিলেও উহা বায়ুসঞ্চরণের ছন্দটি ত্যাগ করে না। বাংলা সাহিত্য উড়িবার ডানাকে পায়ে হাঁটিবার উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি পদচারণার চাল অভ্যাস করে নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে অতিপ্রচলিত পয়ার ছন্দ স্থল ও জলের মধ্যে সংযোজক প্রণালীর কাজ করিয়াছিল বলিয়া ইহা আবেগ ও প্রয়োজনের মধ্যে প্রকাশরীতির পার্থক্য অনুভব ও অনুশীলন করিতে বিরত ছিল। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে পদ্যের গদ্যান্বয় করিলে বা ব্যবহারিক জীবনের সংলাপ-রীতিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করিলেই যে গদ্যের অনায়াসে জন্ম হইতে পারিত, সেই সামান্য পরিবর্তন বা অনুসরণের কল্পনাও কোন প্রাগ্-আধুনিক লেখকের মনে জাগে নাই। অথবা যে সংস্কৃতের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত, তাহার দার্শনিক সূত্র ও ভাষ্যও কোন বাঙালী লেখককে অনুরূপ প্রয়োগে প্রেরণা দেয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে পয়ারের অসম বিন্যাসের মধ্যে কায়ক্লেশে প্রবেশ করাইয়াছেন, তথাপি গদ্যের কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ গদ্যে লেখা হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের খঞ্জ, হোঁচট-খাওয়া বাহন প্রয়োজনের কাঁটার বেড়া ডিঙাইয়া সাহিত্যের রাজপথে পদক্ষেপ করিতে কোন দিনই সাহসী হয় নাই। পুঁথি লিখিতে বসিলেই লেখকের কানে যে অস্পষ্ট কাব্যগুঞ্জন ধ্বনিত হইত তাহাই তাহার মুহূর্ত-পূর্বের মুখের কথাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিত।

প্রাগ্-আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ভাষা—পদ্য

যে কোন কারণেই হউক, যখন আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব হয় নাই, তখন এই অভাব-মোচনই যে ইহার মধ্যে আধুনিকতার প্রথম সূচনা হইবে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। (কিন্তু এই গদ্যের উদ্ভব হইয়াছে ঠিক অন্তরের প্রেরণায় নহে, বাহিরের প্রভাবে।) বাঙালীর মন ঠিক গদ্যানুকূল না হইলেও বাহিরের প্রয়োজন-সাধনের জন্য উহাকে গদ্যচর্চায় ব্রতী হইতে হইয়াছে। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বায়ুসঞ্চালনের ফলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া প্রবর্তিত হয়, তেমনি কাব্যরসনিমজ্জিত বাঙালী লেখকের ক্ষেত্রেও গদ্যরচনারূপ

বাংলা গদ্যের প্রথম উদ্ভব বাহিরের প্রভাবে ও প্রয়োজনে

আরোপিত কর্তব্যের চাপ ক্রমশঃ স্বভাবকুশলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় পরিণত হইয়াছে। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের বাণীপ্রচার ও দেশীয় চিত্তকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস, শাসনকার্যে সুবিধার জন্য তরুণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রীঃ অঃ), মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন ও সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ও বিস্তার ও ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ, তীক্ষ্ণ সমাজ-পর্যবেক্ষণ ও সর্বশেষে মৌলিক মননশক্তির আবির্ভাব প্রভৃতি নানামুখী কারণের সমবায়ে এই নবজাত গদ্যসাহিত্য শিক্ষানবীশী স্তর হইতে পরিণত শিল্পসৌন্দর্যের পর্যায়ে উন্নীত হইল। এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একটু সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১)
খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক-গোষ্ঠীর প্রভাব

পাশ্চাত্ত্য বণিকের সহযাত্রী ও পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার পূর্বসূরি-রূপেই বাঙলার মাটিতে খ্রীষ্টীয় পাদরীর আবির্ভাব। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বাণিজ্য প্রায় সমকালেই এ দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই ধর্মযাজকদের ধর্মানুরাগের আন্তরিকতায় সংশয় করিবার কোন হেতু নাই। হতভাগ্য পৌত্তলিকদের মধ্যে সত্যধর্মপ্রচারের কল্যাণময়তায় ইহাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তাহা কতকটা স্বার্থবুদ্ধি ও হীন চাতুরীর দ্বারা কলুষিত হইলেও, মোটের উপর আন্তরিক নিষ্ঠা-সঞ্জাত। পাদরীরা গোড়া হইতে জনসমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য চলতি ভাষা-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। দোম এটনিয়ো নামে পোর্তুগীজ পাদরী-দের দ্বারা ধর্মান্তরিত একজন বাঙালী খ্রীষ্টান ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং পোর্তুগীজ পাদরী মানোএল তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের অসারতা-প্রতিপাদন জন্য আঞ্চলিক কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান যাজক-সম্প্রদায় বাংলা গদ্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাকে প্রধান তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়—(১) বাই-বেলের অনুবাদ—এই অনুবাদগুলি ইংরেজী বাক্‌রীতি ও বাঙালীর পক্ষে অপরিচিত ভাবধারার অনুসরণের ফলে আড়ষ্টতা অতিক্রম করিতে পারে নাই ও বাংলা সাহিত্যে ইহাদের প্রভাব নগণ্য; (২) বাংলা মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন ও ব্যাকরণ-প্রণয়নের দ্বারা ইহারা পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যরচনারীতিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধিতে

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের গদ্য-প্রচেষ্টার তিনটি ধারা: বাইবেলের অনুবাদ; বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন; কেরীর সংস্কৃতপ্রধান গদ্য

ও গদ্যগ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিতে সহায়তা করিয়াছেন; (৩) কেরী সাহেব একদিকে বাংলা গদ্যকে আরবী-ফারসীর প্রভাবমুক্ত করিয়া ও সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করিয়া উহার গঠন-সৌষ্ঠব ও প্রকাশ-মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন; অপর দিকে 'কথোপকথন'-জাতীয় গ্রন্থ লিখিয়া বা অপরকে দিয়া লিখাইয়া সাহিত্যে কথ্যভাষার একটি সম্মানিত স্থান নির্দেশ করিয়াছেন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও আদিযুগের অন্যান্য লেখকদের প্রভাবিত করিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ন্যায় নূতন ভাষাদর্শ-প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছেন।

(২)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

কেরী সাহেবের প্রধান কীর্তি হইল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ সুলেখক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সুখপাঠ্য বিবিধবিষয়ক গদ্য-গ্রন্থ-রচনার ব্যবস্থা করা। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে গদ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য ও সাহিত্যিক গুণ-বিকাশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মিলে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবন-চরিত (রামরাম বসু—'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', ১৮০১; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', ১৮০৫), ইতিহাস-সংকলন (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'রাজাবলি', ১৮০৮), ছোট ছোট সামাজিক ও কাল্পনিক গল্প-কাহিনী (কেরী—'কথোপকথন', ১৮০১, ও 'ইতিহাসমালা', ১৮.২), আদর্শপত্রের নমুনা (রামরাম বসু—'লিপিমালা', ১৮০২) অনুবাদ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'বত্রিশ সিংহাসন', ১৮০২, 'হিতোপদেশ', ১৮০৮; গোলোকনাথ শর্মা—'হিতোপদেশ', ১৮০২; চণ্ডীচরণ মুনসি—'তোতা ইতিহাস', ৮০৫; তারিণীচরণ মিত্র—'ঈষপের ও অন্যান্য গল্প', ১৮০৩; হরপ্রসাদ রায়—'পুরুষ-পরীক্ষা', ১৮১৫) ও দার্শনিক নিবন্ধ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'প্রবোধচন্দ্রিকা', ১৮৩৩)—এই তালিকা হইতেই আদিযুগের গদ্যের বিষয় ও রচনারীতি-বৈচিত্র্যের একটা ধারণা করা যাইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর গদ্যরচনার বিষয়-বৈচিত্র্য

এই বিষয়পঞ্জী হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে লেখকেরা সর্বপ্রথম প্রথাবদ্ধ বিষয়ের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে বিষয় নির্বাচন করিয়াছেন। অবশ্য হয়ত সাহেবদের শিক্ষার প্রয়োজনে পাঠক্রমের একটা ধারা কলেজকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে; কিন্তু কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষাশিক্ষণ, বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ

বিচিত্র বিষয়-নির্বাচনের নানা উদ্দেশ্য

নহে। সুতরাং প্রত্যেক লেখকই নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। এই গ্রন্থগুলি হইতে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানের পরিধি ও কৌতূহলের দিক্-নির্ণয় সম্বন্ধে জানা যায়। অনেকেই স্বাধীনতার অধিকার পাইয়াও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসহেতু অনুবাদের মধ্যে মূলানুসরণের আশ্রয় লইয়াছেন। কেরী সাহেব বাঙালী সমাজে প্রচলিত পুরাণ ও কিংবদন্তী হইতে প্রাপ্ত গল্প-কাহিনীগুলিকেই বাংলা ভাষায় লিখিয়া সিভিলিয়ান ছাত্রদের মধ্যে পবিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথম, কথ্যভাষা ও দ্বিতীয়, সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ইংরেজ তরুণদিগকে ওয়াকিবহাল করিয়া তাহাদের শাসন-কর্তব্যপালনের উপযোগী অভিজ্ঞতাদান। চিঠিপত্রের নমুনা দিয়া লেখক কোন বিশেষ সাহিত্যিক গুণ বা বিশ্রম্ভালাপের অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, কেবল সামাজিক আদব-কায়দা, লঘু-গুরুস্থানীয় অথবা সমান অবস্থাব বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্বোধন-রীতি শিক্ষা দিবাব উদ্দেশ্যেরই বশবর্তী হইয়াছেন—ইহার মধ্যে সাহিত্যরস একেবারেই অনুপস্থিত। লেখনভঙ্গীর শিষ্টাচারানুস্মৃতিই বড়, ইহা যেন শিশুবোধকেরই বয়ঃস্থ সংস্করণ। যে দুইখানি জীবনচরিত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাব প্রেরণা ঠিক গুণিসংবর্ধনা, বীরপূজা অথবা ইতিহাস-রসাকর্ষণ নহে—ইহা অনেকটা বংশমর্যাদার পরোক্ষ প্রচার। প্রতাপাদিত্য ও কৃষ্ণচন্দ্র লেখকদের আত্মীয় বলিয়াই তাঁহারা রচনার বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছেন; তাঁহারা যে যুগপ্রতিনিধি বা ইতিহাস-বিশ্রুত পুরুষ, ইহা তাঁহাদের গৌণ পরিচয়। বংশগরিমার সহিত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার আকস্মিক সংযোগই তাঁহাদের জীবনী-সাহিত্যের নায়করূপে নির্বাচিত হইবার প্রকৃত কারণ।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার কৌতূহলের ব্যাপকতা ও সাহিত্যকৃতির নানামুখিতার পরিচয় দিয়াছেন। দুইখানি অনুবাদ-গ্রন্থ, একখানি ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ ও একখানি বিবিধবিদ্যাসম্বন্ধীয় ও মুখ্যতঃ দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি যে কেবল ফরমায়েসী লেখক নহেন ও তাঁহার মননশক্তি যে বিচিত্রগামী, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি বিষয় দ্বারা অভিভূত না হইয়া বরং নানা বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের শক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গদ্যভাষার মধ্যেও বিষয়োপযোগী প্রয়োগ-কুশলতা ও বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া নূতন পথে পদক্ষেপ ও নবপরীক্ষার সাহসিকতা

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার বহুমুখিতা

দেখা যায়। যেখানে তাঁহার সহযোগীরা এক ঘোড়ার এক্কাগাড়িতে কোনও মতে টাল বাঁচাইয়া চলিয়াছেন, সেখানে মৃত্যুঞ্জয় বহু-অশ্ব-বাহিত রথের আরোহী হইয়া মসৃণ স্বচ্ছন্দ গতিতে ও সম্ভ্রান্ত চালে স্থির লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে কাহার হাতে গদ্যরীতি কতটা অগ্রসর ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহার পরিমাণনির্ণয় সহজও নহে, একান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে।

এই যুগে গদ্যলেখক-গোষ্ঠীর নানা আদর্শ

মনে রাখিতে হইবে যে ইঁহাদের মধ্যে কেহই ভাষার নূতন প্রয়োগের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুত ছিলেন না; সকলের স্কন্ধেই এই দায়িত্ব অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইঁহাদের মুন্সিয়ানার জন্য কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল, এবং এই খ্যাতির জন্যই হয়ত কেরী সাহেব তাঁহাদিগকে এই গদ্যরীতি-অনুশীলনের জোয়ালে জুড়িয়া থাকিবেন। এক মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া তাঁহাদের সম্মুখে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না; তাঁহারা তাঁহাদের আরবী-ফারসী-উর্দু-সংস্কৃতের উপর কম-বেশী অধিকার লইয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচলিত সংলাপ-রীতি বা তাঁহাদের কর্মজীবনে অর্জিত বিশেষ মানস রুচি ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়াই তাঁহাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনভ্যস্ত ভাষায় নূতন বিষয়ের যে প্রকাশ-দুরূহতা, অনির্দিষ্ট ছাঁচে অবাধ্য ভাবকে ঢালাই করার যে গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা তাহাকে প্রায় মল্লযুদ্ধের পর্যায়েই ফেলা যায়। এই দুঃসাধ্য কাজে যাঁহারা অনুবাদের, বিশেষতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের যষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের পদক্ষেপ অনেকটা সুষম হইয়াছে। যাঁহারা উর্দু, হিন্দী বা ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারা নির্ভরযোগ্য আদর্শের অভাবে প্রায়ই হোঁচট খাইয়াছেন। কেরীর নামে যে দুইখানি বই প্রচলিত আছে তিনি তাহাদের যথার্থ রচয়িতা কিনা সন্দেহ। তথাপি ইহাদের মধ্যে সংলাপের সরল রীতি ও গল্প বলার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত বাক্য-যোজনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা মোটামুটি ঠিক পথেই চলিয়াছে। রামরাম বসুর 'লিপিমালা' পত্রের গতানুগতিক লিখনভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছে ও কতকগুলি মামুলি খবর দেওয়া ও জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আর কোন নূতনত্বের অবতারণা করে নাই বলিয়া ইহাকে সাহিত্যিক ভাষার মানদণ্ডে বিচার করা অবিধেয়। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র'-এ আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্য ও বাক্যাংশের অন্বয়ে কিছু অপটুতা আছে বলিয়া ইহার রচনারীতিকে অভিযুক্ত করা হয় ও এই দোষের অভাবের জন্য 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' বইখানিতে উৎকর্ষ আরোপিত করা হয়; কিন্তু

রাজীবলোচনের সহিত তুলনায় রামরামের বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনা আরও জটিল। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাট-বর্ণনায় ও যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিস্ফুট করিতে রামরামের ভাষা যেরূপ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে রাজীবলোচনের ভাষাকে সেরূপ কোন দুঃসাধ্য-সাধনে ব্রতী হইতে হয় নাই। রামরামের আরবী-ফারসী শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বাংলা ভাষার পরবর্তী পরিণতির সহিত খাপ খায় নাই ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা সে যুগের বাংলা গদ্যের উপর ইসলামী প্রভাবের যথার্থ নির্দেশক—তিনি কৃত্রিম সংস্কৃত-আদর্শের পরিবর্তে তৎকাল-প্রচলিত চিঠি-পত্রে, আইন-আদালতে ও দলিলে বহু-প্রযুক্ত গদ্যধারা অনুসরণ করিয়া সৎসাহসই দেখাইয়াছেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সচেতন শিল্পিমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্যনির্মিতির ভিত্তিরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এই মুটে-মজুরের কাজেও তিনি খানিকটা সাহিত্যিক রসবোধ ও সৃষ্টির আনন্দের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের সৌন্দর্য গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহ্যহীন, অপাংক্তেয় বাংলা গদ্যের মধ্যেও কিছুটা মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দ-স্পন্দের একটা ক্ষীণ আভাস প্রবর্তন করিয়াছেন। কাদম্বরীর অলঙ্কার ও সমাস-বহুল, প্যাঁচে প্যাঁচে শৃঙ্খলিত সুদীর্ঘ বিন্যাস, বাহুল্যবর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ গঠন, সরল বিবৃতির সুষম ভঙ্গী ও অমার্জিত কথ্যরীতির নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগ—বাক্যনির্মিতির সর্ববিধ শিল্পরূপই তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন ও সর্বত্র আঙ্গিক সৌষ্ঠব লাভ করিতে না পারিলেও অধিকাংশ স্থলে অনুভূতির বেগ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার 'রাজাবলি' হয়ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ-অবলম্বনে রচিত ও ইহার ইতিহাস অনেকটা পুরাণের ন্যায় কল্পনাশ্রিত। কিন্তু গদ্যের একেবারে উদ্ভব-যুগে তিনি যে এই অপরিণত গদ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা কালানুক্রমিকভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সাহস ও গদ্যের ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় আস্থা একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-তেও তেমনি এক বিরাট জ্ঞানপরিধিকে আয়ত্ত ও প্রকাশ করিবার মহনীয় কল্পনা, দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সঙ্কল্প নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে যে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর পর্বতপ্রমাণ ভার চাপাইতেও তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। পা সময় সময় টলিয়াছে, বাঁধন মাঝে মধ্যে আলগা হইয়াছে, কিন্তু বোঝা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার বৈশিষ্ট্য

এই যুগে সুষ্ঠু গদ্যরচনার প্রধান বাধা ছিল—(১) শব্দ-নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা, (২) দুরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বোধে অনিশ্চয়তা ও (৩) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য-নিরূপণে সুমিতিহীনতা। এই ত্রুটিগুলি এতই ব্যাপক ও সাধারণ ছিল যে যে-কোন লেখকের রচনায় বিরল স্থানেও ইহাদের অভাব দৃষ্ট হইয়াছে তাহাকেই আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অঞ্জলি দিয়াছি। হয়ত ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মাঝে মধ্যে দুই একটি ত্রুটিহীন ও ভারসাম্যযুক্ত বাক্য রচনা করিয়াছেন। হয়ত এই প্রশংসা যথার্থ প্রাপ্য লেখকের নহে, বক্তব্য বিষয়েব বা অনুসৃত মূলরচনার। যিনি গভীর জলে প্রবেশ না করিয়া তীরেব কাছাকাছি থাকিয়া নিজেকে ভাসমান রাখিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা সন্তরণদক্ষ আখ্যা দিয়াছি। মৃত্যুঞ্জয় যে ইহাদের মধ্যে আংশিক ব্যতিক্রম তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গদ্যরীতির উৎকর্ষ যথার্থতঃ মৌলিক মনন ও চিন্তার স্বচ্ছতাব উপর নির্ভবশীল। যাহার সত্য সত্য কিছু বলিবার আছে সে-ই শেষ পযন্ত সুষ্ঠু প্রকাশবাহন আবিষ্কার করিবে; যাহার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে স্থিরতা আছে সে-ই বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ কবিয়া লইবে। পরবর্তী যুগে আমরা এই পথিকৃৎ-গোষ্ঠীর স্তর ছাড়াইয়া মননশীল লেখকবৃন্দের হাতে গদ্য কেমন করিয়া স্বরূপধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা দেখিতে পাইব।

এই যুগে গদ্যরচনার প্রধান বাধাসমূহ

(৩)

মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন

পদ্য অপেক্ষা গদ্যরচনার প্রসারের উপর মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব যে অনেক বেশী তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে। পদ্য স্মৃতিনির্ভর, গদ্য লেখনীনির্ভর। পদ্য লেখা না হইলেও মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। গদ্যকে লেখার স্থায়িরূপ না দিলে তাহা অচিরেই বিস্মৃত হয়। সেই জন্য মুদ্রাযন্ত্রের অভাব সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে পদ্যচর্চার বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কিন্তু গদ্যসাহিত্য মুদ্রাযন্ত্রের পাকা হরফের সূত্র ধরিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, কাব্য কবির প্রেরণাসঞ্জাত; ইহা বিশেষ উপলক্ষের মুখাপেক্ষী; ইহা নিত্য নহে, নৈমিত্তিক। গদ্য কিন্তু প্রাত্যহিক প্রয়োজনে উদ্ভূত—প্রতিদিনই গদ্য লিখিবার কোন না কোন কারণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা না পাইলে সে রচনা কেহ স্মরণ করিয়া রাখিবে না। যাহা

গদ্য-রচনায় মুদ্রাযন্ত্রের দান ও গুরুত্ব

উপযুক্ত আধারের অভাবে অচিরাৎ বিলুপ্ত হইবে সেই গদ্যরচনায় ব্রতী হইতে কোন লেখকই উৎসাহিত হন না। সেই জন্য বাঙলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রসার ও অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ছাপার ব্যবস্থা না থাকিলে, পাঠার্থীদের জোর করিয়া পড়াইবার বিধান না থাকিলে. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব গ্রন্থগুলি অলিখিতই থাকিয়া যাইত এবং হয়ত কোন অনিশ্চিত সুদূর ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানানুরাগের অন্তর-প্রেরণাতেই গদ্য-সাহিত্যের আবির্তাব ঘটিত। ছাপাখানার সুযোগ লইয়া অনেকগুলি সাময়িক পত্র আবির্ভূত হইয়া গদ্যরীতিকে পুষ্ট ও সর্ববিধ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুরের যাজকসম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রথম বাঙলা দেশে বাংলা-অক্ষবসংযুক্ত মুদ্রাযন্ত্রেব আবির্ভাব হয়। হালহেদের বাংলা ব্যাকরণ সর্বপ্রথম ছাপা বাংলা গ্রন্থ। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স্ বাংলা

প্রথম বাংলা মুদ্রা-যন্ত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থ

প্রাচীন পুঁথি ও সমকালীন বাঙালী অনুলিপিকাবদের হস্তাক্ষরের অনুকরণে বাংলা মুদ্রণের অক্ষরাবলী প্রস্তুত কবিবার ভাব লন। বাংলা অক্ষব ও যুক্তবর্ণমালা খোদাই করিবার কাজে তিনি পঞ্চানন কর্মকাবের সহায়তা গ্রহণ কবেন। উভয়ের মিলিত প্রয়াসে যে মুদ্রাযন্ত্রেব সৃষ্টি হইল তাহাই সমগ্র ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি ও বাঙালীর জ্ঞান-মনন-সাধনার মূলে।

(৪)
সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব

সাময়িক সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার মুদ্রাযন্ত্র-আবিষ্কারের অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ ফল। বই লিখিতে দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতি, বিষয়নির্বাচন, উপকরণ-সংগ্রহ,

বাংলা সংবাদপত্র-আবির্ভাবের পটভূমি

লিখিবার শ্রম ও মুদ্রণের সুযোগ-প্রতীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রস্তুতির কাল অতি সংক্ষিপ্ত ও ইহার প্রকাশ দ্রুত ও নিয়মিত। বিষয়ের জন্য ইহাকে অপেক্ষা করিতে হয় না; হাতের কাছে যে উপাদান আছে, সদ্যঃসংঘটিত ঘটনা, প্রচলিত মতবিরোধ, সামাজিক রীতি-নীতির ভালমন্দ-বিচার, কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ-পরিবেশন ইত্যাদি লঘু সামগ্রীই ইহার আলোচ্য বস্তু। অবশ্য সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন ও কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য লেখা বলিয়া ইহার রচনা সরল ও সাবলীল হওয়া

প্রয়োজন। বিশেষতঃ পণ্ডিতী ভাষাব উৎকট সংস্কৃতানুকরণ ও অনুবাদের উগ্র বৈদেশিক গন্ধ দূরীভূত না হইলে ইহাব মধ্যে জীবনবস-পরিবেশন সম্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য গদ্যচর্চার আদিযুগেব পর যখন গদ্যভাষা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিল, তখনই (১৮১৮ খ্রীঃ অঃ) প্রথম সংবাদপত্রেব আবির্ভাব। পণ্ডিত ও মুনসীরা গদ্যেব অকর্ষিত জমিব উঁচু-নীচু, ঢেলা-মাটি প্রভৃতি ভাঙিয়া কতকটা সমান করিলে সাংবাদিকেরা উহাতে মানবিক কৌতূহলেব প্রথম বীজ বপন করিতে অগ্রসব হইলেন।

বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের স্থান

কোন দেশেই সংবাদপত্র, এমন কি সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকাও, সাহিত্যেব পর্যায়ে স্থান পায় না। বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রেব স্থান নির্দেশ করিতে হইতেছে তিনটি বিশেষ কারণে—(১) গদ্যরীতির সরলীকরণে ও উন্নয়নে ইহাব উল্লেখযোগ্য অংশ আছে; (২) ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক, আক্রমণ ও জবাবের ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অবতারণা করিয়া ইহা বাঙলার মনীষা ও লিপিকুশলতাকে পুষ্ট করিয়াছে; এবং (৩) সমাজেব উৎকেন্দ্রিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাব ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন কবিয়া ইহা বাংলা বিদ্রূপাত্মক উপন্যাসের প্রেরণা যোগাইয়াছে—এখানেই সাহিত্যের সহিত ইহাব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন এই সাংবাদিকতার সূত্র ধরিয়াই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এই যুগের সাময়িক পত্রিকা

এই যুগে যে সমস্ত পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'সমাচারদর্পণ' (১৮১৮, ২৩শে মে, প্রথম সংখ্যা), (২) রামমোহন রায়-প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (সেপ্টেম্বর, ১৮২১) ও 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২১, ৪ঠা ডিসেম্বর, প্রথম সংখ্যা); (৩) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২ খ্রীঃ); ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রবর্তিত 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১, ২৮শে জানুয়ারি, প্রথম সংখ্যা)। ইহাদের মধ্যে 'সমাচার-দর্পণ'-এ খ্রীষ্টানদের কর্তৃক হিন্দুধর্মেব প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্য রামমোহনেব 'সম্বাদকৌমুদী'র আবির্ভাব। আবার সতীদাহনিবারণ-বিষয়ে রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়াতে ভবানীচরণ রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্ররূপে 'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। 'সংবাদপ্রভাকর'-এ গঠনমূলক সাহিত্য-সমালোচনা, বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যসংগ্রহ ও পূর্বকালীন কবিদের জীবনতথ্য-সংকলনের সূত্রপাত হয় ও সম্পাদকের ব্যঙ্গাত্মক কাব্য-রচনা ইহাতে প্রধান স্থান

পায়। এইরূপে সাংবাদিকতা ক্রমশঃ সাহিত্যপদবীতে আরোহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

(৫)

সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাব

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই যুগের প্রধান গদ্যলেখকগণ হয় সংবাদপত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ফলে, না হয় সংবাদপত্রের নিকট প্রেরণা পাইয়া স্বাধীন ও সাহিত্যিক গুণবিশিষ্ট গদ্যরচনায় ব্রতী হন। ইঁহাদের মধ্যে **রামমোহন রায়** (১৭৭২-১৮৩৩) বয়স ও রচনার দিক দিয়া সর্বপ্রথম। রামমোহনের গদ্যের শিল্পরূপ ও গঠনসৌষ্ঠব যে পূর্বযুগের সহিত তুলনায় সর্বত্র উন্নততর ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু নদী যেমন নিজ স্রোতোবেগের দ্বারা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া অগ্রগতির পথ করিয়া লয়, রামমোহনও তেমনি নিজ মতপ্রতিষ্ঠার ও তত্ত্বপ্রতিপাদনের আগ্রহে, নিজ নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও আবেগের ভিতরের টানে ভাষার সমস্ত আড়ষ্টতা ও পারিপাট্যের অভাবকে অতিক্রম করিয়া নিজ বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। অন্তরের ভাব ও অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক, মৌলিকতা-হীন রচনার শিথিল মাংসসমষ্টির মধ্যে তিনি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের দৃঢ় অস্থিসংস্থান সংযোজনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার ভাষা শ্রুতিমধুর না হইলেও ও সময় সময় কর্কশ হইলেও ইহার শক্তি ও আকর্ষণীয়তা অনুভূত হয়। যুক্তিনিষ্ঠ মনের স্বভাব-শৃঙ্খলা তাঁহার বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগকেও সু-গ্রথিত করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি আধুনিক অনুশীলিত মন লইয়া গদ্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার গদ্য ললিত-মধুর না হইলেও মননদীপ্ত ও ভাবের সমুন্নতিতে মর্যাদাময়।

রামমোহনের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

রামমোহনের বহুমুখী কর্মোদ্যমের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অন্যতম ছিল। তিনি প্রধানতঃ দেশমধ্যে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচলিত করিতেই ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে দেশ-বাসীর মনে প্রকৃত ধর্মচেতনা জাগ্রত করিতে যত্নবান হন। সর্ববিধ আচারমূঢ়তা ও কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজে উদার ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবর্তন করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। দেশমধ্যে ইংরেজী-শিক্ষার প্রসার ও স্বাধীনতাবোধের উদ্রেকে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনিই

রামমোহনের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস

বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁহার মানবতাবোধ দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ফরাসী বিপ্লব ও ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি যে কেবল নিজেই সাহিত্য-রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, বাঙালীর চিত্তে নূতন চিন্তা-মননের বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া উন্নত ও অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও **অক্ষয়কুমার দত্তের** (১৮২০-১৮৮৬) হাতে গদ্যভাষা আরও মননশীল ও পরিমার্জিত রূপ গ্রহণ করে। ইঁহারা উভয়েই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার (প্রতিষ্ঠা ১৮৪৩ খ্রীঃ অঃ) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অক্ষয়কুমার বিশেষ করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোচনায় রত ছিলেন। কিন্তু এই দুরূহ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে কল্পনাবিলাসেরও অভাব ছিল না তাহা প্রমাণ হয় তাঁহার 'চারুপাঠ'-এর অন্তর্ভুক্ত স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি রূপক-কল্পনার নিপুণ ও সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের গদ্য

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার রচনায় সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও অপূর্ব প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। রামমোহন রায়ের যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মচেতনা দেবেন্দ্রনাথে আবেগময় ভক্তি ও অনুভূতি-রসে আপ্লুত হইয়াছে। অথচ এই ভক্তিপ্রবণতা দৃঢ় সংযমের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া কোথাও মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতায় পর্যবসিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমার কেহই প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খলা ও নিরাবেগ তত্ত্বনিষ্ঠা ও দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে ধ্যান ও উপলব্ধির নিবিড়তা যোগ করিয়া ইহার সমৃদ্ধতর পরিণতির সূচনা করিয়াছিলেন।

বাংলা গদ্য ও ঈশ্বরচন্দ্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)—রামমোহন বাংলা গদ্যকে পরিণতির যে স্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া উহাকে পরিণতির এক উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপিত করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার হাতেই গদ্যভাষা কৈশোরের অনিশ্চয়তা ও অস্থির গতি ছাড়াইয়া পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। গদ্যের কাঠামো ও বাক্যের

ভারসাম্য ও অন্তশ্ছন্দ-স্থিরীকরণে তাঁহারই প্রভাব যে সর্বাধিক তাহা নিঃসন্দেহ। বাংলা গদ্যের জনক কে ইহা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে নানারূপ মতবাদ দেখা দিয়াছে। অবশ্য সন্তানের পিতৃত্বনিরূপণের ন্যায় ভাষার পিতৃত্ব-নিরূপণ নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কথ্যভাষার জন্ম লোকমুখে; সাহিত্যিক ভাষা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বহু জননীর স্তন্যপানে, বহু ধাত্রীর লালন-পালনে, বহু শিক্ষা-দাতার সযত্ন অভিভাবকত্বে বাড়িয়া উঠে, সুতরাং ভাষা সম্বন্ধে একজনকত্ব অপেক্ষা বহুমাতৃকত্বই অধিকতর প্রযোজ্য। মৃত্যুঞ্জয় এই নবজাত ভাষাশিশুকে সূতিকাগৃহে স্তন্য দিয়াছিলেন; রামমোহন ইহাকে কৈশোরক্রীড়ার ক্ষেত্রে আপন নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে শিখাইয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র ইহাকে পূর্ণ যৌবনের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিযা জীবনের বিচিত্র কর্তব্যপালনের উপযোগী দীক্ষায় অভিষিক্ত করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না—তাঁহার কর্মজীবন সাহিত্য ছাড়াইয়া বিশালতব সমাজক্ষেত্রে প্রসাবিত হইয়াছিল। তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজসংস্কার ও নীতিপ্রতিষ্ঠাব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যরচনা শিল্পচেতনা অপেক্ষা প্রবলতর সমাজবোধের দ্বাবাই বেশী প্রভাবিত। তিনি শিক্ষক ও সমাজসেবীর ভূমিকা হইতেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের অধিকাংশই বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক বা ভাবানুবাদ। একদিকে 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থ, অন্যদিকে 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) ও 'সীতার বনবাস' (১৮৬০)-জাতীয় অনুবাদ-গ্রন্থের ভিতর দিয়াই তিনি বাংলা গদ্যের বহিরঙ্গের সুষমা ও অন্তরের লাবণ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে তিনি মূলের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভাবপরিবর্তন সাধন করিয়াছেন ও ভাষাকে যেরূপ নিপুণতার সহিত ভাবের অনুগামী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিল্পজ্ঞান ও সমকালীন সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলা ও সীতা তাঁহার হাতে যেন আমাদের পরিবার-জীবনের স্নেহ-মমতা-লজ্জা-অভিমান প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তির অধিকারিণী বাঙালী নারীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে অনমনীয় পৌরুষ ও করুণা-বিগলিত কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহার ছাপ তাঁহার সমাজচেতনা-প্রসূত 'বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) ও তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'আত্মজীবনচরিত'-এর

স্থানে স্থানে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ ও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে তাঁহার ব্যক্তিসত্তা-প্রকাশেব কোন অবসর ছিল না—সেগুলি হইতে তাঁহাব জ্ঞান-ও-শিল্পসাধকেব রূপটিই চোখে পড়ে। কিন্তু তিনি শুধু বিদ্যাসাগব ছিলেন না, দয়াব সাগবও ছিলেন ; এবং তাঁহার অন্তবেব অপরিমেয় করুণা যখন বিরোধী শক্তির সংঘাতে গভীরভাবে মথিত হইত, তখন ইহা ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রেব রুদ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ কবিত। তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, নিস্তরঙ্গ বচনাভঙ্গী এক প্রবল আবেগেব ভাবপ্লাবনে আলোড়িত হইয়া উঠিত। তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ' গ্রন্থে যখন তিনি দেশাচাবেব নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও অনুযোগ ধ্বনিত করিয়াছেন বা তাঁহার আত্মজীবনীতে যখন তাঁহার শৈশব-স্মৃতি-পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে বাইমণিব সুধাস্নিগ্ধ মাতৃস্নেহেব কথা স্মবণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাষা লেখকের দীর্ঘকালেব অন্তঃসঞ্চিত উত্তাপে, ব্যক্তি-অনুভূতিব নিবিড় স্পর্শে যেন প্রাণময়তাব বিদ্যুৎ-শিখায় ভাস্বব হইয়া উঠিয়াছে। এই সব স্থলে তাঁহার অনবদ্য শিল্পবোধের পাষাণমূর্তি যেন জীবন্ত প্রতিমায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগরী ভাষা বঙ্কিমী ভাষাকে স্পর্শ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য

টেকচাঁদ ঠাকুর নামে পরিচিত **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৩—১৮৮৩) ও হুতোম প্যাঁচার ছদ্মনামধারী **কালীপ্রসন্ন সিংহ** (১৮৪০—১৮৭০) বামমোহন-বিদ্যাসাগব হইতে এক পৃথক পথ ও মেজাজ অনুসবণ কবিয়াছেন। প্রথমত ইঁহাদেব ভাষা চলিত ভাষা ও গুরুগম্ভীব সাহিত্যিক ভাষা হইতে শব্দে ও চালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিদ্যাসাগবী ভাষা মহৎ ও কোমল ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং শ্রুতিমধুর ও ধ্বনিপ্রবাহ-সমন্বিত হইলেও জীবনের লঘুতর দিকের, ইহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাসের ও চটুল গতিচ্ছন্দের রূপ ফুটাইবার পক্ষে অনুপযোগী ছিল। চোখের সামনে যে জীবন খেয়ালে, হুজুগে, উৎসবে ব্যসনে, রঙ্গ-কৌতুকে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহাকে যথাযথ প্রতিবিম্বিত করাব শক্তি ইহার ছিল না। গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও প্রশান্ত সৌন্দর্যসৃষ্টির বাহিরে জীবনের যে স্থূল, রসোচ্ছল অংশ আছে তাহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা দাবী করিল। প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের রচনা সেই দাবী মিটাইবার প্রয়াস হইতে উদ্ভূত। ইঁহারা বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করিয়া সর্বজনবোধ্যতার প্রয়োজনে ইঁহাদের অভিনব রীতি-প্রবর্তনকে সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্তী

আলালী ও হুতোমী ভাষা-উদ্ভবের পটভূমি

যুগে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষাকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে উপস্থাপিত করিয়া উভয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণেই যে আদর্শ গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এই অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন ও নিজের রচনায় উহা হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনেব দিক দিয়া বিচাব করিলে আলালী ও হুতোমী ভাষা কেবীব 'কথোপকথন', মৃত্যুঞ্জয়ের লঘু রচনা 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস'-এর ভাষাব পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ। বাংলা গদ্যের উদ্ভব-যুগ হইতে যে দুই ধাবা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছিল, উহাদের মধ্যে কথ্যধারা বামমোহন-বিদ্যাসাগরেব নবসৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষাব প্রবলতর প্রভাবেব নিকট সাময়িকভাবে পবাজয় স্বীকাব কবিয়াছিল। এখন অনুকূল উপলক্ষ্য পাইয়া ইহা আবার মাথা তুলিল ও ব্যাপকতব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ বিস্তার করিল। আলালী-হুতোমী ভাষাব যথার্থ অভিনবত্ব রচনা-রীতিতে নহে, নূতন 'উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ইহার বলিষ্ঠ প্রয়োগে।

আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম প্যাঁচাব নক্সা-র বৈশিষ্ট্য

টেকচাঁদ-হুতোমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল বাস্তব জীবন-চিত্রণে ও গল্পরসের অনুশীলনে। বামমোহন-বিদ্যাসাগব আদর্শের মানদণ্ডে জীবনের বিচার কবিয়াছেন; তাঁহাবা জীবনেব বস পরিবেশন করেন নাই। রামমোহনে গল্প একেবারেই নাই; বিদ্যাসাগরে যাহা আছে তাহা যৎসামান্য ও অন্যেব ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। 'আলালের ঘবেব দুলাল' (১৮৫৭) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২) ঘটনার ভিতর দিযা চবিত্র-চিত্রণে ও জীবনেব বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশেব রসসিক্ত বর্ণনায় ঔপন্যাসিক আদর্শের সচেতন অনুসবণ করিয়াছে। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' খণ্ডচবিত্রের সমষ্টি—তৎকালীন কলিকাতার গাজনেব সং, যাত্রাগান, রথ-যাত্রার সমাবোহ, বিবিধ হুজুক উপলক্ষে কৌতূহলী জনতার ভিড়, প্রাচীনকালের রীতি-অনুষ্ঠান, নানাপ্রকাবের ভণ্ডামি ও ইতর আমোদ প্রভৃতির কৌতুকপূর্ণ ও বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দিয়াছে—ইহাতে ব্যক্তিচরিত্র-অঙ্কনের বা সমগ্র গল্প বলিবার কোন চেষ্টা নাই। সুতরাং ইহা ব্যঙ্গাত্মক সমাজ-চিত্র, উপন্যাস নহে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ঐক্যবদ্ধ ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে একটি পরিবারের কয়েকটি লোকের ভাল-মন্দের, উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত গৌণ চরিত্র ঘটনায় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছে ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবন-যাত্রার ধারা-ধরন, উহার শিক্ষা, বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বড় মানুষের

মোসাহেব-পরিবৃত, আড়ম্বরপূর্ণ, অসার কালক্ষেপ—ইহাদের একটি কৌতুকোজ্জ্বল ছবি আঁকা হইয়াছে। 'নববাবুবিলাস'-এর বাবু-চরিত্র এখানে একটি অর্ধ-শরীরী কল্পনা হইতে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভবানীচরণের রচনায় মানুষ গৌণ, সমাজচিত্র মুখ্য; প্যারীচাঁদের ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান মর্যাদা, ব্যক্তি সমাজের ভিড়ে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই। এমন কি মোসাহেব-জাতীয় গৌণ চরিত্রগুলিও—বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, ঠক চাচা—শুধু উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-মাত্র নহে, তাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। ভবানীচরণের সঙ্গে প্যারীচাঁদের আর একটা পার্থক্য এই যে ভবানীচরণ কেবল সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতিই দেখিয়াছেন; কিন্তু প্যারীচাঁদ বরদাচরণ ও রামলালের মধ্য দিয়া সমাজনীতি ও জীবনাদর্শের একটা উন্নততর পুনর্গঠনের সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা কেবল যে উচ্ছন্ন যাইবার পথেই ঠেলিয়া দেয় না, ইহা যে উচ্চতর সমাজচেতনা ও নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করে এই আশাবাদী অভিজ্ঞতা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও বাঙলার নৈতিক জীবনের চল্লিশবর্ষব্যাপী ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের ভিতর দিয়াই যে লেখকের মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

আলালী ও হুতোমী ভাষার তুলনা

'আলালের ঘরের দুলাল' যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয় নাই, ইহার প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ভাল করিয়া ফোটে নাই, ইহার জীবন-চিত্রণ যে তরল কৌতূহল ও সুলভ নীতিবাদের দ্বারা অযথা ভাবে প্রভাবিত তাহা যেমন সত্য, তেমনি ইহা যে উপন্যাস-রচনার দিকে সার্থক অগ্রগতি তাহাও তেমনি সত্য। 'আলাল' সম্পূর্ণ উপন্যাস হয় নাই বলিয়া ইহাকে যদি খারিজ করিতে হয়, তবে মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহনের অপটু ও অসম্পূর্ণ গদ্যরচনা-প্রয়াসও অনুরূপ কারণে বর্জনীয়। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন উভয়ের মধ্যে কথ্যভাষা-প্রয়োগে কে অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে তাঁহাদের আপন আপন উদ্দেশ্যের উপর। প্যারীচাঁদ একটা গভীর বিষয়, জীবনের একটা চিরন্তন নীতিকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন—কাজেই তাঁহার রচনারীতির মধ্যে বিষয়ানুরূপ খানিকটা গাম্ভীর্য থাকিবেই। তিনি হালকা সুরের চরম পর্যায়ে নামিতে পারেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সুরু হইতেই ফষ্টি-নষ্টি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কলম ধরিয়াছেন—কোন সামগ্রিক জীবন-নীতি বা ভাল-মন্দ আচরণের নৈতিক ফলাফল ফুটাইয়া তোলা তাঁহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত ছিল। তিনি হোলিখেলার কর্দমাক্ত আবীরের পিচকারী

হাতে আসরে নামিয়াছেন—অবশ্য যাহাদের কাপড়-চোপড়ে এই কাদা-মাখা রং ছড়াইয়াছেন তাহাদেব নীতির বিচারে অপদস্থ করাও তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে নৈতিকতা একেবারেই গৌণ। সুতরাং তিনি ভাষাকে যতটা হালকা ও ইতবতা-দুষ্ট করিতে পারিয়াছেন প্যারীচাঁদের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। উভয়ের গ্রন্থের ও গ্রন্থকারেব নামকরণেই উভয়ের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা পবিস্ফুট। টেকচাঁদেব মধ্যে খানিকটা সম্ভ্রমবোধ আছে, হুতোম প্যাঁচা নিজের ছদ্মনাম-গ্রহণে যেরূপ, সেইরূপ তাঁহার বচনারীতিতেও সমস্ত মর্যাদাবোধকে হাসি-হুল্লোড়েব আবিল জোয়ারে ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাব শক্তি, ব্যঙ্গপ্রয়োগ-নিপুণতা অনস্বীকার্য, কিন্তু তিনি খোলাখুলি ভাঁড়ের অংশ অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া পোশাক-পবিচ্ছদে শালীনতার আদর্শ বেপরোয়াভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। ভবিষ্যতেব বাঙলায় আলালের উত্তবাধিকারী পাওয়া যায় ; হুতোমেব উত্তরাধিকাবিগোষ্ঠী সাহিত্যসভা ত্যাগ করিয়া নিছক ইতর-জনের আসরে, বড়তলায় ছাপা কুরুচিপূর্ণ পুস্তিকায় নামিয়া পড়িয়াছে।

৩

এই যুগের গদ্যরচনার বিভিন্ন নমুনা

(১)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যের আদর্শ

(ক) এজন্য যজ্ঞদত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্যবক্ষার কাবণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে রাজাধিরাজদের যেমন প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেইমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে। যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়েব প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া কহে এ কি আশ্চর্য।

—বত্রিশ সিংহাসন

(খ) ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে ; সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। সেই ভূপতি এক সময় কাহার-ও কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন। তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু, ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর

যৌবন, ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকে-ও অনর্থের নিমিত্ত হয় ; যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না।

—হিতোপদেশ

(২)

কেরী সাহেবের গদ্যের আদর্শ

দুই বৎসব পূর্ণ হইলে এত মত হইলে ফারোঙা স্বপ্ন দেখিলেন। দেখ সে ডাণ্ডাইয়াছে নদীব কিনারায়ঃ দেখ নদী হইতে উঠিল সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভী ও চরিতে লাগিল ধাবের উপব, তাহার পবে আব সাতটা গাভী উঠিল নদী হইতে বড কুচ্ছিত আব কৃশা, পরে নদিতীবে ডাণ্ডাইল আর সকল গাভীর কাছে, অতঃপর কুচ্ছিত কৃশা গাভীবা খাইয়া ফেলাইল সেই সাতটা সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গাভীদিগকে। তখন ফাবোঙাব চৈতন্য হইল।

—বাইবেলের অনুবাদ

(৩)

রামমোহন রায়ের গদ্যরচনার আদর্শ

নিন্দা ও তিরস্কারেব দ্বারা অথবা লোভপ্রদর্শন দ্বাবা ধর্মসংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচাবসহ হয় না। তবে বিচাববলে হিন্দুব ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতবাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন কবিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ দেওয়া হইতে সমাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেব ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচাব হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকাবকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমন নিয়ম নহে।

—ব্রাহ্মণ-সেবধি, রামমোহন রায় (১৮২১)

(৪)

দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আদর্শ

তাহার পর ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া চলিতেছি, এমন সময় প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ডাঙ্গার দিকে লইয়া গেল। ডাঙ্গায় তো

আসিল, কিন্তু প্রতিকূল ঝড় গঙ্গার উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙ্গে, আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। আমি সেই দোলায়মান বোট হইতে উঠিয়া পাড়েব উপর দাঁড়াইলাম। সেখানে ভূমি যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির; চড়াব বালু যেন ছিটাগুলির মত আমার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা মোটা চাদব গায় দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার সেই প্রমত্ত ভীষণ মূর্তির মধ্যে সেই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গের পানসী-খানা সকল আহারীয় সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া গেল।

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
আত্মজীবনী, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(৫)

অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যরচনার আদর্শ

আমি বিদ্যাধরীর এই আশ্বাসবাক্য বিশ্বাস কবিয়া, পরম পুলকিত চিত্তে তাঁহার অনুবর্তী হইবামাত্র পর্বত-শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশীধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। আহা! সেই সুধাময় মধুর রব যাহাদেব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের চিত্তভূমিতে অনির্বচনীয় আনন্দ-নীর নিঃসৃত ও আশ্চর্য উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল এমন প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল, যেন তাহারা মরণ-ধর্মশীল মানবস্বভাব অতিক্রম করিয়া অমরভাব প্রাপ্ত হইতেছে।

—চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ

(৬)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার আদর্শ

(ক) এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

—সীতার বনবাস, প্রথম পরিচ্ছেদ

(খ) ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস।

তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায়-অন্যায়-বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্র-ও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে; অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।

—বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক

(৭)

আলালী গদ্যরচনার আদর্শ

"শ্যামের নাগাল পালাম নাগো সই—ওগো মরমেতে মরে রই—" টক্-টক্-পটাস-পটাস্ মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিটকারী দিতেছে ও শালার গরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটা হন হন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটে। ঘোড়ার বাবা—পক্ষিবাজের বংশ—টঙস টঙস ডঙস্ ডঙস্ করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুটা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ীর হেঁকোঁচ-হেঁকোচে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

—আলালের ঘরের দুলাল

(৮)

হুতোমী গদ্যরচনার আদর্শ

দত্ত বাবুর গাড়ী রুন্থু রুন্থু ছুন্থু ছুন্থু করে মুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগলো। দত্তবাবু তড়াক করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে দারোয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ীর দারোয়ানেরা খোদ-হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক। "হোরির বক্সিস্" "দুর্গোৎসবের পার্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামী" দিয়ে-ও মন পাওয়া ভার। দত্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবুলে একজন দারোয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন।

—হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কলিকাতার বারোয়ারী পূজা

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাটক ও নাট্যশালা

নাটকের প্রথম উৎস

(১)

কবি, পাঁচালী, যাত্রা ইত্যাদি

পূর্ণাঙ্গ নাটকের আবির্ভাবের পূর্বে গীত-প্রধান আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার প্রথম বীজ নিহিত থাকে। প্রথম প্রথম হস্তলিখিত পুঁথির অনুলিপি যখন খুব অল্প সংখ্যায় পাওয়া যায় ও অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকও খুব বিরল, তখন আবৃত্তির মাধ্যমেই তাহাদের কাহিনী শ্রোতার গোচর করা হয়। কাব্যের যে সমস্ত অংশে নাটকীয় রসের স্ফুরণ হইয়াছে বা জোরাল উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্বারা নাট্য-সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাদের আবৃত্তির সুরেই উদ্‌গাতার অজ্ঞাত-সারে অভিনয়ের ক্ষীণ পূর্বাভাস শোনা যায়। কাব্যের অন্তর্নিহিত বীররস ও করুণরস এই প্রকারে ভাবস্ফুরণদক্ষ কণ্ঠের সহযোগিতায় শ্রোতার চিত্তে অভিনয়-তৃপ্তির আস্বাদন জাগায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আদিযুগের কাব্যই নাটকের প্রথম উৎস। লেখক ও শ্রোতৃমণ্ডলী এইরূপ পরোক্ষভাবে নাট্যরস-উপলব্ধিতে অভ্যস্ত হইলে ধীরে ধীরে কাব্যের মধ্যেই সচেতনভাবে নাটকীয়তা-স্ফুরণের চেষ্টা হয়। আবার সাহিত্য ছাড়াও লৌকিক নৃত্য-গীত-অঙ্গভঙ্গীর ভাবপ্রকাশিকা শক্তির ভিতর দিয়া নাটকের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে পারে। দেব-পূজা বা গণ-উৎসব উপলক্ষ্যেও পূজা বা উৎসবের সহিত সম্পৃক্ত কোন বিষয় লইয়া মুখে মুখে নাটকীয় দৃশ্যরচনার দ্বারাও জনগণের নাট্যরস-পিপাসার কিছুটা পরিতৃপ্তি-সাধন সম্ভব। এই ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া বহু বিলম্বে, হয় অন্য সাহিত্যের অনুসরণে কিংবা নিজদেশীয় প্রেরণার বলে, নিজস্ব-আঙ্গিক-বিশিষ্ট নাটকের উদ্ভব হয়। কিন্তু সব দেশেই নাটক অতীত ঐতিহ্যের প্রভাব বহন করে। বহিরবয়বে ইহা সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেও ইহার অন্তঃপ্রকৃতিতে গীত ও কাব্যের অনুপ্রেরণা, ভাবোচ্ছ্বাসের অসংযত আধিক্য চিরকালই সক্রিয় থাকে।

নাটকের প্রথম উৎস : আদিযুগের কাব্য

বিশেষ করিয়া বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে জন্ম-ইতিহাসের উপরি-উক্ত স্তরগুলি উদাহৃত হইয়াছে। যদিও ইহার সামনে সংস্কৃত সাহিত্যের সুপরিণত, উৎকৃষ্ট নাটকের প্রচুর দৃষ্টান্ত উপস্থিত ছিল, তথাপি সংস্কৃত অনুসরণের পথে ইহার আবির্ভাব ঘটে নাই। ইহা ঘুরপথে পাক খাইতে খাইতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জাতীয় চেতনা-সংহতি, গৌরবময় কর্ম-প্রেরণা ও পরিণত রসবোধ থাকিলে সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্য উদগ্র আগ্রহ জাগে, বাঙালী-জীবনে সেরূপ পরিণতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত লক্ষ্যগোচর হয় না। আধুনিক কালেও উন্নত নাটকীয় আদর্শের উপযোগী জীবনাকৃতি বাঙালার মধ্যে জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, নাটকের ক্ষেত্রে, জীবন-প্রস্তুতির অভাবের জন্যই হউক বা বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতের জন্যই হউক, তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া আছি ইহা সর্বসম্মত সত্য।

বাংলা নাটকের দুর্বলতা

বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদিলগ্নে, 'চর্যাপদে' আমরা বুদ্ধনাটক, তৎ-সম্পর্কিত নৃত্য-গীত ও নটপেটিকা অর্থাৎ অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার বাক্সের কথা শুনি। ইহা সম্ভবত বুদ্ধজীবনীর কোন কোন অংশকে নাটকীয় রূপ দিবার প্রচেষ্টা এরূপ অনুমান করা যায়। বাংলা সাহিত্যে নাটকীয় অঙ্কুরের প্রথম বিকাশ হইল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া। এই প্রেম লইয়া যে আদিকবিরা কাব্য রচনা করিয়াছেন—জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি—সকলেই ইহার মধ্যে নাটকীয়ত্বের আরোপ করিয়াছেন। এ প্রেমের রসবৈচিত্র্য, ঘটনাপ্রবাহ ও আবেগসংঘাত এত প্রচুর ও বেগবান যে ইহা কাব্যের চিত্রিত ঘট হইতে নাটকের তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অনিবার্যভাবে উপচাইয়া পড়ে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমনিবেদনে তাই সংলাপ ও গভীর চিত্ত-মন্থনের পরিমাণ এত বেশী। বিশেষত এই মধুর প্রেমকাহিনী এত জনপ্রিয় হইয়া পড়িল, পণ্ডিত ও আনুষ্ঠানিক ভক্তের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া আপামর-সাধারণের মধ্যে এত বিস্তৃতিলাভ করিল যে শুধু কাব্যের সুললিত ঝঙ্কার ও রসনিবিড় বর্ণনা শুনিয়া অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতদের তৃপ্তি হইল না। তাহারা এই আদর্শ প্রেমিকযুগলকে ও তাঁহাদের ছলনা-মধুর, বাধা-বিঘ্নে উদ্বেল, বেদনায় মর্মস্পর্শী ও উচ্চতর ভাবব্যঞ্জনায় রহস্যময় ও ধর্মসাধনার ইঙ্গিতবাহী এই প্রণয়লীলাকে নাটকের প্রত্যক্ষতায় দর্শন ও অনুভব করিতে চাহিল। তাই প্রাক্-চৈতন্য যুগের জয়দেব ও বিদ্যাপতি রাজসভার কবি হইয়াও

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে নাটকের মূল

তাঁহাদের বর্ণাঢ্য কাব্যে নাটকীয় গতিবেগ, দুর্বার আবেগের অকৃত্রিম সুর সঞ্চার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে —ইহার কাব্যগুণকে ছাপাইয়া ইহার নাট্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড প্রভৃতি সংঘাতমূলক আখ্যান সংযোজনা করিয়া ইহার নাটকীয় আবেদনকে ঘনীভূত করিয়াছেন। নাটকের যে প্রধান লক্ষণ—প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীব মুখে চবিত্রানুযায়ী ভাষার আরোপ—তাহাও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই-এর সংলাপের মধ্যে চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'কে শুধু কাব্য না বলিয়া গীতিনাট্য বা নাটগীতি বলাই অধিকতর সঙ্গত।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তব যুগে নাটকের লক্ষণ আবও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। চৈতন্যদেব নিজে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে এত বিভোর ছিলেন যে তিনি সর্বদাই এই প্রেমলীলাব অনুধ্যান ও অভিনয় কবিতেন। তাঁহার দিব্যোন্মাদ তাঁহার এই ভাবতন্ময়তারই বহিঃপ্রকাশ। অভিনেতা যেমন অভিনীত চবিত্রেব সঙ্গে একাত্মতা অনুভব কবে, চৈতন্যদেবও তেমনি আপনাকে বাধা বা কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি মনে করিয়া নিজ ব্যক্তিসত্তাই বিস্মৃত হইতেন। আমবা চৈতন্য-জীবনী হইতে জানিতে পারি যে তিনি একাধিকবার কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই অভিনয় কতখানি প্রাচীন যাত্রার পূর্বাভাস তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কিন্তু অভিনয়-প্রেরণা হইতে নাটকেব রূপকল্প উদ্ভূত হয় বলিয়া এই সময় যে নাট্যাঙ্গিকের আদর্শ কিছুটা স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। চৈতন্যযুগে তৎপ্রচাবিত প্রেমধর্মের প্রভাবে জাতীয় জীবনে যে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল তাহা নাটক-রচনার উপযোগী পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব'ও 'বিদগ্ধমাধব' নামে কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত দুইটি নাটকে ও কবি কর্ণপুরের চৈতন্যলীলা-বিষয়ক 'চৈতন্য-চরিতামৃত' নাটকে। এই নাটক তিনখানি সংস্কৃত ভাষায় ও নাট্যাদর্শে রচিত বলিয়া উহাদের বাংলা নাটকের উদ্ভবে বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। উহারা কেবল যুগের নাটকপ্রবণতার নিদর্শন ও কোন কোন মৌলিক নাট্যধারা, বিশেষতঃ প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা এই উৎস হইতে ভাবপ্রেরণা ও কিছু কিছু আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে নাট্যধারা

চৈতন্যদেব যেমন কৃষ্ণলীলার মূর্ত অভিনয়-বিগ্রহ ছিলেন, তেমনি চৈতন্যলীলাও আমাদের অন্তরে নাট্যাবেগের আলোড়ন জাগাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণকে যেমন আমরা চৈতন্যদেবের আবেগ-বিহ্বল অনুভূতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে ও তাঁহাদের লীলাবিলাসকে নাট্যকলার বিষয়রূপে অনুভব করিতে শিখিলাম, তেমনি চৈতন্য-জীবনও —বিশেষতঃ তাঁহার জগাই-মাধাই উদ্ধার ও সন্ন্যাসগ্রহণ আমাদের মনে নাট্যমুক্তির উপযোগী আবেগ সঞ্চার করিল। বোধ হয় 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' যাত্রা-পালার আদিম প্রেরণা চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তী যুগ হইতে উদ্ভূত। ইহাদের লিখিত রূপ হয়ত লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই ধারা যে অষ্টাদশ শতকের নাট্যপ্রচেষ্টার পিছনে প্রবহমাণ এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণযাত্রা ও নিমাই-সন্ন্যাস যাত্রা

কিন্তু কার্যতঃ আমরা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক পাই নাই, পাই গীতিকবিতার মধ্যে নাট্য-ইঙ্গিতের ফল্গুপ্রবাহ। পদাবলী সাহিত্যের পালা-বিভাগ, নায়ক-নায়িকার মানস অবস্থা অনুযায়ী পদবিন্যাস, মান-অভিমান-বিষয়ক পদে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক সংলাপের প্রাধান্য, সখী ও দূতীর মুখে তীক্ষ্ণ অভিযোগের আরোপ, কীর্তনিয়াদের আখরের সাহায্যে অন্তর্নিহিত ভাব ও অস্ফুট সংঘাতের পরিস্ফুটন—এ সমস্তই এক সর্বব্যাপী নাটকীয় পরিবেশের দ্যোতক। কোন কোন সমালোচক* মনে করেন যে এই আঁখরের সম্প্রসারণ ও গায়কের তত্ত্বব্যাখ্যা ও মন্তব্যের সংযোজনার মাধ্যমে কীর্তন হইতে যাত্রার উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

কীর্তন হইতে যাত্রার উদ্ভব

২

মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই এই অভিনয়প্রবণতা, সুরসংযুক্ত আবৃত্তির দ্বারা রস-সঞ্চার-প্রয়াস বাঙালীর নাট্যকৌতূহলের সাক্ষ্য দেয়। ইহার সঙ্গে নৃত্য ও গান নাট্যরস-স্ফুরণের সহায়তা করিয়াছে। চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গলে আখ্যায়িকার সরল প্রবাহ ও ঘটনার ত্বরিত গতি বিশেষ একটি নাটকীয় মুহূর্তকে জমাট বাঁধিবার অবসর দেয় নাই। কিন্তু 'মনসামঙ্গল'-এ চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বৈরথ সংগ্রাম ও বাসরঘরে সন্তঃ-

মঙ্গলকাব্যে নাটকীয়তা

* বঙ্গসাহিত্যে নাটকের ধারা—বৈদ্যনাথ শীল

পতিহারা বেহুলার স্তম্ভিত-করা দুর্ভাগ্য সুস্পষ্ট নাটকীয় আবেদন লইয়া আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত করে। বেহুলা ও চাঁদসদাগরের বিষয়ে আধুনিক কালে যে সব নাটক লেখা হইয়াছে তাহাদের মধ্যযুগীয় কোন পূর্বরূপ ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই, তবে এইজাতীয় আবৃত্তির মধ্যে জনসাধারণের কাব্যরস অপেক্ষা নাট্যরস-পিপাসাই যে অধিক নিবৃত্তি লাভ করিত এরূপ অনুমান করা চলে।

রামায়ণ-মহাভারতের নাট্যরূপ-গ্রহণে বিলম্ব

রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি হইতে বর্তমান যুগের নাটক অনেক উপাদান সংগ্রহ করিলেও মধ্যযুগে ইহারা যে বিশেষ নাটকীয় প্রেরণা যোগাইয়াছে এরূপ কোন নিদর্শন নাই। এগুলি পাঁচালী-কাব্যরূপে অভিহিত হইয়াছিল। ইহাদের সুবসংযোগে আবৃত্তি করার প্রথা অবশ্যই ছিল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেদনের প্রাধান্য ও আদ্যন্ত সমগ্র কাহিনীর প্রতি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হওয়ার জন্য কোন বিশেষ ঘটনার নাট্যসম্ভাবনা হয়ত দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যকথার অত্যন্ত জনপ্রিয়তাব জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, রামায়ণ-মহাভাবতের নাট্যরূপায়ণের জন্য আমাদিগকে উনবিংশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

নেপালে আবিষ্কৃত চারিখানি নাটক সপ্তদশ শতকের কাছাকাছি বাংলা যাত্রা-গানের মিশ্রপ্রকৃতি ও আঙ্গিক-শিথিলতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।

প্রথম বাংলা নাটক

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর নাট্যরূপ বাংলা নাটকের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গীত ও অশ্লীলতা সমান মাত্রায় মিশ্রিত। ইহার 'গীতাভিনয়' নামই ইহাব মধ্যে গীতি-প্রাধান্য সূচিত করে।

পাঁচালী ও প্রাচীন যাত্রার মধ্যে নাটকীয় উপাদান ও আদর্শ কতটা ছিল তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। নাটক-প্রসঙ্গে কবিগানের উল্লেখ

কবিগান ও নাটক

নাটকের গীতিপ্রাধান্য ও গীতোদ্ভবতার আর একটি নিদর্শন। বাস্তবিক কবিগানের মধ্যে খানিকটা অসংলগ্ন ও যদৃচ্ছাপ্রবর্তিত কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কোন নাটকীয় লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুই প্রতিযোগী কবির দলপতি দুই বিভিন্ন অথচ পরস্পর-সম্পর্কিত চরিত্র রূপে আবির্ভূত হইয়া চরিত্রানুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি করিতেন ও শ্লীলতাহীন আক্রমণের দ্বারা পরস্পরকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

এই অংশ-অভিনয় ও চরিত্র-সঙ্গত বাক্যযোজনাব জন্য কবিগানের মধ্যে নাটকের ঈষৎ স্পর্শ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার সহিত আসল নাটকের যোগসূত্র অতিশয় ক্ষীণ। কবিগান প্রকৃতপক্ষে কাব্যশাখারই অন্তর্ভুক্ত।

কবিগানের উদ্ভব ও বিস্তার

ঈশ্বর গুপ্তের মতে কবিগানেব উন্মেষ-কাল অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে। তখনও কলিকাতাব নাগবিক জীবন আবম্ভ হয় নাই। সুতবাং রবীন্দ্রনাথের অভিমত—যে, কবিগান নাগবিক প্রতিবেশে উদ্ভূত হইয়াছিল ও হঠাৎ-ধনী কলিকাতার ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীব মনোবঞ্জনেব জন্য গাওয়া হইত—সম্পূর্ণ গ্রহণীয় মনে হয় না। গ্রামীণ পবিবেশের চিহ্ন ইহাব ভাবানুপ্রেরণাব মধ্যে অতি-পরিস্ফুট। সব কবিওয়ালাই কলিকাতাব অধিবাসী ছিলেন না। অবশ্য উঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দুই জনেব—হরু ঠাকুব ও বাম বসুর—নিবাস কলিকাতাতেই ছিল। তবে ইহা সত্য যে বাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ অভিজাত-বংশীয়দেব রুচিসমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পববর্তী যুগে কবিগানেব আসব কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কিন্তু সে কলিকাতা আধুনিক কালের যান্ত্রিক ও সমাজসংহতিরিক্ত কলিকাতা নয়; উহা ছিল গ্রাম্য সমাজেবই সম্প্রসারিত সংস্কবণ।

কবিগানের লৌকিক অংশ

কবিগানেব প্রধান উৎস ছিল রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অধ্যাত্মভাব-বর্জিত, স্থূল-দেহাসক্তি-প্রধান লৌকিক অপভ্রংশ। যখন এই প্রেমের বস ইতবজন-সাধারণের আসবে অশিক্ষিত-পটু, স্বভাব-নির্ভর কবিসম্প্রদায় কর্তৃক পবিবেশিত হইতে লাগিল, তখন যে উহা রুচিতে বিকৃত, অতিমাত্রায় লঘু-তবল ও কাব্যগুণে নিকৃষ্ট হইবে ইহা স্বাভাবিক। আসবে মুখে মুখে ও হঠাৎ-প্রয়োজনের তাগিদে যে সমস্ত গান রচিত হইত তাঁহারা যে ক্ষণজীবী হইবে ইহাতেও আশ্চর্যের কিছু নাই। যখন কথা-কাটাকাটি কবিগানে প্রধান হইয়া উঠিল ও ইতব শ্রোতৃবৃন্দের রুচির সমর্থন পাইল তখন উহার কবিত্বও যে উপিয়া যাইবে তাহাও অনিবার্য। কিন্তু তথাপি যে সমস্ত কবিগান কালেব শাসন এড়াইয়া আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাদের ভাবের সরল আন্তরিকতা ও কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে লজ্জিত হইবার কিছু নাই। বরং বাঙলা দেশে যে এত উচ্চদরের স্বভাবকবি ছিলেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কবিগান সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী ধারণা স্পষ্ট করিয়া

লইবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিগানের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত "স্থূল, মূঢ় ও রূঢ়" ছিল কালের আগুনে তাহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কবির আসরে সদ্যোরচিত যে সমস্ত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ গান ইতর শ্রোতাদের আনন্দ দিত ও সুরুচিসম্পন্ন সমালোচকদেব দ্বাবা তীব্র ভাষায় নিন্দিত হইত তাহারা কিছুদিন লোকের স্মৃতিব মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া এখন বিস্মৃতিব গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ছাপার অক্ষবে তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। অশ্লীল কবিগানেব দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগেব ব্যক্তিরা বোধ হয় বিশেষ উদ্ধৃত করিতে পাবিবেন না। উহার যে সমস্ত নমুনা মুদ্রিত আকারে আমাদের নিকট পৌছিযাছে ও চিরন্তন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে রুচিবিকার ও অশালীনতাব অভিযোগ প্রযোজ্য নহে। তাহাদের বিরুদ্ধে বড়জোর গঠনের শিথিলতা ও অতিভাষণ-প্রবণতার অভিযোগ কবা যাইতে পাবে। গোঁজলা গুঁই-এর 'এসো চাঁদবদনি', বাসু-নৃসিংহের 'কহ সখি কিছু প্রেমেবি কথা,' কেষ্টা মুচির 'হবি কে বুঝে তোমার এ লীলে,' রাম বসুব বিরহের গান, কিছু কিছু আগমনী ও বিজয়া গান—এ সবই উচ্চাঙ্গেব কবিত্বসম্পন্ন ও আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শী। বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাসংগ্রহে এগুলি স্থান পাইবার উপযুক্ত। মনে হয় এইজাতীয় গান আসবে বচিত হয় নাই; কবির নির্জন অনুভূতি ইহাদের উৎস। রাম বসুব আগে কবিগানে বাগ্‌যুদ্ধের প্রথা পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৎপূর্বে পালাব উপযোগী গান বাঁধিয়া আনিয়া আসরে গীত হইবাব বীতি ছিল। কবিব শ্রেষ্ঠ গানগুলি এই পূর্বচিন্তনেরই ফল বলিয়া মনে হয়।

কবিগানের কাব্যোৎকর্ষ

কবিওয়ালাদের গানে আব একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব লক্ষণীয়। ইহাদের গানে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার সুর শোনা যায়। পদাবলী সাহিত্যের প্রেমগীতিব পিছনে কিছু মানবিক অনুভূতি ছিল কি না সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। যদি বা ইহার মূলে কবির কোন ব্যক্তিগত বা সমাজ-সম্ভব আবেগ ছিল, ধর্মবোধের ঘন প্রলেপে তাহা চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে যখন এই প্রলেপের আবরণ ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন সমাজ-মনের নবোদ্ভিন্ন আবেগ-আকূতি বৈষ্ণবসাধনার ভাববৃত্তকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। কবিগানে যদিও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের রূপক ও চিত্র বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি

কবিগানে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার সুর

মনে হয় যে ইহার প্রেমবর্ণনায় এক অনভ্যস্ত, বাস্তবজীবন-সম্ভব উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছে। রাম বসুর বিরহ-গীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর বিরহের প্রতিধ্বনিমাত্র নহে; ইহাব মধ্যে রাধাকৃষ্ণেব নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। মনে হয় যে কৌলীন্যপ্রথা-প্রচলনের ফলে বাঙলার উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতি পরিবারে যে বিচ্ছেদজ্বালা, স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা, পিতৃসংসারে অবজ্ঞাতা নারীব মর্মবেদনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহাই যেন এই গানের রন্ধ্রপথে চাপা সুরে উদ্‌গীরিত হইয়াছে। বাংলা গীতিকবিতা উনবিংশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম হইতে লোক-জীবনে অবতরণ করিয়াছে, সেই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা কবিগানেই পাওয়া যায়। কবিগানে যাহা মবণীয় তাহা মরিয়া গিয়াছে; যাহা স্মবণীয় তাহাই অবশিষ্ট আছে। সুতবাং কবিগান সম্বন্ধে আমাদের যে মুরুব্বিয়ানার মনোভাব তাহা বর্জন কবিয়াই ইহার শাশ্বত মূল্যাবধারণ কর্তব্য।

পাঁচালী ও দাশরথি

পাঁচালী ও যাত্রাগানের আদিরূপ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। মধ্যযুগে সমস্ত আখ্যায়িকা-কাব্যকে 'পাঁচালী' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হইত। রামায়ণ মহাভাবতকে শ্রীরাম-পাঁচালী ও ভারত-পাঁচালী বলা হইত। পাঁচালীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনিশ্চিত; তবে ইহার প্রয়োগগত অর্থ এই বিবাট আখ্যান-কাব্যগুলি যে গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল তাহারই নির্দেশ দেয়। উনবিংশ শতকেব মাঝামাঝি দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৮) হাতে যে নবপর্যায়ের পাঁচালী প্রবর্তিত হয় তাহা গীতিপ্রধান ও কবিগানের উন্নততর, শিল্পগুণান্বিত সংস্কবণ। এই পাঁচালীর গীতিগুলি অলঙ্কার-যমক-প্রাচুর্যে ও শ্লিষ্ট উক্তির বহুল প্রয়োগে চমকপ্রদ; ইহারা পালাকারে গ্রথিত বলিয়া ইহাদের পিছনে একটা আখ্যায়িকার যোগসূত্র বর্তমান। দাশরথি প্রাচীন ভক্তিরস-উদ্বেলতার শেষ কবি। আদি পাঁচালীর আখ্যায়িকার পিছনে সুর ও গানের গৌণ সংযোগ ছিল; দাশরথির পাঁচালীর ক্ষেত্রে গীতপরম্পরার পিছনে যাত্রাপালার অবিচ্ছিন্ন আখ্যানধারা প্রবাহিত। বাঙালী কবির ভাবকেন্দ্র যে আখ্যায়িকা হইতে গীতিকবিতায় সরিয়া আসিয়াছে, পাঁচালীর রূপান্তরে তাহাই প্রমাণিত।

(২)

নাটক-রচনার সূত্রপাত

বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার নাটক আসিল ইহার পূর্ব-প্রবণতার স্বাভাবিক পরিণতিরূপে নহে, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের সচেতন অনুকরণ ও বিলাতী

রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জার আকর্ষণে। বস্তুতঃ বাঙলার সমাজ-পটভূমিকায় আগে আসিয়াছে রঙ্গমঞ্চ, পরে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অভিনয়-যোগ্য নাটকের সন্ধান হয়। এইভাবে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া আধুনিক নাটক বিপরীত-মুখী হইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে।

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটকের উদ্ভব

১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামে রুশদেশীয় এক ভদ্রলোক কলিকাতায় প্রথম নাট্যশালা নির্মাণ কবেন। ইহারই অনুকরণে দেশীয় নাট্যমোদী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বাটীতে অথবা উদ্যান-ভবনে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য নাটক-রচনার ভার সে যুগের খ্যাতনামা লেখকদের উপর অর্পণ করেন। এই ভাবে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে (১৮৩৫) ও বেলগেছিয়ার রাজাদেব বাগান বাড়িতে (১৮৫৮) রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় রঙ্গালয়ে অভিনয়েব জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নেব দ্বাবা 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করা হয় এবং এই অভিনয়দর্শনেব ফলে সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন দত্তের মৌলিক নাটক লিখিবার প্রেরণা জাগে। এইখান হইতে বাংলায় মৌলিক নাটকের ধারার আরম্ভ। তৎপূর্বে সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে অনুবাদ ও মৌলিক বচনার প্রথম অপটু প্রয়াসের কথা মনে রাখিলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট হইবে।

প্রথম যুগের নাট্যশালা ও অনুবাদ-নাটক

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার-কৃত 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী' ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলার' নাম করা যাইতে পারে। এই নাটকগুলিতে সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে লেখক বাংলা বাচন-রীতি গ্রহণ কবিয়া ও মাঝে মধ্যে যাত্রার অনুসরণে গানের সংযোজনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যখন বাংলা নাটক সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত আঙ্গিক বা রীতির বিশেষ প্রভাব পড়িল না।

রামনারায়ণের সংস্কৃত নাটক

ইংরেজী হইতে অনুবাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' (১৮৪৩) ও 'চারুমুখচিত্তহরা' (১৮৬৪) নাটকদ্বয়ে যথাক্রমে শেক্সপিয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভিনিস' ('Merchant of Venice') ও 'রোমিও জুলিয়েট' ('Romeo Juliet')-এর ভাবানুকরণ করেন। কিন্তু নাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত হয় নাই ও অন্যান্য নাট্যকারকে প্রভাবিতও করে নাই।

ইংরাজী নাটকের অনুবাদ

ইহার পূর্বেই মৌলিক নাটকরচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) বাংলা ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। লেখকের ভূমিকাতে বোঝা যায় যে তিনি ট্রাজেডির ভাবের দিক দিয়া যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ ইহাব রূপ দেওয়া তাঁহার শক্তির অতীত ছিল। নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকেব বিসদৃশ যোগসাধনে ও রূপকথাব অবাস্তবতার মধ্যে ট্রাজেডিবিধানেব অমোঘতা প্রবর্তন কবিয়া তিনি এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি তৈবী করিয়াছিলেন। তাবাচবণ শিকদাবের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) পৌবাণিক কাহিনী-অবলম্বনে বচিত—তিনি ইহাতে ইংবেজী নাটকের দৃশ্য-সংযোজনা ও বিভাজন-পদ্ধতি অনুসরণ কবেন, কিন্তু নাটকীয় সংলাপে পয়ার ব্যবহাব করায় ইহাব নাটকীয় আবেদন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মৌলিক নাটকের উদ্ভব

(৩)

নাটকের পরিণত রূপ

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রথম সার্থক নাটকের গৌরব দাবী কবিতে পাবে। ইহাতে লেখক পুরাণ ও পবানুকবণ ছাড়িয়া সর্বপ্রথম বাস্তব সামাজিক জীবনে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙলা সমাজে যাহা সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ও কুফলপ্রসূ প্রথা সেই কৌলীন্যেব করুণ ও উপহাস্য দিক উদ্ঘাটন কবাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার দৃশ্যাবলী পবম্পব-বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নাটকীয় সংহতির নিবিড়তা লাভ কবিতে পাবে নাই, ইহাব কৌতুকবস কোথায়ও করুণ ও কোথায়ও প্রহসন-ধর্মী হইয়াছে; ইহার সংলাপ কখনও বা অলঙ্কারভাব-বিড়ম্বিত, কখনও বা কথ্যভাষার ইতবতার আতিশয্যে ভাঁড়ামোতে পর্যবসিত; চরিত্রসমূহ ব্যক্তি নয়, শ্রেণীপ্রতিনিধি (type); কোন কোন চরিত্র—যেমন অনৃতাচার্য—সস্তা হাস্যরসের খাতিরে অবাস্তব হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দোষ সত্ত্বেও ইহাতে প্রথম সত্যকার সমাজ-জীবনের স্পর্শ ও মানবহৃদয়ের আন্দোলন অনুভব করা যায়। সমস্যাপীড়িত মানবজীবনের অন্তরবেদনা, প্রথানুগত্যের পিছনে গোপন মর্মব্যথা, হাসিব অন্তরালে অশ্রুর আভাস নাটকখানিকে জীবন-রসোচ্ছল করিয়াছে। বাঙালী শ্রোতা সর্বপ্রথম নিজ সমাজ-পরিবেশে আপনার হাসি-কান্নায়, বিদ্রূপ-সমবেদনায় দোলায়িত হইয়া আত্মপরিচয় লাভ করিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর যে নূতন সমাজ-চেতনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক

একটি বিশেষ সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণের হাতে নাটকীয় রূপ লাভ করিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' সমাজসংস্কার-উদ্দেশ্যে লেখা বাংলা নাটকের প্রথম নিদর্শনরূপে নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিল।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) নিজ প্রতিভাব স্পর্শে বাংলা নাটককে অনিশ্চিত পরীক্ষার অস্থিব ও উদ্দেশ্যহীন গতি হইতে মুক্তি দিয়া উহার নিজস্ব প্রকৃতিটি আবিষ্কার করিলেন, ইহার নানামুখী উদ্‌ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রসংহত করিয়া ভবিষ্যৎ গতিপথটি স্থিব কবিয়া দিলেন। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এই তিনটি নাটক ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এই দুইটি প্রহসন বাংলা নাট্যকলাব প্রথম সার্থক ও সুসংবদ্ধ প্রকাশরূপে চিবস্মবণীয়। মধুসূদনেব নাট্যরচনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুকরণের চিহ্ন থাকিলেও, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে ঘনীভূত নাট্যরসে, নাটকীয় রস-পুষ্টির জন্য ঘটনা-বিন্যাসে এবং চরিত্রসৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালীর প্রাণধর্ম ও জীবননিষ্ঠতাব পবিচয় সুস্পষ্ট। তাঁহাব প্রহসন দুইটিতে স্বল্পতম পবিসরের মধ্যে তাঁহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ত লক্ষ্য তাঁহার নিখুঁত সঙ্গতি-বোধ ও নাটকীয় উদ্দেশ্যেব একমুখিতাকে উজ্জ্বলভাবে পবিস্ফুট করিয়াছে। সমাজ-জীবনেব অসংখ্য দুর্নীতি-অসঙ্গতিব মধ্যে আপন শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জনে স্বাভাবিকতাকে বিকৃত না কবিয়া তিনি সুনির্বাচিত একটি বিষয় হইতেই পূর্ণ কৌতুকরসেব বিকাশ সাধন কবিয়াছেন। নবীনের অশোভন উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাচীনেব ধর্মাভিনয়েব অন্তরালে পাপাসক্তি উভয়কেই সমানভাবে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি আপনার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তবে নবীনের দোষ ব্যক্তিগত নহে, গোষ্ঠীগত এবং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষমার্হ; কিন্তু প্রাচীনের ভণ্ডামি ও ইন্দ্রিয়লালসার প্রতি তাঁহাব ব্যঙ্গ আবও তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। প্রথমটিতে নীতিবাদ ও রুচিবোধের এবং দ্বিতীয়টিতে ব্যঙ্গের মাধ্যমে মুখোস-খোলার প্রশ্রয়হীন কঠোরতার প্রাধান্য।

নাট্যকার মধুসূদন

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের রূপায়ণ ও ভাষণভঙ্গী সংস্কৃতাশ্রয়ী। আখ্যানের নাট্য-সম্ভাবনা মধুসূদন পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মুখ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ অভিনয়ের সাহায্যে না ফুটাইয়া বিবৃতির মাধ্যমে গোচর করিয়াছেন—আবার গৌণ বিষয়কে সুদীর্ঘ সংলাপের ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর যুগ্ম আকর্ষণে

শর্মিষ্ঠা নাটক

যযাতির চিত্তের দোলায়মানতা, দেবযানীর প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দাঁড়াইতে শর্মিষ্ঠার সঙ্কোচ ও প্রকাশ্য ও গোপন প্রেমের মধ্যে যযাতির মনোভাবের তারতম্য এইগুলিই ছিল নাট্যরসের মুখ্য উপাদান। কিন্তু মধুসূদন এই সমস্ত সূক্ষ্ম মানস প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দেবযানীর অতি-উচ্ছ্বসিত অভিমান, শুক্রাচার্যের অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মধুসূদন মহাভারতের মূল কাহিনীটিরই অনুবর্তন করিয়াছেন—পৌরাণিক আখ্যানরসই নাট্যরস অপেক্ষা তাঁহার নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অলক্ষ্য নাটকীয়তাকে তিনি প্রস্ফুটিত করেন নাই। শর্মিষ্ঠার মধ্যে আদর্শ সতীর সহিষ্ণুতা মূর্ত হইয়াছে। এই গুণ যতটা কাব্যোচিত, ততটা নাটকোচিত নহে। ইহাতে পুরাণাভিভূত কবিচিত্তেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

('পদ্মাবতী' গ্রীক আখ্যানের ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।) মধুসূদন অবশ্য গ্রীক পুরাণকে হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়া উহাকে বাঙালী ধর্মসংস্কারের অনুযায়ী রূপ দিয়াছেন। শচীর ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কর্তৃত্বাভিমানী চরিত্র গ্রীকদেবীর নিখুঁত প্রতিবিম্ব; কিন্তু মুরজা ও রতি হিন্দু আদর্শে রূপান্তরিত। পদ্মাবতী ভীরু, কোমলস্বভাবা, পরনির্ভরা বাঙালী নারী, হেলেনের মোটেই সমগোত্রীয়া নয়। ঘটনাবিন্যাস ও শেষ পরিণতি ভারতীয় অলৌকিক দৈবসংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘটনাপুঞ্জের দ্রুত সঞ্চরণে, দৈবের মুহুর্মুহু হস্তক্ষেপে, পদ্মাবতী যে মুরজার কন্যা এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে নাটকীয় রস বায়ুতাড়িত সরোবরের ন্যায় কোথাও স্থির হইয়া জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই। এই দেবলোকের অবাস্তব আবহাওয়ায় মানবিক রসের একমাত্র স্ফুরণ ঘটিয়াছে রাজা ইন্দ্রনীলের ব্যাকুলতা ও পদ্মাবতীর করুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ে। দৃশ্যসংস্থানের দিক দিয়া 'পদ্মাবতী' শর্মিষ্ঠার তুলনায় অধিকতর অবিন্যস্ত। মনে হয় যে চমকপ্রদ আখ্যান-সন্নিবেশ ও বহিরাগত বিপদ্জালের মধ্যে যতটুকু নাটকীয় রস স্ফুরিত হইতে পারে তাহার বেশী তিনি আর কিছু চাহেন নাই। দৈব-নির্ভর, অলৌকিকতা-পিয়াসী বাঙালীর রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই তিনি তাঁহার নাট্যকলাকে নিয়মিত করিয়াছেন।

পদ্মাবতী নাটক

('কৃষ্ণকুমারী'-তে মধুসূদন দৈবশাসিত, মায়াময় সুখ-দুঃখে ভরা, পৌরাণিক জগৎ হইতে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ, অমোঘ কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় গ্রথিত, দ্বন্দ্বময় রঙ্গভূমিতে নামিয়া আসিয়াছেন। অন্যান্য নাটকে যে বিপদের ঘনঘটা দৈবানুগ্রহে মুহূর্তে কাটিয়া গিয়াছে, এখানে তাহা ঘনীভূত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে মানবভাগ্যকে অভিভূত

করিয়াছে।) 'কৃষ্ণকুমারী'র আখ্যান কাজেই ট্রাজেডির পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

রাজপুত-ইতিহাসের রাজন্যবর্গের আত্মকলহ ও পরস্পর রেষারেষির সহিত গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাট চক্রান্ত মিশিয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই এই শোকাবহ পরিণতি ঘটাইয়াছে। ঘরের ছোট আগুনেই রাজ্যব্যাপী বিরাট অগ্নিদাহের সৃষ্টি হইয়াছে। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করিতে রাষ্ট্রবিপ্লবের আয়োজন করিয়াছে ও এক সরল, ফুলের মত শুভ্রশুচি রাজকুমারীর আত্মনাশের কারণ হইয়াছে। নাটকে বিরোধী দুই রাজা জয়সিংহ ও মানসিংহ উপলক্ষ্যমাত্র; কিন্তু তাহাদের উদ্ধত দাবী উদয়পুরের অসহায় রাজপরিবারে যে মর্মান্তিক অবস্থাসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই নাটকের প্রকৃত উপজীব্য। রাজা, রাণী, রাজভ্রাতা ও রাজকুমারী সকলেই এই আগুনের বেড়াজালে আটক পড়িয়া দারুণ অস্বস্তি ভোগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক ট্রাজেডির বলিষ্ঠ দ্বন্দ্ব, দৈবের বিরুদ্ধে শৌর্যপূর্ণ সংগ্রাম নাই, আছে নিরুপায়ের হাহাকার ও করুণ রসের অতিপ্লাবন। কৃষ্ণকুমারীর নিজের কোন দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়া তাহার জীবনে এই নিদারুণ পরিণামের আবির্ভাব ঘটে নাই। মদনিকা তাহার মনে মানসিংহের প্রতি যে অনুরাগের বীজ বপন করিয়াছিল তাহা এত ক্ষীণ ও অপরিণত যে তাহা ট্রাজেডির সহায়ক কারণরূপে বিকশিত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত যে সে অপরের হাতে বলি না হইয়া দেশরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে আত্মবলিদান দিয়াছে ইহাতে তাহার ট্রাজেডির নায়িকার উপযুক্ত মর্যাদা কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। মধুসূদনের শিল্পবোধ যে এখনও বিশুদ্ধ ট্রাজেডির রসে অভিষিক্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ এখানেও দেখা যায়। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা-সম্বন্ধীয় দৃশ্যগুলি, তাহাদের চটুল বাগ্‌বিতণ্ডা, ছদ্মবেশধারণ, পরস্পরের মতলব বানচাল করিবার ধূর্ত প্রচেষ্টা—এই সবই হাস্যরস-প্রধান নাটকের লক্ষণাক্রান্ত; এই লঘু অস্ত্রক্ষেপ, এই "পঞ্চশরের বেদনামাধুরী" হইতে যে রুদ্রের রোষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আমরা কেহই কল্পনা করিতে পারি না। কমেডির খোলসের মধ্যে ট্রাজেডির শাঁস ভরিয়া মধুসূদন যে ভাব-অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন তাহা ট্রাজেডির পরিপূর্ণ রস-বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে।

(মধুসূদনের নাট্যরচনার কাল মাত্র দুই বৎসরব্যাপী। এই স্বল্পকালের মধ্যে এক অনভ্যস্ত শিল্পকলার প্রস্তুতিহীন অনুশীলনে তিনি যে পরিমাণ সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন। বাঙালীর জীবন-ঐতিহ্য ও

মন-মেজাজের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার মিল ঘটাইতে যে সাময়িক ছন্দপতন অনিবার্য মধুসূদনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহার চেয়ে বেশী গুরুতব নয়। সুতরাং যেমন কাব্যে, তেমনি নাটকেও তাঁহাব প্রতিভা পূর্ণ অভিনন্দনের অধিকারী।)

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা

দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯-১৮৭৩) মধুসূদনেব প্রায় সমসাময়িক নাট্যকার। এই দুই শ্রেষ্ঠ অথচ ভিন্নধর্মী নাট্যকারের যুগপৎ আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে নাট্যচেতনা যে কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুব প্রকৃতি ও জীবনচর্চা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন জীবনকে দেখিয়াছেন কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে এক অদম্য উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসেব ঘূর্ণিবায়ুব ভিতর দিয়া এবং পরবর্তী কালে এক মহাকাব্যোচিত মহিমা ও পৌবাণিক ভাবাসঙ্গেব অন্তবাল হইতে। আব একজন জীবনকে দেখিয়াছেন তাহাব অলিতে-গলিতে, তাহার পল্লী ও মফস্বল শহবেব সহজ বিকীর্ণতায় ও ব্যাপ্তিতে, ইতব জনতাব ভাঙা-চোবা মুখের কথায় ও মনোভঙ্গীতে, হাস্যবসিকেব সমস্ত আববণ-সবানো, অন্তর্ভেদী, তির্যক দৃষ্টিক্ষেপে। তাই মধুসূদন মিলনান্ত নাটকে সংযত-গম্ভীর, বিয়োগান্ত নাটকে অভিজাতরুচিতে আতিশয্য-বিবোধী। তিনি দীনবন্ধুব মত প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ও আশা মিটাইয়া কাঁদিতে জানিতেন না। বাঙলার জীবন-যাত্রা তাঁহাকে তাহাব এই নিজস্ব অমাজিত ভাবাতিশয্যের শিক্ষা দেয় নাই। দীনবন্ধুর নাটকে প্রথম বাংলা জীবনের উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তে মাটিব স্পর্শ পাওয়া গেল। কোন ধার-কবা কৃত্রিম উপাদান নহে, বাঙলার জীবনসম্ভূত রসধারাই এখানে নাটকের দেহ ও মন গড়িয়াছে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী

তাঁহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) কোন দৈবরোষসংঘটিত নহে, মানবিক-আচবণ-প্রসূত ট্রাজেডিকে রূপ দিয়াছে। ইহার শাশ্বত সাহিত্যমূল্যের সহিত সাময়িক প্রচার-তাৎপর্য মিশিয়া ইহাকে এক অসাধারণ গুরুত্ব দিয়াছে। ইহা শুধু জীবনের আবেগ-মুক্তির নহে, মনুষ্যত্ব-বিরোধী উৎপীড়ন-মুক্তিরও নাট্যকাহিনী। নীলকরদের অত্যাচার সে যুগে বাঙলার প্রাণশক্তিকে পিষিয়া মারিতেছিল—ইহার প্রতিরোধ যেমন অর্থনৈতিক কারণে, তেমনি জাতীয় মর্যাদাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। ইহার ভদ্র গার্হস্থ্য জীবন ও নিম্নশ্রেণীর লোকের ব্যক্তি-জীবন আশ্চর্যরূপে স্বভাবানুসারী ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও আবেগের মাত্রায় সম্পূর্ণ-

নীলদর্পণ

রূপে বাঙালী-ভাবাদর্শের অনুগামী। নীলকরের অত্যাচারে যখন এই ভদ্র ও ইতর জীবনকে বিনষ্ট করিয়াছে, তখন কিন্তু ইহা এই উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম সুর জাগাইয়াছে। ইতর ব্যক্তিরা—যথা আদুরি, তোরাপ, সাধুচরণ প্রভৃতি—তাহাদের অভ্যস্ত ভাবের স্বচ্ছ দর্পণরূপ রসপূর্ণ কথ্য ভাষায়ই তাহাদের সুখ ও দুঃখ, সহজ জীবনানন্দ ও দুঃসহ লাঞ্ছনাবোধ প্রকাশ করে। ভদ্র ব্যক্তিরাই দুঃখের অসহ্য অভিঘাতে আত্মহারা হইয়া কৃত্রিম, আলঙ্কারিক ও অত্যুচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোক সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার সম্বন্ধে ছিল না এই মত স্পষ্টতঃ ভুল। মনে হয় যে ভদ্র ব্যক্তির আবেগ-প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার একটা ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ ও কৃত্রিম সাহিত্যাদর্শের প্রতি অকারণ মোহ ছিল। তিনি মনে করিতেন যে যে-ভাষায় সাধারণ লোকে দুঃখ জানায়, তাহা ভদ্র লোকের চূড়ান্ত ক্ষোভ ও অপমানবোধের প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে অত্যাচার তোরাপকে কেবল দৈহিক নির্যাতন অনুভব করাইয়াছে, তাহাই গোলোক ও নবীনমাধবকে আত্মমর্যাদার উচ্চভূমি হইতে ধূলিসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দেহযন্ত্রণার অতিরিক্ত এক দুঃসহতর আত্ম-গ্লানিতে জর্জরিত করিয়াছে। এই অনুভূতির পার্থক্যের জন্যই প্রকাশরীতির পার্থক্য। সহজ কথায় মনের যে চরম দুঃখ প্রকাশ করা যায় এই সত্য দীনবন্ধুর অজ্ঞাত ছিল। সংস্কৃত নাটকে চরিত্রের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী ও নর-নারী-ভেদে যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভেদ দেখা যায়, তাহারই অনুরূপ একটা পার্থক্য দীনবন্ধু নিজ নাটকে অনুসরণ করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর রচনার বিশিষ্টতা

বাঙালী-জীবনে বাস্তব ট্রাজেডিকে রূপ দিতে গিয়া দীনবন্ধু মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে দুঃখের বীজাণু বাঙালী-মনের অবচেতনে দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিল তাহা যখন নাট্যানুভূতির উত্তাপে বাহ্যাভিব্যক্তি পাইল তখন ইহা প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে অতিমাত্রায় প্রকট হইল। যে গৃহস্থবধূ কখনও চেঁচাইয়া কাঁদে না, তাহার যদি একবার মুখ খুলিয়া যায়, তবে তাহার উচ্চকণ্ঠ সকলকে ছাড়াইয়া উঠে। তেমনি বাংলা সাহিত্যের স্বল্পবাক্ ট্রাজেডি-বধূ দীনবন্ধুর প্রশ্রয়ে চরম গলাবাজি করিয়াছে, শোককে উপভোগ-বিলাসিতার পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। স্তূপীকৃত মৃত্যু, উন্মাদ, আত্মহত্যার বীভৎস সমাবেশ বাংলা নাটকের সদ্যোজাত ট্রাজিক ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন হইয়াছে। উচ্চতম নাট্যাদর্শের মানদণ্ডে এই মরণ-বিলাসের

অনুপযোগিতা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই রুচিবিকার ও আতিশয্যপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। প্রথম কারণ হয়ত নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা—নীলকরের অত্যাচারে একটা সমস্ত পরিবারকে উন্মূলিত না দেখাইলে জনমত ক্ষিপ্ত হইবে কি করিয়া? বিদ্যাসাগরকে রঙ্গমঞ্চে চটি-ছোঁড়ায় উত্তেজিত ও ইংরেজ সরকারের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করিতে হইলে নাটকীয় সংযম অপেক্ষা নীতি-কৌশলগত অতিরঞ্জনই অধিক কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পৌরাণিক অতিভাষণের আদর্শও ইহার মূলে থাকিতে পারে। দীনবন্ধু পুবাণেব বিষয় বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সূক্ষ্মতব প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই—পৌরাণিক কল্পনাতিশয্য তাঁহার বস্তুনিষ্ঠতা ও স্বভাবচিত্রণের মধ্যেও অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, পুবাণ-বসপুষ্ট বাঙালীর রসরুচি ও মাত্রাজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও হয়ত তাঁহাকে সুর চড়াইতে হইয়াছে। 'নীলদর্পণ'-এব অতিরঞ্জন-প্রবণতার দায়িত্ব নাট্যকার ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সমভাগেই চাপাইতে হইবে—পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্রও এই অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' দোষে-গুণে, বস্তুরসে ও ভাবাতিশয্যে বাঙালী-জীবনেব নাটক।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক

দীনবন্ধুব অন্যান্য নাটকের মধ্যে—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) ও 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩),—আর ট্রাজেডির পুনবাবৃত্তি ঘটে নাই, এগুলি সবই হাস্যরসাত্মক ও প্রায়শঃ প্রহসনজাতীয়। ইহাদের মধ্যে 'সধবার একাদশী' বিশেষভাবে আলোচ্য। এই নাটকে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিষয় আরও পূর্ণাঙ্গভাবে ও প্রচুরতর রসোচ্ছলতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর রসিকতা, তাঁহার তীক্ষ্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তর-যোজনার অসাধারণ নৈপুণ্য, তাঁহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সার্থক ও সাবলীল প্রয়োগ এই নাটককে স্মরণীয় করিয়াছে। তরুণ বাঙালী-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগাসক্তি, তাহাদের খামখেয়ালী দুরন্তপনার নিত্যনূতন লীলা, স্ফূর্তি ও ইয়ারকির রঙীন আবেশ এই নাটকের দৃশ্যগুলির মধ্যে আশ্চর্য সরসতা ও স্বভাবানুবর্তিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ডেপুটি জলধর ও কলিকাতায় আগন্তুক পূর্ববঙ্গীয় রামমাণিক্য এই লঘুপক্ষ প্রজাপতিদলের সহিত মিশিতে গিয়া নিজেদের আরও উপহাসাস্পদ করিয়াছে। কিন্তু এই নাটকে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও গভীরভাবে পরিকল্পিত চরিত্র নিমচাঁদ। তাহার

চরিত্রে নব্যবঙ্গের ক্ষুরধার মনীষা ও অভাবনীয় নৈতিক অধঃপতন, আকাশস্পর্শী কল্পনা ও তাহার শোচনীয় বাস্তব পরিণতি, নির্লজ্জ মোসাহেবি ও মর্মভেদী অনুশোচনার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখানো হইয়াছে। সে শুধু একক ব্যক্তি নহে, সমগ্র যুগেব প্রতিনিধি। নিমচাঁদ দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবের রহস্যময় দ্বৈত-সত্তার অতুলনীয় প্রতিচ্ছবি। এই একটি চবিত্রের দ্বারা প্রহসন উচ্চাঙ্গের কমেডিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(৪)

নট-নাট্যকারের আবির্ভাব ও সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে সাধাবণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাটকের পরিণতির আর একটি স্তর সূচিত করিল। ইতিপূর্বে নাটকের অভিনয় হইত ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বঙ্গমঞ্চে—তাহাতে কেবল নিমন্ত্রিত লোকেরাই দর্শক-শ্রেণীভুক্ত হইতেন, নাট্যামোদী জনসাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণ লোকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে ও দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দল-গঠনপূর্বক অভিনয়কে একটা স্থায়ী বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে সাধারণ বঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইল। এই ব্যাপারে প্রথম দিকে নাট্যরচনার কোন নূতন প্রেরণার প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সাধাবণ রঙ্গালয়ে যখন নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে হইল, তখনই প্রচলিত নাটকের অপ্রাচুর্য ও স্থলে স্থলে অনুপযোগিতাও অনুভূত হইল। দর্শকের রুচি-অনুযায়ী বৈচিত্র্য-প্রবর্তনের জন্যও নূতন নাটকরচনার প্রয়োজন দেখা দিল। এবং এই প্রয়োজনের সূত্র ধরিয়াই প্রতিভাশালী নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকারের ভূমিকায় আবির্ভূত হইতে বাধ্য হইলেন। এই নট-নাট্যকারের দ্বৈতমিলন নাটক-রচনার ইতিহাসে নূতন যুগের সূত্রপাত করিল।

সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা

অভিনেতা কর্তৃক নাটকরচনার দোষ-গুণ দুইই আছে। গুণের মধ্যে হইল, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধে অভিনেতা নাটকের নাট্যোপযোগিতা বাড়াইয়া তোলে। অভিনয়োৎকর্ষ নাটকের একটি প্রধান গুণ। রঙ্গমঞ্চের উপর ও দৃশ্যসংযোজনার মাধ্যমে কোন ভাবকে কিরূপ ফুটাইয়া তোলার সুবিধা, সংলাপের দীর্ঘতা ও ঘটনাসন্নিবেশের পারম্পর্য কিরূপ নিয়মিত করিতে হইবে এ বিষয়ে সাধারণ নাট্যকার হইতে নট-

অভিনেতা-নাট্যকারের দোষ-গুণ

নাট্যকার অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইবেন ইহা স্বাভাবিক। ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে শেক্সপিয়র-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যখন নাটকরচনায় হাত দিলেন তখন নাট্যজগতে এক অভাবনীয় রূপান্তব সাধিত হইল। তেমনি গিরিশচন্দ্রের নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইবাব ফলে বাংলা নাটকেব যে গঠনদুর্বলতা, শ্লথ গতি ও পণ্ডিতী গন্ধ অনেক পরিমাণে কাটিয়া গেল, ইহা যে সাবলীল ও জীবনাবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল তাহা নিঃসন্দেহ। দর্শকেব রুচিব সঙ্গে ইহাব যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইল তাহাও স্বীকার্য। তবে এই সম্পর্কঘনিষ্ঠতা সব সময় হিতকর না হইয়া অপকর্ষেবও হেতু হইয়াছে। শ্রোতাব স্থূল রুচি ও অহেতুক অন্ধ সংস্কাবের দাবী মিটাইতে গিয়া বহু নাটককে যে পবিণতির স্বাভাবিকতা, ভাবসঙ্গতি ও আবেগেব মাত্রাবোধ বিসর্জন দিতে হইয়াছে তাহা গিবিশচন্দ্রেব খেদপূর্ণ স্বীকারোক্তিতেই পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া বহুক্ষেত্রে নাটকের দ্বারা অভিনয় নিয়ন্ত্রিত না হইয়া অভিনয়ের দ্বাবাই নাটক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। জনপ্রিয় অভিনেতৃবৃন্দের বিশিষ্ট ঝোঁক ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য বাখিয়াই নাট্যকাব্যকে চবিত্রসৃষ্টি ও পাত্রপাত্রীব মুখে ভাবেব আবোপ করিতে হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১১), **ক্ষীরোদপ্রসাদ** (১৮৬৩-১৯২৭) ও **দ্বিজেন্দ্রলালের** (১৮৬৩-১৯১৩) যুগকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।

নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ

ইহাদের নাটকের সংখ্যার অজস্রতা ও বিষয়েব বৈচিত্র্য অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ কবে যে ইহাদের নিকট নাট্যপ্রেরণার একটা বিবাট উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছিল। ১৮৭২ হইতে ১৯২২ এই পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যে যত কাব্য ও উপন্যাস রচিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা নাটকের সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং এই যুগে সাহিত্য ও সমাজরুচির মুখ্য ধারা যে নাটকের খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য। এই কাল-পরিধির মধ্যে বাঙালী-জীবনে যে দুইটি প্রধান ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—দেশাত্মবোধের নব উন্মাদনা ও পুনরুজ্জীবিত ভক্তিরসের প্রবল প্রবাহ—তাহা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতে নাটকেই অধিকতর উদ্দীপনাময়, প্রাণ-মাতানো অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চাঙ্গের নাটকে সাহিত্যিক গুণের সহিত অভিনয়-নৈপুণ্য যুক্ত হইয়া ইহার আবেদনকে আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী করে। শ্রেষ্ঠ কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়া আমাদের মনে যেটুকু ভাব জাগে, রঙ্গমঞ্চের সযত্নরচিত মায়াময় পরিবেশে ও অভিনয়ের প্রত্যক্ষবৎ উপস্থাপনে তাহা শতগুণে বর্ধিত হইয়া আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে। স্বাধীনতার স্পৃহা ও ধর্মানুভূতির উদ্বোধনে

বাংলা নাটক যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহার সহিত কাব্য-উপন্যাসের তুলনা হয় না। সাহিত্যের আবেদন কেবল শিক্ষিত, রসগ্রাহী মনের নিকট; কিন্তু নাটকের আবেদন উচ্চশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত-নির্বিশেষে প্রায় সর্বজনীন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে এই সময়ে জাতির তীব্রতম জীবনাবেগ নাটকের মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছিল।

দেশপ্রেমমূলক ও ঐতিহাসিক নাটক

তথাপি এইরূপ অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যেও বাংলা নাটক চরম উৎকর্ষ ও নিখুঁত পারিপাট্য লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে এই অতি-উচ্ছ্বসিত আবেগ মহৎ কর্মের আধারে বিধৃত হইয়া স্থায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় নাই। কল্পনা-প্রধান দেশপ্রেমের উষ্ণ বাষ্পোচ্ছ্বাস হয়ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকে মহৎ নাটকের গুণ-মণ্ডিত করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র নাটকটিকে সমবিন্যস্ত উৎকর্ষের উত্তুঙ্গতায় তুলিতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকখানি নাটক দেশপ্রীতির ভাবগৌরব ও নাট্যাবেগকে প্রশংসনীয় রূপ দিয়াছে, কিন্তু অবান্তর বস্তুর সমাবেশে ও প্রকাশের অসংযমে ইহারাও পূর্ণ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য'-এ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অবাস্তব কাল্পনিকতা ও অতি-স্ফীত ভাবালুতা মিশিয়া ইহার নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ ও দর্শকের রসানুভূতিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলিও সম্পূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ হয় নাই—উপাদান-বিশৃঙ্খলা ও বহুভাষণ এখানেও নাটকীয় সংহতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্ত নাটক আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতীতি হয় যে যে-দেশপ্রেম একটা সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র এবং জাতীয় চরিত্রে অত্যাজ্য ভাবসংস্কাররূপে পরিণতি লাভ করে নাই, যাহা অপরিস্ফুট মুক্তি-কামনা হইতে স্থির অন্তর-সাধনায় উন্নীত হয় নাই তাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রেরণা দিতে পারে না। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবন হইতে নাটকে সংক্রামিত হয় নাই, বরং নাট্যকল্পনার বাস্তবাতিশায়ী মহনীয়তা অ-প্রস্তুত জাতীয় জীবনে এক ক্ষণিক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৫), 'মীরকাসেম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' (১৯০৭), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সাজাহান' (১৯১২) ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' (১৯২১) বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলমগীরের দ্বৈতসত্তামূলক চরিত্র-রূপায়ণ ঐতিহাসিক নাটকে এক অভিনব মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন।

জাতীয় অনুভূতির দ্বিতীয় ধারা—ভক্তিরসপ্রবাহ—অবশ্য বাঙালী-মানসের ঐতিহ্যগত স্থায়ী সংস্কাররূপে গণ্য হইতে পারে। উনবিংশ শতকের যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই ধর্মসংস্কারের মূল কিছুটা শিথিল করিলেও ইহার সম্বন্ধে তাহার একটা মানস ঔৎসুক্য, বিচলিত নিষ্ঠার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা লালায়িত মনোভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় যখন আমাদের দেব-দেবী-কল্পনা ও অধ্যাত্মবোধ আবার প্রত্যক্ষ সত্যরূপে প্রতিভাত হইল, তখন ধর্মাকৃতির একটা বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস আমাদের অন্তরকে প্লাবিত করিল। এই উচ্ছ্বাস তরঙ্গের প্রাণ-চাঞ্চল্যই গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ভক্তিমূলক নাটকে বিধৃত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের অলৌকিক ঘটনা, ঈশ্বরের মানবিক রূপে আবির্ভাব ও মনুষ্যবৎ ভাবাধীনতা, ভক্তির অসাধ্য-সাধন—সমস্তই আবার আমাদের নবজাগ্রত বিশ্বাস-প্রবণতার নিকট জীবন্ত সত্য ও রসচেতনার উদ্দীপকরূপে গৃহীত ও অভিনন্দিত হইল। মধ্যযুগের যাত্রাগান, প্রবল ধর্মাকৃতি, উহার দার্শনিক তত্ত্ব-প্রিয়তা ও সঙ্গীতপ্রাধান্য লইয়া, আধুনিক যুগের উচ্চতর অভিনয়কৌশল ও নাট্যরীতির সাহায্যে, আমাদের মানসলোকে আবার নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে অসংখ্য আখ্যায়িকা নাট্যরূপ লইয়া আমাদের অতীতের সহিত যোগসূত্রকে সুদৃঢ় করিল। এইরূপ অলৌকিক আখ্যানবস্তুকে আধুনিক যুক্তিবাদী মনের নিকট গ্রহণীয় করিতে নাট্যকারদের বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক কলা-কৌশল অবলম্বন করিতে হইত না—আমাদের মনের সহজ বিশ্বাস, সুনিপুণ বচনাভঙ্গী ও অভিনয়ের দ্বারা যথাযথ ভাবোদ্রেক, বিশেষতঃ ভক্তিরসের মোহাচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা পৌরাণিক ঘটনাবলীকে কোনরূপ অদল-বদল না করিয়াই নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। অবশ্য আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে এগুলি সম্পূর্ণ নাটক নহে, নাটকাধারে সংরক্ষিত অলৌকিক রসের আত্ম-বিস্তার ও যথাসম্ভব গাঢ় পরিণতি মাত্র। যেখানে দেব-মহিমা ও ভক্তের আত্মনিবেদনই নাটকের উপাদান, সেখানে জাগতিক নিয়ম বা কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকিতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাতে বা দুই বিরোধী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে কিছুটা নাটকীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু ইহাদের পিছনে সদা-সক্রিয় যে দৈবলীলা সমস্ত ঘটনার রশ্মিধারণ করিয়া আছে তাহারই অপ্রতিহত প্রভাবে মানবিক দ্বন্দ্বের উত্তেজনা মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া পড়ে। তথাপি

ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটক

এইজাতীয় নাটকই বাঙালীর সার্থকতম, তাহার মনোধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কান্বিত নাট্যরস-বিকাশের দৃষ্টান্ত। এই যাত্রাধর্মী, ভক্তিরস-প্লাবিত পৌরাণিক নাটকের প্রথম প্রবর্তকরূপে মনোমোহন বসুর (১৮৩১—১৯১২) নাম স্মরণীয়। এই পৌরাণিক নাটকে বাঙালী দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবেগের মাত্রাধিক্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য পুনঃপ্রবর্তিত হয়। তাঁহার 'সতী' (১৮৭৩) ও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক (১৮৭৫) গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভাকে নূতন পথের সন্ধান দেয়। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' (১৮৯৩), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) ও 'পাণ্ডবগৌরব' এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নবনারায়ণ' (১৯২৬) বাঙালী নাটক হইতে যে রস আস্বাদন করিতে চাহিয়াছে, যে ভাবানুভূতিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

এই যুগে সমাজ ও পরিবার-জীবনের সমস্যামূলক নাটক অনেক রচিত হইয়াছে। পূর্বযুগের উদ্দেশ্যমূলক বা ব্যঙ্গাত্মক নাটক এখন প্রহসন ও অপেরা বা গীতি-নাট্যের রূপ লইয়াছে। সমাজজীবনের জটিলতাবৃদ্ধি ও পরিবারজীবনে আদর্শহীনতা ও ব্যক্তি-সংঘাতের উগ্রতার জন্য এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে নাটকের উপযোগী হইয়া উঠিল। এই বিষয়ে নাট্যকারদের মনোভাব রামনারায়ণ ও দীনবন্ধুর মত মোটেই ব্যঙ্গপ্রবণ বা হাস্যরস-প্রধান নহে; তাঁহারা ইহার বিষাদান্ত, দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত দিকের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন। জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত যতই তীব্র হইল, ততই ইহা মিলনান্ত নাটকের সুলভ সমাধান অস্বীকার করিয়া ট্রাজেডির চরম দুঃখময় পরিণতিকে আহ্বান জানাইল। আবার ইহার সহজ দুঃখময়তার উপর শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শ উহার নিয়তি-প্রেরিত অপ্রতিবিধেয় বেদনা, প্রতিকূল দৈব ও আপনার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে মানুষের করুণ ব্যর্থতা, ছোটখাট ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি—আরোপিত হইয়া এক দুশ্ছেদ্য জটিলতার সৃষ্টি করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকে শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনুকরণের চিহ্ন মাঝে মাঝে অশোভনভাবে প্রকট হইলেও মোটামুটি একটা বিষয়োপযোগী ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছিল। সাজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়ের ঐতিহাসিক সত্য শেক্সপিয়রে ট্রাজিক কল্পনার স্বাভাবিক আশ্রয়ভূমিরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বাঙালীর অতি-সঙ্কীর্ণ ও গতানুগতিক গার্হস্থ্য জীবনে এইরূপ বিপর্যয়কারী, বিশৃঙ্খলা-বিধ্বংসী ট্রাজেডির অভ্যাগম আমাদের সঙ্গতিবোধের বিরোধী। উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে যে

গুরুগম্ভীর সামাজিক নাটক

বজ্র পড়িলে স্বাভাবিক হয় তাহাই যদি সমতলস্থিত লতাপাতা-ঘেরা কুটিরের উপর পড়ে, তবে ইহার ভাবসত্যে আমাদের সংশয় জাগে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৮৯১), 'বলিদান' (১৯০৫), ও 'শাস্তি কি শান্তি' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৪) ট্রাজেডির প্রতি এইরূপ অতিপ্রবণতার নিদর্শন ও সেইজন্য নাটক হিসাবে কম বেশী অসার্থক।

বাংলা নাটকে সাধারণতঃ গম্ভীর ও বিষাদময় ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও ইহাতে যে রঙ্গরস, হাসি-খুশি ও লঘু, নিরঙ্কুশ কল্পনা-বিলাসেরও স্থান ছিল তাহা প্রমাণিত হয় ইহার প্রহসন ও অপেরাগুলিতে। সমস্ত প্রখ্যাত নাট্যকারই ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের গুরুগম্ভীর রীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রহসন ও গীতি-নাট্যের লঘু ভঙ্গীরও অনুশীলন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—ইহাদের সকলেরই প্রহসন ও নৃত্যগীত-সমন্বিত, রোমান্টিক-কল্পনামধুর নাটকরচনাতেও দক্ষ হাত ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার শেক্সপিয়রের ট্রাজি-কমেডির আদর্শে গম্ভীর বিষয়ের মধ্যেও হাস্যরসিকতা ও তরল বাগ্‌ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। একজন মাত্র নাট্যকার প্রায় পুরাপুরি প্রহসন ও নক্সা-রচয়িতা—তিনি রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫০—১৯২৯)। তাঁহার 'খাসদখল' (১৯১১) হাসির মধ্যে করুণ রস মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এই উভয় রসের মধ্যে হাসি ও ব্যঙ্গচরিত্রেরই প্রাধান্য। তাঁহার প্রহসনাবলীর মধ্যে 'বিবাহবিভ্রাট', 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' প্রভৃতির মধ্যে সামান্য ব্যঙ্গের খোঁচা থাকিলেও ইহারা প্রধানতঃ অনাবিল হাসির ফোয়ারাই ছুটাইয়া দেয়। গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার', 'আবু হোসেন', 'য্যায়সা কি ত্যায়সা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' (১৮৯৭) ও 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) প্রহসন-শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

হাস্যরসাত্মক নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রহসনে বা ব্যঙ্গরচনায় নহে, কল্পনা-প্রধান গীতিনাট্যে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'আলিবাবা' (১৮৯৭) ও 'বরুণা' কল্পনা-সঙ্গতি, দক্ষ ঘটনা-বিন্যাস, গান ও সংলাপের সুষ্ঠু মিশ্রণ এবং খামখেয়ালী, আকস্মিকতা-তাড়িত আচরণের মধ্যে নাটকোচিত মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই দুই গীতিনাট্যকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

গীতিনাট্য

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য দিয়া আমরা বাংলার নাট্য-প্রতিভার শক্তি ও

দুর্বলতা, ইহার বিষয় ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও মিশ্র, দ্বিধাজড়িত মনোভাব, ইহার নাট্যকলার নিয়ন্ত্রণ-অসহিষ্ণু ভাবোচ্ছ্বাস, ইহার প্রচুর প্রতিশ্রুতি ও অসম্পূর্ণ সিদ্ধির ইতিহাসের পরিচয় পাই।

বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ

বাংলা নাটকের পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করিতেছে বাঙালীর চেতনায় পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে এক অন্তরঙ্গ ও অখণ্ড সংহতিস্থাপনের উপর। বাঙালী নিজ স্বভাবধর্মে স্থির প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার নাট্যকলাও যে অনুরূপ স্বকীয়তা ও দৃঢ়তা লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস ও ছোট গল্প

প্রস্তুতি পর্ব

উপন্যাসের মূলবীজ নিহিত আছে মানুষের গল্পানুরাগে—তাহার গল্প শুনিবার ও উপভোগ করিবার সহজ প্রবৃত্তিতে। পৃথিবীর সমস্ত আদিযুগের সাহিত্যই আখ্যানমূলক। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসি প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলিতে আখ্যানের চমৎকারিত্ব ও জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি সুষ্ঠুভাবে সংমিশ্রিত হইয়াছে। আমরা গল্প পড়িতে পড়িতে যে সমস্ত চরিত্রের পরিচয় লাভ করি তাহারা সকলেই নিজ নিজ তীক্ষ্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লইয়া আমাদের অন্তরে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, একিলিস, আগামেমনন, প্যারিস, হেক্টর, হেলেন, এণ্ড্রোম্যাকি—ইহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাহাদের কথাবার্তা ও আচরণের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—ইহাদের আচরণের সঙ্গতি ও সংলাপের রীতি ইহাদিগকে সহজেই চিনাইয়া দেয়। মহাকাব্যরচয়িতারা সচেতনভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ করেন না, ঘটনার প্রবাহ তাঁহাদের রচনায় এক মুহূর্তের জন্যও গতিহীন নহে। কিন্তু ঘটনাবিবৃতি ও ধর্মতত্ত্ব-আলোচনার মধ্য দিয়াও তাঁহাদের গভীর অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গতির জন্য চরিত্রগুলি সজীবত্ব ও আত্মবৈশিষ্ট্য লাভ করে।

আদিযুগের আখ্যান-মূলক সাহিত্য

আর একপ্রকার গল্প আছে যাহা মুখ্যতঃ উদ্দেশ্যমূলক বা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সমাবেশ। উহাদের মধ্যে আমরা চরিত্র পাই না, পাই সমাজচিত্র, বাস্তব জীবনের বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত। পূর্ণবিকশিত স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ণ মানব-চরিত্র এখানে অনুপস্থিত—উদ্দেশ্য ও ঘটনার আকর্ষণই এখানে প্রধান। এই জাতীয় গল্পের দৃষ্টান্ত হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধ জাতক, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইটালী দেশের সাহিত্যে ডেকা-মেরন, রূপকথা প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে পশুপক্ষীর রূপকচ্ছলে নীতিতত্ত্ব ও মানবপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কতকগুলিতে

উদ্দেশ্যমূলক গল্পের ধারা

নিরঙ্কুশ রঙীন কল্পনার সাহায্যে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে জীবনের রহস্যময়, আকস্মিক দিকটা সংকেতিত হইয়াছে। ইহাদের চরিত্রগুলি অস্পষ্ট, ছায়াময়, কুহেলিকায় ঢাকা, ঘটনা-চমৎকারিত্বের আড়াল হইতে অর্ধ-পরিস্ফুট। এখানে আমরা মানুষ সম্বন্ধে ততটা কৌতূহলী নই, যতটা যে ঘটনা-জালে সে জড়াইয়া পড়ে তাহার প্রতি আগ্রহান্বিত। উপন্যাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই এই দুই ধারা বর্তমান ছিল এবং উহাদের হইতে প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ও পরবর্তী যুগের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে উহাদের রূপান্তর-সাধন করিয়াই আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব। মানুষ যখন কেবলমাত্র শ্রেণীর প্রতিনিধি নহে, যখন সে নিজস্ব তাৎপর্য ও পরিচিতিতে প্রতিষ্ঠিত তখনই তাহার বিচিত্র জীবনকাহিনী লইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে।

বাংলা উপন্যাসের সুরু ব্যঙ্গচিত্রে

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আসিয়াছে প্রধানতঃ সমাজের ব্যঙ্গচিত্রের সম্প্রসারণে। বিদেশী সভ্যতা ও জীবনাদর্শের অভিঘাতে আমাদের দীর্ঘকাল হইতে অনুসৃত স্রোতোহীন জীবনযাত্রায় যখন চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ জাগিল, যখন আমরা আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার দোষ-গুণ সম্বন্ধে সজাগ হইলাম, যখন অনুকরণ ও গোঁড়ামির বিপরীত-মুখী মোহান্ধতা আমাদের কৌতুকরস ও আঘাত করিবার প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করিল, তখনই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হউক, উহার জন্মস্থল সমাজপ্রতিবেশ সাহিত্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইল। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে 'নববাবুবিলাস' ও ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ভাবী উপন্যাসের আসন্ন পূর্বাভাসরূপে দেখা দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পটভূমি

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক মিলন-প্রচেষ্টা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেই প্রক্রিয়ায় পূর্ণ পরিণতির লক্ষণ দেখা দিল ও বাংলা সাহিত্য এই ভাবদৃষ্টি-সমন্বয়ের ফলে নূতন জীবনীশক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহার পরিচয় পাই কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের এবং উপন্যাস ও গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। প্রথম যুগের ব্যঙ্গাত্মক প্রবৃত্তি কাটিয়া গিয়া তাহার স্থলে গভীর মিলনের অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত হইল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব বস্তু ও তথ্যকে ছাড়াইয়া এক বিশিষ্ট অন্তর্ভেদী ভাব-কল্পনা, মানবপ্রকৃতি-বিচারের এক নূতন অনুভূতি ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর রূপ পরিগ্রহ করিল। ইতিহাসবোধ জাগ্রত হইয়া অতীত যুগের বিস্ময়-রসাশ্রিত কাহিনী ও

আবেগময় জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ও তৎকালীন নরনারীকে জীবন্তবৎ আমাদের নিকটে উপস্থাপিত করিল। সমকালীন জীবনযাত্রার মধ্যেও এক অভিনব ভাব-সংঘাত, আনন্দ-বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব আবিষ্কৃত হইয়া উহাকে অসাধারণ তাৎপর্য ও গৌরবে মণ্ডিত করিল। বাঙালী-জীবনের স্থির জলাশয়ে যেন এক অদৃষ্টপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটার তরঙ্গলীলা খেলিয়া গেল। এই নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত, জীবন-সমুদ্রমন্থনে অজ্ঞাত বিষামৃতের আস্বাদে বিহ্বল, নিজের অপ্রত্যাশিত পরিচয়-উদ্‌ঘাটনে বিস্মিত বাঙালী-সমাজের চিত্রকর-রূপেই বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮—১৮৯৪) উপন্যাসাবলীকে মোটামুটি নিম্নলিখিত শ্রেণী-পর্যায়ে বিভাগ করা যায়—(১) ঐতিহাসিক : 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), রাজসিংহ (১৮৭৭); (২) ইতিহাস-পটভূমিকায় রচিত ও রোমাণ্টিক ভাবকল্পনা-রঞ্জিত গার্হস্থ্য জীবন-চিত্র : 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫); (৩) বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী : 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৬); (৪) ধর্মতত্ত্ব-প্রভাবিত : 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী-চৌধুরাণী' (১৮৮৩), 'সীতারাম' (১৮৮৬); (৫) লঘু ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত : 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩), 'রাধারাণী' (১৮৭৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

(১)

বঙ্কিমচন্দ্র

এই বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চিত্রণ ও ঘটনাবিন্যাসের বিশিষ্ট রীতিটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস লইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। বঙ্কিমের উপস্থাপিত ঘটনাবলী কতদূর ইতিহাসসম্মত এই বিষয়ে সংশয় জাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসরণ করা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যবহির্ভূত ও ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অনিশ্চিত। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের প্রয়োগ করেন উহার নির্ভুল তথ্যানুস্মৃতির দিক দিয়া নহে, উহার সাধারণ জীবনসত্য ও যুগের সাধারণ লক্ষণের দিক দিয়া। অবশ্য ঔপন্যাসিকের ইতিহাস-চিত্রে একটা জীবনানুগ অন্তঃসঙ্গতি থাকা চাই ও কোনও কালানৌচিত্য-

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

দোষ যেন ইহাতে অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া না উঠে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র-পরিবর্তন কবার অধিকার তাঁহার নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলাফল ঠিক রাখিতে হইবে—কিন্তু গৌণ চরিত্রকে তিনি ইচ্ছামত অঙ্কিত, ও যুদ্ধের মধ্যে কিছু কিছু নূতন ঘটনা তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী সংযোজন করিতে পারেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ হইবে ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে জীবনের গতিবেগ বাড়ানো ও উহাব মধ্যে বীবত্বপূর্ণ, উন্নত-আদর্শ-মণ্ডিত ও আবেগ-তবঙ্গিত বিকাশসমূহ ফুটাইয়া তোলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইতিহাসের তথ্য হইতে উহার রস নিষ্কাশন ও জীবন-যাত্রায় উহার স্বচ্ছন্দ-সুন্দর লীলা-প্রদর্শনই আমবা ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে প্রত্যাশা কবিতে পাবি। ইতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া বিশেষ নাড়াচাড়া করিলে এই রসই জমাট বাঁধিবে না ও উহার উপভোগ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। আবও এইজাতীয় উপন্যাসে কার্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃঢ় চবিত্রবিকাশ অপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনাসন্নিবেশই প্রধান আকর্ষণের বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে মোটামুটি এই মূলসূত্রগুলি অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে উড়িষ্যাব অধিকাব লইয়া মোগল-পাঠানে যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহাবই পটভূমিকায় বচিত। এই যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে প্রেমের যে অতর্কিত উদ্ভব, দ্রুত পরিণতি ও সাফল্যের পথে নানা অভাবনীয় বাধা-বিঘ্ন ঘটিয়াছে তাহাই ইহাব উপজীব্য। ইহাব নায়ক মানসিংহের পুত্র যুববাজ জগৎসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও ঠিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ নহেন।, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী ক্ষাত্র শক্তির আদর্শ ও প্রেম-প্রবণ অথচ সন্দেহপরায়ণ তরুণরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিলোত্তমা ও আয়েষা উভয়েই তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কিন্তু আয়েষা আত্মদমনের দ্বারা তিলোত্তমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। প্রতিনায়ক ওসমান ও বীরেন্দ্রসিংহ বীরত্বেব সহিত ঈর্ষ্যা, হঠকারিতা ও প্রবৃত্তির অসংযম মিশাইয়া খানিকটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-পরিকল্পনার সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ ও আচরণে ইহাকে পরিস্ফুট করিবার ক্ষমতা তাঁহার তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার রূপবর্ণনা ও উপন্যাসে উহাদের বিশিষ্ট অংশ-গ্রহণের মধ্যে চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিমলা, আসমানি ও বিদ্যা-দিগ্‌গজের চরিত্রে বাস্তব জীবনের দিকটাও দেখানো হইয়াছে। কতলু খাঁর হত্যা, তিলোত্তমার অন্তরে প্রেমের উন্মেষ, আয়েষার আত্মবিসর্জন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব—

দুর্গেশনন্দিনী

এই সমস্ত দৃশ্যগুলি মানবিক আবেগবর্ণনায় বঙ্কিমের নিপুণতার পরিচয় বহন করে। 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স হইলেও ইহাতে মানবপ্রকৃতির পরিচয় অনেকটা হালকা ও স্বপ্নাবিষ্ট হইলেও ইহার মধ্যে যে বাস্তব স্পর্শের অভাব নাই, তাহা এই দৃশ্যগুলি ও তাঁহার সাধারণ জীবন-চিত্রণ প্রমাণ করে। বিমলাচরিত্র পুরনারী ও পরিচারিকার সংমিশ্রণে গঠিত ও নারীপ্রকৃতির দ্বৈতরহস্য ইহাতে কতকটা আভাসিত হইয়াছে।

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী। ইহাতে ইতিহাস-তথ্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক কল্পনার অংশই বেশী।

মৃণালিনী

ইহার চরিত্রগুলি প্রায় সবই অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কিংবদন্তীর পিছনে যে সুনিশ্চিত বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা বিদ্যমান, বঙ্কিম পশুপতি-চরিত্রে তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। ইহার ইতিহাস-অংশ অত্যন্ত শিথিল; ঐ সুদূর অতীতের সাধারণ জীবনযাত্রাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। বাঙলার স্বাধীনতালোপের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বঙ্কিম দিতে পারেন নাই, তবে ইহার মর্মান্তিক গ্লানি ও অনুশোচনা তিনি অগ্নিস্রাবী ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আসলে রাজনৈতিক পটভূমিকায় ইহা দুইটি প্রেমের কাহিনী। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে কল্পিত—কেবল মৃণালিনীর অবিশ্বাসিতা সম্বন্ধে সন্দেহ ইহাকে ক্ষণেকের জন্য ঘোরাল করিয়াছে। পশুপতি-মনোরমার প্রেম আধুনিক জটিলতায় দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। পশুপতির আকর্ষণ সহজেই অনুভব করা যায়; কিন্তু মনোরমার মনোভাব—পশুপতিকে নিজ স্বামী জানিয়া তাহার প্রতি আগাইয়া যাওয়া, আবার পর মুহূর্তেই এক নিগূঢ় বিমুখতায় পিছাইয়া আসা—প্রহেলিকার মত কৌতূহল জাগায়। মনোরমার নিজের প্রকৃতিতেও দ্বৈতভাবের সংমিশ্রণ তাহাকে একসঙ্গে আকর্ষণীয় ও দুরধিগম্য করিয়াছে। মনোরমাচরিত্র-পরিকল্পনা ও যবনপ্লাবনের দৃশ্য—এই দুইটি বিষয়েই বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক অগ্রগতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

'রাজসিংহ'-কে (১৮৭৭) বঙ্কিম তাঁহার একমাত্র সত্যিকার ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে ইহাতে যে শুধু ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ বেশী আছে তাহা নয়, ইহাতে ইতিহাস-রসই উপন্যাসের

রাজসিংহ

প্রাণবস্তু। রাজসিংহ, আওরঙ্গজেব উভয়েই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং ইঁহারাই উপন্যাসের নায়ক ও প্রতিনায়ক। ইতিহাসের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিসংঘর্ষই উপন্যাসের মূল উপাদান ও ইহার

পরিণতির স্তবনির্মাণেব সহায়ক—ইতিহাসেব কটাক্ষে আবর্তিত হইয়াই উপন্যাসের রস ঘনীভূত হইয়াছে। ইতিহাস-বহির্ভূত অংশ—জেব-উন্নিসা-মবাবক-দরিয়া ও মাণিকলাল-নির্মলকুমাবীব কাহিনী—ইতিহাসেব বৃহত্তব আলোড়নেব মধ্যে ব্যক্তিক দ্বন্দ্বেব ক্ষুদ্রতব ও তীব্রতব আত্মকেন্দ্রিক আবর্ত রচনা করিয়া ইতিহাসকে ব্যক্তিজীবনেব রসে সমৃদ্ধ ও জীবনকে ইতিহাসেব গতিবেগে চঞ্চল কবিয়াছে। এখানে ইতিহাসে আকস্মিকতা যেন জীবন-নাটকেব সুশৃঙ্খল পবিণতিতে বিধৃত হইয়া অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস গার্হস্থ্য জীবনেব পটভূমিকারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—এখানে ইতিহাস মুখ্য নহে, গৌণ। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'চন্দ্রশেখব'-(১৮৭৫)-এ পবিবাব-জীবনেব ঘবোয়া সুখ-দুঃখ-অন্তর্দ্বন্দ্বই ইতিহাসেব সামান্য একটু স্পর্শে একটা ভাব-নিবিড়তা ও অসাধাবণ রস-রূপ লাভ কবিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'-য় ইতিহাস প্রায় নাই বলিলেই চলে। ইতিহাস-বাজ্য হইতে আগন্তুকা মতিবিবি ইতিহাস হইতে যুগ-পবিচয় লইয়া আসে নাই, আসিয়াছে মোগল সাম্রাজ্যেব অন্তঃপুর-লালিত দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ও দুর্জয় সংকল্প লইযা। তাহার হঠাৎ-উন্মেষিত স্বামিপ্রেম —কুলত্যাগ ও বহুচাবিণীত্বেব সমস্ত বাধাকে যে শক্তিতে হেলায় অস্বীকার কবিয়াছে তাহাব মূল উৎস বাদশাহেব অন্দবমহলে সুদীর্ঘ জীবনযাপন-প্রসূত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। আবেগের যে স্পর্ধায় সেলিম মেহেরুন্নিসাকে পতিবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, সেলিম-প্রণয়িনী মতিবিবিও সেই জোরে পূর্ব-স্বামীকে সপত্নীবক্ষ হইতে কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত। এ শক্তি সে আর কোথা হইতে পাইত না বলিয়াই উপন্যাসে ইতিহাসেব অবতারণা। 'কপালকুণ্ডলা'র সত্যিকাব বিষয় হইল নায়িকাব অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-উদ্‌ঘাটন। নির্জন সমুদ্রকূলে, ধর্মীয় আবহাওয়ায় অসামাজিক জীবনে লালিতা কিশোরী গার্হস্থ্য ধর্মের সহিত কতখানি নিজেকে মানাইয়া লইতে পাবে উপন্যাসের মধ্যে ইহারই পরীক্ষা চলিয়াছে। অবশ্য এই পবীক্ষাব ফলে কোন সার্বভৌম জীবন-সত্যে পৌছানো যায় না। কপালকুণ্ডলার স্বভাব নিস্পৃহ ও ধর্মমোহাভিভূত চিত্তে যে প্রেমের রং ধরে নাই ইহা যেমন তাহার আবেষ্টনের ফল, তেমনি তাহার প্রকৃতিরও পবিণাম। প্রথমদর্শনে নবকুমাবের প্রতি তাহার যে দয়া ও সহানুভূতি জাগিয়াছিল, দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্বামীর প্রণয়াতিশয্যের ফলেও তাহা প্রেমে রূপান্তরিত হইল না। শ্যামার স্বামিবশের ঔষধ-আহবণও সেই একই

কপালকুণ্ডলা

সমবেদনা-প্রসূত। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রেম-সহযোগিতার উত্তাপ- ও মাদকতা-শূন্য। সমুদ্রসৈকতের নির্জনতায় যাহার আবির্ভাব, জাহ্নবী-তরঙ্গের সমুদ্রাভিমুখী গতি-প্রবাহের মধ্যে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা ও নিশ্চিহ্ন বিলয়। যে নিগূঢ় ভাবসঙ্গতি শ্রেষ্ঠ রোমান্সের লক্ষণ, যে অনিবার্য ঘটনা-পরিণতির একমুখিতা মহৎ ট্রাজেডির প্রাণশক্তি সেই উভয়বিধ উৎকর্ষই 'কপালকুণ্ডলা'তে উদাহৃত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখর' অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ঘটনা-ভিত্তিতে রচিত। ইংরেজী-আমলের প্রতিষ্ঠা ও মীরকাশেমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ—ইহাই উপন্যাসের পটভূমিকা। এখানে ইতিহাস ও গার্হস্থ্যজীবন প্রায় সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী আর মীরকাশেম-দলনী এই দুই আখ্যান অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার একই জালে আবদ্ধ; এবং ইহাদের সহযোগিতা উপন্যাসের ট্রাজেডিকে আরও গভীর ব্যাপকতা দিয়াছে। দরিদ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে ও রাজার প্রাসাদে একই অপ্রতিবিধেয় দুর্দৈব নিজ অশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিহাসের ঘূর্ণায়মান চক্রের তলে রাজমহিষী ও ব্রাহ্মণগৃহিণী একই সঙ্গে পিষ্ট হইয়াছে। দলনীর দুর্ভাগ্য মূলতঃ ইতিহাসসঞ্জাত—গুরগণ খাঁর রাজনৈতিক চক্রান্তই তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছে। শৈবলিনী নিজ অদম্য প্রবৃত্তির বেগেই পারিবারিক জীবনের সুরক্ষিত গণ্ডী হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—তবে এই গৃহ-উৎক্রমণের প্রথম প্রেরণা আসিয়াছে ইতিহাস-ঝটিকার এক ঝলক উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ হইতে। যে আগুনে চন্দ্রশেখরের গৃহ পুড়িয়াছে তাহা প্রধানতঃ শৈবলিনীর অন্তঃরুদ্ধ চিত্তপ্রদাহ হইতে উদ্ভূত, কিন্তু লরেন্স ফস্টার নামে ইতিহাস-অগ্নিকুণ্ডের একটা জ্বলন্ত শলাকা আসিয়াই ভিতরের চাপা আগুনকে বাহিরে মুক্তি দিয়াছে। শৈবলিনী-চরিত্র এই উপন্যাসে বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সুদীর্ঘ আত্মনিরোধ, ফস্টারকে আমন্ত্রণ জানাইবার অভাবনীয় দুঃসাহসিকতা, দৃঢ় মনোবল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনভ্যস্ত ইতিহাস-সঙ্কটের মধ্যে স্বচ্ছন্দ-নির্ভর পদক্ষেপ—এ সবই যেমন তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন, তেমনি তাহার উৎকট, নরক-বিভীষিকার উত্তপ্ত কল্পনাজাল-সমাকীর্ণ, মনোবিকারমূলক প্রায়শ্চিত্তের চিত্রও সেই একই অসাধারণত্বের দ্যোতক। তাহার মনোগহনের যে গভীর গুহায় তাহার পাপের অদৃশ্য মূল নিহিত, তাহাতেই অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া এক শ্বাসরোধকারী ধূমোচ্ছ্বাস বিকীর্ণ করিয়াছে। পাপ তাহাকে যে অতল গভীরে নিমজ্জিত করিয়াছে, আত্মশুদ্ধির প্রেরণা তাহাকে ঠিক সেই অনুপাতে কল্পনার

চন্দ্রশেখর

ঊর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তেব এই ভারসাম্যের মধ্যেই শৈবলিনী-চরিত্রের স্বাভাবিকতা নিহিত। চন্দ্রশেখব ও প্রতাপ শ্রেণীপ্রতিনিধি, ব্যক্তিত্বভাস্বর নহে, তবে শৈবলিনীর প্রবল আকর্ষণের সহিত তুলনায় প্রতাপের মিতভাষিতা ও সংযম তাহাব ব্যক্তিত্বকে কতকটা পরিস্ফুট কবিয়াছে। শৈবলিনীব রহস্যময় চরিত্র ও ইতিহাস ও পবিবাব-জীবনের সুনিপুণ গ্রন্থনেব মধ্য দিয়া নিদারুণ নিয়তিবাদের ব্যঞ্জনাই উপন্যাসটিকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীব উপন্যাসগুলি বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনের সংঘাত-সমস্যা-সম্বন্ধীয়। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৫), ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৬) বঙ্কিম-প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। এই উপন্যাসসমূহে বঙ্কিমেব জীবন-চিত্রণের মধ্যে সমাজ-নীতিব প্রাধান্য আধুনিক সমালোচক-গোষ্ঠীর বিরূপ মন্তব্যের হেতু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে যে প্রত্যেক দেশেব সমাজে কোন না কোন আদর্শের প্রভাব দেখা যায়—আদর্শহীন বাস্তব বর্ণনা ও প্রবৃত্তিব নিরঙ্কুশ প্রসার সেই বিশেষ সমাজের জীবনধারাব সত্য পরিচয় নাও হইতে পারে। বঙ্কিমেব যুগে বাঙালী-হিন্দুসমাজ নীতি-শাসিত আদর্শানুসরণের মধ্যেই নিজ প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিত। বাঙালীর সমস্ত জীবনযাত্রা সমাজ-কল্যাণের আদর্শকেই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সহজ শিষ্টাচার, ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ও মনুষ্যত্বের সমর্থন পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বরূপলক্ষণ, তেমনি নীতি ও ধর্মের অনুশাসনে প্রবৃত্তিদমন, দশের কল্যাণার্থ একের আত্মবিসর্জন বাঙালী সমাজের স্বাভাবিক জীবনছন্দরূপে, জীবনের স্বতঃসিদ্ধ লক্ষ্যরূপে স্বীকৃত ছিল। সুতরাং নীতির খাতিরে বঙ্কিম সহজ জীবনধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন এই সমালোচনা অন্ততঃ বঙ্কিমযুগের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য। হিন্দুসমাজ পার্বত্য শহরের মত আদর্শের উচ্চশৃঙ্গে নির্মিত ছিল—উহার স্বাভাবিক চলা-ফেরা সমতলভূমির মধ্যে নহে, দুরারোহ চড়াই-এর কৃচ্ছ্রসাধনের পথই অনুসরণ করিত। বাঙলা দেশে নর-নারীর স্বাধীন প্রেম, প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা সমাজ-চিত্তের বিশেষ গঠনের জন্যই, মানস সংস্কৃতির বিপরীত প্রভাবের ফলেই এমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করিবে, যাহাতে ইহার শুধু বাহিরের সাফল্য নহে, অন্তরের আত্মপ্রসাদও ব্যাহত হইবে। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বালবিধবা; তাহাদের প্রেম-উপভোগ-স্পৃহা স্বাভাবিক ও সহানুভূতির যোগ্য। কিন্তু এই স্পৃহাকে বিশেষ পুরুষের সাহচর্যে চরিতার্থ করিতে গেলে প্রবলতর অধিকার ও সমাজকল্যাণ বিপর্যস্ত হয়। সুতরা

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণ-কান্তের উইল

বাংলার সমাজ-মানসের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় এই ইচ্ছা কল্যাণ হইতে অকল্যাণই সৃষ্টি করিয়াছে বেশী। ইহাকে জয়ী করিলে দেশের বাস্তব প্রতিবেশে জীবনের যে রূপটি ইহার পরিণত ফল তাহার বিরোধিতা করা হয়। কুন্দ ও সূর্যমুখী উভয়ে সমান নির্দোষ ও পাঠকের সমান সহানুভূতির পাত্র, সুতরাং সূর্যমুখীর ন্যায্য ও ধর্ম- ও সমাজ-সমর্থিত অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া সেখানে কুন্দকে স্থাপিত করিলে যে অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা আর্ট ও নীতি উভয়ের বিচারেই অন্যায্য। কুন্দের প্রতি আকস্মিক রূপমোহ যদি চিরকালের জন্য সূর্যমুখীর দীর্ঘ-পরীক্ষিত গুণানুরাগের উপর জয়ী হইত, তবে ইহার মধ্যে কি মহৎ জীবননীতি ফুটিয়া উঠিত? কুন্দের মনে যে অনধিকারের অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল ছিল, তাহাই অবহেলার অজুহাতে তাহাকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম-সংস্কার তাহার চেতনার গভীরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নিজ হাতে তাহার জলো কালিতে লেখা অধিকার-লিপি মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য করিয়াছে। কুন্দের মহৎ প্রকৃতি সে যে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা, সূর্যমুখীকেন্দ্রিক নগেন্দ্রের সংসারে তাহার যে কোন স্থির আসন নাই এই ধারণায় আত্মাবমাননা হইতে আত্মবিনাশকেই প্রশস্ততর পন্থা বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে।

রোহিণী চরিত্র

রোহিণী সম্বন্ধে এই মন্তব্য আরও প্রযোজ্য। গোবিন্দলাল ও রোহিণী রূপতৃষ্ণা-প্রণোদিত হইয়া একজন ক্ষুব্ধ অভিমানে, আর একজন জীবনপিপাসার অনিবার্য প্রয়োজনে পরস্পরকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে গুণাকর্ষণের কোন স্পর্শই ছিল না। রোহিণীর সহিত তুলনায় ভ্রমরের প্রেম অনেক বেশী উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল। সুতরাং ভ্রমরের প্রেমের অপেক্ষা ইহাকে বেশী স্থায়িত্ব দিলে তাহা মানবপ্রকৃতি ও বিশ্ববিধান উভয়েরই বিরোধী হইবে। ভ্রমর অতিরিক্ত আদর্শবাদ ও অভিমান-প্রবণতার জন্য মরিল। রোহিণী মরিল তাহার মত ইতর ও লালসাময় প্রেম বাঁচিতে পারে না বলিয়া। রোহিণীর অন্য কোনও রূপ সুখী পরিণাম, উপন্যাসের চরিত্র-কল্পনা ও বিষয়-বিন্যাসের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সম্ভব মনে হয় না। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া রোহিণীর প্রেমে তৃপ্তি লাভ করিলেন ইহা উভয়েরই চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন। গোঁয়ার হরলালই তাহার যোগ্য জীবন-সঙ্গী হইত, কিন্তু তাহার বংশমর্যাদা তাহার প্রেমানুভূতি অপেক্ষা বড় হইয়া এই সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করিয়াছে। যাঁহারা রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু ঘটাইবার জন্য বঙ্কিমকে হৃদয়হীনতার জন্য অপরাধী করিয়াছেন তাঁহারা রোহিণী সমস্যার কোন

উৎকৃষ্টতর সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। রোহিণী বাঁচিয়া থাকিলে হীরা দাসীর পর্যায়ে নামিয়া যাইত; তাহার মৃত্যু অন্ততঃ তাহাকে এই অবনতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। রোহিণীর অপমৃত্যু তাহার কলঙ্কিত ভোগসর্বস্ব প্রেমের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য মৃত্যু—ইহাতে নীতির কোন অনুচিত প্রভাব নাই, আছে সূক্ষ্মতর বিশ্ববিধানের সহিত সহজ সঙ্গতি।)

'রজনী'তে অনেক আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার আছে; মনে হয় যে বঙ্কিমের কল্পনা এখানে বাস্তব বন্ধন সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া বাস্তবের মুখোস-পরা এক মায়ারাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিহার করিয়াছে। অন্ধের রূপোন্মাদ ও প্রেমোন্মেষের মধ্যে যে একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল আছে বঙ্কিম তাহার কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন, তবে ইহার মধ্যে নিষ্ঠার গভীরতা নাই, আছে অভিনবত্বের বিস্ময়-বোধ। শচীন্দ্র-রজনীর প্রেমের মধ্যে সন্ন্যাসীর তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রক্ষেপই প্রমাণ করে যে ইহার মানবিক দিকের ছিদ্রকে অলৌকিকত্বের বাংঝাল দিয়া আবৃত করিতে হইয়াছে। লবঙ্গলতার নিরুদ্ধ প্রেমের কাহিনীও খানিকটা অতি-নাটকীয় মনে হয়; সে অমরনাথকে সত্য ভালবাসিলে তাহার ঘৃণার আগ্নেয় স্বাক্ষর প্রেমিকের পৃষ্ঠদেশে মুদ্রিত হইয়া থাকিত না। ইহার মধ্যে এক অমরনাথের উক্তি ও আচরণের মধ্যেই সত্যানুভূতির গভীর সুর ও জীবন-সমীক্ষার দার্শনিক সার্বভৌমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমের নিজের জীবন-জিজ্ঞাসার আর্তি, জীবনরহস্যের সন্ধান ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। অমরনাথের এত রূপ-গুণ সত্ত্বেও, তাহার তীক্ষ্ণ মনীষা ও পরোপকার-প্রবণতা সত্ত্বেও কেন যে তাহার জীবনে দারুণ শূন্যতাবোধ, চরম ব্যর্থতা আসিয়াছে তাহারই মর্মভেদী, সমাধানহীন প্রশ্ন সমস্ত উপন্যাসে ধ্বনিত হইয়াছে। উপন্যাসটি প্রথম শ্রেণীর হউক বা না হউক, ঔপন্যাসিকের আত্মপরিচয় অমরনাথের মধ্যে যে বিধৃত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার আঙ্গিকের অভিনবত্বও বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন সম্বন্ধে নূতন পরীক্ষা-প্রবণতার সার্থক নিদর্শন।

রজনী

বঙ্কিমের গার্হস্থ্য জীবনের উপন্যাসগুলির উৎকর্ষের প্রধান নিদর্শন উহাদের মধ্যে জীবনসংঘাত, মহৎ প্রকৃতির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মহিমান্বিত প্রকাশে। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের প্রলোভনের সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম, কুন্দ-সূর্যমুখী-ভ্রমরের দারুণ মনঃপীড়া, স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তির ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের নিজ কৃতকর্মের ফলের সঙ্গে অদৃষ্টের অভাবনীয় সংযোগ—এই সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ,

গার্হস্থ্য উপন্যাসে জীবনবোধ

রহস্যময় রূপ আমাদের নিকট ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবন-সমুদ্রে সুখ-দুঃখ-তরঙ্গো-চ্ছ্বাসের যে বিপুল আলোড়ন আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ। ইহাদের নীতিবাদ বাহির হইতে কৃত্রিম-ভাবে আরোপিত অলঙ্কার নহে, ধর্মসংস্কার-লালিত হিন্দুজীবনের সহজ প্রাণ-লীলার অভিব্যক্তি, অস্থিমজ্জাগত প্রেরণারই ঐতিহ্যানুসারী স্ফুরণ। পরবর্তী-যুগে আমাদের নিজের জীবনবোধের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা বঙ্কিমের জীবনদর্শনের অকৃত্রিমতায় সংশয় পোষণ করি।

বঙ্কিমের চতুর্থ শ্রেণীর উপন্যাস-ত্রয়ীতে—'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৩) ও 'সীতারাম'-এ (.৮৮৬)—তত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনবোধকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ ধারণাই জন্মে। মনে হয় যে বঙ্কিমের আদর্শকল্পনা ঠিক উপন্যাসধর্মী না হইয়া উপন্যাসের বহি-রবয়বের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশের অবসর খুঁজিয়াছে। জীবন-প্রত্যয় অপেক্ষা তত্ত্বপরীক্ষাই যেন বঙ্কিমের প্রধান অভিপ্রায়। 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাসের নিরূপিত তথ্যসীমায় ধ্যানকল্পনা কতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, কর্মসন্ন্যাসের গেরুয়া আংরাখায় আধুনিক স্বদেশপ্রেমের ইউনিফর্ম কতটা তৈয়ারী হইতে পারে, অতীতের ছায়াপটে ভবিষ্যতের অস্ফুট সম্ভাবনা কতখানি সুস্পষ্টভাবে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, বঙ্কিম উপন্যাস-রীতির মাধ্যমে তাহারই পরীক্ষা করিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে ভয়াবহ শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, বঙ্কিম তাঁহার আবেগময় কল্পনার দ্বারা সেই ফাঁক পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। এই ঘটনা ও সমাজশৃঙ্খলাচ্যুত, বিপর্যস্ত জনসংঘের মনে বাস্তব প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে নূতন জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্বপ্নচ্ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহাই উপন্যাসের একমাত্র বস্তুগত অবলম্বন। তাহা ছাড়া, আর সমস্তই উদাত্ত-কল্পনাদীপ্ত ভাব-রূপক। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভক্তিসাধনের আকুল প্রশ্নের যে দৈববাণীরূপ উত্তর মিলিয়াছে তাহাই উপন্যাসের মর্মকথা। উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রীই এই সাধনার অঙ্গ ও উপকরণমাত্র, তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। সন্তানধর্মের দীক্ষা তাহাদের পূর্বনামের ন্যায় তাহাদের ব্যক্তিসত্তাকেও গ্রাস করিয়াছে। ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি—ইহারা বিভিন্ন অবস্থা-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু আসলে ইহারা আদর্শ-সূর্য-প্রক্ষিপ্ত ছায়ারই সমস্থাভেদে আকার-ভেদ মাত্র। এক মহেন্দ্র ও কল্যাণী সম্পূর্ণভাবে সন্তানধর্মের আওতায় আসে

আনন্দমঠ

নাই বলিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্বের কিছুটা অবশিষ্ট আছে। গ্রন্থশেষে মহাপুরুষ আসিয়া সত্যানন্দকে লইয়া গিয়াছেন; ইংরেজের নিকট বহির্বিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগ লইবার জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম আপাতত মূলতুবী রহিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা অন্তর-লোকের প্রতিবিম্ব মাত্র—উপন্যাস-রীতির ছদ্মবেশে কল্পিত ভাবসাধনারই বহির্বিকাশ।

দেবী চৌধুরাণী

'দেবী চৌধুরাণী'-তে (১৮৮৩) সমাজ, পরিবার ও তৎকালীন রাষ্ট্র-বিশৃঙ্খলার যে চিত্র আছে তাহা সম্পূর্ণ বাস্তবানুযায়ী। হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর বৌ, নয়ান বৌ সবাই আমাদের চেনা-শোনা প্রতিবেশী। এই বাস্তব খোলসের মধ্যে বঙ্কিম অনুশীলন-তত্ত্বের ও নিষ্কাম ধর্মের শাঁস ঢোকাইয়াছেন। প্রফুল্ল-কে তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার-রূপে-কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু সে দেবীত্বে উন্নীত হইয়াও শাশ্বত নারীত্ব হারায় নাই। প্রফুল্লকে কোন অবস্থাতেই অবাস্তব বা বাঙলার সমাজ-জীবনের সহিত বেমানান মনে হয় না। দেবী চৌধুরাণী-রূপে সে সাগরের বাপের বাড়ি গিয়াছে ও ব্রজেশ্বরকে ধরিবার জন্য কৌতুকরসপূর্ণ কৌশল-জাল পাতিয়াছে। শাস্ত্রবিদ ও নিষ্কামধর্মব্রতী প্রফুল্লকেও সংসারকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে চমৎকারভাবে মানাইয়াছে; এত পালিশ সত্ত্বেও বাঙালী নারীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কার তাহার মধ্যে একেবারেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙালী পরিবারের আদর্শগৃহিণীর মধ্যে গীতাতত্ত্বের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রকাশ পাইয়াছে, প্রফুল্ল সেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভবানী পাঠককে কোন মহাপুরুষ অজ্ঞাত রহস্যের রাজ্যে লইয়া যায় নাই; প্রফুল্ল শান্তির ন্যায় হিমালয়ে তপস্যা করিতে যায় নাই। কাজেই একজনকে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট ফাঁসি দিয়াছে; অপরজন সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বঙ্কিমের আকাশচারী কল্পনা এই উপন্যাসে মাধ্যাকর্ষণের টান স্বীকার করিয়া মৃত্তিকায় নামিয়া আসিয়াছে। দিবা-নিশা প্রভৃতি দুই-একটি রূপক-চরিত্রকে বাদ দিলে এই উপন্যাসে তত্ত্বের উপস্থিতি ঔপন্যাসিক রসের বিশেষ হানি করে নাই।

সীতারাম

বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-ও অতিরিক্ত তত্ত্বভারাক্রান্ত বলিয়া মনে করা যায় না। এখানে ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, পরিবার-জীবনের সমস্যা-সঙ্কট ও ব্যক্তি-চরিত্রের বেদনাময় বিপর্যয় একটি কার্যকারণ-সূত্রগ্রথিত, দৃঢ়বদ্ধ বাস্তব পরিবেশ রচনা করিয়াছে। এই সুরক্ষিত গৃহদুর্গে বিকৃত ধর্মবোধ, সন্ন্যাসের মিথ্যা আস্ফালন

বিস্ফোরক বারুদের মত ভয়াবহ ভাঙন ধরাইয়াছে। এবং যেহেতু সীতারাম শুধু গৃহস্বামী নহেন, রাজাও বটেন, সেইজন্য গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানও ভূমিসাৎ হইয়াছে। শ্রী অদৃষ্টবিড়ম্বিতা, শত্রুমর্দিনী ও অপ্রাপণীয়া—এই ত্রিবিধ কারণের সমাবেশে সাধারণ হইয়াও রোমান্সের অসাধারণত্ব-মণ্ডিতা; কিন্তু নন্দা ও রমা একেবারে খাঁটি বাঙালী স্ত্রী। সীতারামের অধঃপতনের মূলে ধর্মতত্ত্বের পরোক্ষ প্রভাব আছে; কিন্তু যে অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা তাহার সংযমকে উৎখাত করিয়াছে তাহা বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। রমার প্রতি গঙ্গারামের মোহ ও রমার স্বামিপুত্রের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রসূত মোহান্ধতার কাহিনী আধুনিক উপন্যাসের মনোবিকার-বিশ্লেষণের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইবে। পার্থক্য এই যে রমা কখনই সচেতনভাবে অবৈধ প্রেমের প্রশ্রয় দেয় নাই ও নিজের ভুল বুঝিয়া সে চরম প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রমার প্রকাশ্য বিচারের দৃশ্য বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তির উৎকর্ষের জ্বলন্ত নিদর্শন। সর্বনাশের শেষ মুহূর্তে সীতারামের আকস্মিক জাগরণ, তাহার সুপ্ত মহত্ত্বের অতর্কিত পুনরুদ্বোধন—সাধারণ মনস্তত্ত্ব ও হিন্দুর বিশেষ মানস সংস্কার উভয়ের দ্বারাই সমর্থিত। ধর্মতত্ত্ব-প্রতিপাদন লেখকের উদ্দেশ্য ইহা স্বীকার করিলেও যে উপায়ে এই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা উপন্যাস-রীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

(৫) বঙ্কিম ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' সংক্ষিপ্ত উপন্যাস, ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত নহে। উপন্যাসের আঙ্গিক স্থিরীকৃত না হইলে ছোট-গল্পের রস ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে। উপন্যাসের প্রত্যাশিত রসপরিণতি যে ক্ষুদ্রতর পরিসরে ও সুমিত উপকরণের সাঙ্কেতিক প্রয়োগে লাভ করা যায় এই অনুভূতি ও শিল্পবোধ জাগিতে সময় লাগে। যেমন মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য হইতে গীতি-কবিতা, তেমনি বড় উপন্যাস হইতে ক্ষুদ্রতর কাহিনীর ভিতর দিয়া ছোট গল্পের ক্রমাবির্ভাব। কাজেই উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্পের সূক্ষ্মতর কারুশিল্প ও মানবিক আবেদনের একটা আংশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার তাৎপর্য অনুভব করেন নাই। তখন দীর্ঘরচনার, মানবজীবনের বিস্তৃত পরিচয়ের যুগ; ঘরের একটা জানালা খুলিয়াই যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহার মধ্যেই যে একটি অখণ্ড রসাবেদন নিহিত আছে তাহা সে যুগে অনুভূত হয় নাই। সেই জন্য

বঙ্কিমের অন্যান্য গল্প

যে সমস্ত খণ্ডকাহিনীতে ছোটগল্পের সম্ভাবনা ছিল তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিস্তারিত ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও আকারে ছোট কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু উহারা ছোটগল্প হইয়া উঠে নাই। ছোটগল্পের সার্থক আবির্ভাবের জন্য আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

(২)

রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই উপন্যাস-রচনায় হাত দিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক উপন্যাস-ধারার সার্থক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত দীপ্ত কল্পনা তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা তাঁহার অপেক্ষাকৃত বেশী।

তাঁহার 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) ও মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) তাঁহার প্রথম স্তরের ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনচিত্রণের প্রথা অনুসরণ করিয়া তাঁহার উপর বঙ্কিম-প্রভাবের নিদর্শন দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার উপন্যাসে এই উভয়বিধ উপাদানের সংমিশ্রণ সর্বত্র সমপরিমাণেও হয় নাই, সুষ্ঠুও হয় নাই। 'বঙ্গবিজেতা' বিশেষতঃ কাঁচা হাতের রচনা। এখানে আকবর-টোডরমলের ইতিহাসের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের সংযোগ খুব নিবিড় বা ঘনিষ্ঠ হয় নাই। এখানে ইতিহাসেরই প্রাধান্য এবং যাহা কিছু ঘটিয়াছে সবই ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসের গ্রাস হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য উদ্ধার করিতে পারে নাই। চরিত্রগুলি সবই অস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যহীন। বিমলা-চরিত্র অনেকটা আয়েষা-চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত। উপন্যাসটি কোথায়ও জীবন-অভিজ্ঞতা-বর্জিত প্রথানুসরণের উর্ধ্বে উঠে নাই।

বঙ্গবিজেতা

'মাধবীকঙ্কণ' 'বঙ্গবিজেতা'র তুলনায় অনেক উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। এখানে নরেন্দ্রনাথ নামে এক জমিদারপুত্র কর্মচারী-চক্রান্তে জমিদারি হারাইয়া ও কর্মচারী-কন্যা হেমলতার প্রণয়ে ব্যর্থ হইয়া দেশ ছাড়িয়া রাজমহলে সাহ সুজার দরবারে উপস্থিত হইয়াছে ও সাজাহানের রাজত্বশেষে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে যে তুমুল ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দেয় তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইতিহাস-চক্রে ঘূর্ণিত

মাধবীকঙ্কণ

হইবার পর হইতেই তাহার ব্যক্তিগত জীবন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। তথাপি তাহার নিষ্ফল বাল্যপ্রণয়ের করুণ ও ক্ষুব্ধ স্মৃতি তাহার অন্তরে অনির্বাণ চিতানলের মত প্রধূমিত হইয়াছে। আর যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফাঁকে ফাঁকে এক রহস্যময়, দুর্দম প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাহার নিস্পৃহত্বকে বিড়ম্বিত করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। এই অবাঞ্ছিত প্রেমের অত্যাচার তাহার জীবনে অনেক দুঃখ আনিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অভাগিনী জেলেখাঁ ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যায় সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত নরেনকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। কেননা সেখানে সে বেতন-ভোগী সৈনিকরূপে সাধারণ দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু প্রেমই তাহার জীবনে সত্যিকার জটিলতা আনিয়াছে। যে প্রেমকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও যে প্রেমের নিকট সে নিজে প্রতিহত হইয়াছে উভয়ের মিলিত প্রভাব তাহাকে ক্ষুব্ধ ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে—একটা তিক্ত নৈরাশ্যবোধে সে জীবনের সুস্থ, সহজ বিকাশ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। নরেন্দ্র-চরিত্রের এই বিকৃতি, তাহার রোষপ্রবণতা ও অস্থির হঠকারিতা ও ইহাব সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিশ্রিত তাহার গভীর হৃদয়াবেগ ও প্রথম প্রণয়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তাহার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে ইহাই রমেশচন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। শেষ পর্যন্ত বিবাহিতা হেমলতাব সহিত তাহার দেখা হইয়াছে ও বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ যে মাধবীকঙ্কণ সে হেমলতার হাতে পরাইয়া আসিয়াছিল হেমলতা তাহা ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের সমস্ত সম্পর্কেব অবসান ঘোষণা করিয়াছে। এই বিদায়-দৃশ্যটি আবেগের গভীর, অথচ সংযত প্রকাশ ও বিষাদময় কারুণ্যরসের উদ্দীপনে উপন্যাস-জগতে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইহার পর, (মহারাষ্ট্র) 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও (রাজপুত) 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯) রমেশচন্দ্রের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি উজ্জ্বল নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে 'রাজসিংহ'-কে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়াছিলেন ইহারাই সেই অর্থে একই দাবী করিতে পারে। 'জীবন-প্রভাত'-এ শিবাজীর অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুত্থান, মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বাধীনতা-সংগ্রাম বর্ণনীয় বিষয়। এই উপন্যাসে রাষ্ট্রযুদ্ধই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে—ইহার মধ্যে ব্যক্তিসংঘর্ষের একমাত্র নিদর্শন রঘুনাথজী হাবিলদারের সঙ্গে তাহার ভগ্নীপতি

মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত

চন্দ্ররাও-এর ঈর্ষ্যামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই পারিবারিক কলহ ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের গতির মধ্যে এক-আধটু অসম ছন্দের প্রবর্তন করিলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। রঘুনাথ ও সরযূর প্রেমকাহিনীও একেবারে বিশেষত্বহীন। আমরা সমগ্র উপন্যাসে শিবাজীর মহনীয় চরিত্র, তাঁহার সংগ্রামের রোমাঞ্চকর বিবরণ ও নবোদ্ভূত সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে বিপুল প্রাণস্পন্দন ও কর্ম-উদ্দীপনার কাহিনীতেই মুগ্ধ হই, কোন সূক্ষ্মতর আবেদনের প্রত্যাশা করি না।

রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা

'জীবন-সন্ধ্যা'-য় ইতিহাসবিশ্রুত, কীর্তিভাস্বর রাজপুতজাতির অস্তোন্মুখ গৌরবের শেষরশ্মির করুণ, বিষাদময় দীপ্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়ের রাজপুতের ন্যায় কোন ঐতিহ্য-মহিমা ছিল না। রাজপুতদের রীতি-নীতি, তাহাদের প্রভুভক্তির আদর্শ ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কলহ-বিরোধ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপকরণে বিশেষ সমৃদ্ধ ও শুধু রাষ্ট্রের কথায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র জাতির মর্মকথা ও বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। দুর্জয়সিংহ-তেজসিংহের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দেশশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে এই জাতিবৈরের সাময়িক বিরতি, বৈর-নির্যাতন-বিষয়ে উন্নততম নৈতিক আদর্শের অনুসরণ—এই সমস্তই প্রতাপসিংহ-মানসিংহের রাজনৈতিক সংঘর্ষ অপেক্ষা উপন্যাসে প্রাধান্য পাইয়াছে ও পাঠকমনে অধিকতর আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইহা শুধু ইতিহাস নহে, জাতির নিগূঢ় জীবনসত্যের আধার। পার্বত্য ভীল জাতির আচার ও জীবনবোধ, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহাদের মর্যাদা ও অধিকারের হীনতা, তাহাদের কতকগুলি আদিম-গোষ্ঠী-সুলভ বদ্ধমূল সংস্কারের সরস ও যথার্থ বর্ণনা উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। তেজসিংহ ও পুষ্পের প্রেমে ভীলবালিকার কিছুটা অজ্ঞতা ও কিছুটা দুষ্টামির ফলে যে ভুল বোঝার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও উপন্যাসের সরল গতিকে একটু বাঁকা পথে চালাইয়া উপভোগ্য জটিলতার হেতু হইয়াছে। সব দিক দিয়া 'জীবন-সন্ধ্যা' 'জীবন-প্রভাত' অপেক্ষা গভীর রসসৃষ্টিতে, করুণ পরিণতিতে ও তথ্য-বহুল বাস্তব-চিত্রণে শ্রেষ্ঠতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

ইহার পর রমেশচন্দ্র সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ, বীরত্বমুখরিত ইতিহাস ছাড়িয়া বাঙলার শান্ত, ঘটনাবিরল সমাজ-জীবনের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন। 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৩)—এই দুইখানি তাঁহার সামাজিক উপন্যাস।

'সংসার'-এ বর্ধমান জেলার তালপুকুর' নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর ছোট সুখ-দুঃখে ভরা জীবনযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রামের সমাজপতি ধনী জমিদার—তারিণীবাবু, ঈষৎ আত্মগর্বিত, প্রভুত্বপ্রিয়, কূটকৌশলী ব্যক্তি, তবে মানুষ হিসাবে তিনি নিতান্ত মন্দ নহেন। গ্রাম ও পরিবারের কয়েকটি মেয়ের বিবাহিত জীবনের সুখের তারতম্য উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গরীবের মেয়ে বিন্দু, ধনীর মেয়ে উমা, ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কালীতারা এই তিন বাল্যসখীর সংসার-জীবনে সৌভাগ্যের তুলনা করা হইয়াছে। এই তুলনায় রমেশচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ধন বা কুলমর্যাদা সুখের হেতু হয় না, দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক প্রীতি ও সহনশীলতাই শান্তির মূল। তাই বিন্দুর জীবনই সর্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছে। বিন্দুদের পরিবারের কলিকাতা যাওয়া উপলক্ষ্যে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

সামাজিক উপন্যাস

বিন্দুর বিধবা ভগ্নী সুধার সহিত এক উচ্চশিক্ষিত যুবক শরৎচন্দ্রের প্রেমের উদ্ভব উপলক্ষ্যেই শহর ও পল্লীজীবনে একটা তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। যদিও তিন বৎসর পূর্বে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি ইহার প্রতি প্রবল বিরোধিতা সমাজ-মনে তখনও অপ্রশমিত। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'-এ বিধবা-বিবাহ জমিদার নগেন্দ্রনাথের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে গ্রাম্য সমাজে বিশেষ আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব শহরের রসনাকে বিদ্বেষ-বিষে জর্জর ও কুৎসা-রটনায় মুখর করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়াছে ও গ্রাম্য সমাজও শরৎচন্দ্রের হাকিমি পদ-প্রাপ্তির পর ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য তালপুকুরের ঠাকুরদাদা-ঠানদিদি এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া দাম্পত্য সম্পর্কের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যঙ্গমধুর জীবনদর্শন অভিব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি সমাজ-বিরোধী দম্পতিকেই আশ্রয় করে, কেননা এখানে বালবিধবার প্রেমাকাঙ্ক্ষা কোন ন্যায্যতর অধিকারকে স্থানচ্যুত করে নাই। উপন্যাসটি রমেশচন্দ্রের সরস বর্ণনা ও সরল পল্লীজীবনের সহিত অকৃত্রিম সহানুভূতির নিদর্শনরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

'সংসার'-এ বিধবা-বিবাহ-সমস্যা

'সংসার'-এর সাত বৎসর পরে লেখা 'সমাজ' (১৮৯৩) কিন্তু লেখককে উগ্র

সমাজ-সংস্কারকরূপে পরিচিত করিয়াছে। উপন্যাসে বিধবা-বিবাহকে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনের যোগ্য করিতে হইলে শুধু উৎকট সংস্কার-মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে চলিবে না—পাত্র-পাত্রীকে সমস্যা-উদ্ভবের পূর্বেই জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করিতে হইবে। আমরা শরৎ-সুধার বিবাহ অনুমোদন করি শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের জন্য নহে, উহারা উহাদের সরল ও অকপট আচরণের দ্বারা আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু সুশীলা ও দেবীপ্রসাদ কেহই জীবন্ত চরিত্ররূপে আমাদের ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠে নাই—সুতরাং তাহাদের বিবাহে আমরা দর্শকমাত্র, তাহাদের পক্ষাবলম্বী উৎসাহী সমর্থক নহি। এ বিবাহ আবার শুধু বিধবা-বিবাহ নয়, অসবর্ণ বিবাহও বটে। ইহা ঘটিয়াছে পাত্র-পাত্রীর পরস্পর-অনুকূল মনোভাবের মধ্য দিয়া নহে, রমাপ্রসাদ সরস্বতীর হয়ত যুক্তিযুক্ত কিন্তু নিশ্চিত স্পর্ধিত সমাজ-বিদ্রোহের মাধ্যমে। ইহার সহিত বৈষয়িক ষড়যন্ত্র, দীর্ঘকাল মৃত বলিয়া গৃহীত জমিদারবংশের এক সন্তানের হঠাৎ পুনরাবির্ভাব ও তাহার বৈধব্যব্রতধারিণী পত্নীর সহিত পুনর্মিলন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা মিশিয়া গ্রাম্য সরলতার আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছে ও ঘটনা-বিন্যাস বিশেষ ঘোরালো রূপ ধারণ করিয়াছে। মোট কথা তাঁহার এই শেষ উপন্যাসে রমেশচন্দ্র গ্রাম্যজীবনের দরদী চিত্রকরের পরিবর্তে সর্বপ্রকার সমাজ-প্রথার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত বিদ্রোহিরূপেই হাজির হইয়াছেন। তাঁহার শিল্পোৎকর্ষের যাহা প্রধান অবলম্বন তাহাই এখানে অনুপস্থিত। রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলি আমাদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সত্ত্বেও যে এখনও জনপ্রিয়তা হারায় নাই, তাহাই ইহাদের সাহিত্যিক স্থায়িত্বের নিদর্শন।

সমাজ

(৩)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

প্রভাতকুমার যদিও অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তথাপি ছোটগল্প-রচয়িতারূপেই তাঁহার প্রধান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৭) ও 'সিন্দূর-কৌটা' (১৯১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কোন জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব বা হৃদয়সমস্যা, মানবজীবনের কোন গভীর অনুভূতি নাই। লঘু, হাস্যতরল ভাব-কল্পনা, জীবনের সরল, স্বচ্ছন্দ

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

বিকাশ, শেষ পর্যন্ত অনুকূল দৈবের দাক্ষিণ্যে সমস্ত স্বল্পস্থায়ী দুর্ভাগ্যের মধুর পরিণতি, ঘটনার আবর্তহীন একটানা প্রবাহ—এইগুলিই তাঁহাব উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ। কোথাও কোথাও তাঁহার উপন্যাসে ভ্রমণকাহিনীর মত নূতন দেশ দেখার কৌতূহল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অচেনা লোকের সহিত ক্ষণিক পরিচয়ের রুচিকর স্বাদ অনুভব করা যায়। তাঁহার চরিত্রসমূহ বাঙলার সাধারণ নরনারী—ইহারা ঘটনাস্রোতের সহিত ভাসিয়া চলে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা বা মনস্তত্ত্বের দুর্বোধ্যতা নাই। এই উপন্যাসগুলি যেন মধ্যযুগেব মঙ্গলকাব্যের আধুনিক জীবনোপযোগী পরিবর্তিত সংস্করণ, বাঙালীর দৈবনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়হীন, নমনীয় মনোভাবের যথার্থ চিত্র।

নবীন সন্ন্যাসী

'নবীন সন্ন্যাসী'তে এক ধর্মভাবাপন্ন, উচ্চশিক্ষিত যুবক হঠাৎ সংসার-বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে, কিন্তু দুই চারিদিন এই যাযাবরবৃত্তির অভিজ্ঞতার পর অনাহারের ক্লেশে ও পথিশ্রমে পীড়িত হইয়া এক ভদ্র গৃহস্থের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় ও শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিদূষী কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফেবে। লেখক এই উপন্যাসে তাঁহার নায়কের কৃচ্ছ্রসাধন-সংকল্পেব উপব স্নিগ্ধ বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিয়া কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সিঁদুর-কৌটা

'সিঁদুর-কৌটা'য় এক বাঙালী খ্রীষ্টান যুবতী—সুশী—পল সাহেব নামে এক ইতর, অর্থলোভী, আত্মসম্মানহীন মাদ্রাজী খ্রীষ্টানের সঙ্গে বিবাহিত হয়। কিন্তু পল তাহার বিবাহিতা পত্নীর ভরণ-পোষণে অক্ষম হইয়া তাহাকে শহরের এক হোটেলে ফেলিয়া উধাও হয়। এই সময় বিজয় নামে এক বাঙালী উকিল—যে ছুটিতে বেড়াইতে গিয়া সেই হোটেলেই অবস্থান করিতেছিল—সুশীর অসহায় অবস্থার প্রতি সহানুভূতির বশে তাহার পলাতক স্বামীর খোঁজ করিতে থাকে ও পলের খোঁজ না পাইয়া তাহার দেখাশোনা করিতে বাধ্য হয়। এই সহানুভূতি অল্পদিনের মধ্যেই সুশীর অশ্রুজলে আর্দ্র ও তাহার সসঙ্কোচ প্রেমনিবেদন ও আত্মসমর্পণে বিগলিত হইয়া প্রেমে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে পল তাহার গা-ঢাকা অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আত্মপ্রকাশ করে ও অম্লান বদনে কিছু টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে। একটু অনুসন্ধানেই বাহির হইয়া পড়ে যে সে অন্য স্ত্রী বর্তমান থাকিতে সুশীকে প্রতারণা করিয়া বিবাহ করিয়াছে ও আইন অনুসারে সে বিবাহ অসিদ্ধ। এই আবিষ্কারের পর সুশীর

সহিত বিজয়ের হিন্দুমতে বিবাহের আর কোন বাধা রহিল না। বিজয়ের প্রথমা পত্নী বকুরাণী হইতে যে বাধা আসিতে পারিত তাহা বকুরাণীর ক্ষীণ ব্যক্তিত্ব, কোমল স্বভাব ও স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিতার জন্য সহজেই অপসারিত হইল। শেষ পর্যন্ত সিঁদুরকৌটা-উপহারের সহিত সুশী হিন্দুস্ত্রীর সপত্নীর সহিত অংশীকৃত মর্যাদায় ও স্বামিস্বত্বে অধিষ্ঠিত হইল। লেখক তাঁহার মানস সন্ততিদের সুখী করিবেনই এইরূপ যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া কলম ধরিয়াছিলেন তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল।

'রত্নদীপ' প্রভাতকুমারের একমাত্র উপন্যাস যেখানে জীবনের বেদনাময় সংঘাত ও ট্রাজেডির করুণ পরিণতি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানেও একটি দৈবসংঘটনের আকস্মিক যোগাযোগ হইতে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। নদীয়াব জমিদারবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী ভবেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছেদ করিয়াছিল। পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সে যখন বাড়ি ফিরিতেছিল, তখন অকস্মাৎ রেলগাড়িতে এক ক্ষুদ্র স্টেশনে তাহাব মৃত্যু ঘটিল। সেই স্টেশনে সহযোগী স্টেশনমাস্টাব রাখাল ভট্টাচার্য—যাহার সহিত মৃত ভবেনেব আশ্চর্য অবয়ব-সাদৃশ্য ছিল—সেই মৃতদেহ নামাইয়া লয় ও নির্জন স্টেশনঘরে তাহার ডায়েরি পড়িয়া তাহার জীবনকাহিনী অবগত হয়। ঐ সময় তাহার রেলের চাকরি যাইবার ফলে জাল ভবেন সাজিয়া তাহার জমিদারি হস্তগত করার মতলব তাহার মনে উদিত হয়) ও সে ছদ্মবেশে ভবেনের গ্রামে গিয়া দেওয়ানজী, প্রধান প্রধান কর্মচারী ও পুরাতন চাকর-দাসী প্রভৃতিকে ও গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকেও সে ভাল করিয়া চিনিয়া আসে। ইহার পর তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিয়া সে বাড়িতে পত্র দেয়। তাহার বিধবা মাতা ও পরিত্যক্তা স্ত্রী বৌরাণী তাহার জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় দিন গুনিতেছিল। (রাখাল জাল ভবেন সাজিয়া আসিয়া সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—দীর্ঘ অদর্শনের পর তাহার ছদ্মবেশ কেহ ধরিতে পারিল না)। কিন্তু ব্রহ্মচারিণী-বেশধারিণী, কঠোর-ব্রত-সাধনে রতা বৌরাণীকে দেখিয়া তাহার সঙ্কল্প বিচলিত হইল—সে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবার দুঃসাহসকে মনে স্থান দিতে পারিল না। সুতরাং সেও এক ব্রতের অছিলা করিয়া বৌরাণীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল ও তাহার করুণ মিনতি ও ক্ষুব্ধ অভিমান ও অনুযোগও তাহাকে স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অটল রাখিল। (এ দিকে কলিকাতার এক জুয়াচোর খগেন তাহার

রত্নদীপ উপন্যাস

পূর্বপরিচিতা অভিনেত্রী কনকলতার সহযোগিতায় বেওয়ারিশ জমিদারিটি হাত করিবার মতলব আঁটিতেছিল। স্থির হইয়াছিল যে কনকলতা সহচরীরূপে বৌরাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পুনর্বিবাহে রাজী করিবে ও খগেনই এই পুনর্বিবাহের পাত্ররূপে নির্বাচিত হইবে। কনকের আসার কয়েকদিন পরেই জাল ভবেনের আবির্ভাবে এই মতলব ফাঁসিয়া গেল। কিন্তু খগেন নবাগত জমিদারপুত্র যে জাল এই দৃঢ় ধারণা পোষণ করিয়া কিছু অনুসন্ধানের পর রাখালের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করিল। সে রাখালের সহিত দেখা করিয়া তাহার গোপন রহস্য ফাঁস করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট মোটা টাকা দাবি করিল, কিন্তু রাখাল এই ভীতিপ্রদর্শনে অবিচলিত থাকিয়া তাহার অসাধারণ চরিত্রগৌরব ও প্রলোভন-জয়ের পরিচয় দিল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই প্রকাশিত হইল; কিন্তু রাখালের নির্লোভতা ও সৎসংকল্পের কথা জানিয়া জমিদার-পরিবার তাহাকে সসম্মানে বিদায় দিল। এই শেষ আঘাতে বৌরাণীর জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইল—তাঁহাকে চিতাশয্যায় শায়িত করিবার সময় তাঁহার বিবাহের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বাসরে খেলার কড়িগুলি তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা আছে দেখা গেল।

(এই উপন্যাসে বৌরাণীর চরিত্রে প্রভাতকুমার যে সরলতা, দৃঢ়নিষ্ঠা, অপূর্ব সংযম ও সহিষ্ণুতা, রাখালকে পতিজ্ঞানে তাহার প্রতি ভাবপ্রকাশের কুণ্ঠাজড়িত শালীনতা ও রাখাল যে তাহার স্বামী নয় এই আবিষ্কারে আপনাকে অশুচি বিবেচনায় একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার লজ্জা ও আত্মধিক্কারের সমাবেশ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে যে একটি সংযত গভীর কারুণ্যরসের সঞ্চার করিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে নহে সমগ্র বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে দুর্লভ)। তাঁহার রাখালও চরিত্র-মহিমার সহজ, অনাড়ম্বর, অ-নাটকীয় প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে। অন্যান্য গৌণ চরিত্র—খগেন, কনক প্রভৃতিও—সুচিত্রিত। অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা, আবেগের অন্তর্ভেদী শক্তি ও জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশমান রহস্যময়তা এই উপন্যাসে স্মরণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। (প্রভাতকুমার যে গভীর রসসৃষ্টিতে অক্ষম ছিলেন এই অভিযোগ এই উপন্যাসে সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে।)

রত্নদীপের শ্রেষ্ঠত্ব

((ছোটগল্প-রচনায় প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব সর্ববাদিসম্মত।) তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল ছোটগল্পের দিকেই। এমন কি তাঁহার উপন্যাসগুলি এককেন্দ্রিক

না হইয়া একাধিক ছোট গল্প ও খণ্ড-আখ্যানের সমাবেশ বলিয়াই মনে হয়।

প্রভাতকুমারের ছোট গল্প

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রথম প্রবর্তনা রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু তাঁহার ছোটগল্প ঠিক বাঙালীর সাধারণ জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাব প্রায় সমস্ত ছোটগল্পেব উপবেই এক কবিসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতি, এক অসাধারণ সৌন্দর্য-কল্পনার ঘন আস্তবণ বিস্তৃত আছে। তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন এক অখণ্ড উপলব্ধির যোগসূত্রে গ্রথিতরূপে, এক মায়ামণ্ডিত কাব্য-বাতায়নের রন্ধ্রপথ দিয়া। ইহাতে বাঙালী জীবনের স্থূল বাস্তবতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবরূপই বেশী প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভাতকুমারেব ছোট গল্পে বাঙালীব সহজ জীবনের প্রসন্ন কৌতুকরস, উহাব খেয়ালী কল্পনাব রঙীন বুদ্‌বুদ্‌-বিলাস, ছোট ছোট পারিবারিক বিবোধেব ক্ষণিক আলোড়ন ও মুহূর্ত-পরেব অবসান, ক্ষুদ্র অসঙ্গতিব আত্মপ্রকাশ ও হাস্যকর ফলশ্রুতির মধ্যে উহার সংশোধন—এইগুলিই রূপ পাইয়াছে।) সুতবাং যুদ্ধপূর্ব যুগেব বাঙালীব জীবনানন্দ, যখন নৈরাশ্যবাদ ও সমস্যাজর্জরতা তাহাকে গ্রাস কবে নাই, সেই সময়ের জীবন-রসপুষ্ট কল্পনা-বিলাস, শিক্ষিত বাঙালীর মানস আকাশে বজ্রবিদ্যুৎশূন্য লঘু মেঘরাশিব মৃদুমন্দ সঞ্চরণ, মুস্কিলেব সঙ্গে মুস্কিল-আসানের সহ-অবস্থিতি ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এমন কি, 'দেশী ও বিলাতী' গল্পসংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলিতে বিলাত-প্রবাসী বাঙালী অনভ্যস্ত সমাজ-পরিবেশের মধ্যেও দৈবের স্নিগ্ধ প্রশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সেখানে সে ভালবাসার আশা ও যোগ্যতার অধিক প্রতিদান পাইয়াছে। বিদেশিনীর মধ্যে মাতৃস্নেহেক স্পর্শ লাভ করিয়াছে, ভুলভ্রান্তি করিয়াও সহজেই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। মনে হয় মঙ্গলকাব্যেব বরাভয়প্রদা দেবী বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত দৈবের দুলাল বাঙালী সন্তানের উপর তাঁহাব স্নেহহস্ত প্রসারিত কবিয়াছেন।

(উপন্যাসের গঠন-শিল্পে প্রভাতকুমারের যে ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখা যায়, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ছোটগল্পের আঙ্গিক ও পরিমিতিবোধ, উহার ভূমিকাবর্জিত প্রারম্ভ ও অতর্কিত, অথচ তৃপ্তিকর পরিণাম, উহার ক্ষুদ্র

ছোটগল্পে প্রভাত-কুমারের কৃতিত্ব

পরিসরের মধ্যে ক্ষিপ্র ও সার্থক ঘটনা-বিন্যাস, উহার অন্তর্নিহিত রসবস্তু বা সমস্যাটিকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করার ব্যঞ্জনা-কৌশল—এই সবের উপরই তাঁহার একটি সহজসংস্কার-জাত অধিকার ছিল। তাঁহার খুব কম গল্পেই শিল্পবোধের অভাব বা অসংলগ্নতার

দোষ দেখা যায়। যেখানে লঘু উপস্থাপনার মধ্যে অনভ্যস্ত গভীর সুর শোনা যায়, সেখানেও উভয়বিধ উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। যেখানে তিনি প্রেমের কথা বলিয়াছেন, সেখানেও একটি স্নিগ্ধ কৌতুকবোধ, একটি সুরুচিপূর্ণ শালীনতার মাত্রা রক্ষিত হইয়াছে।/ মোপাঁসার মত আদিরসপ্রধান গল্প তিনি লেখেন নাই ; কিন্তু অভ্রান্ত শিল্পসুষমা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া তিনি মোপাঁসার সঙ্গে তুলনীয়।

তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্পের উদাহরণ দিলে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। তাঁহার 'বলবান জামাতা' গল্পে নামের ভুল ও জামাতার দৈহিক পরিবর্তনেব জন্য যে ঘোবালো পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, নির্দোষ হাস্যরসেব প্রবাহে তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

বলবান জামাতা—গল্প

মনে রাখিতে হইবে যে এই ঘটনার জট পাকাইতে ঘটনাব আকস্মিকতার সহিত জামাইএব মানস প্রতিক্রিয়াও সহযোগিতা করিয়াছে। সে নাম ভুল করিয়া পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠিয়াছে, তাহার তারও দেরিতে পৌঁছিয়াছে। ইহা দৈবের পবিহাস। কিন্তু সে যখন নিজের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছিয়াছে, তখনও যে তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই ইহার মূলে আছে তাহার স্বকৃত অপরাধ। শ্যালিকার বিদ্রূপবাণে জর্জবিত হইয়া সে নিজ নলিনী নামেব সম্পূর্ণ বিপরীত এক পালোয়ানী দেহ গড়িয়া তুলিয়াছে এবং চেহারাকে পরুষদর্শন করিতে মুখের সামনে দাড়ির যবনিকা ঝুলাইয়াছে—ইহাতেই নিজ শ্বশুরালয়ে পর্যন্ত তাহার পরিচয়-স্থাপনের পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে। তারপর ভুল ভাঙিলে সে ইহা লইয়া একদিনও গায়ের ঝাল মিটায় নাই—ইহাও তাহার চরিত্রে সংযম ও ক্ষমাশীলতার নিদর্শন। সুতরাং এই গল্পে যে রসসৃষ্টি হইয়াছে তাহা একদিকে যেমন ঘটনার আকস্মিকতা-প্রসূত, অপরদিকে তেমনি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেরও অভিব্যক্তি।

'ভুল শিক্ষার বিপদ' গল্পে করুণ রসেব উৎসার এক বৃদ্ধের উৎকেন্দ্রিক, অশিষ্ট আচরণের আধারে বিধৃত হইয়াছে। ট্রেনে এক সহযাত্রী যুবক বৃদ্ধকে তাহার খাবারের যে অংশ দেয়, সেই খাদ্যতালিকার মধ্যে মার্মালেড বা কমলালেবুর মোরব্বা ছিল। এই তথ্যটুকু জানিয়া বৃদ্ধ সমস্ত সংযম হারাইয়া যুবককে কটূক্তি করিয়া উঠিল।

ভুলশিক্ষার বিপদ—গল্প

যুবক যখন তাহার অশিষ্ট আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল, তখনই বৃদ্ধের এই অদ্ভুত আচরণের রহস্য প্রকাশ পাইল। মেয়ের বিবাহের জিনিসপত্র কিনিতে গিয়া মেসের এক রুগ্‌ণ

যুবকের হাতের কাছে অনবধানতা-প্রযুক্ত সে একঝুড়ি কমলালেবু রাখিয়া দেয়। যুবকটি সমস্ত ঝুড়ি কমলালেবু নিঃশেষ করিয়া জ্বরবিকারগ্রস্ত হয়। বৃদ্ধ মেয়ের বিবাহের টাকা ভাঙিয়া তাহার প্রাণপণ চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। সে নিজেকে তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করিয়া সেই হইতে কমলালেবু বর্জন করিয়াছে। বৃদ্ধের নিজের গ্রাম সম্বন্ধে গৌরববোধ নয়ানজোড়ের ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়াইয়া দেয়—তবে ঠাকুরদাদার ছিল নিজ আভিজাত্যে গর্ব, আর এই গল্পের বৃদ্ধের গর্ব সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। তাহার উৎকেন্দ্রিকতার নীচে এই রুদ্ধ আবেগ তাহার প্রকৃতির মহত্ত্বকে আরও প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে।

কাশীবাসিনী-গল্প

'কাশীবাসিনী' গল্পে এক পদস্খলিতা নারীর করুণ অপত্যস্নেহের কাহিনী গল্পটির মধ্যে এক গভীরতর সুর সঞ্চার করিয়াছে। তাড়িঘাটের স্টেশনমাস্টার গিরীন তাহার স্ত্রী মালতীর সঙ্গে রেলের বাসায় থাকে। হঠাৎ একদিন এক অপরিচিতা প্রৌঢ়া ট্রেন ফেল করার অজুহাতে তাহার বাসায় আশ্রয় লয় ও মালতীর নিঃসঙ্গ জীবনকে স্নেহমমতায় কিছুটা পূর্ণ করে। মাতাল স্বামীর ব্যবহারে অব্যবস্থিতচিত্ততা—কখনও সোহাগ, কখনও তর্জন—মালতীর জীবনে এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মনোভাবকে স্থায়ী করিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় অপরিচিতা মাতৃস্থানীয়া নারীর আদরযত্ন তাহার নিকট আরও নির্ভরযোগ্য স্নেহাশ্রয় বলিয়া মনে হইল। সুতরাং সে এই নবাগতাকে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। ইতিমধ্যে কাশীবাসিনী চলিয়া যাওয়ার কয়েকদিন পর মালতীর একখানা গহনা হারাইয়া যাওয়ায় কাশীবাসিনীকে সন্দেহ করিয়া গিরীন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশের জুলুম হইতে কষ্টে অব্যাহতি পাইয়া সেই নারী বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে আবার মালতীর বাড়ি আসে ও সে যে তাহার ভ্রষ্টচরিত্রা মাতা এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে। এই পরিচয়ের ফলে তাহার সমস্ত পূর্ব আচরণ এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—মালতীর সাহচর্যে তাহার যে অতৃপ্ত ও অস্বীকৃত সন্তানস্নেহ গোপন পথে চরিতার্থতা খুঁজিতেছিল তাহাই সুস্পষ্ট হয়। মালতীর প্রতিক্রিয়াও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়—এই সত্য জানার পর তাহার যে প্রথম তীব্র বিরাগ তাহাই একটু পরে অশ্রুভরা স্বীকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। 'হউক অসতী, তবুও ত মা' এই বিপরীতমুখী উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহার মনের দ্বৈত ক্রিয়া সুন্দরভাবে বিধৃত হইয়াছে। প্রভাত-কুমার কত সহজে ও অকৃত্রিম সরলতার সঙ্গে, মনস্তত্ত্বের কোন গোলকধাঁধার

মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কিরূপ সুরুচি ও সংযমের আবেষ্টনে পতিতা নারীর অন্তর-রহস্য পরিস্ফুট করিয়াছেন।

এই উদাহরণগুলি হইতে প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের বিশিষ্ট রীতি ও রূপ পরিষ্কার হইবে। (তাঁহার বিষয় যে সামান্য ও আলোচনা যে অগভীর ছিল, একথা বলিলে তাঁহার কৃতিত্বকে খর্ব করা হইবে। তিনি এক দিকে কবির ঊর্ধ্বচারী কল্পনা ও অন্যদিকে বিকৃত মনস্তত্ত্বের অতি-প্রাধান্য—উভয় প্রকার অতিরেককে বর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদের আদর্শে স্থির ও জীবননিষ্ঠায় সুস্থ বাঙালী জীবনের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা যদি অগভীর হয়, তবে সে যুগের বাঙালী জীবনধারাই অগভীর ও আবর্তহীন স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়।)

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের রীতি

(৪)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় উপন্যাসের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবপ্রেরণা ও উপস্থাপনা-রীতির পথিকৃৎ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি রচনায় এক নূতন সমাজচেতনা, রীতির অভিনবত্ব ও মানবিক সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কবি-কল্পনা ও অসাধারণত্বের প্রতি আকর্ষণ তাঁহাকে শীঘ্রই উপন্যাসের প্রধান ধারা হইতে অপসারিত করিয়া এক অননুকরণীয় স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কেহ উপন্যাস লিখিতে সাহসী হন নাই, কেননা রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতি ও তত্ত্বচেতনা না থাকিলে লাবণ্য, কুমুদিনী, এমন কি এলা, বিমলার মত চরিত্রগুলিকে প্রাণময় করা অসম্ভব। তাঁহার বাচনভঙ্গীর ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা পরবর্তী কেহ কেহ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু যে প্রতিবেশ ও চরিত্র-পরিকল্পনার সহিত উহা সামঞ্জস্যশীল তাহার অনুপস্থিতিতে এই অনুকরণ অনেক সময় প্রাণহীন বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিকত্ব তাঁহার গৌণ পরিচয়—তাঁহার প্রতিভার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের ইহা অন্যতম শাখা মাত্র। উপন্যাসের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ আনুগত্য ছিল না। শুধু তথ্যপর্যবেক্ষণের তন্ময়তা ও জীবনবিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-ধর্ম

মনোভাব তাঁহাকে চালিত করে নাই। উপন্যাসের রীতির অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় তিনি কাব্যানুভূতির বস্তুনিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টির হাতে ঔপন্যাসিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-রশ্মি ছাড়িয়া দিয়া উর্ধ্বচারী দেবতার মত মর্ত্যলোকের বিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। (তাঁহার উপন্যাসে জীবনের কাহিনীকাব কখন যে কবি ও তত্ত্বদর্শী মনীষীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা কঠিন। এই প্রবণতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, ঐতিহ্যধারার অনুবর্তী গোষ্ঠী-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত নহেন)।

এই পবিপ্রেক্ষিতে বিচার কবিলে বঙ্কিমচন্দ্রেব সহিত তাঁহার আমূল পার্থক্য সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকেই বঙ্কিমেব উত্তবাধিকাবিত্বেব মর্যাদা দিতে হয়। (বঙ্কিমের রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাসেব ধাবা শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ পরিহার কবিয়াছিলেন—পুঞ্জীভূত সমস্যার চাপে ক্লিষ্ট যুগচেতনা অতীতের বীরত্ব-কাহিনী ও প্রেমের অতি-নাটকীয় উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন প্রেবণা অনুভব করিল না। কিন্তু বঙ্কিমের দুইখানি গার্হস্থ্য উপন্যাসে—বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তেব উইল-এ ও 'চন্দ্রশেখব' প্রভৃতি বোমান্সে সমাজ-মনেব যে বেদনা, অতৃপ্ত প্রণয়াবেগের যে মর্মজ্বালা অর্ধোচ্চারিত হইয়াছে শবৎচন্দ্র তাহাকেই আবও গভীরভাবে উপলব্ধি ও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিবার কাজে আত্মনিয়োগ কবিলেন। বঙ্কিম-যুগের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীতে বাঙালীব সমাজ-চেতনার গভীর রূপান্তর ঘটিয়াছে। বঙ্কিমের সময় সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও ক্ষোভের অঙ্কুব সাধারণ মনোভাবেব বিরল ব্যতিক্রমরূপে দেখা দিয়াছিল, শরৎচন্দ্রের কালে আসিয়া তাহাই প্রায় সার্বভৌম বিস্তৃতি ও ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিল। বঙ্কিম মানবমনকে সামাজিক আদর্শের অনুবর্তী করিতে চাহিয়াছিলেন, কেননা এই আদর্শের প্রাণশক্তি ও কল্যাণময় প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার অক্ষুন্ন বিশ্বাস ছিল। অবৈধ প্রবৃত্তির দমন ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত সুখের বিসর্জন—হিন্দুধর্মের এই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা তাহাকেই তিনি ব্যক্তিমনের সমস্ত চঞ্চল আত্মতৃপ্তির উপর জয়ী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজের সঙ্কীর্ণ অত্যাচারী রূপ কোথায়ও দেখি না। সমাজ নিজ ক্রূর, নিষ্ঠুর আচরণ বা হীন চক্রান্ত দ্বারা কাহারও অসংযত লালসাকে পিষিয়া মারিতে চাহে নাই; কিন্তু সামাজিক বিবেকবুদ্ধি বা আদর্শ-চেতনাই এই সমস্ত অসামাজিক

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শের স্বরূপ

প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেই এক গোপন অস্বস্তি ও আত্মনিগ্রহের বীজ বপন করিয়াছে। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে সমাজ-বিরোধী ইচ্ছা ও কাজের মধ্যেই একটি আত্মধ্বংসী পরিণতি আছে—বিশ্ববিধানের মত সমাজবিধানেরও এমন একটি নৈর্ব্যক্তিক, অথচ অনিবার্য শক্তি বর্তমান যাহা অপরাধীকে অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার বিধিলঙ্ঘনের শাস্তি দেয়। বঙ্কিম বেণী ঘোষাল বা গোলোক চাটুজ্যের ন্যায় কোন দাম্ভিক, স্বার্থপর, অত্যাচারী সমাজপতির কল্পনা করেন নাই—তাঁহার শৈবলিনী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি উন্মার্গগামী নর-নারীর শাস্তি কোন বাহ্য অভিভব হইতে আসে নাই। রোহিণীর শাস্তি আসিয়াছে সমাজের উদ্যত দণ্ড হইতে নহে, সমাজ-চেতনার দ্বারা পরোক্ষভাবে ও আত্মানুশোচনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ব্যর্থ প্রেমিকের অকস্মাৎ-উদ্গীরিত রোষানল হইতে। বঙ্কিম সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা ও অধঃপতন এবং সমাজ-বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা—এই উভয়দিককার হিসাবেই ভুল করিয়াছিলেন—যে যৌবনজলতরঙ্গ সমস্ত বিধি-নিষেধের বাঁধ ছাপাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল তাহাকে তিনি প্রাচীন আদর্শের প্রশস্তিগানের দ্বারা রোধ করিবেন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। তিনি 'বিষবৃক্ষ' লিখিয়া ইহা যে ঘরে ঘরে অমৃতফল প্রসব করিবে এইরূপ আত্মভোলানো স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তিনি এই বিষবৃক্ষের ফলের স্বাদুতার কথাই প্রচার করিয়াছিলেন। যে বিরাট উদ্বৃত্ত শক্তি নগেন্দ্রনাথের মনের স্রোতকে ফিরাইয়া উহাকে সূর্যমুখীর অভিমুখী করিয়াছিল তাহার রহস্য কয়জন বুঝিল? যে দুঃসহ ভ্রমর-চিন্তা গোবিন্দলালের হীন রূপাসক্তির কণ্টকতরুকে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়িতমূল করিয়া একদিনকার হঠাৎ-ওঠা ঝড়ে তাহাকে ভূপাতিত করিল তাহার ঊর্ধ্বগামী প্রেরণা কয়জন অনুভব করিল? কিন্তু এই উপন্যাস লেখার ফলে কুন্দনন্দিনীর প্রতি সহানুভূতি এবং রোহিণীর প্রখর রূপশিখার দাহকারী আকর্ষণ ও তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের নির্লজ্জ লালসার সমর্থন সমাজ-চেতনায় সর্বব্যাপী হইয়া উঠিল।

এই হিসাবভুলের সংশোধনের ভার শরৎচন্দ্রের উপর পড়িল। সমাজ ও ব্যক্তি-মনের সংঘর্ষে তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সমাজ-নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা উভয়ের তুলনামূলক বিচারে তিনি নিঃসংশয় হইলেন যে শেষোক্তটির ভবিষ্যৎ মূল্য—সম্ভাবনা অনেক বেশী। সমাজের উন্নত আদর্শের দোহাই পাড়া নিছক ভাববিলাসমূলক ও অবাস্তব; উহা এখন অন্ধ প্রথানুগত্য ও নিছক স্বার্থবুদ্ধিতে

শরৎচন্দ্রের সামাজিক আদর্শের নূতনত্ব

পরিণত হইয়া ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের নৈতিক অধিকার হারাইয়াছে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত-বর্ণনা হিন্দু ধর্মাদর্শের অন্তিম দীপ্তি—উহাতেই "স্তূপপাদমূলে জ্বলিয়া নিবিল শেষ আরতির শিখা"। হিন্দু সমাজনেতার মধ্যে রমানন্দ স্বামীর ন্যায় ক্রান্তদর্শী, মানবচিত্তরহস্যের সন্ধানদক্ষ, পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ভারসাম্য-বিধায়ক, পাষাণ গলাইতে সক্ষম বিধানদাতা কোথায়? মানবমন এখন দীর্ঘ আত্মনিরোধের বেদনায়, নিষ্ফল ত্যাগ-বৈরাগ্যের তিক্ততায় পূর্ব আদর্শের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। সে আর কেন্দ্রীয় শাসন মানিবে না, নিজের অনুভূতির আলোকে ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়া নিজ পথের সন্ধান করিবে। সমাজের আসল কাজ হইল ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ গুণের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন; ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলধন নষ্ট করিয়া সমাজের ঐশ্বর্যের খাতায় অভাবাত্মক ঋণের অঙ্কই বাড়িয়া যাইবে। মানুষের একটা আদর্শ নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু সে আদর্শ বাহির হইতে আরোপিত হইবে না, আত্মচিন্তা ও আত্মবিচারের ফলে, মানবিকতার সুস্থ বিকাশ ও পূর্ণমূল্যের স্বীকৃতির দ্বারাই তাহা উদ্ভূত হইবে। সমাজের নির্বিচার বর্জন-নীতি আত্মঘাতী—পাপীকেও দরদ দিয়া বিচার করিতে হইবে, তাহার মধ্যেও যে সমস্ত সদ্‌গুণ আছে তাহাদিগকে বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে, অবস্থাচক্রে যে অসতী তাহারও চরিত্রগৌরব ও সতীত্ব-মর্যাদাকে স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণের আধাররূপে ব্যক্তিজীবনে পরোক্ষ প্রেরণা যোগাইবে। ইহাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অনুসৃত নূতন সমাজ-নীতি।

শরৎসাহিত্যে সূক্ষ্ম আবেগের বৈচিত্র্য

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল আমাদের পরিবার-জীবনের সাধারণ আবেগ ও বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধে এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম সত্যানুভূতি। আমরা যাহাদিগকে প্রথারূপে গ্রহণ করি, তিনি তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রের বিশিষ্ট অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে মা ছেলেকে বা স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শের রেখাচিত্রের অনুসরণে, এবং সেই ভাব-বর্ণনায় আমরা এই সাধারণ আদর্শের উপর এতটা জোর দিই যে বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যক্তিগত পার্থক্যটুকু চাপা পড়িয়া যায়। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে মা যেমন নিজের ছেলেকে ভালবাসেন, তেমনি সময় সময় পরের ছেলেকেও সমান ভালবাসেন, এবং এই ভালবাসা সব সময় রক্তের নৈকট্য-বন্ধনের অনুসারী নহে। দাম্পত্যপ্রেমও তেমনি সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

মান-অভিমান, তীব্র মতভেদ ও সময় সময় ঘৃণা-অবজ্ঞা-বিমুখতার ছদ্ম আবরণও ইহার স্বরূপকে দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তোলে। স্নেহ-প্রেমের এই তির্যক গতি পরিবার-জীবনের ভারসাম্য কিরূপ দারুণভাবে বিচলিত করে শরৎচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম তূলিকায় তাহা আঁকিয়াছেন। মানবিক বৃত্তিসমূহ যে সর্বদা কর্তব্য-প্রথার ছক-কাটা পথে চলে না, উহারা যে আপন খেয়ালখুশিমত চলিয়া সংসারে মৃদু-রকমের অভাবনীয়তার চমক জাগায় শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

বিচিত্র হৃদয়াবেগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

মেজদিদি হেমাঙ্গিনী বড় জায়ের বৈমাত্র ভাই কেষ্টাকে ভালবাসিয়া সংসারে একটি ক্ষুদ্র ঝড় বহাইলেন। কেষ্টাও তাহার সবল, স্থূলবুদ্ধি প্রকৃতির এক ধরনের হাস্যকর, অথচ করুণ ভালবাসার পরিচয় দিয়া মেজদিদির অন্তরে নিজ আসন সুদৃঢ় করিয়া লইল। এই দুই অসম ভালবাসার মিলিত শক্তির নিকট পরিবারের সমস্ত বিরোধিতা, ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের সমস্ত বিষোদ্গার পরাজিত হইয়া ইহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বিন্দু তাহার একরোখা, আত্মাভিমানী প্রকৃতির অজস্র, সংসারের অন্যান্য দাবী-দাওয়ার মর্যাদালঙ্ঘী সবটুকু স্নেহ দিয়া তাহার বড় জায়ের ছেলে অমূল্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। এই একপেশে ভালবাসার প্রবল স্রোতে সংসারে ভাঙন ধরিয়াছে, ইহারই জোরে সে ছেলের নিজের মায়ের প্রশ্রয়ের অধিকারকেও অস্বীকার করিয়াছে; রাগে কটুকথা বলিয়া অন্যায় দিব্য দিয়াছে। তাহার ভাশুর ও জা যদি সাধারণ মানুষের মত জিদের বশবর্তী হইতেন, উচ্চারিত অপমান-বাক্যের পিছনে বিপুল, আত্মবিস্মৃত স্নেহের আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিতে না পাইতেন তবে এই অতিরিক্ত টানাটানিতে সংসার-তরণীর ভরাডুবি ঘটিত। শেষ পর্যন্ত ইহাদের শুভবুদ্ধিই শুভ পরিণামের সূচনা করিয়াছে। নারায়ণী তাহার মাতৃহীন দেবর রামের সমস্ত দুরন্তপনা শুধু যে নিজে সহ্য করিয়াছে তাহাই নয়—তাহার মাতা ও স্বামীর সমস্ত হিতপরামর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া স্নেহের দাবীকেই অগ্রগণ্য করিয়াছে। রামকে পৃথক করিয়া দিলেও সে আশা করে যে তাহার বৌদিদি তাহার ভাগেই পড়িবে। এই অবস্থাসঙ্কটের সমাধান বেশ সন্তোষজনক হয় নাই—দিগম্বরী ও শ্যামলালের ফোঁসফোঁসানি শান্ত হয় নাই। রামলালের সুবুদ্ধিসঞ্চারেই এই ভাঙন প্রতিরুদ্ধ হইবে এইরূপ আশার ইঙ্গিতেই ছোট গল্পটির সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

প্রেমের রহস্য-উদ্ঘাটন ও স্বরূপ-নির্ণয়ে শরৎচন্দ্র যে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির

পরিচয় দিয়াছেন তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর সংকীর্ণ, প্রথাশাসিত জীবনযাত্রায় প্রেমস্ফুরণের যে বিরল অবসর ছিল, তাহারই তিনি যে আশ্চর্য সুযোগ লইয়াছেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর। অতি-আধুনিক যুগে ভদ্রসমাজের নর-নারীর খানিকটা অবাধ মেলামেশার ফলেই এই শাস্ত্রনির্দেশনিরপেক্ষ, গুরুজনের অনুমোদন-বহির্ভূত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়-উন্মেষের অবকাশ ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রেমকাহিনীমূলক উপন্যাসগুলিতে যে প্রেমের বর্ণনা পাই, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও অস্বাভাবিকতা ও কষ্টকল্পনা দেখা গেলেও মোটের উপর উহার ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী ও ঘটনাপরিবেশ বাঙালী সমাজবিন্যাসেরই যথার্থ পরিণতি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মে। উহার মধ্যে বাঙালী সমাজ-চেতনা ও মনোভঙ্গীর লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

প্রেমসম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি

শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার রচনা 'বড়দিদি'তে (১৯১৩) সুরেনের বড়দিদির উপর ছেলেমানুষী নির্ভরশীলতা ও মাধবীর স্নেহপরিচর্যা হঠাৎ যে কেমন করিয়া ভালবাসায় রূপান্তরিত হইল তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। এই অর্ধস্ফুট মানসলীলার বাস্তব পরিচয় দিতে গিয়া লেখককে ঘটনা-বিন্যাসকে অনেকটা কৃত্রিম আদর্শের ছাঁচে ঢালিতে হইয়াছে। তথাপি প্রেমের অভাবিত জন্ম-রহস্যের আদিকাহিনীরূপে ইহার একটা মূল্য আছে। 'পণ্ডিতমশাই'-এ (১৯১৫) বৃন্দাবন ও কুসুমের অনিশ্চিত সম্পর্কটি চরণকে আশ্রয় করিয়া খানিকটা স্পষ্টতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু কুসুমের কুণ্ঠা-সংকোচ ও চলচ্চিত্ততা অনেকটা উচ্চবর্ণের আদর্শের অনুস্মৃতি বলিয়া কৃত্রিমতা-দুষ্ট বোধ হয়। 'পরিণীতা'-য় (১৯১৪) শেখর-ললিতার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দুই নিঃসম্পর্ক প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। শেখরের মনোভাবের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা অপেক্ষা অধিকারবোধের স্থূল অভিমানই প্রবলতর। এক পক্ষের এই সুস্পষ্ট অবহেলা ও বিমুখতা সত্ত্বেও ললিতার মনে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে। এবং শেষ পর্যন্ত তাহার এই স্থির প্রত্যয়ই অপর পক্ষকে তাহার দাবী স্বীকার করাইয়াছে। এই প্রাথমিক পর্বের ছোটগল্পগুলিতে শরৎচন্দ্র প্রেমের সামাজিক আধার খুঁজিতে যে খানিকটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা সহজেই বোঝা যায়—প্রণয়ের মুক্তার উপযোগী শুক্তি-আহরণে তিনি স্থানে স্থানে স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন।

প্রথম দিককার প্রেমমূলক উপন্যাস

'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) হইতে শরৎচন্দ্রের প্রেম-চিত্রণে খানিকটা নিশ্চিতিবোধ আসিয়াছে। এখানে পল্লীজীবনের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বৈষয়িক বিরোধের ছদ্মবেশে এক গোপনচারী, সমাজবিধি ও নিজ অন্তর-আদর্শ উভয় দিক দিয়াই আত্মকুণ্ঠিত, প্রেমের অস্তিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। সমাজের ভয়, বৈধব্যের সংস্কার ও আচরণের হীনম্মন্যতার জন্য এই প্রেম কোনও দিনই তাহার প্রকাশ-ভীরুত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই। রমেশের প্রতি আচরিত প্রতিটি অন্যায়ের বেদনাময় প্রতিক্রিয়া, ভাই যতীনকে রমেশের আদর্শে মানুষ করিবার কুণ্ঠিত কামনা ও নিজ জ্বালাময় অন্তর্দাহ —ইহাই তাহার অন্তর্গূঢ় অস্বস্তির যৎকিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ। জ্যাঠাইমা তাহার মনের কথা বাহিরে না আনিলে এই ব্যথাদীর্ণ অনুভূতি চিরদিন অপ্রকাশিতই থাকিত। পল্লীসমাজের হীন পরিবেশে এই প্রেমের কুণ্ঠিত আবির্ভাব, চারিদিকের কুয়াসার মধ্যে ইহার ক্ষীণ রশ্মির ম্লান আলোক ইহার অকৃত্রিমতার নিদর্শন। মরুভূমিতে ফোটা ফুলের মতনই ইহার স্বল্পায়ু, বর্ণহীন জীবন। কিন্তু গ্রাম্যজীবনের পঙ্ককুণ্ডে এই সুদূর নক্ষত্রদীপ্তি এক মহনীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

পল্লীসমাজে প্রেমের চিত্র

'বিরাজ বৌ'-এ (১৯১৪) দাম্পত্যপ্রেম কেমন করিয়া অভিমানের এক অদম্য উচ্ছ্বাসে আপনাকে অস্বীকার করিয়া বসিল ও কেমন করিয়া সমস্ত জীবনব্যাপী অনুতাপে এক মুহূর্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল তাহারই করুণ কাহিনী। ইহার আঘাত-সংঘাতের মধ্যে গ্রাম্য পরিবেশের যাথার্থ্য ও পরিবার-জীবনের সত্যকার সমস্যা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

বিরাজ বৌ

'দেবদাস' (১৯১৭) ও 'চরিত্রহীন'-এ (১৯১৭) লেখক গণিকা-জীবনে সত্যকার প্রেমের উদ্ভব-রহস্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাদের কলঙ্কিত জীবনের আরম্ভই হয় ভালবাসার অতৃপ্ত আবেগে ও ইহার পাত্রের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানে। কুলবধূর একনিষ্ঠ প্রেম প্রেম অপেক্ষা নিষ্ঠাকেই বেশী মূল্য দেয়; সুতরাং প্রেমের রহস্য হয় ইহাদের সহজ সংস্কারজাত, না হয় একেবারেই অনাস্বাদিত। কিন্তু যাহারা প্রেমের জন্য অজ্ঞাত পথে পদক্ষেপের দুঃসাহস দেখাইয়াছে ও সামাজিক মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়াছে, তাহাদের ভালবাসা যদি একেবারে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত না হয়, তবে তাহাদের মধ্যেই ইহার সত্য পরিচয় সম্ভব ও প্রত্যাশিত। বহু পরীক্ষার পর প্রকৃত

দেবদাস

প্রেমিকের সন্ধান পাইয়া ইহাদের ভালবাসার অস্থিব আকৃতি উহার বিশুদ্ধতম রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। শরৎচন্দ্রের এই জাতীয় উপন্যাস এইরূপ যুক্তিবাদ ও জীবন-অভিজ্ঞতাব উপরই প্রতিষ্ঠিত মনে হয়। দেবদাসের হতাশ প্রণয়ের জ্বালাময়, ছন্নছাড়া জীবন এই নিগূঢ় নিয়মেই চন্দ্রমুখীব স্নেহ-পরিচর্যাব মধ্যে আশ্রয় ও শান্তি লাভ কবিয়াছে। কিন্তু এখানে সত্যকাব প্রণয়োন্মেষ হইয়াছে কি না সন্দেহ। দেবদাসেব দিকে প্রেম একেবারেই নাই, আছে কৃতজ্ঞতা; আব চন্দ্রমুখীব দিকে হয়ত আছে নিবিড় সহানুভূতি ও মাতৃসুলভ সেবা-যত্ন। বৈধেব ন্যায় অবৈধ মিলনেও কতকগুলি কোমল বৃত্তিব সমবায়কে প্রেম বলিয়া ভুল হইতে পারে। কেহ কেহ হয়ত পঙ্কিল জলে মিষ্ট স্বাদ পাইতে পাবেন, কিন্তু স্বাদেব মিষ্টতা কোথা হইতে আসিল তাহাব রহস্য অনাবিষ্কৃতই থাকে। তাই দেবদাস সরস তথ্যবিবৃতি, হৃদয়েব গভীরে অবগাহন নহে, নাটকেব ভূমিকা, নাটক নহে। পার্বতীর দেবদাসের প্রতি ভালবাসা কর্তব্যবোধে সংশোধিত, 'বজনী'তে অমবনাথেব প্রতি লবঙ্গলতাব মনোভাবের অনুরূপ।

নাটকীয়তার সংঘাতময় ও সমাবোহপূর্ণ আয়োজন হইয়াছে 'চবিত্রহীন'-এ (১৯১৭)। এই উপন্যাসে লেখকেব অভিনব জীবন-অভিজ্ঞতাব একটা অংশেব সার-নির্যাস পরিবেশিত হইয়াছে। কিরণময়ীর মনস্বী বিশ্লেষণের ভিতব দিয়া প্রেমেব স্বরূপ-বহস্য ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রেমের আত্মগোপনশীলতা কি অসাধাবণ, কতরূপ ছদ্মবেশে ইহা মানব-সংসারে বিচরণ করে, বাঙালী পাঠকের নিকট সেই আশ্চর্য কাহিনী লেখক বিবৃত করিয়াছেন। হারানেব প্রতি মনোভাবে একবিন্দু কোমলতাহীন কর্তব্যনিষ্ঠা, অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি আচরণে একান্ত নিরুপায়ের ছলনাভিনয়, দিবাকরকে আকৃষ্ট করার মধ্যে নৈরাশ্যেব আঘাতপ্রাপ্ত প্রেমেব মর্মান্তিক প্রতিঘাত—উপেন্দ্রের মর্মরশুভ্র ও মর্মর-কঠিন ব্যক্তিত্বেব মধ্যে সুরবালার চক্ষু লইয়া অতর্কিতভাবে এই বহু-অন্বেষিত প্রেমের আবিষ্কার—প্রেম লইয়া কি বিচিত্র পরীক্ষাই না উপন্যাসটিতে চলিয়াছে! প্রখব বুদ্ধিব অভিমানে, প্রেমে সার্থক হইবাব যে প্রধান অবলম্বন—আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে আত্মসমর্পণ—তাহাই কিরণময়ীব ছিল না। হৃদয়াবেগের এই সূক্ষ্ম স্প্রিং-এ ঠিকমত দম দিতে না জানিয়া সে সমস্ত যন্ত্রটিই বিকল করিয়া ফেলিয়াছে। প্রেম-রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বোহিণী গুলি খাইয়া মরিয়াছে; আর অতি-অভিজ্ঞ কিরণময়ী উন্মাদের পথে আত্মহত্যা ববণ করিয়াছে।

চরিত্রহীনেব কিরণময়ী

সাবিত্রীর ভালবাসা কিরণময়ীর বিপরীতধর্মী। তাহার পূর্বজীবনের

গোলমেলে ইতিহাস তাহার প্রেমাদর্শের উপর আলোকপাত করে না। সত্যকার প্রেম যখন আসে তখন সে নিজের অন্তরের আলোকে তাহার গন্তব্য পথকে সুনিরূপিত করে। সতীশের সম্বন্ধে সাবিত্রীর মনোভাবেরও যেমন কোন অনিশ্চয়তা ছিল না, তেমনি তাহার কি কর্তব্য সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেমের যে শাশ্বত আদর্শ ও বিশ্বজয়ী শক্তি জগতেব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রশস্তি লাভ কবিয়া আসিতেছে, এক অশিক্ষিতা, কুৎসিত আবেষ্টনে অবস্থিতা মেসের ঝি তাহারই প্রসাদলাভে ধন্য হইয়াছে। উপন্যাসেব ঘটনার সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে, লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও নির্মম প্রত্যাখ্যানেব ফাঁকে ফাঁকে প্রেমের এই লীলারহস্য স্তবে স্তরে উন্মোচিত হইয়াছে। সাবিত্রীকে যে মুহূর্ত হইতে আমরা দেখি, সেই মুহূর্ত হইতে তাহাব চরিত্রে ও আচরণে কোন অসঙ্গতি নাই, তাহাব অবস্থাব অনুপযোগী কোন আদর্শবাদ ও ভাবোচ্ছ্বাসেব আতিশয্য ইহার মধ্যে কোন ছন্দপতন ঘটায় নাই। সবোজিনীর ভালবাসায় কোন জটিল স্ববিরোধ নাই, ইহা প্রেমাস্পদেব চরম দোষ জানিয়াও তাহার প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

চরিত্রহীনের সাবিত্রী

'দেনাপাওনা' (১৯২৩) ও 'দত্তা'য় (১৯২৪) প্রেমই হইল মূলকথা; তবে এই দুই উপন্যাসে যে বিশেষ পবিবেশে এই প্রেমেব বিকাশ হইয়াছে তাহাবও মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। জীবানন্দ ও ষোডশীব ভালবাসা লাঞ্ছিত প্রেমেব গৌববময় পুনঃপ্রতিষ্ঠাব কাহিনী। একদিন বিবাহের অভিনয়েব পব জীবানন্দের স্ত্রী-ত্যাগ, তাহাব ঘৃণিত চরিত্র, ষোড়শীব প্রতি তাহাব রূঢ় আচরণ ও চণ্ডীগড়ের সম্পত্তি লইয়া বৈষয়িক বিবোধ; অপব দিকে ষোডশীর ভৈরবী-জীবন ও স্বামী-সম্বন্ধে নিদারুণ ঘৃণা—দুইদিকের প্রবল বাধা সত্ত্বেও জীবানন্দেব মত পাপিষ্ঠও ভালবাসার স্বাদ নূতন কবিয়া অনুভব করিয়াছে ও ষোড়শীর পূর্বসংস্কার ও জীবানন্দের প্রতি মমতা তাহার মনেও কিছুটা সাডা জাগাইয়াছে। জীবানন্দেব যে বে-পবোয়া দুঃসাহস তাহার পাপাসক্তিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে তাহাই তাহার পরিশুদ্ধ প্রণয়-কামনাব পিছনেও অদম্য শক্তি সঞ্চার কবিয়াছে। আত্মাকে কলুষিত করায় ও আত্ম-সংশোধনে তাহার সমান জিদ। প্রৌঢ়া ষোড়শী তাহার সমস্ত দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মপ্রত্যয় লইয়াও এই নব আবির্ভাবকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। উহাদের মিলনে আমরা আবেশহীন প্রৌঢ় প্রেমের এক শক্তিমান পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

দেনাপাওনা

'দত্তা'-য় বিজয়ার সহিত নরেনের বৈষয়িক ও খানিকটা সংঘর্ষমূলক পরিচয় অনেক ভুল বোঝাবুঝি, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষজনিত বাধা ও আত্মনিগ্রহের নিরুপায় নৈরাশ্য অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত সার্থক প্রেমে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু প্রেমই ইহার প্রধান কথা নহে। বিজয়ার চরিত্রের দৃঢ়তা পিতা কর্তৃক তথাকথিত বাগ্‌দানের মর্যাদারক্ষারূপ কর্তব্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ কবিয়া ও অবশেষে বাগ্‌দানের কথাটা যে মিথ্যা ইহা জানিয়া অন্য সমস্ত বাধার উপর জয়ী হইয়াছে। যাহারা প্রেমের সার্থক পরিণতির পথে বাধা দিয়াছে, সেই রাসবিহাবী ও বিজয়াব বাগ্‌দত্ত বর বিলাসবিহারী—একজন তাহার কৌশলময়তা ও ধর্মনিষ্ঠাব অপূর্ব অভিনয়ে ও অপরজন তাহার অনমনীয় এক-গুঁয়েমিব জন্য—চবিত্রবৈশিষ্ট্য লাভ কবিয়াছে। প্রেমিক হিসাবে নরেন নিতান্তই অসহায় ও দুর্বলচেতা। সুতবাং উপন্যাসটি শুধু প্রেম-কাহিনী নহে; ইহার পটভূমিকায় যে অন্যান্য প্রধান চরিত্র স্থান পাইয়াছে তাহাদেব তীক্ষ্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্যও ইহা প্রশংসনীয়।

দত্তা

শ্রীকান্ত (চাবি পর্ব) শরৎচন্দ্রেব বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। অনেকে ইহা আত্মজীবনমূলক মনে করেন। ইহার অনেক আখ্যান ও জীবন-অভিজ্ঞতার বহু অংশ যে শরৎচন্দ্রেব ব্যক্তি-জীবনসঞ্জাত এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে। এখানে শ্রীকান্তেব প্রতি বাজলক্ষ্মীর বাল্যপ্রণয় দীর্ঘ বিস্মৃতির পর অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অপরূপ প্রণয়লীলা নানা সূক্ষ্ম পবিবর্তনের স্তব বাহিয়া অগ্রসব হইয়াছে। শ্রীকান্তের দিকে আত্মসম্ভ্রমবোধ ও দার্শনিকোচিত ঔদাসীন্য, একটা প্রকৃতিগত নিস্পৃহতা; রাজলক্ষ্মীর দিকে গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা, আচারগত শুচিতা ও ধর্মানুষ্ঠানেব বাড়াবাড়ি, কখনও কখনও শ্রীকান্তের নির্লিপ্ততার প্রতি অভিমান—এই প্রেমকে নিশ্চিন্ত আরাম ও নিশ্চল পূর্বানুস্মৃতি হইতে রক্ষা কবিযা ইহাকে মুহূর্তে মুহূর্তে এক নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ঈর্ষ্যা, অধিকার হারাইবার ভয়ই বাজলক্ষ্মীর ধর্মের নেশা টুটাইয়া তাহাকে শ্রীকান্তেব প্রতি নূতন করিয়া আগ্রহান্বিত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয় যে এই প্রণয়ের ইতিহাসকে অযথা দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে, ইহার সমস্যায় নূতন জালের সংযোজনা ইহাকে কোন সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যায় নাই। লেখক হিসাবের চলতি খাতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যই খোলা রাখিয়াছেন, 'নিজের হাতে গড়ি বিপদজাল নিজেই কাটিয়া তাহা' একপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন।

শ্রীকান্ত

কিন্তু শ্রীকান্তের প্রধান পবিচয় প্রেমিকরূপে নহে, জীবনেব বিচিত্র রসের আস্বাদনকারী দার্শনিকরূপে। সে দরদী রসিকের দৃষ্টি ও প্রজ্ঞাশীল দর্শকের বিচাববুদ্ধি লইয়া জীবনেব সমস্ত ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছে। তাহাব জীবনেব অভিজ্ঞতা সমাজের সুদূবতম প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত প্রসাবিত। যাহাদেব উপব সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল, যাহারা ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, জীবনকে খেয়ালখুশি-মত কাটায় তাহাদিগকেই সে বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিযাছে ও তাহাদেব নিকট হইতেই জীবন সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য তত্ত্ব আহবণ কবিয়াছে। ইন্দ্রনাথেব মত ডাংপিটে ছেলে, অন্নদাদিদিব মত সমাজচ্যুতা নারী, বজ্রানন্দেব মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সুনন্দাব মত কুলাচারে আস্থাহীন, কিন্তু অন্তবেব প্রত্যয়ে অটল গৃহস্থবধূ, গহরেব মত আত্মভোলা স্বভাব-কবি, কমললতার মত নিবাসক্ত সেবা-মাধুর্যেব প্রতীক বৈষ্ণব-কন্যা—ইহাবা সকলেই শ্রীকান্তেব অনুভূতি-ভাণ্ডাবে নূতন ঐশ্বর্যেব উপহার আনিয়াছে। তাহাব শ্মশানেব উপান্তে আত্মগত চিন্তা, আঁধাবেব রূপবর্ণনা, সুদূর ব্রহ্মদেশে বাঙলার আচার-সংস্কারহীন মানবিক সম্পর্কেব স্বাধীন বিকাশ, সন্ন্যাসীর তাঁবুতে ও বৈবাগীব আখড়ায় জীবনেব ভারবর্জিত স্বচ্ছন্দগতি, তাহাব নিজ মনের সমস্যা লইয়া আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ—এই সমস্তের ভিতর দিয়া মানবজীবনরহস্যের কি গভীব ও বহুমুখী উপলব্ধি আমাদেব অন্তরকে কানায় কানায় পূর্ণ করে! শবৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-পাঠেব পর আমরা যেন নূতন চক্ষু দিয়া জীবনকে দেখিতে শিখি, আমাদেব মনে অনুভূতিব এক নূতন দ্বাব খুলিয়া যায়। ইহাব মধ্যে ঔপন্যাসিক ঐক্য নাই, ইহা যেন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও উপলব্ধিব শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি; এক শ্রীকান্তেব চরিত্রের মধ্য দিয়াই ইহাবা ঐক্যবন্ধনে সংহত হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত'-ই শরৎচন্দ্রের জীবনভাষ্য।

শ্রীকান্তে শরৎ-চন্দ্রের জীবনভাষ্য

'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসই শরৎচন্দ্রেব জীবন-সমস্যার তীক্ষ্ণতম রূপায়ণ। ইহাতে আধুনিক মনের দোটানার মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধান্তসংকট, দুই বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে ইহার অসহায় দোলা মর্মান্তিকভাবে উদাহৃত হইয়াছে। অচলার নারী-হৃদয়ের উপর এই মন্থনদণ্ডের তীব্রতম ঘর্ষণ কাজ করিয়াছে। সে একবার মহিম, একবার সুরেশ এই উভয় বন্ধুর দিকে পর্যায়ক্রমে আকৃষ্ট হইয়াছে ও শেষ পর্যন্ত কে যে তাহার কাঙ্ক্ষিত সে সম্বন্ধে মন স্থির করিতে পারে নাই। মহিমের প্রতি তাহার মনোভাব ভালবাসা না একনিষ্ঠতার অহমিকা, সুরেশের প্রতি তাহার আকর্ষণ পরাজিতের প্রতি

গৃহদাহ

সমবেদনা না দুরন্ত আবেগের নিকট আত্মসমর্পণ তাহা শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত থাকে। সুরেশের উন্মত্ত হঠকারিতা বাহিরের দিক হইতে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছে, কিন্তু অন্তরের বিমুখতাকে শান্ত করিতে পারে নাই। এই দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া সে নিজেও সুখী হয় নাই, প্রতিযোগী প্রেমিকদের মধ্যেও কাহাকেও সুখী করিতে পারে নাই। তাহার মত শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা সুরেশের অত্যাচারকে কেন নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিল, কেনই বা চিঠি লিখিয়া তাহার বাবাকে পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার খবর দিতে পারিল না, সুরেশের ভ্রান্ত স্বামিপরিচয়কে নীরবতার দ্বারাই সমর্থন করিল ইহার রহস্যভেদ দুরূহ। এই দুর্বল ছলনার মধ্যে মিথ্যা সম্ভ্রমের মোহ ছাড়াও হয়ত সুরেশের দাবীর মৌন স্বীকৃতি, তাহার অসংযমের জন্য নিজ দায়িত্ব-চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। অচলার চিত্তদাহের এই ধিকিধিকি আগুনে মহিমের সংসারজীবন ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহার বিস্ফোরক শক্তি সুরেশকেও নিশ্চিত মৃত্যুর আত্মাহুতিতে ঠেলিয়া দিয়াছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র—মৃণাল, রামবাবু প্রভৃতি—পূর্ণভাবে জীবন্ত নহে—ইহারা অচলার বিপরীত আদর্শের প্রতীক। মৃণালের স্বামিপ্রেম একটা অবাস্তব আদর্শের আড়ম্বর, ইহা তাহার জীবনে পরীক্ষিত সত্য নয়। তাহার সেবাধর্মই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ। রামবাবুর অন্ধ সংস্কার অচলার সংস্কারহীনতার স্থূল প্রত্যুত্তর —ইহার প্রাণশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, কেবল আঘাতের অস্ত্র মাত্র। মহিম ও সুরেশ দুই তীরের ন্যায় অচলার দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ জীবনপ্রবাহকে ধরিয়া রাখিয়াছে। অচলা-চিত্তের স্ববিরোধই আধুনিক জীবনের একটা মর্মান্তিক, অনিবার্য প্রবণতারূপে সার্বভৌম সত্যের মর্যাদায় আসীন।

সমাজ-নির্যাতনের কাহিনী 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) ও 'পল্লীসমাজ'-এ গভীর সহানুভূতি ও বেদনাবোধের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। 'পথের দাবী'-তে (১৯২৬) পরাধীন জাতির মর্মবেদনা ও বিপ্লববাদের মূলতত্ত্ব প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু

পথের দাবী

'আনন্দমঠ'-এ যেমন, 'পথের দাবী'-তেও তেমনি সমাজ-জীবনের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের নিগূঢ় যোগসূত্রটি দেখানো হয় নাই—সব্যসাচী, সুমিত্রা প্রভৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহাদের চরিত্র-রহস্য কেমন করিয়া রূপ পাইল তাহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। সন্ত্রাসবাদের এই রহস্যময় ও বিপদসঙ্কুল আবহাওয়ায় অপূর্ব ও ভারতীর মধ্যে প্রেম-সম্পর্কটিই ঝোড়ো বাতাসে বিক্ষুব্ধ তরুণ চারার মতই সঙ্কুচিত, অথচ অদম্য প্রাণশক্তিতে নিজ ডালপালা মেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে কখনই

সুনজরে দেখেন নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রেম ও নিপীড়িত জাতির আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গোপন ষড়যন্ত্রের অপরিহার্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে।

শেষপ্রশ্ন

'শেষ প্রশ্ন'-এ (১৯৩১) লেখক এক নূতন জীবনদর্শনকে যাচাই করিতে চাহিয়াছেন। অতীতের প্রচলিত সংস্কার ও আদর্শনিষ্ঠা, নীতির দিক দিয়া ভাল হইলেও, আধুনিক যুগেব পরিবর্তিত পবিস্থিতিতে তাহাবা যে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে ও জীবনেব সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী, প্রেমে যে ক্ষণিক আবেগ-তৃপ্তির অতিরিক্ত স্থায়িত্ব ও মূল্য নাই, স্বাদুতাই যে জীবনরসের উৎকর্ষেব একমাত্র মানদণ্ড—এই জাতীয় বৈপ্লবিক মতবাদ লেখক কমলেব মুখ দিয়া প্রচাব করিয়াছেন। বইখানিতে তাঁহার যুক্তির চমকপ্রদ মৌলিকতা, নূতন অনুভূতিব চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-ছটা প্রকটিত হইলেও উপন্যাস হিসাবে ইহাকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া যায না।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প সংখ্যায় অপ্রচুব ও দুই একটি ছাড়া উহা সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহাব উপন্যাস আমাদেব মানস মুক্তি সম্পাদন করিয়া আমাদের সমাজ-চেতনা ও ন্যায়-অন্যায়-বোধকে উদ্দীপ্ত কবিয়া, আমাদেব মনোজগতেব বহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া, প্রখব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মসচেতন নব-নাবীব সৃষ্টি কবিযা, বর্তমান যুগেব জীবন-যাত্রাব সমস্যা-জর্জবিত, বেদনাময় রূপটি প্রকটিত কবিয়া আমাদিগকে একেবারে সমগ্র জগৎব্যাপী আধুনিকতাব কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে বাহিরেব আলোকে ঘবেব কথা বুঝিতে শিখাইয়াছেন, আমাদিগকে আত্মপবিচয়ে উদ্বুদ্ধ করিযাছেন। ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব কাব্যেব মধ্যে একদিকে উপনিষদ-চেতনা, অন্যদিকে বিশ্ববোধ এই দুই বিপবীত সীমাব মধ্যে আমাদের অনুভূতিকে প্রসাবিত কবিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাব উপন্যাসে সমস্যার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ধ্যানলোকেব তন্ময়তার এক আশ্চয ও সময় সময় বিসদৃশ সম্মিলন ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্র আমাদের জীবনসমুদ্র মন্থন কবিযা উহার বিষ ও অমৃত একসঙ্গে আমাদের ওষ্ঠে তুলিয়া ধবিয়াছেন ও অভ্যস্ত জীবনের আবাম-শ্লথ পবিবেশ হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন জীবনসমন্বয়ের দুরূহ কাযে আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন। বাঙলার অতি-আধুনিক জীবনযাত্রা ও উপন্যাস-সাহিত্য তাঁহারই পথনির্দেশের ধারানুসরণে তাঁহার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আরও নূতনতর পরীক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্য ও কবিতা

১

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার প্রাচীন কাব্য-ধারা নিঃশেষিত হইল। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও যাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাহা তাঁহার অতীতের অনুস্মৃতি নহে, ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শের পূর্বেই তাঁহার মনে যে বস্তু-সচেতনতা, যে তির্যক প্রকাশভঙ্গী ও ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি, কল্পনার নূতন ক্রীড়াশীলতা ও ছন্দের যে নূতন পরীক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা শুষ্কপ্রায়; শাক্ত পদাবলীর অচিরোদ্ভূত প্রেরণাও যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না তাহার লক্ষণও সুপরিস্ফুট। যুগের পরিবর্তনশীল হাওয়ায় কবি-চেতনাকে এমন নাড়া দিয়াছে যে উহার পক্ষে অতীতের আত্মতৃপ্ত ও নিঃসংশয় পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব হইল না।

ভারতচন্দ্রে ভাবী যুগের পূর্বাভাস

এই যুগে কবিয়ালদের উদ্ভব হইয়াছে—কবিগানই এই যুগের প্রধান নূতন সৃষ্টি। ইহার মধ্যে প্রাচীন যুগের আদিরস ও ভক্তিরসের সংমিশ্রণ ঘটিলেও, বিদ্যাসুন্দর, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ও শক্তিপূজার প্রাকৃতজনোচিত রুচিহীন রূপান্তর ও বিচ্ছিন্ন সুরের প্রতিধ্বনি অনুভূত হইলেও, ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এতাবৎ অভিজাত-সংস্কৃতি ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনার দ্বারা সুরক্ষিত কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে গণজীবনের অসংস্কৃত স্বভাবধর্মের অনুপ্রবেশ ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষীণ আবরণে বাস্তবজীবনের আকৃতির ক্রমস্ফুরণ। দীর্ঘ দিন ধরিয়া অনুশীলিত পুরাণসম্মত ভক্তিবাদ যে নিরক্ষর জনসাধারণের চিত্তকে রসসিঞ্চিত করিয়া তাহাদের কণ্ঠের সুরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কবিগানের মধ্যে তাহারই নিদর্শন। ইহা ঠিক লোক-সাহিত্য না হইলেও অভিজাত-সাহিত্যের লৌকিক সংস্করণ। পৌরাণিক সংস্কৃতির অত্যন্ত ব্যাপক প্রসারের ফলেই ইহা গণচেতনায় কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় ইহার অতীতাশ্রয়ী ভাব নহে, ইহার ভবিষ্যৎ

কবিগানে বাস্তবতার সুর

তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যানুভূতির সার্বভৌম প্রসার ও সাধারণ মানুষের বোধোপযোগী প্রকাশরীতি। কবিওয়ালাদের সকলেই অশিক্ষিত ছিল ও সকলেই আসরের মধ্যে বসিয়া প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরস্বরূপ মুখে মুখে গান বাঁধিত, আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কবিওয়ালারা—যথা, গোঁজলা গুই, কেষ্ট মুচি, এণ্টনি ফিরিঙ্গি—হয়ত অশিক্ষিত ছিল ও স্বভাবকবিত্বের বলেই কবিতা রচনা করিত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণসম্ভূত কবিওয়ালাগণ—যেমন রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি—নিশ্চয়ই অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত ছিলেন না ও তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তি সাহিত্যরুচির দ্বারা কিছুটা মার্জিত ছিল। আর যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কবিগান বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে তাহারা আসরে গীত হইলেও কাব্যসাধনার নিভৃত আত্মচিন্তার অনুকূল অবসরে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কবিগানে আধুনিকতার আর একটি লক্ষণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বেনামীতে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন মানবিক প্রেমের অনুভূতি ও প্রকাশ। মনে হয় যে কৌলীন্যপ্রথা-বিড়ম্বিত সমাজজীবনে যে অবরুদ্ধ প্রেমের করুণ আর্তি হৃদয়ের তলে গুমরাইয়া মরিতেছিল, তাহাই এই সমস্ত পল্লীকবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবসাধনার প্রচলিত রস ও রীতির কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া বাস্তব জীবনসম্ভূত হৃদয়বেদনাই এই গানের মধ্যে অনিবার্য ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও কবিগানের মধ্যে অনেক সমসাময়িক ঘটনার ব্যঙ্গাত্মক উল্লেখ দেখা যায়—ইহাতেও মনে হয় যে কবি-কল্পনা কাব্যের সুনির্দিষ্ট বিষয়-পরিধি অতিক্রম করিয়া জীবনের প্রত্যক্ষ প্রবাহ হইতে প্রেরণা আহরণ করিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতেছে।

কবিগানে মানবিক প্রেমের অনুভূতি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) যুগসন্ধিক্ষণের কবি ও ইহার রুচিনিয়ামক। তাঁহার কবিতায় মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদকরূপে তিনি সাহিত্যসমালোচনা, কবিয়ালদের জীবনী ও কবিতাসংগ্রহ, সমাজ ও ধর্মনীতি-বিষয়ক সমসাময়িক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিচিত্ররূপ মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও সাংবাদিকতা উভয় ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা, বাস্তব জীবনের সহিত গভীর পরিচয়ের নিদর্শন মিলে। এই দিক দিয়া তাঁহার মনোধর্ম

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমাজ-সচেতনতা

আধুনিক হইলেও তাঁহার কবিতার অনেক স্থলেই তিনি কবিয়ালদের বিশিষ্ট ভঙ্গীর অনুবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গ-প্রবণতা, কৌতুকরসসৃষ্টির দিকে বিশেষ ঝোঁক, অনুপ্রাস-যমকের আতিশয্যে চমক লাগাইবার প্রয়াস, তাঁহার উচ্চকণ্ঠ হাসিহল্লা—এ সবই কবিয়ালদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রমাণ। তিনি যখন 'পাঁঠা', 'তপ্‌সে মাছ' বা 'আনারস' লইয়া ভোজ্যরসের কবিতা লেখেন, তখন তিনি মূলত কবিয়ালদের ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহাদেরই জীবনদৃষ্টির অনুসারী। কিন্তু কবিয়ালদের অসংলগ্ন, শিল্পবোধহীন রচনাকে তিনি তাহার মনীষা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োগে উন্নত শিল্পপর্যায়ে উঠাইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে মুকুন্দরাম, এমন কি বৈষ্ণবসাধনায় নিবিষ্ট-চিত্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদের কবিতার মধ্যে সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যের সরস বর্ণনা দিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কোন কবি ভোজন-বিলাস লইয়া কবিতা রচনা করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। তা ছাড়া বাঙলা দেশের ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা- ও আকাঙ্ক্ষা-বিড়ম্বিত গার্হস্থ্য জীবন ও ইহার কলহপরায়ণা, স্থূলরুচি, রন্ধন ও ঢেঁকিশালার কুশ্রী পরিবেশে অধিষ্ঠিতা বঙ্গনারীর ব্যঙ্গ-চিত্র বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় শেষবারের মত অঙ্কিত হইয়াছে। এই যুগের পর নারী সম্বন্ধে আমাদের কাব্য-মনোভাব রোমান্টিক প্রশস্তির পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মনোধর্মের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে শেষ খাঁটি বাঙলা কবিরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

ইংরাজীর গঠনমূলক প্রভাব—ঈশ্বর গুপ্তে অস্বীকৃত

কিন্তু তাঁহার কবিজীবনের আর একটি দিক আছে, যেখানে তিনি ইংরেজ-শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাজে যে আলোড়ন জাগিয়াছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একদিক্ দিয়া বলা যায় যে তাঁহার খাঁটি বাঙালীসুলভ গুণগুলিরও বিকাশ হইয়াছে বাঙলা-সমাজের এই পরিবর্তনের স্রোতে চঞ্চল, হাস্যকর অসঙ্গতিপূর্ণ প্রতি-বেশের অভিঘাতে। ইংরেজ ও ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে আমাদের চিরাভ্যস্ত সমাজপ্রথা ও রীতি-নীতির বিপর্যয় তাঁহার যে ব্যঙ্গাত্মক বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহাই তিনি আমাদের দেশী জীবনেরও অসঙ্গতির প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনোভঙ্গী স্বভাবতই শ্লেষ-প্রবণ ছিল বলিয়াই তিনি এই বৈদেশিক প্রভাবের অভাবাত্মক দিকটাই লক্ষ্য করিয়াছেন; উহার বিশৃঙ্খলতা ও রুচিবিকারের অন্তরালে যে গভীরতর সংশ্লেষ-মূলক গঠনকার্য চলিতেছিল তাহার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন। সেইজন্য আমরা

তাঁহার কবিতায় হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-প্রহসনেরই প্রাধান্য দেখি, অপর দিকের কোন সন্ধানই পাই না। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহেব সহিত সম্যক পরিচিত হইয়াও বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ পরিণতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি যে পথে বাঙালীর জীবনস্রোতকে প্রবাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন উহা সে পথে না চলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত পথই অবলম্বন করিয়াছে। বিদেশী সুবাব তীব্র ঝাঁজ ও উগ্র স্বাদ যে কালক্রমে বিশুদ্ধ মধুর রসে পরিণত হইয়া বাঙালীব জীবনসঞ্চিত অমৃতের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া যাইবে ইহা অনুমান করিবার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাই এই যুগের বাঙালীব প্রতিনিধি-কবি পববর্তী যুগে একক ব্যতিক্রমে পর্যবসিত হইয়াছেন—আধুনিক কাব্যধাবার প্রবর্তক না হইয়া ইহাব গতিবোধেব ব্যর্থপ্রয়াসের নায়করূপেই সাহিত্যেব ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৬) সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধক কাব্যে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবি-কল্পনা প্রয়োগ কবিয়া আধুনিক কবিতাব সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাব 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), শূবসুন্দরী (১৮৬৮) ও কাঞ্চীকাবেবী (১৮৭৯) এই নূতন কাব্যধারাব সার্থক নিদর্শন। বাজপুত-ইতিহাস ও উড়িষ্যার ধর্মমূলক কিংবদন্তী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি গীতি-উচ্ছ্বাসময় ভাষায় ও শৌর্যদৃপ্ত ভঙ্গীতে এই কাব্যগুলি রচনা করিয়া বাংলা কাব্যেব মোড় ফিবাইয়া দিলেন ও নূতন বিষয়েব সহিত অভিনব কাব্যবীতিব সংযোগে যে গতানুগতিকতাব গ্লানিমুক্ত কবিতা বচনা করা যায় তাহা প্রমাণ কবিলেন। তাঁহাব ভাষা অনেকটা ঈশ্বর গুপ্ত-প্রভাবিত ও ক্লাসিক্যাল রীতিব সংযম ও গাঢ়বদ্ধতায় মননপ্রধান হইলেও উদ্দীপনাময় আবেগসঞ্চারেব পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে গীতিকবিতার অন্তর্মুখী নিগূঢ়তা ও ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁহার রচনায় দুর্লভ, প্রবহমাণ পয়ারছন্দে আখ্যান-কাব্যের ওজস্বী ভাবপ্রকাশেই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব। মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী হইতে আধুনিক যুগেব বিস্তৃততর কাব্য-পরিধিতে উত্তরণের দিকে রঙ্গলাল অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন ও কাব্যের বন্ধনমুক্তি-বিষয়ে তাঁহার আংশিক সাফল্য যে তাঁহার পববর্তী কবি মধুসূদন দত্তকে তাঁহার মৌলিক পথ-আবিষ্কারে অনেকখানি উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

রঙ্গলালের রোমান্টিক দেশাত্মবোধ

২

প্রকৃতপক্ষে **মাইকেল মধুসূদন দত্তই** (১৮২৪—১৮৭৩) নব যুগের বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রথম দেশীয় বিষয়-বস্তুর কাব্যোপস্থাপনায় পাশ্চাত্ত্য কবি-কল্পনার বিশেষ রীতিটির সার্থক প্রয়োগ করিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহার সব দিক দিয়াই অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল। কি অন্তঃপ্রকৃতিতে, কি মানস-অনুশীলনে ও জ্ঞান-চর্চায় তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়-স্থাপনের জন্য যেন দৈব-প্রেরিত ভাগ্যবিধাতারূপেই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার দোষ ও গুণ, তাঁহার শক্তি ও দুর্বলতা, তাঁহার অস্থিরমতিত্ব ও স্থির সাধনা, তাঁহার ভোগবিলাস ও আদর্শনিষ্ঠা সবই একযোগে তাঁহাকে বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়-সিদ্ধির বাহনরূপে নির্মাণ করিয়াছিল। সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় তিনি ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন ও প্রাচীন সমাজপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই গভীর অনুরাগ ও সমাজ-বিদ্রোহপ্রবণতা শুধু ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীর একটা সাধারণ চিত্তচাঞ্চল্য ও সমাজশাসন-অসহিষ্ণুতার পর্যায়ভুক্ত ছিল না। ইহা প্রতিভাশালীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মর্মমূল হইতে উৎসারিত ছিল। ইহা শুধু সমাজপ্রথাকে ভঙ্গ করিয়া ও ধর্মজীবনে স্বাধীনতার দাবী করিয়াই সুলভ তৃপ্তি লাভ করে নাই। মধুসূদনের অতৃপ্তি ও অস্বস্তির মূলে এমন একটা দুর্বার বেগ ছিল, আত্মকেন্দ্রিক জীবনের এমন একটা নিগূঢ়-রহস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রেরণা ছিল যে ইহা তাঁহাকে কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় সমস্ত নিয়মবন্ধন, সমস্ত অভ্যস্ত আবর্তনচক্র হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। প্রতিভার এত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, এত অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ দাবীর, সমস্ত পরিমিতি-বোধের এত সামগ্রিক অস্বীকৃতি লইয়া বাঙালী সমাজে আর কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমাজ-সংস্কারক এক আদর্শ ত্যাগ করিয়া অপর এক উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, এক সমাজপ্রথার বশ্যতা অস্বীকার করিয়া উদারতর, মুক্ততর প্রথার বশীভূত হইয়াছেন, হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় লইয়াছেন, পরিবার-নির্দিষ্ট পাত্রীর পরিবর্তে স্বয়ং-নির্বাচিত প্রণয়িনীকে গ্রহণের দাবী জানাইয়াছেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার কবিধর্মের অনির্দেশ্য ও দ্রুতপরিবর্তনশীল প্রয়োজনবোধ ছাড়া আর

আধুনিক কাব্য প্রতিষ্ঠায় মধুসূদনের অধিকার

কোনও মানদণ্ডে তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার পিতামাতার আশ্রয় ও পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগ, খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ ও ইউরোপীয় মহিলা-বিবাহ, তাঁহার ভোগবিলাসের আতিশয্য ও অমিতব্যয়িতার জন্য দারিদ্র্যবরণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে না পারার জন্য অবিরত অশান্তিভোগ—এসবই তাঁহার মহাকবি হওয়ার জন্য আয়োজন ও প্রস্তুতি, দেশীয় শিরা-ধমনীতে পাশ্চাত্ত্যের উষ্ণ-রক্ত-সঞ্চারের জন্য যন্ত্রণা ও অস্ত্রোপচার। কোন কবি এরূপভাবে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া কাব্যসরস্বতীর চরণে রক্তপদ্মের ন্যায় উপহার দেন নাই। মধুসূদন শুধু প্রতিভায় নয়, শুধু বিরাট ও বহুমুখী জ্ঞানার্জনে নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনসাধনার মধ্য দিয়া, এই নব কাব্যসৃষ্টির জন্য যে সর্বতোমুখী আত্মনিয়োজনের প্রয়োজন তাহার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু যদিও এই কাব্যসাধনার জন্য মধুসূদনের জীবনব্যাপী প্রস্তুতি ছিল, তথাপি আকস্মিকতার অঙ্গুলিস্পর্শেই তাঁহার কাব্যরচনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব লইয়াই কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার যেমন আত্মশক্তিতে অসীম প্রত্যয় ছিল, তেমনি বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধেও অগাধ আস্থা ছিল। মধুসূদনের যুগে মহাকাব্য-রচনাই ভাষার শ্রেষ্ঠ মর্যাদালাভের একমাত্র উপায় ও পরীক্ষাস্থল বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্য তিনি যখন বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন স্থির করিলেন, তখন তিনি হোমার, ভার্জিল, ডান্টে, ট্যাসো, এরিয়স্টো প্রভৃতি বিদেশী এবং ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি দেশীয় মহাকবিদের রচনার প্রতিস্পর্ধী মহাকাব্য-রচনার দুঃসাহসিক কল্পনাকেই রূপ দিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে বাংলা নাটকের দুরবস্থা তাঁহার লুপ্ত প্রতিভার উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিল—তিনি সপ্তাহের মধ্যে যুগোপযোগী আধুনিকতার লক্ষণ-সম্পন্ন নাটক-রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা সগৌরবে পালন করিলেন। আবার বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাজি রাখিয়াই তিনি বাংলার প্রথম মহাকাব্য 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্য-রচনায় ব্রতী হইলেন। এইরূপ উদাত্ত ভাষাগৌরব ও ধ্বনিগাম্ভীর্য-সমন্বিত, অন্ত্যমিলহীন, অথচ অন্তশ্ছন্দঃস্পন্দের বিচিত্র প্রবাহের দ্বারা গীতোচ্ছ্বাস-ময় কবিতার জন্য দেশের কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্ম মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য-কাব্যপুষ্ট, প্রতিবেশনিরপেক্ষ একক কল্পনার মধ্যে। কবিপ্রতিভার

মধুসূদনের আত্মপ্রত্যয় ও বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয় শ্রদ্ধা

সহিত সমকালীন কাব্যরুচির এরূপ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি তিনি নিজ অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই পাইয়াছিলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য (১৮৬০) মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার প্রথম গৌরবময় পরীক্ষামূলক নিদর্শন হইলেও ইহা বিদগ্ধ সমাজের রুচিবিরোধ সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই। ইহার আবির্ভাবে প্রশংসা অপেক্ষা বিস্ময়েরই পরিমাণ ছিল বেশী। ইহাতে নব-পরীক্ষিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের আড়ষ্টতা ও পয়ার-অনুকৃতির একঘেয়েমি সম্পূর্ণ কাটে নাই। বিশেষতঃ ইহা মহাভারতের সুন্দ-উপসুন্দ-কাহিনীরূপ এক অখ্যাত আখ্যান-অবলম্বনে রচিত। ইহার কোন সার্বভৌম যুগোচিত বা যুগাতিশায়ী ভাব-তাৎপর্য ছিল না। সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালী ইহার মধ্যে নিজ মানস অভীপ্সার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় নাই। ইহার শব্দধ্বনিসমারোহ ও ছন্দকুশলতার পিছনে কোন প্রাণচঞ্চল জাতীয় আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন জীবনাবেগের উত্তপ্ত রক্ত-প্রবাহ সঞ্চারিত করে নাই। ইহার মধ্যে ছন্দ ও ভাষাশিল্পীর কারুকার্য আছে, জীবনবোধের সূক্ষ্মতর আবেদন নাই। মধুসূদনের মনে তিলোত্তমার অপরূপ রূপোচ্ছলতা যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল তাহাই কাব্যের মুখ্য আবেদন—অথচ এই দেহ-লাবণ্য রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র মত কোন অমূর্ত ভাবব্যঞ্জনা-সংযোগে দেহাতীত স্তরে উন্নীত হয় নাই। প্রকৃতি-বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব প্রশংসার্হ। কিন্তু সৌন্দর্যদর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত দুই অসুর-ভ্রাতার ভ্রাতৃবিরোধ নিছক বর্ণনাই রহিয়া গিয়াছে—যুগচেতনায় কোন বিশিষ্ট তাৎপর্যবাহী হইয়া উঠে নাই। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ মহাকাব্যের বহিরাঙ্গিকের সহিত অন্তঃপ্রেরণার কোন সার্থক সমন্বয় হয় নাই।

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

'মেঘনাদবধ' কাব্যে (১৮৬১) মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গরূপ অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। উদাত্ত ভাষণ, ছন্দ-নির্মিতি-কৌশল ও মানবিক রসবৈচিত্র্যের দিক দিয়া 'মেঘনাদবধ' 'তিলোত্তমাসম্ভব' অপেক্ষা অনেকখানি অগ্রসর। রাবণ কর্তৃক সীতা-অপহরণ ও রামের সীতা-উদ্ধারের উদ্যম বাঙালীর নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত ও উহার চিত্তে এক শাশ্বত রসসংস্কারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মহাকাব্যটি বাঙালী পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তদাক্ষিণ্য দাবী করে। মধুসূদন রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে এক যুগ-চেতনা-আকাঙ্ক্ষিত নূতন তাৎপর্য সন্নিবেশ করিয়া ইহার আবেদন আরও ঘনীভূত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে নরচন্দ্রমারূপে

মেঘনাদবধ কাব্যে যুগাদর্শ

উপস্থাপিত করিয়াছেন; কৃত্তিবাস উঁহাকে অবতাররূপে কল্পনা করিয়া উঁহার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও ভক্তিরসোচ্ছলতায় উঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যুগপ্রয়োজনের দাবী মিটাইয়াছেন। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস উভয়ের নিকটই রাম-রাবণের যুদ্ধ, ধর্ম ও অধর্ম, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রাম; এই সংগ্রামে রাবণের প্রতি যে সহানুভূতি জাগিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনাতীত ছিল। এই যুদ্ধ যে কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে আততায়ীর বিরুদ্ধে জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদা ও ভাবাদর্শ লাভ করিতে পারে তাহাও তাঁহারা মনে করেন নাই। কিন্তু মধুসূদনের রচনায় যুগমানসের বিশেষ অভিলাষটি, যুগচেতনার কাম্যতম স্পন্দনটি স্ফুরিত হইয়া ইহাকে প্রকৃত মহাকাব্যের গৌরব দিয়াছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর যে অভাবের জন্য ইহা শিল্পশালা হইতে জীবনবেদীতে উন্নীত হইতে পারে নাই, 'মেঘনাদবধ'-এ সেই অভাব পূর্ণ হইয়া ইহা জাতির সর্বজনীন জীবনবোধের উপর আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

অবশ্য রাম-রাবণযুদ্ধের যে ঐতিহ্যগত ভাবাদর্শ তাহাকে মধুসূদন অস্বীকার করেন নাই। গৌড়জনের সুধাপানের জন্য তিনি মধুচক্র-রচনার সঙ্কল্প পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যে পূর্বতন ও সর্বজন-আস্বাদ্য মধুসঞ্চয়কে সম্পূর্ণভাবে নিংড়াইয়া ফেলিয়া সেই শূন্য ভাণ্ডারে আধুনিক যুগের সুবাসার রক্ষা করিবেন ইহা তাঁহার কাব্যের মূলগত উদ্দেশ্যেরই বিরোধী। তিনি রামসীতার চরিত্র-মহিমা, রামের বিনয়মণ্ডিত, করুণার্দ্র স্বভাব ও সীতার দুঃখদহনে শুচিস্নাত, অনুপম সারল্য, পতিপ্রেম ও ভাব-সৌকুমার্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার মুখে তিনি রাবণের প্রতি যে অভিযোগ ধ্বনিত করিয়াছেন ও চতুর্থ সর্গে সীতার অরণ্যবাসের যে আরণ্য প্রকৃতির সহিত একাত্ম, ক্রীড়াশীল কল্পনায় মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতেই নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয় যে হিন্দুর সনাতন সংস্কারের মর্যাদাহানি করা তাঁহার একেবারেই অভিপ্রায় ছিল না। তিনি রামকে ছোট করিয়া রাবণকে বড় করেন নাই। কিন্তু রাবণেরও যে একটা মহত্ত্ব আছে, সে যে নিছক পাপের প্রতিমূর্তি নহে, সেও যে এক গৌরবময় আদর্শের প্রতীক ইহাও তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ রাম-রাবণের সংঘর্ষ যে একেবারে পাপ ও পুণ্যের বিরোধ নহে, পরন্তু দুই বিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া তিনি সমস্ত সংগ্রামটিকেই উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। রাক্ষসকুলেও যে রাবণের মত নিয়তি-নির্যাতনের নিকট অপরাজেয় চরিত্র, ইন্দ্রজিতের মত দেশপ্রেমিক বীর,

রাম ও রাবণ দুই আদর্শের প্রতীক

প্রমীলার মত আদর্শ পতিব্রতা বীরনারী জন্মিতে পারে, তাহারাও যে সুনিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাঁড়াইয়া মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, নিজপক্ষের নৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সর্বস্বপণ করিতে পারে, রামের প্রতি সহানুভূতির মাত্রা না কমাইয়া রাক্ষসগোষ্ঠীর এই মহনীয় দিকটা দেখানো যে শুধু সম্ভব নহে, অপক্ষপাত বিচারে অপরিহার্য, কবি ইহাই দেখাইয়াছেন। এখানে রাক্ষসচরিত্রের উপর ইলিয়ডের ট্রয়-যোদ্ধাদের ছায়াপাত হইয়াছে, যদিও হেলেন স্বেচ্ছায় কুলত্যাগিনী আর সীতা বলপ্রয়োগে অপহৃতা হওয়ায় এই সমীকরণের নীতির দিক দিয়া বিশেষ যৌক্তিকতা নাই। গ্রীক দেব-দেবীর অনুকরণে 'মেঘনাদবধ'-এর দেবসমাজের খানিকটা নৈতিক অধোগতি ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রামচরিত্রের সনাতন মহিমা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সমসাময়িক যুগে রামের নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা রাবণের দৈবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সংগ্রামের অধিকতর উপযোগিতা ও প্রবলতর আবেদন আছে বলিয়া মধুসূদন ইহারই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে রামের প্রতি সহানুভূতির অভাব প্রকাশ পায় নাই।

মহাকাব্যের সংগঠনে মধুসূদনের পরিমিতিবোধ

মহাকাব্যের সার্থক রচনা যুগমানসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও কয়েকটি বিরল গুণের একাঙ্গিক (organic) সমাবেশের উপর নির্ভরশীল। যে বিরাট পটভূমিকার মধ্যে উহার ঘটনা-বিন্যাস করিতে হয় উহাকে পূর্বতন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, আখ্যান-কিংবদন্তী, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনার সমবায়ে গঠন করার প্রয়োজন। সুতরাং অতীত ইতিহাসের সহিত ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ পরিচয়, কল্পনার দিগন্তব্যাপী প্রসার, ভাবসমুন্নতি-সৃষ্টির জন্য অতীতের বিচিত্র-উপাদান-গঠিত প্রাণসত্তার এক বিশাল-আয়তন-ব্যাপ্ত, সহজ সম্প্রসারণ—মহাকাব্য-রচয়িতার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় গুণ। প্রকাণ্ড প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের উপর প্রসারিত অসীম নীলাকাশের ন্যায় মহাকাব্য-বর্ণিত আখ্যায়িকার ঊর্ধ্বতন বায়ুস্তরে যেন জাতীয় জীবনের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা স্থির-স্তব্ধভাবে আসীন এইরূপ অনুভূতি জাগাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই পরিধির বিশালতা ও কল্পনা-প্রসারের উপযোগী উদাত্ত প্রকাশরীতির উপর সহজ, অস্খলিত অধিকার থাকা চাই। এই মহিমান্বিত, ঊর্ধ্বচারী প্রকাশের জন্য যেমন চাই সুপ্রযুক্ত শিল্পকৌশল ও শব্দনির্বাচনের বিশিষ্ট আভিজাত্যপ্রধান ভঙ্গী, তেমনি চাই অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত সমুন্নতি। শুধু শিল্পকলা আনিবে নিষ্প্রাণ আলঙ্কারিক স্ফীতি; আর অলঙ্কার-বর্জিত শুষ্ক অনুভূতি, যতই অকৃত্রিম হউক, আনিবে মহাকাব্যের

মর্যাদাহীন সাধারণ কাব্যের ভাষা। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন কাব্যের তুলনায় মহাকাব্যে থাকিবে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিবর্তে বড় তুলির টানে আঁকা একপ্রকার প্রশস্ত, সাধারণীকৃত রং ও রেখার বিন্যাস, যাহার প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখী গভীরতা নহে, বহির্মুখী ব্যাপ্তি। মধুসূদনের কাব্যে এই সমস্ত গুণেরও আশ্চর্য সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বীররস, করুণরসের সাধারণীকৃত রূপ, ঐশ্বর্যসমারোহ, বর্ণাঢ্য চিত্রসৌন্দর্য, রণসজ্জা ও যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও কোলাহলমুখরতা—এই সমস্ত কাব্যবর্ণনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যক্তিত্বের নিগূঢ়তায় কোন মহাকাব্যকারই প্রবেশ করেন না, মধুসূদনও করেন নাই; তাঁহার নর-নারী শ্রেণী-প্রতিনিধি। রাবণের রাজমহিমার অন্তরালে তাহার ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন বিশেষ শোনা যায় না; ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার কণ্ঠে যে শৌর্য- ও প্রণয়াবেশে মিশ্রিত সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা রাজপরিবারের তরুণ-তরুণীর সাধারণ পরিচয়; চিত্রাঙ্গদা রাজমহিষীর সম্ভ্রম-সংযত শোকপ্রকাশে সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের হাহাকারকে সংবৃত করিয়াছে। চিতাশয্যায় শায়িত ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার ভস্মীভূত দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাবণের যে শোকোচ্ছ্বাস তাহা রাজচরিত্রানুযায়ী, রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় ব্যক্তিগত শোকের আতিশয্য হইতে নিয়ন্ত্রিত। মধুসূদনের মহাকাব্যের সর্বত্রই এই পরিমিতিবোধ ও কাব্যাদর্শের নিখুঁত অনুসরণ।

বীরাঙ্গনার অনন্যতা

মহাকাব্যের এই উচ্চকণ্ঠ, শক্তিগর্ভ ভাষণ মধুসূদনের এক অত্যাজ্য, বারে বারে ফিরিয়া-আসা সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সমস্ত অন্যজাতীয় রচনাতে—পত্রসাহিত্য, চতুর্দশপদী কবিতা, এমনকি গীতি-কবিতাতেও এই বলিষ্ঠ প্রকাশরীতির চিহ্ন পরিস্ফুট। স্বল্পায়তন বিষয়ের অন্তর্মুখী স্বগতোক্তির মধ্যেও যেন অকস্মাৎ এক দূরোৎক্ষিপ্ত আহ্বানের সুর শোনা যায়। তথাপি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর (১৮৬২) একান্ত ব্যক্তিগত, ঘরোয়া আবেগ-প্রকাশের মধ্যে ইহার ধ্বনিবহুল, ধাতব স্বনন ত্যাগ করিয়া এক নূতন কোমলতা, মানবকণ্ঠ-সুলভ সূক্ষ্ম অনুরণন ও বিষয়ানুযায়ী স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করিয়াছে। ইহার নায়িকারা প্রকৃতি- ও অবস্থাভেদে প্রত্যেকে এক স্বতন্ত্র সুরে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে—চরিত্রের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর এক সূক্ষ্ম সঙ্গতি এই অন্তররহস্যের দর্পণরূপ রচনাগুলিকে নাটকীয়-গুণসমৃদ্ধ করিয়াছে। এই নায়িকাগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই পদমর্যাদায় রাণী ও রাজকুলোদ্ভবা, কিন্তু নারীত্বই ইহাদের প্রধান

পরিচয়। ইহারা মহাকাব্যের আভিজাত্যের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্ব স্ব নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যে, নারীপ্রকৃতির বিচিত্র-আবেগ-চিহ্নিত, পরিপূর্ণ আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণয়ের আত্মনিবেদন শকুন্তলা, রুক্মিণী, শূর্পণখা, তারার উক্তির মধ্য দিয়া নূতন নূতন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শকুন্তলার হীনতাবোধেব, অনুগ্রহপ্রার্থনাব কুণ্ঠা, রুক্মিণীতে সমপযায়ভুক্তা মুগ্ধা কিশোরীব সলজ্জ, অথচ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ প্রেমজ্ঞাপন, শূর্পণখার ভোগবিলাসে অভ্যস্তা রাজকুমারীর বনচারী লক্ষ্মণের প্রতি ঈষৎ আত্মপ্রাধান্যগবিত, অনুগ্রহের আশ্বাসে লোভনীয় অনুরাগবিবৃতি, আর তাবার প্রচ্ছন্ন-ইঙ্গিত-ভরা, আত্মদোষ-ক্ষালনে ব্যগ্র লালসাব নির্লজ্জ প্রকাশ—এ সমস্তই একই ভাবের বিচিত্র স্বরূপাভিব্যক্তি। কৈকেয়ী, জনা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ইহারা সকলেই বিবাহিতা নারী, পতির প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মনোভাব ও বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে কি চমৎকার পার্থক্য। কৈকেয়ীর তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী শ্লেষ, জনার পুত্রশোকে আত্মহারা রমণীর স্বামীব প্রতি অসংবরণীয় বোষোচ্ছ্বাস, ভানুমতীর ভ্রান্ত পতির প্রতি মৃদু, কল্যাণকামী উপদেশ, আব দ্রৌপদীর স্বর্গলোক-প্রবাসী প্রিয় দয়িতের প্রতি ঈষৎ অভিমান-স্নিগ্ধ, বঙ্কিম কটাক্ষ এক দাম্পত্য সম্পর্কের নানা দিকের নাটকীয় প্রকাশ। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব ও অননুকরণীয় সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি আখ্যান-কাব্য কতকটা এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংলাপ গীতি-উচ্ছ্বাসের ও নীতিকথার অতিবিস্তারেব জন্য নাটকীয় পরিমিতিবোধ ও তীব্র সংঘাতের আদর্শ হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার বিচিত্র ভাব-প্রকাশের উপ-যোগিতা, আমাদের সাধারণ জীবনের নানাবিধ আবেগেব গতিচ্ছন্দের সহিত সমতা রক্ষা করার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১) ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ। আমরা যখন চিন্তা করি যে 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' একই বৎসরে, প্রায় একসঙ্গেই রচিত হইয়াছিল, তখন আমরা তাঁহার এই দুই বিপরীত কোটিতে সমকালে ক্রিয়াশীল প্রতিভাতে চমৎকৃত না হইয়া পারি না। যে কবি একই সঙ্গে রণভেরী ও প্রেমের বাঁশী বাজাইয়াছেন তাঁহার বিচিত্রগামী শক্তি অনিবার্যভাবে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। অবশ্য মধুসূদনের বৈষ্ণব-ভাবনিষ্ঠা বা ধর্মবিশ্বাসের কিছুই

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

ছিল না; তিনি অধ্যাত্মসাধনাহীন, নিছক রূপমোহসঞ্জাত আধুনিক প্রেমেরই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধাকে 'Mrs. Radha' বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত পর্যায়ের নায়িকাতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। মধুসূদন বৈষ্ণব ভাবাদর্শের বহিরবয়বই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অন্তঃপ্রকৃতির ভাবগভীরতা ও অলৌকিক ব্যঞ্জনা তাঁহার অনুভবশক্তির বাহিরে ছিল। তথাপি প্রাচীন সুরের প্রতিধ্বনিপূর্ণ, রমণীয় প্রকৃতির পরিবেশে উদ্ভূত, খেদ-অনুযোগ-অতৃপ্তিতে ভরা নিছক প্রেম-কবিতারূপে ইহাদের মূল্য মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। বিধর্মী মধুসূদন বাঙলা দেশের প্রাচীন ভাবধারায় যে কতখানি অবগাহন করিয়াছিলেন এই ছন্দকুশল, অথচ গভীর-অনুভূতিহীন কবিতাগুলি তাহারই নিদর্শন।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) মধুসূদনের নূতন কাব্য-আঙ্গিক-গঠনে কৃতিত্বের আর একটি নিদর্শন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সনেটকে মধুসূদন বাংলায় প্রবর্তন করিয়া বাংলা কাব্যে একটি অভিনব প্রকাশরীতি যোজনা করিলেন। গীতি-কবিতার তরল, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত ভাবোচ্ছ্বাসকে যে সংহত-ঘনীভূত করিয়া চতুর্দশ পংক্তির কঠোর-নিয়ম-বদ্ধ, আঁটসাঁট কাঠামোর মধ্যে বিন্যাস করা যায় বাংলা কাব্যে মধুসূদনের পূর্বে তাহার কোন দৃষ্টান্ত মিলে না। ইহাদের মধ্যে আবেগের তীব্রতা অপেক্ষা জীবন সম্বন্ধে পরিণত চিন্তা, প্রজ্ঞা ও মননের মাধ্যমে মুহূর্তের অনুভবের স্থায়িত্ব-বিধান, অতীত স্মৃতিচারণা-অবলম্বনে চেতনার গভীর স্তরে অবতরণ ইত্যাদি প্রধান রস। এক অখণ্ড ভাব ও চিন্তার ত্বরাহীন রসপরিণতি ও সনেটের অষ্টক ও ষট্ক এই দুই অংশে ইহার বিবর্তনের পরিপাটি বিন্যাস ইহার বিশিষ্ট রূপাবয়ব।

সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য

মধুসূদনের সনেটগুলি তাঁহার বাল্যস্মৃতি, হিন্দুর বিবিধ পূজা ও উৎসব, পূর্বতন কবিগোষ্ঠীর স্মৃতিতর্পণ ও বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়, কবিতা ও কাব্যের রসবিশ্লেষণ প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া রচিত। এগুলির অধিকাংশই তাঁহার ইউরোপে প্রবাসকালের মধ্যে তাঁহার কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। মহাকাব্য ও নাট্যরীতি-অনুসারী পত্রাবলীর মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনের যে অন্তরঙ্গ অভিলাষ, আত্মরতির যে স্বচ্ছন্দ বিলাস প্রকাশের সুযোগ পায় নাই, সেগুলি বাহিরের সকল চাপ, কল্পনার ঊর্ধ্ববিহারের কৃচ্ছ্রসাধনা হইতে মুক্তি পাইয়া সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের

অবিচ্ছিন্ন বীররস-অনুশীলনেব মধ্যে করুণ রসেব উৎস যে কোথায় লুকানো ছিল, রাজপরিবেশের ঐশ্বর্যময় বর্ণনার অন্তরালে গার্হস্থ্য জীবনের শান্ত-মধুর স্মৃতি কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল, রক্ষকুল-লক্ষ্মীব দেব-মহিমার মধ্যে কোজাগবী পূর্ণিমাব শরৎ-লক্ষ্মী তাঁহার জ্যোৎস্নাশুভ্র, চোখ-জুড়ানো শ্রী ও বরদানেব ঝাঁপি লইয়া কেমন কবিয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন তাহাবই ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। রণভেবীব কর্ণবিদারী কোলাহলেব ক্ষণিক বিরতিতে, প্রখরোজ্জ্বল নাট্যশালার স্তিমিতদীপ নেপথ্যলোকে আমরা যে অকস্মাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা-প্রকৃতিবর্ণনাব ভিতর দিয়া শান্তশ্রীমণ্ডিত, করুণ কোমল পল্লীজীবনের একটি চকিত আভাস উপলব্ধি কবি, তাহা মধুসূদনের এই গভীরস্তরশায়ী, অবদমিত চেতনালোক হইতেই উদ্ভূত। 'সুবর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে' অথবা 'দীন যথা যায় দূব তীর্থদবশনে'—এই জাতীয় উপমা কবিব বাল্যস্মৃতিবিভোর, ছাড়িয়া-আসা অতীতেব মুগ্ধ রোমন্থনরত প্রকৃতিরই পরোক্ষ পরিচয় বহন করে।

মধুসূদন সনেটেব প্রথম শিল্পী, কিন্তু একেবাবে নিখুঁত শিল্পী নহেন। কল্পনাব উদ্দামতায়, মননের অতিরেকে, প্রকাশেব বাঁধভাঙা উচ্ছলতায়, তাঁহার সনেট যে খানিকটা রূপাদর্শচ্যুত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। সনেটের ভাব জমাট বাঁধিতে যে পংক্তিসীমানিঃশেষিত, স্থির ছন্দগতির প্রয়োজন, মধুসূদনের মুহুর্মুহু যতিস্থান-পরিবর্তনে, ছন্দের পংক্তির সীমা-লঙ্ঘনে, কল্পনা-তরঙ্গেব দ্রুত উত্থান-পতনে তাহা সময় সময় ব্যাহত হইয়াছে। মহাকাশ-বিহাবে অভ্যস্ত ঈগল পাখীকে গণিয়া গণিয়া নাচানো ভবন-শিখীতে রূপান্তবিত করিলে সে ময়ূরের সহজ নৃত্যচ্ছন্দ আয়ত্ত করিতে কিছু অসুবিধা বোধ করে। সময় সময় অতিবিক্ত কল্পনাবিলাস ('কমলে কামিনী') বা বণনাত্মক বিষয়-নির্বাচনেও সনেটেব বিশিষ্ট রূপ ও রীতিব দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। তথাপি, এই সমস্ত ছোটখাট দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, মধুসূদনের সনেট, কবি-মনের একটি সার্থক বিকাশ ও কবি-শিল্পীর একটি সার্থক রূপসৃষ্টি-রূপে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অমবতা লাভ করিয়াছে ও ভবিষ্যৎ সনেট-লেখকদের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার গীতিকবিতাব সংখ্যা অল্প হইলেও 'আশার ছলনে ভুলি' বা 'রেখো মা দাসেরে মনে' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি, কবি-মনের অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস নূতন যুগের মন্ময়তার উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে।

মধুসূদনের সনেটের দোষগুণ

মধুসূদন তান্ত্রিক সাধকের ন্যায় উৎকট এবং কতকটা বাংলা কাব্যের স্বভাবধর্ম-বিরোধী তপস্যার দ্বারা প্রাচ্য কাব্যদেহে পাশ্চাত্ত্য ভাব-আত্মার যে অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার শৌর্যধর্মের, মহাকাব্যোচিত উদাত্ত কল্পনারীতির যোগ্য উত্তরসাধক বাংলার সমকালীন সমাজে দুর্লভ ছিল। যাঁহারা তাঁহার বহিরঙ্গের অনুকরণ-প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী যুগের গীতিকবিতার প্লাবনে মধুসূদনের মহাকাব্য-সেতুবন্ধ ক্রমশঃ ক্ষয়মূল হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—তাহার ভগ্নাবশেষের দুই একটি খণ্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও খেদ জাগায়। তাঁহার ঠিক পরের যুগের বিহারীলাল চক্রবর্তী হইতে এই গীতি-প্লাবনের আরম্ভ। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মধুসূদনের বিপরীতধর্মী সাহিত্যস্রষ্টারাও তাঁহার নিকট ঋণী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তিনি প্রথম অপসারিত না করিলে, তাঁহার পরবর্তী লেখকদের প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ, অপরিচিত পথে সাবলীল পদক্ষেপ ও নবসৃষ্টির প্রেরণা যে বহু পরিমাণে ব্যাহত হইত তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি কলম্বসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া নূতন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে নানা বিচিত্র ছাঁদের উপনিবেশ-পরম্পরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না। বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতা-মহাদেশের আবিষ্কারকের জয়মাল্য চিরদিন তাঁহার কণ্ঠে অম্লান হইয়া থাকিবে।

উত্তরকালে মধুসূদনের প্রভাব

৩

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪): বাংলা কাব্যের নবযুগে কবিপ্রকৃতির নূতন পরিচয়ের একটা দিক যেমন মধুসূদনে রূপ পাইয়াছে, তেমনি উহার বিপরীত-ধর্মী আর একটা দিক বিহারীলালে উদাহৃত। কবির অন্তরে যে একটা অকারণ, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, একটা অপ্রশমিত অভাবের অস্বস্তি অনির্বাণ দহনজ্বালায় ধূমায়িত হয়, এবং ইহাই যে তাঁহার কবিতার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি কবির এই জীবনসত্য প্রাগ্-আধুনিক যুগে অজ্ঞাত ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কবিতায়

বিহারীলালের কবি-প্রেরণার উৎস

প্রেমের রহস্যময় অনুভূতি রাধিকার অন্তর্দীর্ণ ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া কবিচিত্তের এই নিগূঢ় অতৃপ্তি-বেদনার কিছু পরোক্ষ সন্ধান দেয়। কিন্তু এখানেও প্রথমতঃ অনুভূতি কবির ব্যক্তিগত নহে ; দ্বিতীয়তঃ, মনোবেদনার একটা সুনির্দিষ্ট প্রণয়াকৃতি-মূলক কারণ আছে। আধুনিক যুগের কবিতায় খেদের সুর আরও সর্বাত্মক ও ইহা ব্যক্তি-প্রকৃতির গভীরতর মূলে নিহিত। আদর্শ-কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় ও রূপ-সুষমার স্থির জ্যোতির পরিবর্তে অনুভূতির ক্বচিৎ-দীপ্ত, ক্বচিৎ-স্তিমিত আলোকে ইহার চকিত, অসংলগ্ন আভাসন—ইহাই বিহারীলালের কবি-প্রেরণার অভিনব উৎস।

বিহারীলালের কবিধর্মের মধ্যে প্রথম হইতেই একটা অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা ছিল। তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ১৮৭০) কাব্যদ্বয়ে তিনি চিরপ্রচলিত কাব্যপ্রথার অনুসরণ না করিয়া নিজের ও বন্ধুবর্গের জীবনের অতি-বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে তাঁহার বিষয় যেমন একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কাব্যপ্রথা-বিরোধী, তেমনি তাঁহার ভাষাও অমার্জিত ও তীক্ষ্ণ ভাবে বাস্তবানুসারী। নিজের অন্তরঙ্গ জীবনের সমস্ত কথা যে এত খোলাখুলিভাবে, কোনও রূপ ভাব-মার্জনার পালিশ ছাড়া কাব্যে প্রকাশ করা যায় ইহা বিহারীলালের পূর্বে কেহই কল্পনা করেন নাই। ইহাতে অবশ্য তাঁহার কবিতার উৎকর্ষ বাড়ে নাই, কিন্তু তাঁহার মৌলিকতার দুঃসাহস প্রকাশিত হইয়াছে।

বিহারীলালের স্বকীয়তা

'নিসর্গসন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী'-তে (১৮৭০) বিহারীলাল ধীরে ধীরে তাঁহার বস্তুবিন্যাসের স্থূলতা অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিজস্ব কল্পনাবৈশিষ্ট্যের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। প্রথমটিতে তাঁহার প্রকৃতি-সচেতনতা, ও দ্বিতীয়টিতে তাঁহার নারী সম্বন্ধে রোমান্টিক মনোভাব উন্মেষিত হইয়াছে। প্রকৃতির যে রূপে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহা উহার শান্ত, অন্তর্মুখী প্রকাশ নহে, উহার বাহ্য বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের উন্মত্ত আলোড়ন। তিনি ঝটিকার ধ্বংসলীলা ও সমুদ্রের চির-অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে কোন স্থির ভাব-কেন্দ্রিকতা নাই, আছে তথ্য ও আবেগের এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ, অতিরিক্ত বস্তুসন্নিবেশ, অবান্তর মন্তব্য, ছেলেমানুষী বিস্ময় ও মাত্রাতিসারী উত্তেজনার একপ্রকার জগাখিচুড়ি। 'বঙ্গ-সুন্দরী'-তে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণের বিচিত্র বিকাশই কবির

নিসর্গসন্দর্শন ও বঙ্গসুন্দরী

বিষয়। এখানেও তথ্যের বস্তুপ্রধান কাঠামোর মধ্যে নারী-আদর্শের ভাব-প্রশস্তি একটি সঙ্গতিহীন, বিরুদ্ধ-উপাদানগঠিত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা আখ্যান-কাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত রচনার মধ্যে বিহারীলাল যে তাঁহার প্রথম কবিতাগ্রন্থের অসংস্কৃত বস্তু-তান্ত্রিকতাকে ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত ভাবুকতা ও নিবিড় কল্পনাময়তার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইতেছেন, স্থূল বস্তুপিণ্ডকে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে রূপান্তরিত করিতেছেন তাহার নিদর্শন মিলে। যদিও বাস্তবকে তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার গতি যে রূপহীন বস্তু হইতে স্বপ্নসুষমার দিকে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী'র একটি স্তবক :

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী-রতন
খেলা করে নীল-নলিনীদলে।

'সারদামঙ্গল'-এর অপরূপ জ্যোতির্ময় আবির্ভাব 'তামসী-তরুণ-উষা কুমারী-রতন'-এর পূর্বসূচনা। কবির ছন্দ-লালিত্য ও স্বর্গাভিসারী কল্পনা যে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে সমস্ত পার্থিববন্ধনমুক্ত হইয়া বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ ভাবরূপের আধার রচনা করিবে তাহার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এখানে সঙ্গীত ও চিত্ররূপে আমাদের অনুভূতিগোচর হয়।

সারদামঙ্গল ও সাধের আসন

'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) ও 'সাধের আসন'-এ (১৮৮৯) বিহারীলালের কবি-প্রতিভার এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রকাশ। এরূপ বিরাট, মহিমান্বিত কল্পনা, এরূপ অন্তর্গূঢ়, রহস্যময় ভাবব্যঞ্জনা, বোধাতীত ধ্যানতন্ময়তার এরূপ আত্মকেন্দ্রিক প্রসার আর কোন গীতিকাব্যের বিষয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। কাব্য যতই আবেগময় ও কল্পনাপ্রধান হউক না কেন তাহার মধ্যে কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা যুক্তিশৃঙ্খলার যোগসূত্র, একটা গঠনসৌষ্ঠবের ক্রম বর্তমান থাকে। বিহারীলালের কাব্যে এই শৃঙ্খলা ও ক্রমবিন্যাসের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় কখন এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথায় চলিয়া যাইতেছেন, প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে পদক্ষেপ করিতেছেন তাহা ভাবক্রমের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। যেমন স্বপ্নের আপাত-অসংলগ্নতা, মিশ্র উপাদান ও অবাধ ব্যাপ্তির মধ্যে একটা মূলগত ভাবের ঐক্যক্রিয়া থাকে, তেমনি বিহারীলালের দ্রুতপরিবর্তনশীল

চিন্তাধারা ও চিত্রকল্পের মধ্যে একই অনুভূতির লীলাবিলাস অদৃশ্য অথচ অনুভবগম্য যোগসূত্রের মত প্রতিভাত হয়। এই কবি-বৈদান্তিকের চোখে বস্তুজগতের বহির্বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে মায়াবরণভেদী একক শক্তির খেলা তাহা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাই যুক্তিতে যাহা খাপছাড়া ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, যাহাকে স্বপ্নসঞ্চরণের ন্যায় অর্থহীন বলিয়া ঠেকে তাহার মধ্যে এক গভীরতর ঐক্যবোধের অন্তঃসঙ্গতি আছে।

বিহারীলালের দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রেমসৌন্দর্য-সাধনার যুগ্মানুভূতি

এই কবিতাদ্বয়ের বিষয় নিখিলবিশ্বের মূলীভূত কারণস্বরূপ সৌন্দর্যসত্তার বন্দনা। সারদা ইহারই মানবী প্রতিমূর্তি। কবি ইঁহাকে কখনও কবিপ্রতিভার উন্মেষ-প্রেরণা, কখনও বা প্রেয়সীজায়া, কখনও বা সর্বভূতব্যাপ্তা বিচিত্ররূপিণী প্রাণশক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইঁহার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের চিন্ময় রূপ ও মানবিক প্রণয়োচ্ছ্বাসের ব্যাকুল মিলনাকূতি যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এক অদেহী সত্তাকে ঘিরিয়াই কবির বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, প্রণয়োৎকণ্ঠার সব কয়টি সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। রূপের মধ্যে অরূপের সুদূর ব্যঞ্জনা, পার্থিব প্রণয়ের আবেগবিহ্বলতার মধ্যে এক উচ্চতর ভাবমুগ্ধতার স্ফুরণ তাঁহার প্রেমনিবেদনকে এক ধ্যান-রোমাঞ্চের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে কবি ও সাধকের যে অপূর্ব সমন্বয়, কাব্যসৌন্দর্য ও তত্ত্বানুভূতির যে আশ্চর্য সমীকরণ, সীমা ও অসীমের, উভয়েরই পারস্পরিক অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যে অন্তরঙ্গ মিলন সাধিত হইয়াছে, বিহারীলালে তাহারই অসম্পূর্ণ প্রারম্ভিক প্রয়াস। বিহারীলাল অবশ্য সর্বত্র কাব্যের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন নাই—তাঁহার ভাবমত্ততা সর্বদা রূপের শাসন মানে নাই। তিনি যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন সে পরিমাণে শিল্পী ছিলেন না। যাঁহারা কাব্যরসিক বিহারীলালের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অনুযোগ থাকিবেই; কিন্তু যে কল্পনা নিজ গতির আবেগেই মূর্তি গ্রহণ করে, যে ভাবনিবিড়তা নিজ প্রতিচ্ছায়া-প্রক্ষেপের দ্বারাই রূপধর্মী হইয়া উঠে তাহা তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং এই গুণের জন্যই তাঁহার কবিতা উহার সমস্ত অস্পষ্টতা ও সংহতি-শিথিলতা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট কাব্যের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে।

৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) ও **নবীনচন্দ্র সেন** (১৮৪৭—১৯০৯)—তাঁহাদেব কবিত্বশক্তির আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যুগনির্দিষ্ট ধারক ও বাহকরূপে, যুগেব ভাবপ্রতিনিধিত্বের প্রতীকরূপে বাংলা কাব্যে মধুসূদনের পরেই এক মর্যাদাপূর্ণ আসন অধিকাব কবিয়াছিলেন। মধুসূদনেব আবির্ভাব ও পৌরাণিক কাহিনী-অবলম্বনে সার্থক কাব্যসৃষ্টিব ফলে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে একটি নানামুখী, বিরুদ্ধ-উপাদানগঠিত ভাব-আলোড়ন জাগিয়াছিল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাহারই তরঙ্গশীর্ষে দুই উজ্জ্বলতম ফেন-মুকুটরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। মধুসূদন বিধর্মী হইয়াও তাঁহার রচনায় হিন্দুসংস্কৃতির মহিমময় জয়গাথা গাহিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহার ঠিক পরবর্তী কবিগোষ্ঠী মহাকাব্যোপম সুবিস্তীর্ণ আধারে ও উদাত্ত রচনারীতিতে, হিন্দুধর্মেব বিশুদ্ধতর, দার্শনিক তত্ত্বানুযায়ী সূক্ষ্মতর মর্মব্যাখ্যান ও উন্নততর আদর্শবাদ-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) হেমচন্দ্রের রচনার পরবর্তী, কিন্তু নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস'-এর (১৮৯৬) পূর্ববর্তী। সুতবাং বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব হেমচন্দ্রের উপর অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে না পড়িলেও 'বঙ্গদর্শন'-এ হিন্দুধর্মের যে নবপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল তাহার আবেগ-রঞ্জিত রশ্মিচ্ছটা সে যুগের সমস্ত বাতাবরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদনের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে মহাকাব্যের বিরাট আঙ্গিক ও পরিকল্পনা ও হিন্দুধর্মেব গূঢ়তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসরূপ রচনাশৈলী ও বিষয়নির্বাচন গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা ইহার সহিত ইঁহাদের কাব্য-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও কল্পনার স্বকীয়তা যোগ করিয়া এক মিশ্রধরণের কাব্য সৃষ্টি করিলেন। বিষয়ের সহিত রচনাশৈলীর অনুপযোগিতা, মহাকাব্যের আঙ্গিক অনুসরণ করিয়াও উহার আদর্শরক্ষার অক্ষমতা, বীরত্বময় পরিবেশে গার্হস্থ্য ও পাবিবারিক জীবনের তরলায়িত কারুণ্য-উচ্ছ্বাসের অযথা সংমিশ্রণ ও বাঙালীর অন্তরে ক্রমসঞ্চীয়মান গীতরসধারার অবারিত প্রয়োগ—এই সমস্ত প্রবণতার সমাবেশই তাঁহাদের কাব্যকে মহাকাব্যের উত্তুঙ্গ মহিমা হইতে চ্যুত

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

করিয়া মধ্যস্তবের অশ্রুনির্ঝরসিক্ত, কোমলভাব-প্রলেপে তাপহীন জীবনবোধের পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সে যুগ হইতে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত হেম-নবীনেব কাব্যের মূল্য মহাকাব্যেব মানদণ্ডে বিচাবিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের কাব্যগত যে সমস্ত দোষ-ত্রুটিব উল্লেখ কবা হয়, উহা সমস্তই মহাকাব্যেব আদর্শচ্যুতি ও লক্ষণহীনতা-বিষয়ক। যেহেতু সমসাময়িক যুগে তাঁহাবা মধুসূদনেব সহিত তুলিত হইয়া কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন ও হিন্দুত্বেব আদর্শেব প্রতি অতি-শ্রদ্ধাশীল সমালোচক-গোষ্ঠী কর্তৃক কেহ বা 'নভোলোকেব কবি', কেহ বা 'উনবিংশ শতকেব মহাভারতকার'-আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন, সেই অতি-প্রশংসাব প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এখন পযন্ত তাহাদিগকে অতি-দূষণেব ফলভোগ করিতে হইতেছে। যখন সমালোচকেব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মানুরাগেব নেশা কাটিয়া গিয়া বিশুদ্ধ কাব্যবিচাবেব মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হইল, ও মহাকাব্যেব বিরল-গুণ-সন্নিবেশ সম্বন্ধে আমাদেব ধাবণা স্ফুটতব হইল, তখনই এই একদা-প্রশংসিত কবিদ্বয় তাঁহাদেব মধুসূদন-প্রতিস্পর্ধী-উচ্চাসন হইতে ব্যর্থ কবিযশঃপ্রার্থীব বক্রদৃষ্টিসম্বর্ধিত লাঞ্ছনার বিপরীত কোটিতে অবনমিত হইলেন। এখন তাহাদেব সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে তাহাবা কি পাবিয়াছেন তাহাব অপেক্ষা তাহারা কি পারেন নাই তাহারই তালিকা দীর্ঘতব হইয়া থাকে।

হেম-নবীনের সমালোচনায় আদর্শের ত্রুটি

অনুবীক্ষণেব উলটা দিক দিয়া দেখাব ফলে এই কবিদেব যে বিকৃত রূপ দেখা যায় তাহা যে তাঁহাদের সত্য পরিচয় নয় এই উপলব্ধির সময় আসিয়াছে। যে কোন বিরাট পরিকল্পনা ও ভাবগাম্ভীর্যমূলক বচনাকে যে মহাকাব্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সাধারণ আখ্যান-কাব্যেও মহাকাব্যের লক্ষণ অংশতঃ প্রকটিত হইতে পারে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কেহই তাঁহাদের মহাকাব্য-রচনার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং মহাকাব্যীয় ফলশ্রুতি তাঁহাদের নিকট দাবী করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিচার্য। তাঁহাদের কবিপ্রকৃতিকে মহা-কাব্যের লোহার খাটে (Procrustean bed) শোয়াইয়া উহাদের স্বাভাবিক অঙ্গায়তনকে সেই খাটের মাপে বিন্যাস করিবার কৃত্রিম চেষ্টা আমাদিগকে সেই কবিত্বের মর্মমূলে পৌঁছিতে সহায়তা করিবে না ইহা সুনিশ্চিত। হেমচন্দ্রের

হেম-নবীনের কাব্যের মূল্যায়নে নূতন দৃষ্টি-কোণের আবশ্যকতা

'বৃত্রসংহার' ও নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী কতকটা মধুসূদন-প্রভাবিত হইলেও, মহাকাব্যের বহিরঙ্গের কিছুটা গ্রহণ করিলেও উহাদের অন্তঃপ্রকৃতি, মূলগত ভাব-প্রেরণা ও কাব্যাভিপ্রায় যে মহাকাব্য হইতে বহুলাংশে পৃথক ইহা মনে রাখিয়াই এই কাব্যগুলির মূল্যাবধারণ বিধেয়।

মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার

'বৃত্রসংহার'-এর সহিত 'মেঘনাদবধ'-এর নিবিড় সাদৃশ্য ও হেমচন্দ্র-কৃত মধুসূদন-কাব্যের প্রথম রসগ্রাহী সমালোচনা-সূত্রে উভয়ের কবিসম্পর্কের নৈকট্য উহাদের মধ্যে তুলনাকে অনিবার্য করিয়া তোলে এবং এই তুলনার ফলে হেমচন্দ্র কতকটা নিষ্প্রভরূপে প্রতীয়মান হন। মহাকাব্যের হরধনুতে জ্যা-রোপণ তাহার শক্তির অতীত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া লঘুতর ধনুকে শরসন্ধান-নৈপুণ্য যে তাহার ছিল না এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। আসলে, 'বৃত্রসংহার' 'মেঘনাদবধ'-এর এক বিচিত্ররসপুষ্ট পারিবারিক সংস্করণ, ইহাতে গার্হস্থ্য জীবনের রূপ, রস, সাধারণ দ্বন্দ্ব-জটিলতা ও বিষণ্ণ-করুণ অনুভূতি মহাকাব্যের কঠোর-আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত সীমাকে অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে 'মেঘনাদবধ'-এর কেন্দ্রানুসারী রসবিন্যাস ও সমকালীন যুগের তীক্ষ্ণ জীবনাদর্শ-ব্যঞ্জনার একান্ত অভাব। বৃত্রের জয়-পরাজয়ের মধ্যে যুগমানস কেবল সুপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সুপরিচিত নীতির পুনরাবৃত্তি দেখিয়াছে, নিজ মানস অভীপ্সার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে নাই। পাঠকের সমস্ত অনুভবশক্তি, সমস্ত মানস প্রতীক্ষা একান্তভাবে একই পরম পরিণতির দিকে সংহত হয় নাই, ধীর মন্থরগতিতে, পরিসমাপ্তির প্রতি অতি-কৌতূহলী না হইয়া, বিভিন্ন রসের আস্বাদন করিয়া ফিরিয়াছে। কাজেই ছন্দোবৈচিত্র্য-গীতসুরের প্রবর্তন, আখ্যান, রসের আস্বাদন, বর্ণনাকৌশলে তৃপ্তি ও শেষে একটা প্রত্যাশিত পরিণতিতে নিরুত্তাপ সন্তোষ পাঠকচিত্তকে নানাভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। এই বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি মহাকাব্যীয় গাঢ়বদ্ধতার পরিবর্তে একটা শিথিল আখ্যানসূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। এই বিভিন্ন উপাদানগুলির বর্ণনাকৌশল ও আখ্যানের শিথিল-সংবদ্ধ রূপনির্মিতিই 'বৃত্রসংহার'-এর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের উৎকর্ষের মূলে।

'বৃত্রসংহার'-এর কতকগুলি সর্গে যে ভাবগাম্ভীর্যের সার্থক ও সমুন্নত প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাতালপুরে দেবতাদের মন্ত্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনা, ব্রহ্ম ও শিবলোকের দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ রূপক-ব্যাখ্যা ও বৃত্রাসুরের

অন্তিম সংগ্রামের প্রলয়-বিপর্যয়—এইগুলির মধ্যে, কবিত্ব মাঝে মাঝে তথ্য-ভারপীড়িত হইলেও, উন্নত ভাব-প্রকাশের উপযোগী কবি-কল্পনা ও রূপায়ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের সংস্কার ও উপলব্ধিসমূহের রূপদান-বিষয়ে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের পিতৃলোক-বর্ণনা ও নরক-দর্শন চিত্রধর্মী ও মানবিক-রসাপ্লুত, তিনি পাপীদের যন্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন কবিসুলভ অনুভূতি ও চিত্রণশীলতার মাধ্যমে; তিনি তত্ত্বের দুরূহতা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার বর্ণনা সুখপাঠ্য ও মহাকাব্য-প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের পরলোকের বিবরণ দার্শনিকতত্ত্ব-সমাকীর্ণ ও নিগূঢ়-অর্থ-উদ্ঘাটন-প্রয়াসী, তাঁহার ব্রহ্ম ও শিবলোক প্রাকৃতিক রম্যতা-বর্ণনার উপলক্ষ্য মাত্র নহে; ইহাদের মধ্যে সৃষ্টিরহস্য ও অধ্যাত্মসাধনার ক্রমারোহী মানস স্তর আভাসিত। মধুসূদন পৌরাণিক চিত্র-কল্পনার অনুগামী; হেমচন্দ্র উপনিষদের তত্ত্বগহন ও রূপরিক্ত পথের পথিক। মধুসূদন হিন্দুধর্মের দুই একটি বিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন; হেমচন্দ্র উহার জটিল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব-কণ্টকিত সামগ্রিক পরিচয়টি কবিত্বের ভাষায় ফুটাইতে চাহিয়াছেন। এই দুরূহতর কার্যে তাঁহার সাফল্য যে মধুসূদনের অনুরূপ হয় নাই তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। মধুসূদনের নিয়তিবাদ আত্মবিরোধক্লিষ্ট আধুনিক মনের জীবনার্তিরই একটা দৈব প্রতিরূপ; হেমচন্দ্রের নিয়তিবাদ কর্মফলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিধানের অমোঘ ন্যায়-বিচার। একটি দৈবলীলার ছদ্মবেশধারী মানবিকতার স্বাধীন, বেদনাময় বিকাশ; অপরটি দৈবশক্তি-নিয়ন্ত্রিত মানব-কর্মফলের অনিবার্য পরিণতি।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের আদর্শের পার্থক্য

হেমচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা ও গীতপ্রধান অংশও প্রশংসার্হ। এগুলিকে মহাকাব্যের অঙ্গরূপে বিবেচনা না করিয়া গাথাকাব্যের স্বচ্ছন্দ-বিচিত্র ভাববিকাশের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করাই উচিত। 'বৃত্রসংহার'-এ 'মেঘনাদবধ'-এর তুলনায় গার্হস্থ্য প্রতিবেশ ও পরিবার-জীবনের কোমল ভাবনিচয়ের প্রাধান্য। বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার দাম্পত্য-সম্পর্ক, উহাদের স্থূল আত্মাভিমান ও ভোগস্পৃহা রাবণ-চিত্রাঙ্গদার মহাকাব্যীয় রাজমহিমার ভাবসমুন্নতিমূলক প্রকাশমাত্র নহে—ইহাতে প্রাকৃত জীবনের বস্তুরস ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই মুখ্য উপাদান। ইহারা কেহই মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার উপযুক্ত নহে। হঠাৎ-বড় মানুষের আত্মম্ভরিতা, অশোভন জিদ ও আবদার, আত্মপ্রাধান্যের মত্ত আস্ফালন ইহাদের চরিত্রের

বৃত্রসংহারে গার্হস্থ্য পরিবেশ ও কোমলতার প্রাধান্য

প্রধান উপাদান। সুতরাং ইহাদের চারিদিকে যে পরিমণ্ডল রচিত হইয়াছে তাহাও এই নিম্নস্তরের জীবনযাত্রার সমপর্যায়ের। এই আবহাওয়ায় ইন্দ্রের দেব-মহিমা ও নিঃস্বার্থ রাজকর্তব্যনিষ্ঠা, শচীর ভাব-গরিমা, রুদ্রপীড়ের উদার শৌর্য—প্রভৃতি মহাকাব্যোচিত চরিত্র-গৌরবের দৃষ্টান্তগুলিও যেন ম্লান ও প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা-লিপ্ত হইযাছে। শচীর পুত্র-বাৎসল্যের মধ্যেই তাহার দেবপ্রকৃতি বিশেষভাবে প্রকটিত—এইখানেই ঐন্দ্রিলার সহিত তাহার সমধর্মিত্ব। ইহাতেই কাব্যটির সংসারকেন্দ্রিকতা প্রমাণিত। রাবণের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গত একটু-আধটু শুনি, কিন্তু ইহাব স্নেহ-মমতা বিস্তৃততর রাজকর্তব্য-পরিধির মধ্যে বিলীন হইয়াছে। বৃত্রের প্রধান পবিচয় পরিবার-গোষ্ঠীর কর্তারূপে, প্রশ্রয়শীল স্বামী ও স্নেহশীল পিতারূপে। এই পবিপ্রেক্ষিতে ইন্দুবালার রণবিমুখ শান্তিপ্রিয়তা, তাহাব প্রকৃতির পুষ্প-পেলব রমণীয়তা ও শত্রুমিত্র-ভেদজ্ঞানহীন, উদাব সমদর্শিতা নিতান্ত বেমানান বলিয়া মনে না হইতেও পারে। যেখানে গার্হস্থ্য সুখশান্তিই প্রধান সুব ও যুদ্ধবিগ্রহ উহার একটা সাময়িক বিপর্যয়, সেখানে ইন্দুবালা-চরিত্র একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। ঐন্দ্রিলা-শচী-রতি-চপলা প্রভৃতি নারীচরিত্র-সমাবেশে কাব্যে যে একটি ভাববৃত্ত রচিত হইয়াছে, ইন্দুবালা তাহার কোমলতম, নমনীয়তম বিন্দুরূপে উহার সম্পূর্ণতাবিধান করিয়াছে। দিকে দিকে প্রজ্বলিত সমরানলের পিছনে গার্হস্থ্য জীবনের যে শান্তিবারি-সেচনের অভিপ্রায় কবির অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন ছিল ইন্দুবালা-চরিত্র তাহারই অনাবৃত, উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। সে দৈত্যকুলে দেবী; সুতরাং অসুর-বিক্ষুব্ধ স্বর্গলোকে দেবরাজ্য-প্রতিষ্ঠার পূর্বসূচনারূপে কাব্যমধ্যে তাহার একটি সঙ্গত স্থান আছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে মহাকাব্যিক আবেদনের অভাব

নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই কাব্যত্রয়ীকে মহাকাব্য-লক্ষণান্বিত, ও মহাকাব্যের আদর্শে বিচারণীয় বলিয়া কোন মতেই মনে করা যায় না। ইহাদের মধ্যে যে বিরাট পরিকল্পনা ও স্থানে স্থানে ভাবগাম্ভীর্য আছে, তাহার মধ্যে মহাকাব্যের কিছু কিছু উপাদান থাকিলেও, ইহা সামগ্রিকভাবে একেবারেই মহাকাব্যে জাতীয় নহে। প্রথমতঃ এই রচনাগুলি তত্ত্বপ্রধান; কৃষ্ণের দেবত্ব-প্রতিপাদন ও তাঁহার মহাভারত-স্থাপনের উপযোগী বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও উদার ধর্মনীতির ব্যাখ্যা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের ঐতিহাসিক অংশ কবিকল্পনা-প্রসূত ও কবির তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কল্পনার চমৎকারিত্ব ও ভাবমহিমা থাকিলেও ইহা পাঠকের পূর্ব-

সংস্কার-বিরোধী বলিয়া যে পরিচিত বাতাবরণ মহাকাব্যিক আবেদনের প্রধান উপাদান তাহার অভাব এখানে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বিখ্যাত সমালোচক প্যাটিসন মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা জীবন-কল্পনা (Scheme of life), জীবনের প্রত্যক্ষ-সংযোগ-সঞ্জাত নহে, সেই মন্তব্য নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অবশ্য কাব্যে গভীরভাবে অনুভূত ও উপস্থাপিত জীবনকল্পনারও স্থান আছে; কিন্তু সে কাব্য মহাকাব্য-পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

কাব্যত্রয়ীর অধিকতর গার্হস্থ্য-প্রবণতা ও পরিকল্পনার ক্রম-সংকোচ

হেমচন্দ্র অপেক্ষাও নবীনচন্দ্র অধিকতর মাত্রায় গার্হস্থ্য জীবনের রসাতুর ও ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ। কাজেই তাঁহার কৃষ্ণের জীবন-সাধনা-ব্যাখ্যার সঙ্গে পারিবারিক জীবনের তরল রসোচ্ছ্বাস প্রচুর পরিমাণে মিশিয়াছে। আসলে নবীনচন্দ্র ভক্তিরস ও ভাববিলাসের কবি। মহাভারত-প্রতিষ্ঠার রাষ্ট্রিক আয়োজন ও নবরাজ্য-সংস্থাপকের নীতি-কৌশল ও দূরদর্শিতা তাঁহার কাব্যে গৌণ; কৃষ্ণভক্তি-প্রচারের দ্বারা মানুষের চিত্তশুদ্ধি ও প্রেমোন্মত্ততার প্রভাবে হিংসা-দ্বেষ-ভেদবুদ্ধির বিলোপই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং তত্ত্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের যে ভাগীরথী-ধারা তাঁহার কাব্যে প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার উপাদান-বিন্যাসের দৃঢ়তা ও মূলকল্পনার কেন্দ্রিকতা সম্পূর্ণ. বিপর্যস্ত হইয়াছে। 'রৈবতক'-এ আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে নাটক-রোমাঞ্চ ও বীররস-স্ফুরণের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল, আখ্যানের পরবর্তী স্তর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়া এই প্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ করিয়াছে। 'রৈবতক'-এ অর্জুন-সুভদ্রার প্রেম ও সত্যভামার রসিকতা শৌর্য- ও কূটনীতি-প্রধান বাতাবরণের মধ্যে কতকটা সহনীয়; ব্যাসাশ্রমে শিশুদের স্খলিতবাক্ অভিবাদন উন্নত ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে একেবারে বিসদৃশ বোধ হয় না। কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র'-এ মহাভারতের সুপরিচিত বস্তুবিন্যাস ও রসাবেদনের মধ্যে একদিকে 'রৈবতক'-এর কল্পনাপ্রসূত ঐতিহাসিক পরিবেশ প্রায় নিষ্ক্রিয় হইয়াছে; অপরদিকে অভিমন্যু-উত্তরা-সুলোচনার পুতুলখেলার ন্যায় তরল-চপল আচরণ, বাঙালী পরিবার-সুলভ সোহাগ-মান-অভিমানের চটুল আতিশয্য শুধু যে মহাকাব্যের পরিপন্থী তাহা নহে, আখ্যান-কাব্যের যে পূর্বতন ভাব-সমুন্নতি তাহার সহিতও সঙ্গতিহীন। 'প্রভাস'-এ একদিকে যেমন জলোচ্ছ্বাস-প্রলয় ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের উদাত্ত-গম্ভীর, সুষ্ঠু-ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনা আছে, অপরদিকে আবার নামসঙ্কীর্তনের ভাবমত্ততা

মহাকাব্যের সু-উচ্চ মালভূমিকে ভক্তি-প্লাবনের নীচে ডুবাইয়া দিয়াছে। বিরাট পরিকল্পনার নানামুখী বিস্তারে যে রচনার আরম্ভ তাহার শেষ পরিণতি ক্রম-সঙ্কুচিত, একক ভাবাবেগের সর্বগ্রাসিতায়। এ যেন হিমালয়ের বিচিত্র, বহু-বিস্তৃত ভূমিপ্রসারের কুমারিকা অন্তরীপের সমুদ্র-কবলিত, সূক্ষ্মাগ্র বিন্দুতে ভাবসর্বস্ব পরিসমাপ্তি।

নবীনচন্দ্রের মহাভারতীয় কল্পনার ভাব-অসঙ্গতি

আসল কথা, নবীনচন্দ্রের মহাভারতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট গঠনসুষমা বা অভ্যন্তরীণ ভাবসঙ্গতি ছিল না। তাঁহার অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস, বৃহৎ ও মহৎ হইতে অতর্কিতভাবে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছে অবতরণ, তাঁহার আখ্যান-বিবৃতির মধ্যে অতিপল্লবিত বিস্তার, অতিরিক্ত ভাবার্দ্রতার প্রক্ষেপ ও গীতিমূর্ছনার অবাঞ্ছিত অতিরেক—এই সমস্ত লক্ষণই তাঁহার স্থির মননশীলতা ও সদাজাগ্রত শিল্প-বোধের অভাবই সূচিত করে। এই প্রবণতাগুলি কেবল যে মহাকাব্য-বিরোধী তাহা নহে; যে কোন সুষম আখ্যান বা তত্ত্বমননমূলক রচনার পক্ষেই ইহা অনুপযোগী। তাঁহার বিরুদ্ধে যথার্থ অভিযোগ তাঁহার কবিত্বশক্তির অপ্রাচুর্য নহে, ইহার অপপ্রয়োগ। গীতার জ্ঞান ও কর্ম-যোগী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিতে গিয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচরিত্র-সুলভ রসবিহ্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার কবিত্বের পরিমাণ যাহাই হউক তিনি যে উপায়-দক্ষ নহেন ইহা সুনিশ্চিত। পদাবলীর ভক্তিবিহ্বল রসোচ্ছ্বাসে যাহার পরিণতি, উদাত্ত-গম্ভীর তত্ত্ব-উপস্থাপনায় তাহার প্রারম্ভে কোন সঙ্গত ভাব-সংযোজনার নিদর্শন মিলে না। হেমচন্দ্র ও নবীন-চন্দ্র ক্রমস্ফীত-গীতি-নির্ঝর-দীর্ণ মহাকাব্য-শৈলশৃঙ্গে তাঁহাদের কাব্যসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে দৃঢ় আশ্রয়ভূমি হইতে স্খলিত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন ইহাই তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। যে গীতিধারা স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত হইবার সুযোগ পাইলে তাঁহাদিগকে কীর্তিসমুদ্র-সঙ্গমে অবলীলাক্রমে পৌঁছাইয়া দিত, তাহাই মুহুর্মুহু প্রস্তর-বেষ্টনীর মধ্যে অব-রুদ্ধ হইয়া হয় শুষ্ক হইয়াছে না হয় দৃঢ় পদক্ষেপের অযোগ্য ভাবার্দ্র জলা-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আখ্যান ও গীতের বিসদৃশ মিলনে উভয় রীতিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে—আখ্যানের মধ্যে গীতের ভাবাতিশয্য ও গীতের মধ্যে আখ্যানের বস্তুকাঠিন্য অনুপ্রবেশ করিয়া উভয়কেই অনেক পরিমাণে স্বধর্মচ্যুত করিয়াছে।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই কিছু বিশুদ্ধ গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' দুই ভাগ (১৮৭০, ১৮৮০); 'বিবিধ কবিতা' (১৮৯৩) ও 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮); নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১, ১৮৭৮)—এইগুলি তাঁহাদের গীতিকবিতাসংগ্রহ। এই যুগে তত্ত্বাচ্ছন্ন ও মননির্ভর কবিগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ গীতিমানস তখনও নির্বারিত হয় নাই। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত', 'পদ্মের মৃণাল এক' 'প্রভু, কি দশা হবে আমার' ইত্যাদি কবিতায় কবির তীব্র স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন সম্বন্ধে ভাবনা ও নিজ অন্ধত্বের জন্য মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কবির মনোভাবের আন্তরিকতা সত্ত্বেও, তাঁহার প্রকাশ আবেগময় ও কল্পনা-ভাস্বর হইয়া উঠে নাই; ভাবনার ধূমরাশি ভাবের অগ্নিদীপ্তি লাভ করে নাই। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র 'পিতৃহীন যুবক' যদিও আত্মজীবনের করুণতম অভিজ্ঞতার কাব্যরূপ, তথাপি, ইহার অপরিমিত দৈর্ঘ্য ও উক্তির পৌনঃপুনিকতা রসকে জমাট-বাঁধিতে দেয় নাই এবং প্রকাশ-দুর্বলতার দ্বারা ইহার ভাবের অকৃত্রিমতা বহু স্থলেই বিড়ম্বিত হইয়াছে। তাঁহার 'ভারত-উচ্ছ্বাস' হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীতের' সহিত তুলনায় নিকৃষ্ট স্তরে স্থান পাইয়াছে। বরং হেমচন্দ্রের বৃহৎ কাব্য 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২)-ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) স্থানে স্থানে ভাবের গভীর উপলব্ধি ও সুমিত প্রকাশে উন্নত গীতি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। হেম-নবীনের অধিকাংশ কবিতাতেই কাব্য-প্রেরণা আসিয়াছে কোন তত্ত্ব বা বহির্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া; সমস্ত বহির্ব্যাপার-নিরপেক্ষ নিবিড় অন্তর-অনুভূতি কবির মনে এক অখণ্ড রসের অনিবার্য প্রকাশ-আকৃতি উদ্রিক্ত করে নাই।

হেম-নবীনের গীতিকবিতা

সমকালীন সমালোচক-গোষ্ঠী মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী কালে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের জন্য যে প্রধান আসন নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে কতকটা অতিপ্রশংসামূলক বলিয়া মনে হইলেও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যথার্থ বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত। বাংলা কাব্যের অগ্রগতির প্রধান শাখা তাঁহাদের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিল। বিষয়-গৌরব, সমসাময়িক রুচির অনুবর্তন, ভাবনার সমুন্নতি ও কাব্যশক্তির, অসম হইলেও, উন্নত প্রকাশ—এই সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে উহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হয়। ইহাদের যথার্থ স্থান নির্ণয় করিতে হইলে ইহাদের তুলনা করিতে হইবে মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় যুগাতিসারী কবির সঙ্গে নহে, যাঁহাদের কাব্যে

বাংলা সাহিত্যে হেম-নবীনের স্থান

যুগচেতনা আংশিকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই যুগানুগত কবি-গোষ্ঠীর সঙ্গে। অবশ্য বিহারীলাল সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ ও আত্মসমাহিত গীতিকবি হইয়াও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাব-শিষ্যের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের জন্য ভবিষ্যৎ কাব্য-ধারার পথিকৃতের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যে পৌরাণিক মহাকাব্যের দিন ফুরাইয়াছে তাহার অনুশীলন ও যে গীতি-কবিতার দিন আসিতেছে তাহাব সার্থক প্রত্যুদ্‌গমনে অক্ষমতার জন্য ভবিষ্যৎ-নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারাইয়াছেন। তথাপি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'যোগেশ কাব্য' (১৮৮১) প্রভৃতি কল্পনাশ্রয়ী, নিরাশ-প্রণয়মূলক ও উদ্ভট ও অবাস্তব ঘটনাজালে কুহেলিকাচ্ছন্ন কাব্যের সহিত তুলনায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রেব কাব্যেব অনুভূতিব গাঢ়তা ও ভাবসত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। সুতবাং তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে আমাদের মতের যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৫

রবীন্দ্রপূর্ব গীতিকবিগোষ্ঠী

বিহারীলালের পূর্বেও যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার অনুশীলন হইতেছিল, তাহার নিদর্শন মিলে অধুনা বিস্মৃত-প্রায় বহু কবির রচনা হইতে। এই সমস্ত গীতিকবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষের পরিচয় না মিলিলেও এবং ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির আপেক্ষিক অভাব ও প্রচলিত রীতির অনুবর্তনে ভাববিলাসের অতি-প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও, ইহারা কাব্যময় ভাষার অনুশীলনে ও আত্মগত ভাবধারার প্রবাহকে চালু রাখিয়া প্রতিভা-চিহ্নিত গীতিকবির আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল। কাব্যাকাশে বাষ্পাকার ভাবরাশির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ-শীল লঘু মেঘমালা কখন যে অনুকূল বায়ুর প্রভাবে সংহত ও নিবিড় হইয়া ধারাবর্ষণে আপনাকে মুক্তি দিবে, কখন যে প্রথানুসরণের মধ্যে প্রতিভার স্বকীয়তা দীপ্ত হইয়া উঠিবে তাহা নিশ্চিত করিয়া নির্ধারণ করা যায় না। তথাপি সকল দেশের সাহিত্যে বহু পথিকের যাতায়াতের চিহ্নিত রাজপথ দিয়াই

প্রাক্-বিহারীলাল গীতিকবি

একদিন প্রতিভার স্বর্ণরথ বিজয়যাত্রার প্রেরণা লাভ করে। এই প্রাক্-বিহারীলাল কবিগোষ্ঠীর মধ্যে **ভুবনমোহিনী দেবীর** ছদ্মনামধারী **নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৮৫২—১৯২২), 'যমুনা-লহরী' ও 'ভারতবিলাপ'-এর কবি **গোবিন্দচন্দ্র রায়** (১৮৩৮—১৯১৭), 'সদ্ভাবশতক'-এর (১৮৬১) কবি **কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার** (১৮৩৭—১৯০৬) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁহার জীবনকালে আবির্ভূত অনেক প্রতিষ্ঠাবান কবি তাঁহার আবির্ভাবের আকস্মিকতাকে ভূমিকা-প্রস্তুতির সূচনা দ্বারা কিছু পরিমাণে খণ্ডিত করেন। এই কবিদের আলোচনা করিলে এই ধারণাই জন্মে যে রবীন্দ্রনাথ আকাশ হইতে পড়েন নাই, বাংলা দেশের বহু-কর্ষিত কাব্য-মৃত্তিকাতেই বীজরূপে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। **সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের** (১৮৩৮—১৮৭৮) 'মহিলা' কাব্য (১৮৮০, ১৮৮৩) বিষয়ের দিক দিয়া এক যুক্তিনিষ্ঠ, আবেগমুক্ত, তথ্যদৃঢ় রূপের পরিচয় বহন করে। কাব্যরীতির দিক দিয়া তিনি বিহারীলালের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে নারীসৌন্দর্য ও প্রেম সাধারণ কবির মনে আবেশমত্ততার সৃষ্টি করে তাহারই বর্ণনায় তিনি ক্লাসিকাল রীতির মননশীল দৃঢ়বদ্ধতা ও শ্রদ্ধান্বিত ভাবসংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মহিলাকাব্য

অক্ষয়কুমার বড়াল (১০৬০—১৯১৯) বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের ভাব-সমন্বয়পুষ্ট কবি। তাঁহার আবেগ ও হৃদয়োচ্ছ্বাস বিহারীলালের ন্যায় গভীর হইলেও উহার প্রকাশ সুরেন্দ্রনাথের সংযম ও যুক্তি-নিবদ্ধ রীতির সমধর্মী। তাঁহার 'নারীবন্দনা' কবিতায় সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়; তাঁহার 'মানববন্দনা'-য় জীববিবর্তন-বাদের বিজ্ঞানতত্ত্ব, মানবের ক্রমাভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তর, ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্ররূপক ও ভাষার ঘনবদ্ধ, অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্তির সাহায্যে চমৎকারভাবে কাব্যোচিত প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এইরূপ কাব্যরূপায়ণের সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তাঁহার পত্নীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচিত 'এষা' (১৯১২) গভীর বেদনাবোধের সহিত দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে। তাঁহার মননপ্রধান কাব্য পরিমাণের স্বল্পতা ও জিজ্ঞাসা-কণ্টকিত ভাবধারার প্রবাহের বেগহীনতার জন্য বাংলা সাহিত্যে উহার ন্যায্য প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৪—১৯২০) কবিতায় বাঙালীর চিরন্তন গার্হস্থ্য রস-

পিপাসা বর্ণাঢ্য কল্পনা ও অরূপলোকের ইঙ্গিতবাহী ঐকান্তিক ভক্তির সংস্পর্শে এক নূতন আস্বাদ-নিবিড়তা লাভ করিয়াছে। তিনি আমাদের সাধারণ গৃহাঙ্গনে ছোট ছোট শিশুর খেলায় ও হাসিতে, দাম্পত্য প্রেমের স্বভাবমাধুর্যে, পারিবারিক সম্পর্কের সহজ প্রীতি-বিনিময়ে, বৈষ্ণব কবির ভাব-প্রগাঢ়তা, বৃন্দাবনের অলৌকিক রসব্যঞ্জনা, অশোক-পলাশের রক্তিম রাগের অতিরঞ্জন আরোপ করিয়া উহাকে অসাধারণত্ব-মণ্ডিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের মতই তাঁহার ভাবাকুলতা, তাঁহার হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত, অসংবরণীয় রূপপিপাসা, কিন্তু তাঁহার রচনার পরিণততব শিল্পবোধ ও প্রকাশদক্ষতা তাঁহাকে নবীনচন্দ্রের ভাবপ্লাবনে অসহায় আত্মসমর্পণের দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। তথাপি তাঁহার অনেক কবিতায় কষ্টকল্পনা, অপরিমিত বর্ণবিলাস ও অনুভূতির অসমতা লক্ষিত হয়। তাঁহার অতি-প্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensuousness) সময় সময় অধ্যাত্ম ইঙ্গিতের সীমার মধ্যে সংযত না থাকিয়া মাত্রাতিরিক্ত উগ্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়ে অতিগুরু ভাবতাৎপর্যের আরোপ, রং লইয়া মাতামাতি, আবীর-কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি তাঁহার কাব্যে ঔচিত্য ও পরিমিতিবোধের অভাবও সূচিত করে। তাঁহার সনেটসমূহে গাঢ়তা ও শিথিলতার যুগপৎ অবস্থিতিও তাঁহার কাব্যপ্রেরণার অসমত্বের পরিচায়ক।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৬—১৯১৮) ঢাকা জেলায় ভাওয়ালের কবি-রূপে পবিচিত। তাঁহার কাব্যে দুর্বার আবেগ, অসঙ্কোচ দেহভোগ-কামনা ও তীব্র বেদনাময় জীবন-অভিজ্ঞতার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। তাঁহার প্রেম-কবিতায় তিনি কবিসুলভ আদর্শবাদের ও অতীন্দ্রিয় মিলনাকৃতির স্নিগ্ধ-শীতল পানীয়ের পরিবর্তে উগ্র দেহলালসার উত্তেজক সুরা পরিবেশন করিয়াছেন। গৈরিক অগ্নিস্রাবের ন্যায় অসংযত ও সময় সময় সুরুচির সীমালঙ্ঘী ভাব-প্রকাশে তিনি এক অসাধারণ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অনুভূতির প্রখরতার অনুরূপ শিল্পসংযম থাকিলে তিনি উনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। তথাপি তিনি বাংলা কাব্যের স্থির, শান্ত, নীলাম্বর-প্রতিবিম্বিত সরোবরে এক উষ্ণ জীবনধারা, এক আবিল স্রোতোবেগ প্রবেশ করাইয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি ও বাস্তব জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করিয়াছেন। ইহার কবিতার প্রকাশভঙ্গীর রূঢ় সবলতা ও অকৃত্রিম ভাবানুসারিতা বাংলা কাব্যে এক নূতন সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

এই যুগে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অনেকগুলি মহিলা-কবির আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কবি **চন্দ্রাবতী** ছাড়া আর বড় একটা নারী-কবির নাম শোনা যায় না। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে প্রেম-ভক্তির যে সর্বজনীন রস-মহোৎসব, তাহাতে নারীব সক্রিয় অংশগ্রহণের বিশেষ কোন নিদর্শন মিলে না। পদাবলীর মাধবী হয়ত কোনও সখীভাববিভোর পুরুষ-পদকর্তার ভাব-সাধনার ছদ্মবেশ। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার নর-নারীনির্বিশেষে প্রসারের ফলে, হয়ত বা পুরুষ-কবির ভাববিহ্বল স্তবস্তুতির প্রেরণায়, নারীর অন্তর-দ্বার উন্মোচিত হইল ও তাহার মনে আত্ম-প্রকাশের আবেগ সঞ্চাবিত হইল। এই মহিলা-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে **স্বর্ণকুমারী দেবী** (১৮৫৫—১৯৩২), **গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী** (১৮৫৮—১৯২৪), **মানকুমারী বসু** (১৮৬৩—১৯৪৩) ও **কামিনী রায়ের** (১৮৬৪—১৯৩৩) নাম সম্মানিত উল্লেখের দাবী কবে। এই মহিলা-কবিগণ সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন; তাঁহাদেব জীবন-কাল ববীন্দ্রনাথেব অন্তিম যুগ পর্যন্ত প্রসাবিত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যজীবন অতীতের স্মৃতিরোমন্থনাশ্রয়ী, হারানো যুগেব ম্লান গোধূলি-আলোকে ধূসর। রবীন্দ্রকাব্যের নবভাবধারাব তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে একেবারেই স্পর্শ কবে নাই। ইঁহাদের কবি-প্রেরণা এক কামিনী রায় ব্যতীত অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। পারিবারিক জীবনের বেদনাময় আঘাত, প্রিয়জন-বিরহ, পুত্র-কন্যার প্রতি আশঙ্কা-ব্যাকুল, নিবিড়-সংসক্তিপূর্ণ স্নেহ-মমতা, ভাগ্য ও ভগবানের প্রতি অশ্রুবিহ্বল, দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ অনুযোগ, জীবন-রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তার জন্য মৃদু খেদ ও ক্ষোভ—বিরল ব্যতিক্রম ও তাঁহাদের কবিতার সাধারণ ভাব ও বিষয়। তাঁহাদের সমস্ত কবিতায় একটা শান্ত, বিষণ্ণ আত্মনিবেদনের সুর শোনা যায়। তাঁহাদের কবিতা, তুলসী-তলায় জ্বালা সন্ধ্যাদীপের স্তিমিত আলোকের ন্যায়, যিনি মানববুদ্ধির অগোচর, সংসারের সুখদুঃখের বিধাতা, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভাবারতির স্নিগ্ধ, শান্ত অর্ঘ্যরচনা। তাঁহাদের কথাগুলি যেন অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে মৃদুস্বরে ফিস ফিস করিয়া বলা; কোথাও কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, আবেগের উদ্দামতা বা কল্পনার ঊর্ধ্বচারী মহনীয়তা নাই। সংসার-জীবনেও যেমন, কাব্যজীবনেও তেমনি, নারীসত্তার অবগুণ্ঠিত প্রকাশ এই কবিতাগুলিতে রূপ পাইয়াছে। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি, অন্তররুদ্ধ আবেগের মৃদু স্পন্দন, প্রকাশের মর্মস্পর্শী, নিরাভরণ

মহিলা-কবি

সরলতা, জীবনজিজ্ঞাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষতা নারীর অন্তর-সৌকুমার্যের সুরভিত পরিচয় বহন করে। ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে নারীপ্রেমের বিচিত্র পরিচয়, নারীহৃদয়ের অপরিমেয় রহস্যের অপূর্ব গাথা রচনা করিতেছেন, তখন তাঁহারই প্রায় সমকালীন মহিলা-কবিরা আপনাদের এই ভাববৈচিত্র্য, হৃদয়ের এই আবেগ-উদ্বেলতার ইঙ্গিতমাত্র না দিয়া কেবল ঘর-কন্নার কথায়, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-চিন্তাভাবনা-বিজড়িত সংসার-জীবনের প্রতিচ্ছবিতেই তাঁহাদের কাব্য-প্রেরণাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। সেখানে প্রতিবেশীর গৃহে নারীর চারিদিকে হাজার রংমশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যেখানে ইঁহারা নিজের ঘরে কেবল স্তিমিত গৃহপ্রদীপের মিটমিটে আলোকেই আত্মপরিচয় অর্ধ-উদ্ঘাটিত করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। নারীর দ্বৈতসত্তার যে জ্যোতির্বিভাসিত দিকটি পুরুষের চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, নারীর চক্ষে সে দিকটা অদৃশ্য থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবন্ধ-সাহিত্য

১

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে যখন কোন জাতির মধ্যে নানাবিষয়ক কৌতূহল ও জগৎ ও জীবনের জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে পিপাসা জাগিয়া উঠে, তখনই সে জাতির সাহিত্যে প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত হয়। প্রবন্ধের বাহিরের রূপ ইহার আকারের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতা ও স্বল্প পরিসরে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দ্বারা নির্ণীত হয়। সাময়িক পত্রিকাই প্রবন্ধ-সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা ও প্রধান আশ্রয়স্থল যোগাইয়াছে। ইহার কলেবর পূর্ণ ও পাঠকসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে এই ক্ষুদ্রাকার, তথ্যপূর্ণ রচনা-সম্ভারের প্রয়োজন। সেই একই কারণে ইহা যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় ও সরস ভঙ্গীতে লিখিত হইবার দাবী করে। একটা সমগ্র গ্রন্থ পড়িতে যে পরিমাণ অখণ্ড মনোযোগ ও গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন, ইহার দুরূহ তত্ত্ব ও গুরুগম্ভীর রচনাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে যে মানসিক প্রয়াস অপরিহার্য, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহাতে সে পরিমাণ মাথা ঘামানো দরকার না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার ভাবগ্রন্থন ও প্রকাশভঙ্গী নিয়মিত হয়। সুতরাং ইহার পিছনে এক দিকে যেমন থাকে জ্ঞান-পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি থাকে বিষয়ের আয়তন ও দুরূহতা যথাসম্ভব কমাইয়া এই জ্ঞানের সহজ উপস্থাপনা। তথ্য ও তত্ত্ব যাহাতে ভার না হইয়া উপভোগরূপে অন্তরে প্রবেশ করে সেই মূল-উদ্দেশ্য লইয়াই প্রবন্ধ-সাহিত্যের সূত্রপাত।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের মূলসূত্র

প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-জাতীয় কোন রচনার নিদর্শন মিলে না। অবশ্য সেখানে প্রবন্ধ শব্দটি প্রকৃষ্ট-বন্ধন-সমন্বিত বৃহৎ রচনাকেই বুঝাইত। তবে রামায়ণ-মহাভারত বা ভাগবত-পুরাণাদির মূল-আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে যে সমস্ত ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে কোন নীতিতত্ত্বের বা ধর্মসমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা বা স্বরূপ-প্রতিপাদন-চেষ্টা হইত সেই প্রচেষ্টাগুলিকে প্রবন্ধ-পর্যায়ভুক্ত করা চলে। অবশ্য যে জাতীয় গল্পে গল্পরসটা গৌণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই মুখ্য, গল্প যেখানে কেবল মাত্র কোন সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইত,

প্রাক্-আধুনিক যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের অনুপস্থিতি

সেইখানেই ইহা প্রবন্ধের সমধর্মী। এই মানদণ্ডে কিছুকিছু বৌদ্ধ জাতককেও প্রবন্ধের পূর্বরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড-আখ্যান-গুলি বৃহত্তর ধর্মকাব্যসমূহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে তাহাদের বিরাট কলেবরে বিলুপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আর যেখানে ধর্মতত্ত্ব-আলোচনায় কেবল মাত্র শাস্ত্রানুগত্যই প্রধান, স্বাধীন বুদ্ধির বিকাশ সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানেও প্রবন্ধের পূর্বলক্ষণ আবিষ্কার করা যায় না।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ

সুতরাং প্রবন্ধ ইহার বিশেষ অর্থে যে আধুনিক যুগেরই আবির্ভাব তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। ইহার উদ্ভবের প্রথম উপলক্ষ্য হইল উনবিংশ শতকের প্রথমে ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদ। বামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজক-গোষ্ঠীর ধর্মবিবোধকে কেন্দ্র কবিয়াই প্রবন্ধেব কায়া প্রথম নির্মিত হয়। অবশ্য আধুনিক অর্থে প্রবন্ধের আত্মা বা অন্তরের বিশেষ বসাবেদনের যে কতটুকু ইহাদের মধ্যে আছে তাহা বলা শক্ত। তবে ইহার বহিরঙ্গের প্রথম সাক্ষাৎ আমরা এইখানেই পাই।

প্রবন্ধে সাহিত্যরসের মূল-উৎস

অতিরিক্ত উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতা ও প্রকাশ-সৌষ্ঠবহীন যুক্তিতর্ক-সর্বস্বতা প্রবন্ধের সাহিত্যিক গুণ-বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ। যখন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যখন কি বলা হইল অপেক্ষা কেমন করিয়া বলা হইল এই প্রশ্নই আমাদের নিকট বড হইয়া দেখা দেয়, তখনই প্রবন্ধের সাহিত্যরস সঞ্চিত হইবার অনুকূল সময় আসে। যখন কোন প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নহে, লেখকেব নিজেরই মননশীলতা বা ভাবপ্রেরণা এক অনুকূল পাঠকগোষ্ঠীকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া আত্মবিকাশের পথ খোঁজে তখনই প্রবন্ধে রসসঞ্চার হয়। জ্ঞানবিতরণ উদ্দেশ্য হইলেও যখন উহার পরিবেশন-প্রথার হৃদয়-গ্রাহিতাকে সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়, তখন জ্ঞানের বস্তু রসের পর্যায়ে পদক্ষেপ করে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

এই সাহিত্যরস-সৃষ্টিপ্রয়াসী প্রাবন্ধিক-গোষ্ঠীর মধ্যে **অক্ষয়কুমার দত্ত** (১৮২০-১৮৮৬) কালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার সমস্ত রচনাই, ছোট হউক বড় হউক, প্রবন্ধধর্মী। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' (১৮৫২-১৮৫৩), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩) ও 'ধর্মনীতি' (১৮৮৫)—বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা-সংযুক্ত; অখণ্ড গ্রন্থ হইলেও ইহাদের এক একটি অধ্যায়ের মধ্যে

প্রবন্ধের রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় ও ভঙ্গীর সরসতা ও ব্যক্তিক অনুভূতির আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য থাকায় ইহারা প্রবন্ধ হিসাবে খুব উচ্চ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু তাঁহার 'চারুপাঠ' তিন খণ্ড (১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৯) সত্যিকার প্রবন্ধ-সংগ্রহ। এই লেখাগুলিতে অক্ষয়-কুমারের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনের প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যগঠনরীতিতে কিছুটা গতিস্বচ্ছন্দতা, অনায়াস-লভ্য সাবলীলতার অভাব থাকিলেও তাঁহার মননের ঋজুতা ও তথ্যের বিন্যাস-পারিপাট্য পাঠকচিত্তের অভিনন্দন লাভ করে। তাঁহার তিনটি স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক নিবন্ধ, ইংরেজ প্রাবন্ধিক অ্যাডিসনের দৃষ্টান্ত-প্রভাবিত হইলেও, রূপক-কল্পনার সার্থক প্রয়োগ ও লেখকের নিবিড় মানসানুভূতির স্পর্শে, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে, শুধু তথ্য ও জ্ঞানের প্রকাশ-সীমা অতিক্রম করিয়া পাঠকের মনে রসবোধের গভীরতর আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর (১৮২০-১৮৯১) ছন্দস্খলিত ও প্রসাদগুণাঢ্য রচনার মধ্যে প্রবন্ধের বিশেষ দর্শন মিলে না। তাঁহার শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'বোধোদয়' বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি হইলেও, ইহার বিষয় ও বিন্যাসরীতি এত সর্বজনবোধ্য প্রাথমিক স্তরের যে ইহাতে প্রবন্ধের যে আদি-লক্ষণ মননশীলতা তাহারও বিশেষ স্পর্শ পাওয়া যায় না। তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ'-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও মতপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত ও আকারে এত বড় যে প্রবন্ধের বিশুদ্ধ ও ফল-নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধনা উহাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই। তবে তিনি প্রবন্ধ না লিখিলেও প্রবন্ধের উপযোগী মার্জিত ও সুগঠিত ভাবসৃষ্টির কার্যে সহায়তা করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মিত লেখক এবং ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকরূপে প্রবন্ধ-সাহিত্যের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত ছিলেন। তাঁহার রচনায় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির আধিক্য ছিল। এই লেখাগুলির মধ্যে লেখকের মনের একটি বিশেষ ভাবমুগ্ধতা, তাঁহার অন্তর-বিচ্ছুরিত একটা জ্যোতির্ময় অনুভূতি প্রবন্ধের একটা নূতন প্রকাশ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তত্ত্বালোচনাকে কাব্যলোকের অনির্বচনীয় রহস্য-লোকে উন্নীত করিয়াছে। তাঁহার রচনার

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞান-বিজ্ঞানের খাঁচায় আবদ্ধ প্রবন্ধ-পাখী যেন ব্যক্তিমনের খোলা জানালা দিয়া মুক্তি লাভ করিয়া অসীম নভোবিহারের পথে উধাও হইয়াছে। তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (১৮৯৮) যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের, মন্ময় অন্তরঙ্গতার একটি নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই সুরটি পরবর্তী যুগে তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথে আরও প্রসারিত ও বিচিত্র গ্রামে ধ্বনিত হইয়া প্রবন্ধের নূতন রূপবিধান করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ততটা ছিল না; তৎপরিবর্তে ছিল ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তা।

২

রাজনারায়ণ বসু

এক একজন লেখক থাকেন যাঁহারা প্রাণরসে উচ্ছল, যাঁহাদের রচনার বিষয়-বস্তুকে ছাপাইয়া তাঁহাদের ব্যক্তিসত্তা নানা আভাসে ইঙ্গিতে, কৌতুকরসের প্রাবল্যে, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যবৈশিষ্ট্যে অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহারা যদি প্রবন্ধ-রচনায় ব্রতী হন, তবে সেই প্রবন্ধ নৈর্ব্যক্তিক, জ্ঞানপ্রধান আলাচনার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির জীবনরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬-১৮৯৯) এইরূপ ব্যক্তিত্বপ্রধান লেখক ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচনার অনেকাংশই এই ব্যক্তি-ধর্মের প্রবল উৎক্ষেপে প্রাণবান ও অনুভব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'সেকাল ও একাল' (১৮৭৪) ও 'আত্মচরিত' যদিও প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্য ও বহিরঙ্গ-অনুবর্তনে লিখিত হয় নাই, তথাপি পরবর্তী স্তরে প্রবন্ধ যে বিশিষ্ট মেজাজ ও আত্মভাবনা-বিকিরণের বাহন হইয়াছে তাহা তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রমশঃ মননপ্রধান, জ্ঞানগরিষ্ঠ ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল না হইয়া, যাঁহারা খেয়ালী কল্পনা, আবেগধর্মিতা ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-সঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী তাঁহাদিগকেই বেশী পরিমাণে আশ্রয় করিতে আরম্ভ করিল। প্রবন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপাটি-বিন্যস্ত আধার না হইয়া ক্রমশঃ তথ্যের সূতায় জড়িত, আবেগের আকাশে উড্ডীন বিচিত্রবর্ণ ফানুসের আকার ধারণ করিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর (১৮২৫-১৮৯৪) সমস্ত রচনাই প্রবন্ধধর্মী। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৪) প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্য-কৃতিই প্রবন্ধ-পর্যায়ভুক্ত। তাঁহার প্রবন্ধের পরিকল্পনায় ও রচনা-পদ্ধতিতে তিনি অক্ষয়-

কুমারের মননশীল আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পিছনে ছিল এক দৃঢ় আদর্শবাদ ও স্বধর্মনিষ্ঠা। ভূদেবের যে প্রখর ও অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও ইয়ং-বেঙ্গল-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যও তাঁহার রক্ষণশীল মন ও প্রাচীন আচারের নিষ্ঠাবান অনুসরণকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আঘাতশীল উগ্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ না করিয়া প্রাচীন সমাজ-প্রথা ও জীবনাদর্শের অকুণ্ঠ সমর্থনেই নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার ইংরেজী শিক্ষা তাঁহাকে যে যুক্তিবাদ-মন্ত্রে ও সংস্কার-মুক্ত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহাই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন প্রাচীনত্বের যুক্তিসম্মত প্রতিষ্ঠায়। রামমোহন ও অক্ষয়কুমার যেমন যুক্তিবাদের দ্বারা উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্মের গ্রহণীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ভূদেব সেই যুক্তি-প্রয়োগেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যে সাধারণতঃ মননপ্রধান তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি ইহারই পিছনে এক অবরুদ্ধ-সংযত আবেগ, এক আদর্শ-স্বপ্নচারী ভাবকল্পনা ঈষৎ আভাসিত হইয়া প্রবন্ধগুলির উপর একটি অনতিস্পষ্ট কাব্যব্যঞ্জনা আরোপ করিয়াছে। ইহারা বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের যে মিলিত প্রকাশ এই ধারণাই পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়। নূতন বিষয়ে কৌতূহল উদ্রিক্ত করা অপেক্ষা অস্থিমজ্জাগত প্রাচীন সংস্কারের সম্বন্ধে সংশয় নিরসন করিয়া উহাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে মননের আরও দুরূহ পরীক্ষা নিহিত। ভূদেবের যুক্তিবাদ এই দুরূহতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য যে আর সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভরতার স্তরে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, ভূদেবের আপাতদৃষ্টিতে আবেগহীন, ব্যক্তিত্ব-স্পর্শবর্জিত রচনাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

৩

প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট, ইহার অনন্যমেয় রূপ-বৈচিত্র্যের চারুশিল্পী, ইহার সমস্ত সীমাতিসারী ভাবসত্তার স্রষ্টা **বঙ্কিমচন্দ্র**। যে প্রবন্ধ এতদিন নাতিসূক্ষ্ম চিন্তা-মননের বাহন ছিল, যাহার পরিধি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রচারের তথ্য ও তত্ত্বের গুরুভারক্লিষ্ট, মন্থরগতি সারসংকলনে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রতিভার স্পর্শে প্রাণের বিচিত্র-ছন্দান্বিত স্পন্দনে আন্দোলিত, জীবনতরঙ্গের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তাহার অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণ্যপ্রবাহ, বিদ্যুৎশিখার ন্যায় কি তীক্ষ্ণ দীপ্তি ও দ্রুত গতি, প্রাণবন্যার কি দুর্বার উল্লাস সঞ্চারিত হইল! ইহার বস্তুভাব আশ্চর্যরূপে লঘু হইয়া ইহা ভাবের উর্ধ্বাকাশে লীলাসঞ্চরণের শক্তি লাভ করিল; ইহার ভূমিচারী পদাতিক-বৃত্তি অকস্মাৎ ডানা মেলিয়া কবিকল্পনার সহযাত্রী হইল। ইহার ভোঁতা ও ভারী মুদ্গর দিব্যবিভাদীপ্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত হইল। ইহার স্থূল প্রয়োজনাত্মক উচ্চারণ-শ্লথতার মধ্যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-তির্যগ্ভাষণের তীক্ষ্ণতা, পরিহাস-রসিকতার চমক, আবেগময় ভাবমুগ্ধতা, গীতিকবিতার সুরের উচ্ছ্বাস, জীবন-পর্যালোচনার অন্তরঙ্গ অন্তর্মুখিতা, ক্ষোভ-অনুযোগ-আশা-নৈরাশ্যের সম্মিলিত ঐকতান—মানবকণ্ঠের সমগ্র স্বরগ্রাম, অনুভূতির সর্বসঞ্চারী ভাবসমষ্টি আপনাদের যথাযথ বাক্‌ছন্দটি খুঁজিয়া পাইয়াছে। গুটিপোকার বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতিতে রূপান্তরের ন্যায় বঙ্কিমের হাতে প্রবন্ধের এক নবজন্ম-পরিগ্রহ ঘটিল। জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাবপ্রধান রসরচনার রূপ গ্রহণ করিল।

সাময়িক পত্রিকার সহিত প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদাহৃত হইয়াছে। তিনি যদি ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপন্যাসক্ষেত্রে তাঁহার নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার আসন ছাড়িয়া তাঁহার বিপুল ও বহুমুখী প্রবন্ধ-সাহিত্য রচনার প্রেরণা পাইতেন কি না সন্দেহ। সাময়িক পত্রিকার কলেবর-পূরণের তাগিদ, বিভিন্নরুচি পাঠকের তৃপ্তিসাধনের আয়োজনই তাঁহাকে এই নূতন শক্তিপরীক্ষার আসরে অবতীর্ণ করাইয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানের বিচিত্র ভাণ্ডার হইতে তিনি উপাদান আহরণ করিয়া বাঙালী পাঠকের শুধু জ্ঞানের ক্ষুধা নহে, রসপিপাসা-নিবৃত্তিরও এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করিলেন। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জীবন-দর্শন, পরাশ্রয়ী শিক্ষা-সংস্কৃতির গ্লানি, কৌতুক-হাস্যের স্নিগ্ধচ্ছটা ও ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত—এই সমস্ত বিষয় ও মানসরীতিকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে অজস্র রসের ধারা, ভাবপ্রকাশের যে অনবদ্য শিল্পরূপ, স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য যে রসনারুচিকর রন্ধননৈপুণ্যের প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর রুচিবোধ ও সমাজচেতনা এক অভিনব অনুভূতি-পর্যায়ে উন্নীত হইল। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিজ্ঞান-রহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) ও 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯) পরে এই দুইখানি গ্রন্থ 'বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম ভাগ' নামে একত্র পুনর্মুদ্রিত হয় (১৮৮৭), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪),

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য

'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৯২)—এই সমস্ত গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিষয়োপযোগী সরস রচনাভঙ্গীর যুগপৎ পরিচয় দেয়।

বঙ্কিমের বস্তুপ্রধান ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ

ইহাদের মধ্যে যেগুলি বস্তুপ্রধান রচনা, যাহারা বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস-সম্পর্কিত, সেগুলিতে বঙ্কিম তাঁহার মুখ্যকর্তব্য তথ্য-পরিবেশনের দিকে বিশেষ-ভাবে অবহিত থাকিয়াও মন্তব্য ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁহার ব্যক্তিমানসের পরিচয় দিয়াছেন। এই তথ্যপুঞ্জ ও তত্ত্বব্যূহের মধ্যে যে একটি সরস-চতুর মন, একটি সৌন্দর্যসচেতন রসস্রষ্টা সাবলীল গতিতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি যে মুহুর্মুহু পাঠককে শুধু জ্ঞানাহরণের নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতা হইতে মুক্তি দিয়া তাহার রসানুভব-শক্তি ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের সংবেগকে সক্রিয়ভাবে উদ্রিক্ত করিতেছেন তাহা প্রতিটি বাক্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি বিষয়ের উপরই এক উদার, উন্মুক্ত, অনুভূতিশীল মনের অবাধ গতিচ্ছন্দের ছাপটি সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি রসবিশ্লেষণের এক নূতন পদ্ধতি, অলঙ্কার-শাস্ত্রের এক অভিনব প্রয়োগ, সাহিত্য-আস্বাদনের মধ্যে এক অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি, কাব্য-পরিবেশের এক তাৎপর্যময় পুনর্গঠন, বিচারমূলসূত্রের সার্থক উপস্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ গুণের সমবায়ে সমালোচনার এক অজ্ঞাত দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়াছে। বঙ্কিমের পূর্বে সমালোচনার প্রাথমিক অসম্পূর্ণ প্রয়াস, সাহিত্যপাঠে মানস প্রতিক্রিয়ার প্রথম অসংগঠিত আলোড়ন দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে সার্থক সমালোচনার ভিত্তি তিনিই প্রথম রচনা করিলেন ও উহার কয়েকটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তও আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব-আলোচনার মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য আদর্শের, বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তিরসাপ্লুত প্রগাঢ় অনুভূতির সার্থক সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত না হইলেও তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতির তাৎপর্য বহুলাংশে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি হয়ত খুব নূতন কথা বলেন নাই; কিন্তু বাঙালীর দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিষয়গুলির যে পুনর্বিবেচনা উচিত এই সত্যের দিকে তিনিই প্রথম অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে জীবন-রসিকতার গভীরতর অনুরণন শ্রুত হয়। এইগুলিতে শুধু রচয়িতার ব্যক্তিমানস নহে, তাঁহার আবেগ-অনুভূতি-কল্পনাস্বপ্ন-জীবনবোধ প্রভৃতি বৃত্তির সূক্ষ্ম

তন্তুজালে রচিত, নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তা এক অবর্ণনীয় আবেদন লইয়া পাঠকের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নাই, কোন 'প্রকৃষ্ট বন্ধনে' গ্রথিত চিন্তন-পারম্পর্য, প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত কোন অচ্ছেদ্য যুক্তি-শৃঙ্খলা নাই। প্রবন্ধের সমস্ত আঙ্গিক-বিন্যাস এখানে ছিন্ন হইয়া ইহা এক মুক্ত মানবাত্মার এক সর্ববন্ধনাতীত মানস-অনুভূতির লীলাবিহারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গোধূলিসন্ধ্যার একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ যেমন দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে, ইহার চারিদিকে যেমন বর্ণালী-মায়া অদৃশ্য চিত্রকরের সমাবেশ-সুষমার এবং স্বপ্নলোকেব সুসম্বদ্ধ চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, কমলাকান্তের প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবোচ্ছ্বাসেব একটি বিন্দু মনোলোকে ঘন হইয়া উঠে, নানা বর্ণের সংমিশ্রণে, নানা সুরের সমবায়ে একটি অপরূপ সত্তা গ্রহণ করে ও অন্তঃসঙ্গতি ও প্রাণলীলার স্পন্দনে একটি চিরন্তন অধ্যাত্ম-সত্যরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের একটি আকৃতি, বেদনার একটি স্পন্দন, কল্পনার একটু উচ্ছ্বাস, জীবনানুভূতির একটি তরঙ্গলীলা বঙ্কিমের ভাবলোকে একটি সুষ্ঠু, সুগঠিত অবয়বে সংহত হয়, একটি অলক্ষ্য যোগসূত্রের টানে নানা সমধর্মী চিন্তা-ভাবনাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত কবে ও পরিশেষে একটি নানা-তন্ত্রীসমন্বিত সুরসঙ্গতিতে (harmony) পবিণত হইয়া অন্তর-গভীরে একটি অপরূপ সঙ্গীতের অনুবণন তুলিতে থাকে। বঙ্কিমের রচনায় প্রসঙ্গ-পরিবর্তন সাধিত হয় কোন বহিরঙ্গমূলক যুক্তিপারম্পর্যের দ্বাবা নহে, এক নিগূঢ় মর্মানুভূতির অনুসরণে, উহার অন্তর্নিহিত প্রাণলীলার স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-সম্প্রসারণে।

কমলাকান্তের দপ্তরে জীবনরস

কমলাকান্তের দুই একটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলেই উপরি-উক্ত মন্তব্যের যথার্থ অনুধাবন করা যাইবে। বঙ্কিমের সমস্ত মনন আসিয়াছে কমলাকান্তের আধ-পাগল, জীবনরহস্যের গভীর-নিমজ্জিত বিশেষ মনোভঙ্গীর তির্যক পথ বাহিয়া, যুক্তিধর্মী আলোচনার সকলের-চলা রাজপথ দিয়া নহে। *'বিড়াল'* প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন জানানো হইয়াছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌছানো হইয়াছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিসমাবেশের দ্বারা নহে; ইহা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এক খেয়ালী কল্পনার এলোমেলো বাতাসে উড়িয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা যখন আসিয়াছে তখন পাঠকের নিঃসংশয় প্রতীতি হইয়াছে যে কোন সমাজ-তত্ত্ববিদ বা অর্থনীতিবিশারদ ইহাকে আমাদের অন্তরের এত গভীরে প্রোথিত

বিষয়বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত-পরিণতির দুইটি বৈশিষ্ট্য

করিতে পারিতেন না। কোথায় খট্টাশায়িত, অহিফেনে ঢুলুঢুলু-নেত্র, ওয়েলিংটনের মার্জারত্ব-প্রাপ্তির কল্পনায় বিভোর কমলাকান্ত ও একদিকে দুগ্ধের মালিক প্রসন্ন ও অন্তদিকে দুগ্ধপায়ী মার্জারের সহিত তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রামূলক সম্বন্ধ, আর কোথায় বা সমাজতত্ত্বের গভীর আলোচনা ও বঞ্চিত দরিদ্রের চৌর্যবৃত্তির অনুমোদন! প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে এই অভাবনীয় অসামঞ্জস্য বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বসমন্বয়কারী শক্তির সাহায্যেই সমাধান লাভ করিয়াছে—নেশাখোর কমলাকান্তকে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকপদে আসীন হইতে দেখিয়া আমরা বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি বোধ করি না। কমলাকান্ত নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় ও প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোয়ালঘরে যে সমাজতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে তাহাই, অর্থাৎ যে সর্বহারা তাহার মোসাহেবি করিয়াই হউক, দুগ্ধদান গ্রহণ করিয়াই হউক যে বাঁচিবার অধিকার আছে, এই জীবনসত্যই অকুণ্ঠিতভাবে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। 'একটি গীত'-এর আরম্ভ বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ধৃতি দিয়া; আর পরিসমাপ্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভাবস্তরে, রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার মর্মজ্বালা-প্রকাশে ও ব্যাকুল মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায়। প্রেমের ভাবতন্ময়তা স্বাধীনতার আকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, বঁধু ও বৃন্দাবন নূতন-দ্যোতনাবিশিষ্ট রূপক-পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই যে প্রেমের প্রসঙ্গান্তর-প্রাপ্তি এত সহজে ও অলক্ষিত ভাব-সংযোজনার মাধ্যমে সাধিত হইয়াছে যে পাঠকের অনুভূতিতে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবের ভাবসাধনার বৃন্দাবনলীলা আর আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ চরিতার্থতার সন্ধান যেন একই সুরে বাঁধা হইয়া, একই প্রকার আবেগ-মূর্ছনার সৃষ্টি করিয়া একাত্মতালাভ করিয়াছে। 'কে গায়' প্রবন্ধে একটি গানের সুর অবলম্বন করিয়া প্রৌঢ় জীবনের সমস্ত পূর্বস্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই স্মৃতিমন্থনের অতল হইতে এক সার্বভৌম জীবনসত্য উত্থিত হইয়া মোহভঙ্গ-বিড়ম্বিত, নৈরাশ্য-তিক্ত জীবনে এক নূতন লক্ষ্য ও তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে। এইরূপে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সমস্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিম প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে এক নূতন রূপ ও ভাবসত্তার সংযোজন করিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত বিষয়-বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত-পরিণতি দুইটি বৈশিষ্ট্যের মুদ্রাঙ্কিত—(১) কমলাকান্তের বিশিষ্ট জীবনবোধের রন্ধ্রপথ দিয়াই ইহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; (২) ইহাদের আঙ্গিক-গঠনে গীতি-প্রেরণার মত স্বচ্ছন্দচারী এক নিগূঢ় ভাবসঙ্গতি আত্মবিকাশ করিয়াছে। এখন হইতে বস্তুসঞ্চয়ে নিরেট,

তথ্যের চাপে স্ফীত গদ্য-প্রবন্ধ এক আত্মিকজ্যোতিঃসমুজ্জ্বল, লঘু-সুষম ভাব-রূপে নবজীবনের পথে অগ্রসর হইল।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র-সূর্যকে ঘিরিয়া 'বঙ্গদর্শন'-এর স্তম্ভে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গদ্য-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। তিনি ইহাকে পাশ্চাত্ত্য রীতি-অনুযায়ী জ্ঞান-পরিবেশনের কতকটা দেশের নাড়ীর সঙ্গে নিঃসম্পর্ক কর্তব্যভার হইতে মুক্তি দিয়া বাঙালীর রুচি, রসবোধ ও জীবন-প্রজ্ঞার সহিত সুস্থ সম্বন্ধে স্থাপিত করিলেন। সুতরাং বাঙালীর প্রাণের সহিত সহজ সংযোগের জন্যই ইহার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক ভাব-শিষ্যের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) ও পরবর্তী যুগের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদর্শনের প্রাবন্ধিক-গোষ্ঠী

ইহাদের মধ্যে **অক্ষয়চন্দ্র সরকারই** বঙ্কিমের রচনারীতি ও তাঁহার সরস কৌতুকের সহিত মিশ্রিত তত্ত্বগভীরতার সুরটি বিশেষ দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'চন্দ্রলোকে' প্রবন্ধটি কেবল বঙ্কিম-রীতির সার্থক অনুসরণই নহে, কমলাকান্ত-চরিত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও তাহার বিশেষ জীবনদর্শনদ্যোতক রস-রচনা। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনারীতিও অনেকাংশে বঙ্কিম-প্রভাবিত। তাঁহার হেমচন্দ্রের কাব্যসমালোচনার মধ্যে মূলতত্ত্ব-উপস্থাপনকৌশল ও অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধ-সংগ্রহগ্রন্থ, যথা, 'সমাজ-সমালোচন' (১৮৭৪), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'সনাতনী' (১৯১১) ও 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) তাঁহার রচনার মধ্যে জ্ঞান-গম্ভীর ও কল্পনা-সরস উভয় রীতির সংমিশ্রণের নিদর্শন। তাঁহার 'গগন-পটুয়া' প্রবন্ধে তাঁহার যে লীলায়িত কল্পনা-বিস্তার ও সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বঙ্কিম-রচনার বাহিরে দুর্লভ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে যে ভাবৈশ্বর্য ও কল্পনা-নিবিড়তার প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছিল, তাঁহার স্বাধীন রচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫)

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর আলোচনা করিলেই প্রতীতি জন্মিবে যে তিনি প্রাগ্-বঙ্কিম যুগের জ্ঞানগর্ভ বিষয়েই নিজ রচনাশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, উহার মধ্যে রসের হিল্লোল প্রবাহিত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে তত্ত্বমূলক প্রবন্ধও যে সরসতার সংমিশ্রণে কতখানি সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে, তাহা পূর্ববর্তী যুগের অক্ষয়কুমার দত্তের অনুরূপ রচনার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। রাজকৃষ্ণের মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা যতটা প্রবল ছিল, ভাবুকতা সে পরিমাণে ছিল না। সুতরাং তিনি বিশুদ্ধ রস-রচনার দিকে অখণ্ড মনোযোগ না দিয়া ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্যানুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহশীল হইলেন। তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু এই ইতিহাস-রচনায় আত্মনিয়োগই তাঁহার দ্বিধা-বিভক্ত মনের পরিচয় বহন করে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও অনেকটা প্রাচীন আদর্শ ও প্রথার গোঁড়া সংরক্ষকরূপেই দেখা দিয়াছেন। মনের যে চলমানতা ও স্থিতি-স্থাপকতা থাকিলে, নানা বিচিত্ররস-আস্বাদনের প্রতি যে সহজ রুচিগত উদারতার অধিকারী হইলে সার্থক প্রবন্ধকার হওয়া যায়, চন্দ্রনাথ বসুর সংস্কারবদ্ধ মনে তাহার বিশেষ চিহ্ন মিলে না। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১), 'ত্রিধারা' (১৮৯১) ও 'সাবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০) সেকালে খানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিল। তবে তাঁহার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, তত্ত্বপ্রতিপাদনে অত্যুৎসাহ ও মনোভঙ্গীর একলক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট নিশ্চলতা ঠিক প্রবন্ধ-রচনার উৎকর্ষলাভের পক্ষে অনুকূল নহে। অবশ্য এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহার বিশ্লেষণ-কুশলতা ও যুক্তি-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু ইহাতে প্রবন্ধক্ষেত্রে স্মরণীয়তার যে বিশেষ আনুকূল্য হইবে এমন বোধ হয় না।

চন্দ্রনাথ বসু

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৪-১৮৮৯) 'পালামৌ' (১৮৮০) ঠিক প্রবন্ধ নহে, মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী, তবে ইহার মধ্যে উপন্যাস ও প্রবন্ধেরও কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়। ইহাতে জীবন-রস-আস্বাদন ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে কৌতূহল, তাহা প্রবন্ধের রূপ না লইলেও ইহার অন্তরাত্মার সৌরভে সুরভিত।

সঞ্জীবচন্দ্র

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্ব এবং বাংলা ও সংস্কৃতের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে সংস্কৃত-পণ্ডিতের গুরু-গম্ভীর

ভাষার প্রতি পক্ষপাত, দুরূহ বিষয়ের দুরূহতর উপস্থাপনা-প্রবণতা একেবারেই ছিল না। তাঁহার সমস্ত রচনাই সহজ, সরল ভাষায় ও কৌতুক-মণ্ডিত স্মিতহাস্যের সহায়তায় লেখা। 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধে তিনি কালিদাস, শেক্সপিয়র ও বাইরনের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও সেদিনের বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের উপর উঁহাদের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মনোজ্ঞ সরসতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯) উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদি হিন্দুযুগের জীবনযাত্রার সরস ও উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন। যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের, তেমনি তাঁহারও উপন্যাসে মন্তব্য ও জীবন-চিত্রণের মধ্যে প্রাবন্ধিক-সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, যেন বঙ্কিম-যুগের একটা দক্ষিণী হাওয়া, একটা প্রাণোচ্ছলতাব তরঙ্গ শতাব্দীর এক পাদ অতিক্রম কবিয়া, বিংশ শতকের গম্ভীরতর পরিবেশে লালিত ও যুগোচিত পাণ্ডিত্যপ্রধান গবেষণাকার্যে নিয়োজিত হরপ্রসাদকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার মধ্যে অতীত স্মৃতির সার্থক উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিমগোষ্ঠী-বহির্ভূত প্রবন্ধকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪০-১৯২৬) বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (১৮৭৫) যে কল্পনার উচ্ছলতা ও সরস চিত্তস্ফূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহাব প্রবন্ধাবলীতে কিয়ৎ-পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে 'তত্ত্ববিদ্যা' (.৮৬৬-১৮৬৯), 'নানা চিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০), 'চিন্তামণি' (১৯২২) প্রভৃতিতে একটা খেয়াল-খুশির আমেজ, ধারাবাহিক গম্ভীর আলোচনার মধ্যে দমকা হাওয়ার উচ্ছ্বাসের ন্যায় কৌতুককর অপ্রাসঙ্গিকতার প্রবর্তন, দার্শনিকতার মধ্যে লঘু চাপল্যপূর্ণ রীতির অনুপ্রবেশ বিশেষ উপভোগ্যতার হেতু হইয়াছে। যে মেজাজ-গত উপাদানে সার্থক প্রবন্ধকার নির্মিত হয়, তাহা তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) ও **বীরেশ্বর পাঁড়ে** প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 'সমালোচনা-সাহিত্য' (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১ বাং সন হইতে উদ্ধৃত) প্রবন্ধে আধুনিক সমালোচনার আদর্শ ও মূলনীতির যে সূক্ষ্ম-রসাত্মক ও মতবাদের উদারতা-ব্যঞ্জক বিচার দেখা যায়, তাহা তাঁহার সাহিত্যরস-আস্বাদনের অসাধারণ শক্তির পরিচয়-বাহী। তিনি এই প্রবন্ধে নিজ মৌলিক বিচারবুদ্ধির নিদর্শন দিয়াছেন। একদিকে

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

যেমন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচ্য রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া উহাদের আস্বাদনে পাশ্চাত্ত্য মানদণ্ডের নির্বিচারে অনুসরণ করেন নাই। প্রবন্ধের ভাব-বিস্তারে ও আঙ্গিক-নির্ধারণেও তিনি সু-মিত শিল্পবোধের অধিকারী। তাঁহার 'বিহারীলাল' সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ (নব্যভারত, ১৩০১ বাং সন হইতে উৎকলিত) এক সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্রেণীর কবির কাব্যসৌন্দর্যের স্বরূপ-নির্ধারণে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাইয়াছে। বাঙালী পাঠকের অনভ্যস্ত রুচি ও অননুশীলিত রসবোধের নিকট নূতন সমালোচনা-রীতির মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া, মৌলিক প্রতিভার সহিত প্রথম পরিচয়-স্থাপনেব দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়া, লেখক তত্ত্বকথার প্রতি একটু বেশী জোর দিয়াছেন; যাহা আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক বিদগ্ধ পাঠকের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা সবিস্তারে প্রমাণ করিতে গিয়াছেন এবং এইজন্য হয়ত প্রবন্ধগুলি কিছুটা অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও তত্ত্বকণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে উহারা যে অনায়াসলব্ধ গঠন-সুষমা ও ভাবসঙ্গতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণ, সেই আদর্শ হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে। তথাপি উহাদের মধ্যে যে প্রবল মানস উৎসাহ, সৌন্দর্য-অনুভূতির যে তীব্র উৎকণ্ঠা একটা রস-পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বীরেশ্বর পাঁড়ে

বীরেশ্বর পাঁড়ে চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় একটু উৎকটরূপে প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল। সাহিত্য-সমালোচনাতেও তিনি হিন্দুর সামাজিক আদর্শের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ বাং সন হইতে সঙ্কলিত) তিনি বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীতে কতদূর হিন্দু আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, এই বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলক দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদের বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সূর্যমুখী ও ভ্রমর-চরিত্রের তুলনা করিয়া ভ্রমর যে অতিরিক্ত আত্মাভিমানের জন্য হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্যের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজের প্রতিকারহীন দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' প্রবন্ধে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর উপর তীব্র আক্রমণও তাঁহার মতবাদে নমনীয়তার অভাবের নিদর্শন-রূপে তাঁহার সহানুভূতির সঙ্কীর্ণতা সূচিত করে। অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিচারে সমালোচনায় অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দাবী প্রাসঙ্গিক নহে। তথাপি ইহাতে

প্রবন্ধকারের সংস্কারাচ্ছন্ন, একদেশদর্শী মনের পরিচয়ের ফলে তিনি যে প্রবন্ধকার-রূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ও **স্বামী বিবেকানন্দ** (১৮৬৩-.৯০২) যে গভীর অনুভূতি ও ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের ধ·ব্যাখ্যা ও প্রচারমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সন্দর্ভাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহারা এই গুণের জন্যই সাহিত্যিক প্রবন্ধের পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে।

কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

কেশবচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও ভগবৎ-স্বরূপ-উপলব্ধির একান্ত আবেগাপ্লুত কামনা ও স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত আহ্বান, সমাজসেবার জ্বলন্ত আগ্রহ, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি প্রাণ-গলানো ভালবাসা ও নিঃসংশয় দৃঢ় অধ্যাত্মবোধ তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবে উদাসীন, কিন্তু প্রাণোচ্ছল রচনাগুলিকে মর্মস্পর্শী আবেদনে মণ্ডিত করিয়াছে। প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অকৃত্রিম ভাবানুভূতি ও উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব হইতে সাহিত্য আত্মবিকাশের অনিবার্য প্রেরণা লাভ করে। যেমন সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে ছোট ঝরনা নিঃসৃত হইলেও তাহা ক্রমশঃ বিরাট নদীর আকার ধারণ করে, তেমনি সুমহান্ ব্যক্তিসত্তার ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তা ও অনুভূতি স্বতই সাহিত্যরূপে বিকশিত হয়। কেশব-চন্দ্রের ধর্মচিন্তায় সমকালীন যুগাবেদন ততটা নাই বলিয়া তিনি সাহিত্যিক অপেক্ষা ধর্মপ্রচারকরূপে অধিকতর বিখ্যাত। স্বামী বিবেকানন্দের যেমন ধর্মবোধ আছে, তেমনি যুগসমস্যাব আবেগময় অনুভূতি আছে বলিয়াই তাঁহার সন্ন্যাসী-সত্তা তাঁহার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করে নাই।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইল যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য সর্ববিধ বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন ও ভাবের আধার হইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র, কিন্তু স্বচ্ছ সরোবরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও ভাবকল্পনা আপন আপন জলধারার উপহার লইয়া আসে। সরোবর নিজ স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই ধারাসমূহের যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, ততটুকুর উপরেই উহার ন্যায্য অধিকার। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে প্রবন্ধ-সাহিত্যের অসীম বিস্তার ও অপার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

৫

সর্বশেষে প্রবন্ধসাহিত্যে দুইজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর বিচিত্র দানের কিছু পরিচয় দিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। তাঁহারা হইলেন **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** (১৮৬৪

—১৯১৯) ও **প্রমথ চৌধুরী** (১৮৬৮—১৯৪৬)। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবের মনে যে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, তাহার অবলম্বনেই তাঁহার প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিত-কথা', 'নানা কথা' প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধ-সংকলন-গ্রন্থে তাঁহার বিজ্ঞানতত্ত্ব-নির্ভর দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানবের চিন্তাজগতে যে বিরাট আলোড়ন তুলিতেছে, তাহার অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াইয়া ও পূর্বসংস্কারকে উন্মুলিত করিয়া তাহার মনে যে নূতন বিস্ময়বোধ জাগাইতেছে, জীবনের তাৎপর্য, চরম লক্ষ্য ও পরিচালনা-বিধি সম্বন্ধে যে নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছে, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় সেই নব দার্শনিকতার রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনে ধর্মনির্ভর দার্শনিকতার পরিবর্তে বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হইলে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও সামগ্রিক রূপের কিরূপ পরিবর্তন হয়, কোন্ নূতন জীবননীতি ও নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করে, নূতন ভাবকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হইবার ফলে ইহার কক্ষপথ কতটা নূতন বৃত্ত রচনা করে, এই সমস্ত নবাঙ্কুরিত, এখনও অনতিস্পষ্ট প্রশ্নজালই তাঁহার প্রবন্ধাবলীকে এক মননদীপ্ত ভাব-পরিমণ্ডলে বেষ্টন করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক হইয়াও ধর্মবিশ্বাসী ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন; বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও অন্যান্য জাতির ধর্মগ্রন্থেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সুতরাং নূতন জীবনদর্শন-প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মধ্যস্থতা করাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মনীষার সমন্বয়-কুশলতা ছাড়াও তাঁহার সরস ভঙ্গীই তাঁহার প্রবন্ধের প্রাণস্বরূপ ও ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রধান আকর। তিনি দুরূহ তত্ত্বসমূহ উপস্থাপনা করিয়াছেন অতিশয় চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে, নানা দৃষ্টান্ত-উদাহরণের সার্থক সমাবেশে, নানা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের চতুর ইঙ্গিতে, কল্পনা-স্ফুরণের নানা ফন্দি-ফিকিরে, রসসৃষ্টির সুপরিকল্পিত আয়োজনে। বিজ্ঞান ও দর্শনের গূঢ় ও জটিল জিজ্ঞাসা তাঁহার রচনায় বস্তুনিষ্ঠতার সুনির্দিষ্ট রূপাবয়ব লইয়া, পরিচিত জীবনের বর্ণাঢ্য রেখাচিত্রে বিধৃত হইয়া, আমাদের মনোলোকে এক পূর্ব-পরিচয়ের অনুকূল ভাবাসঙ্গ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তাঁহার রচনার প্রসাদগুণে, তাঁহার স্মিত কৌতুকের স্নিগ্ধচ্ছটায় আমাদের মনে

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা-ভঙ্গীর সরসতা

অপরিচয়ের বিভীষিকা কাটিয়া গিয়া নূতনের প্রতি আতিথেয়তাবোধ জাগিয়া উঠে; বিজ্ঞানের কত অপবিজ্ঞাত তথ্য, কত ধারণাতীত রহস্য, কত দুর্নিরীক্ষ্য ইঙ্গিত আমাদের মনের স্থায়ী ধারণা-সংস্কারের মধ্যেই আশ্রয় লাভ করে। তিনি আমাদের চিত্তকে বিজ্ঞানাভিমুখী করিয়াছেন, আমাদের চেতনা-সংস্কারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব।

তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা ছাড়া সাহিত্য-চর্চা ও জীবন-রসাস্বাদন-প্রয়াসও আছে। তাঁহার 'মহাকাব্য' প্রবন্ধটিতে এই অতিকায়, অধুনালুপ্ত, কাব্যরূপের যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ স্বরূপ-বিশ্লেষণ আছে, তাহা যে কোন প্রথম শ্রেণীর পেশাদার সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষেও গৌরবের বিষয় হইত। যে সামাজিক পরিবেশে, যে সহজ, কৃত্রিমতার আবরণহীন, হিংস্র-বলিষ্ঠ ভাব-পরিমণ্ডলে ইহার উদ্ভব, তাহার যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন, তাহা যেমন তথ্যের দিক দিয়া যথার্থ, তেমনি অন্তরের ভাবসত্যের দিক দিয়াও অনবদ্য। ইহাতে তাঁহার বস্তুজ্ঞান ও অন্তর-রহস্যভেদী কল্পনা সমানভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার 'চরিত-কথা'য় তিনি বিদ্যাসাগরের যে জীবনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে বহির্ঘটনার যথাযথ সন্নিবেশে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণশিখার দীপ্তরূপটি, তাঁহার বিশিষ্ট জীবনাদর্শটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যিনি তাঁহার মানসিকতার উদার, বিপুল প্রসারে দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন, তিনি যে মানুষের জীবনের ভিতর-বাহিরের অনুরূপ সমন্বয়সাধনে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে জীবনরস

গঠনশিল্পের দিক দিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের কতকগুলি প্রবন্ধ অতিরিক্তরকম দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত তাঁহার বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য এই কলেবর-স্ফীতি অপরিহার্য ছিল। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয়-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আঙ্গিক-সুমিতির আদর্শের পরিবর্তন হইতে বাধ্য। রামেন্দ্র-সুন্দর হয়ত সব সময় তাঁহার উপস্থাপনা-প্রয়োজনে এত অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, গঠন-সুষমার দিকে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার রচনায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে একটা নূতন রূপ ও ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জীবনের অনুভব ও শিল্পীর রূপসৃষ্টির উপর উহার অধিকার-সীমা যে আরও প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

স্থানবিশেষে গঠন-সুষমার অভাব

৬

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে যে তৃতীয় ব্যক্তি প্রবন্ধকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, উহাকে নূতন মেজাজ ও ভঙ্গীর বাহন করিয়াছেন, তিনি **প্রমথ চৌধুরী**। তিনি মাথাব চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রবন্ধকার। তাঁহার সমস্ত রচনা—উপন্যাস, ছোটগল্প, অর্থনীতি ও সমাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ, এমন কি কাব্য পর্যন্ত—প্রবন্ধধর্মী। তিনি প্রবন্ধের মধ্যে মজলিশী আলাপের সুর, খেয়াল-খেলার লীলায়িত ছন্দ, ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দ মননের লঘু-বিসর্পিত সঞ্চরণ প্রবর্তন কবিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রবন্ধে মাঝে মধ্যে হালকা চাল থাকিলেও তাঁহার আলোচনা গাম্ভীর্য-প্রধান ও গভীর সুরে অনুরণিত। হাসি-তামাসা ও রঙ্গ-রসের ছদ্মবেশের আড়ালে তাঁহার গভীর হৃদয়াবেগ, ঐকান্তিক আকুতি আবও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিকল্পনাও তাঁহাব আন্তবিক অনুভূতিব সহিত মিশিয়া তাঁহাব প্রবন্ধকে গীতিধর্মী ও আবেগঘন করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কোথাও কোথাও গীতিকবিতাব গদ্যরূপ, নিবিড় ভাবাবেগ ও কল্পসৌন্দর্যেব সমাবেশে, ভাষায় ও ভাবে একান্তভাবে কাব্যধর্মী, কোথাও বা অন্তর্মুখিতায় আত্মমগ্ন, কোথাও বা খরধার যুক্তিপ্রয়োগে শাণিত খড়্গের ন্যায় দীপ্ত। প্রমথ চৌধুবীর তীক্ষ্ণ যুক্তি, লঘু কল্পনা ও স্বচ্ছন্দচাবী খেয়াল—এই সমস্ত গুণই ছিল, কিন্তু ইহাদের সমাবেশে তিনি তাঁহার একান্ত নিজস্ব একটি ভাবমণ্ডল রচনা করিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতা হইতে মুক্ত। 'প্রবন্ধ' নামের মধ্যেই যে প্রকৃষ্ট বন্ধনের ইঙ্গিত আছে, তিনি তাহাকে অস্বীকাব করিয়াছেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে একান্ত নারাজ। তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনামাতে যে বিষয়-অনুসরণের প্রতিশ্রুতি আছে, তাহা তিনি পূরণ করেন অত্যন্ত পরোক্ষভাবে, নানা শাখাপথে যদৃচ্ছ বিচরণের পর, বিবিধ অবান্তর প্রসঙ্গ-উত্থাপনের মাধ্যমে। দীর্ঘ ভূমিকা, আত্মকথার অবতারণা ও অনেক শিথিল-সম্পর্কিত প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়া তবে তিনি নির্বাচিত বিষয়ের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ান ও ইহার মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত হন। শিকারী যেমন শিকার সম্বন্ধে অতি নিশ্চিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার পূর্বে পাশের ঝোপ-জঙ্গলে নিজ শরসন্ধান-শক্তির পরীক্ষা করে, প্রমথ চৌধুরী

গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য—যদৃচ্ছাচরণ

তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় লইয়া সেইরূপ কৌতুকচ্ছলে খেলা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ গঠনের দিক দিয়া ঢিলে-ঢালা, বিষয়ের শাসন-না-মানা, স্বচ্ছন্দ মানস বিচরণের আঁকা-বাঁকা-রেখা-চিহ্নিত, নির্দিষ্টরূপহীন মানচিত্র, খেয়ালী মনের খাপ-ছাড়া অঙ্গাবরণ।

প্রবন্ধের অন্তঃ-প্রকৃতিতে-ও বৈঠকী মেজাজ

ইহার বহিরবয়ব অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর আরও বিচিত্র ও অভাবনীয়। সাহিত্যের অন্তঃপুরে এ পর্যন্ত যাহার প্রবেশ নিষেধ ছিল, সেই বৈঠকী আলাপের ঢংকে তিনি সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছেন। বাঙালীর স্বভাব-সিদ্ধ ভাবপ্রবণতা ও প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাসকে তিনি শ্লেষ-ব্যঙ্গের কশাঘাতে, আপাত-অসম্ভব উক্তির বিস্ময়-চমকে বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছেন। ফরাসী দেশের সর্বপ্রকার মোহমুক্ত, মননোজ্জ্বল, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, রসিক মন-মেজাজ তিনি বাঙালী-সমাজে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। সে দেশে যেমন চা বা কফির টেবিলের সামনে বসিয়া, পান-পাত্রে চুমুক দিতে দিতে, অতি সহজ সরল সংলাপের ভঙ্গীতে, সমস্ত পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর-আস্ফালন বর্জন করিয়া জীবনের গূঢ়তত্ত্ব ও জটিল সমস্যার মর্মভেদ করা হয়, প্রমথ চৌধুরী বাঙালীর ভাবালুতায় স্যাঁতসেঁতে, নানা যুক্তিহীন সংস্কারে আচ্ছন্ন, কৃত্রিম আদর্শের প্রভাবে নিশ্চল মনোলোকে সেইরূপ স্বচ্ছ, সুস্থ জীবনবোধ, সদা-সক্রিয় গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বীরবল' নাম-গ্রহণের মধ্যেই তাঁহার ভাবাদর্শ ও জীবন-বিচার-পদ্ধতির ইঙ্গিত নিহিত। তিনি কমলাকান্তের ন্যায় ভাবুক দার্শনিক নহেন, তিনি বীরবলের ন্যায় রসিক মনের আলোকচ্ছটায়, তির্যক ভাষণের খোঁচায়, উদ্ভট-মতবাদ-প্রতিষ্ঠায় স্থাণু জীবনের অসুস্থ বিকার দূর করিয়া সেখানে যৌবন-স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলশ্রী আনিবার অভিলাষী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি জীবনকে নিছক হাসি-খুশি ও রসচর্চার ব্যাপার বলিয়া মনে করেন ও ইহার মধ্যে কোন গভীর উদ্দেশ্য ও উপলব্ধির সন্ধান তিনি পান নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ, ইহার উচ্চতর মূল্য, ইহার আবেগোচ্ছলতা ও মহান্ ভাব-কল্পনা সম্বন্ধে অনেকটা আস্থাহীন করিয়াছে এবং ইহার মাত্রাহীন অসঙ্গতি ও ব্যর্থ বৈরাগ্যের অভিনয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ও কৌতুক-রসসিক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই নেতিমূলক ও কৌতুকপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে তাঁহার যে একটি সু-মিত ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন আছে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। তিনি জীবনকে সুস্থ যৌবনশক্তির ক্রীড়াভূমিরূপে, বাস্তববোধ, মৌলিক চিন্তা ও

সর্বপ্রকার আতিশয্যমুক্ত ভোগ ও সৌন্দর্য-চেতনার অনুশীলন-ক্ষেত্ররূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। অতীত যুগের বাঙালী-মনের যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ, উহার বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ভক্তিবিহ্বলতা ও সৌন্দর্যস্রোতে আত্মনিমজ্জন তিনি অনুমোদন করেন নাই ও উহার পুনরাবৃত্তি তিনি অবাঞ্ছিত মনে করেন। কিন্তু যে বৈষয়িক উন্নতি ও সমাজ-বিধানের শোভন বিন্যাসের ফলে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনরস-আস্বাদন ও কলাসৌন্দর্যের সুস্থ, পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল, প্রাচীন যুগের সেই সুচতুর, ঐহিক-চেতনা-তৎপর, রূপচর্চায় দক্ষ নাগরিক জীবনের পুনরভ্যুদয় তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধের ভিতর দিয়া, তাঁহার সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কথা লইয়া মারপেঁচ-খেলা ও চমকপ্রদ অভিমত-প্রকাশের মাধ্যমে তিনি একটি বাস্তব জীবনসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে ও বাঙালীর মনে এক নূতন চেতনা ও জীবনৌৎসুক্য সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই দিক দিয়া তাঁহার রচনা শুধু সাহিত্যগুণসম্পন্ন নহে, এক অভিনব ভাব-প্রকাশ-রীতির প্রবর্তক নহে, পরন্তু এক চির-বিস্মৃত এবং ফরাসীদেশের দৃষ্টান্ত হইতে নূতন করিয়া শেখা জীবনদর্শনেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা-রূপে আমাদের ভাব-জীবনের চিবন্তন সম্পদ।

তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য হইতে তাঁহার মনন-কৌতূহলের বিরাট ব্যাপ্তি ও বিস্তাবেব ধারণা করা যায়। আর কোন প্রবন্ধকার জীবনের এত বিচিত্র দিক, এত বিবিধ প্রকারের প্রশ্ন লইয়া এমন সরস ও স্মরণীয়ভাবে নিজ মননের স্বচ্ছন্দ লীলা প্রকাশ করেন নাই। দেশী, পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য, যুগের সাহিত্যিক ও ধর্মসম্পর্কিত বিতর্ক, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, যৌবনধর্ম-প্রশস্তি, ঋতুরহস্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা এমন কোন বিষয় চিন্তা করা যায় না, যাহার সম্বন্ধে তাঁহার দীপ্ত মনীষা, মৌলিক চিন্তাধারা ও অননুকরণীয় প্রকাশ-চাতুর্য অপূর্ব শ্রী-সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার একটি নিজস্ব মতামত আছে, যাহা আমাদের প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করিয়া আমাদের নিকট সত্যের একটি নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করে। তাঁহার লঘু-তরল ব্যঙ্গের ও আপাত-লক্ষ্যহীন, খেয়ালী-যদৃচ্ছ বিচরণের আড়ালে তিনি জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন ও উপেক্ষিত, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ জীবনসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য

বুদ্ধিহীন ভাবালুতা, অন্ধসংস্কার, ঐহিক-জীবন-চর্যাহীন অধ্যাত্ম স্বপ্ন, বিদেশী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ, রূপান্ধতা ও সঙ্গতিবোধের

অভাব, বাস্তববোধশূন্য রাজনৈতিক মাতামাতি যে সুস্থ জীবনযাত্রার ভিত্তি রচনা করিতে পারে না, তাহা তিনি আমাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক যুগে কবি-ভাবুক-আদর্শ-বিলাসীর দিন ফুরাইয়াছে; তাহার পরিবর্তে মার্জিতরুচি-সম্পন্ন, আচার-ব্যবহারে শালীন, সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী, যৌবনধর্মী সাধারণ নাগরিকই জীবনের জয়পতাকা তুলিয়া ধরিবেন, ইহাই তাঁহার প্রত্যাশা। আমাদের সমাজ-চেতনায় হয়ত এই মনীষা ও রুচিবোধ এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই: প্রমথ চৌধুরী কোন ভাব-সন্ততিধারা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মতবাদের স্থায়িত্ব-বিধানে সমর্থ হন নাই; তাঁহার বিস্ময়চমকপূর্ণ ভাবস্ফুলিঙ্গগুলি কোন স্থির আলোকের সংহতি লাভ করে নাই। তথাপি তিনি বাঙালীর মনে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়াছেন, তাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তির নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমে চৌধুরী মহাশয় যে চিন্তানায়কের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা এই-জাতীয় সাহিত্যের উপর একটা অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ও ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও নববিকাশাভিমুখী করিয়াছে, ইহা সর্বথা স্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

(১৮৬১—১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের সমস্ত শ্রেণী-বিভাগকে অতিক্রম করিয়া সকলপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই আপন উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পলেখক, নাট্যকার, গীতিকার, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য-সমালোচক। প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার রচনা অসাধারণ শিল্প-গুণ-সমৃদ্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্যময়। কোন একজন লেখকের মধ্যে মনীষার এইরূপ প্রসার ও বৈচিত্র্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৃষ্টিশক্তির এই সর্বব্যাপী বিস্তার ও অতুলনীয় উৎকর্ষের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সহিত সমান মর্যাদার আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্য নানাদিকে পূর্ণবিকশিত হইয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিলেও, কবি ছিলেন না ও কাব্যের রূপান্তর-সাধনে তাঁহার কোন অংশ নাই। কোন সাহিত্যের মর্যাদা ও প্রকাশ-শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে উহার কাব্যোৎকর্ষের মানের উপর। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির, উহার ভাব-মহিমা, ছন্দোগৌরব ও কল্পনা-লীলার অপরূপ বিকাশের দ্বারা এই ভাষাকে সর্বাঙ্গীণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে ও নব নব চিন্তা-মনন-অনুভূতির সহিত প্রাণময় সংযোগে ইহাকে আধুনিক মনের সর্ববিধ প্রকাশ-ব্যাকুলতা মিটাইবার উপযোগী বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী দান

ক—কাব্য

(১)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন নানা ভাব-পরিণতির স্তর বাহিয়া ও ভাব-পরিবর্তনের অনুরূপ ছন্দরীতি, কল্পনার আবেশ ও প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করিয়া উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। এই পরিণতির পর্যায়ের ভিত্তিতে উহাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্বে ভাগ করা যায়।

রবীন্দ্রকাব্যের পর্ববিভাগ

প্রথম পর্বে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত-সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) এই কয়খানি কাব্যগ্রন্থকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই কবিতা-গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-কল্পনা যে ধীরে ধীরে উহার প্রাথমিক অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতার কুহেলিকা-জাল কাটাইয়া নিজ স্বরূপ-আবিষ্কার, দীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসব হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।) তরুণ কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি একটা সংশয়ময় আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া, উচ্ছ্বাস-বিড়ম্বিত প্রকাশ-জড়িমার জাল ছাড়াইতে ছাড়াইতে, বাষ্পাকুল দিগন্তরেখাব মধ্যে পথ সন্ধান করিতে কবিতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির দিকে চলিয়াছে। কবি যেন একটা বড়, গভীর-আবেগ-স্পৃষ্ট দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিতে আকুলি-বিকুলি করিতেছেন ; ভাব ও ভাষা উভয়ই যেন তাঁহার স্বীকরণ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এই হৃদয়-অরণ্যে পথ-খোঁজার মধ্যে তাঁহার মনের জাগরণের নিদর্শনগুলি একে একে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং এই মানস জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনায়ও স্বর ও বর্ণযোজনার বলিষ্ঠতা আসিয়াছে। একটা অনির্দেশ্য প্রেমানুভূতি, একটা আলো-আঁধারী রূপক-মায়া এই সময় কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। ('সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এ গোধূলি-বিষাদ, 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এ নবজাগরণের আনন্দ-কাকলী, 'ছবি ও গান'-এ গভীর অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক বং ও সুরের খেলা এবং 'কড়ি ও কোমল'-এ প্রধানতঃ রূপ-বিহ্বলতার মধ্য দিয়া সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবি-মানসের অগ্রগতির স্তরগুলিকে সূচিত করে।)

প্রথম পর্বের সংশয়ময় আত্মজিজ্ঞাসা

(দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্র-মানসের নিঃসন্দিগ্ধ স্বরূপবিকাশ। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬) ও 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যগুলির মধ্য দিয়া এই পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পদক্ষেপ। এগুলিতে বোঝা যায় যে কবির মনের আকাশে কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে ; হর্ষ-বিষাদ আর পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া, কল্পনা আর রূপ-বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া, শব্দযোজনা আর মুহুর্মুহু ভাবসূত্র-স্খলিত হইয়া কাব্যসম্ভাবনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে না। কবিমনের বিশৃঙ্খল উপাদান এক নিবিড় ভাব-সংহতিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। জীবন-জিজ্ঞাসা গভীরার্থক ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; কল্পনা-বিস্তার সুনির্দিষ্ট রূপসীমার মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছে ; আবেগ ছন্দোময় ভাষার অবলম্বনে ভাবের ঊর্ধ্বাকাশে

দ্বিতীয় পর্বে কবি-স্বরূপের বিকাশ

স্থির আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কবির রোমাণ্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, বিশ্বসত্তার সহিত মিলনাকূতি, জীবনদেবতার লীলাচেতনা, প্রেম-ভাবনার অতীন্দ্রিয়তায় উন্নয়ন—এই কাব্যস্তবকে স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'অহল্যার প্রতি', 'মেঘদূত', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'সিন্ধুতরঙ্গ' (মানসী) ; 'সমুদ্রের প্রতি', 'পুরস্কার', 'ঝুলন', 'বসুন্ধরা', 'মানস-সুন্দরী', 'হৃদয়-যমুনা', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'যেতে নাহি দিব' (সোনার তরী); 'অন্তর্যামী', 'জীবন-দেবতা', 'উর্বশী', 'প্রেমের অভিষেক' (চিত্রা) ; 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' (কল্পনা)—এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার জয়-যাত্রার পথে এক-একটি স্বর্ণতোরণ।)

(২)

তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম-ভাব-জগতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনদেবতা-কল্পনা ও বিশ্বানুভূতির মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপ-উপলব্ধির যে পরোক্ষ আভাস ছিল, নিজ ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিয়ন্ত্রী শক্তির পরিচয়-লাভে যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা দেখা গিয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কবিতার প্রেরণারূপে উপস্থিত হইল। 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪) তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাব-পরিক্রমার নিদর্শন। তিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন কোন সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট পূজানুষ্ঠান বা রূপধ্যানের মধ্য দিয়া নহে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে তাঁহার চকিত প্রকাশে, এক ক্রীড়াশীল অদৃশ্য সত্তার মুহুর্মুহু আবির্ভাব-অন্তর্ধান-লীলার লুকোচুরিতে, কখনও কখনও একান্ত ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। ইহাদের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' গানের সংকলন-গ্রন্থ। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় গীতিকবিতার লেখক-রূপে নয়, গীতরচয়িতা-রূপে। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাঁহার ভাবকে, যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনা-প্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও সুরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করেন; গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য ও বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ-প্রবাহের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। রবীন্দ্র-নাথের গানগুলি সহজ, সরল, অলঙ্কাররিক্ত কথায় তাঁহার অন্তরের ভক্তি ও ভগবৎ-

তৃতীয় পর্বে ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধি

প্রেমের আকৃতিকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। এই ভগবদ্‌ভক্তিমূলক গানগুলিতে কবির মনে উপনিষদের চেতনা ও আধুনিক মনের প্রকৃতিপ্রীতির ও ভাববৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি'তেই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মবাদ ও ঈশ্বরোপলব্ধির নিবিড়তার প্রথম পরিচয় পায় ও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁহার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নিদর্শন।)

(এই কালপর্বের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও সমকালীন আর দুইখানি কাব্যগ্রন্থ —'কথা ও কাহিনী' (১৯০০) ও 'ক্ষণিকা' (১৯০০) রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিচিত্র লীলার পরিচয় দান করে। 'কথা ও কাহিনী'তে কবির প্রেমাতুর কল্পনা, বরণীয় বিষয়-গৌরব, দেশের ঐতিহ্য-কীর্তির উদাত্ত প্রশস্তি ও দৃঢ় ও দ্রুতগামী আখ্যানবস্তুর সংযোগে এক নূতন ওজস্বিতা, পৌরুষদৃপ্ত রসাবেদন লাভ করিয়াছে। কবির গীতিপ্রাণতা এখানে সংঘর্ষময় আখ্যায়িকার বস্তুরস ও গতিবেগের সহিত যুক্ত হইয়া উহার অভ্যস্ত স্বপ্নবিভোরতার পরিবর্তে এক সতেজ প্রাণোচ্ছলতায় স্পন্দিত হইয়াছে। 'ক্ষণিকা'তে কবি জীবনবোধের এক লঘু-চপল, পরিহাস-স্নিগ্ধ রূপ আঁকিয়াছেন—ভাবমুগ্ধ আদর্শবাদের উল্টা দিকে যে কৌতুকরস বাস্তব সত্যস্বীকৃতির আধারে সঞ্চিত থাকে, তাহারই ছোট ছোট তরঙ্গলীলায় দোলা খাইয়াছেন। তাঁহার কাব্য অতি সহজভাবে এই পরিবর্তিত মনোভঙ্গীর ছন্দটি অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছে।)

'কথা ও কাহিনী' এবং 'ক্ষণিকা'র সুর

(চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রকাব্য আবার দিক্-পরিবর্তন করিয়াছে। 'বলাকা'(১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া' (১৯২৯) এই তিনখানি কাব্য কবির নূতন জীবন-দর্শনের পরিচয় বহন করে। এই কাব্যগুলিতে কবির প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস, তাঁহার প্রেমানুভূতির ভাবস্বপ্নবিহার ও উচ্চকণ্ঠ আবেগ-মূর্ছনা অনেকটা শান্ত, স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত মিশিয়াছে পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা, মননশীল জীবন-বীক্ষণ ও পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের গভীরতর তাৎপর্যবোধ। 'বলাকা'-তে কবি প্রথম মহাযুদ্ধের ভাবালোড়ন, উহার জীবন-সমীক্ষার নূতন প্রেরণা, এই ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ পরিবেশে মানব-মনের দুরূহতর প্রয়াস ও আদর্শনিষ্ঠার কথা গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন ও তাঁহার ছন্দরীতির পরিবর্তনে এই ভাবান্তর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'বলাকা'র অনিয়মিত, অসম ছন্দ-বিন্যাসে, ঝড়-খাওয়া মনের বিসর্পিত আন্দোলন, উহার চিন্তাধারায় তট হইতে তটান্তরে প্রহৃত ভাব-তরঙ্গের অস্থির

চতুর্থ পর্বের বলাকা, পূরবী ও মহুয়া

গতি ও দূরব্যাপী বিস্তার, উহার সমাধান-অন্বেষণ ও আত্মানুসন্ধানের সংশয়াকুল পদক্ষেপ যেন আপন প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়াছে। 'পূরবী'তে যৌবনস্মৃতি-পর্যালোচনার সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের করুণ সুর ও পরিণত জীবনদর্শনের শান্ত, সমন্বয়কারী বিচারবুদ্ধি মিলিত হইয়া জীবনের এক গভীরতর অর্থ দ্যোতিত হইয়াছে। যৌবনের আবেগ-উষ্ণতা ও সৌন্দর্যবোধ প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞাঘন অনুভূতিতে নিমজ্জিত হইয়া এক অপরূপ রসনিবিড়তা ও ভাববিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'মহুয়া'তে কবির বার্ধক্যে দ্বিতীয় যৌবনের রক্তিম স্ফুরণ ঘটিয়াছে। এ যৌবন বসন্তের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিবিধানে ইহার নিগূঢ় অভিপ্রায়, ইহার মধ্যে প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার বেগ, ইহার নেপথ্যলীলার গোপন ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করে। ইহার প্রেম প্রকৃতির প্রাণরহস্যে অভাবনীয়, ইহার বর্ণানুরঞ্জনে চিত্র-বিচিত্র, এক দুর্জয় আত্মিক সংকল্পে মোহমুক্ত ও উর্ধ্বচারী। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদের অনুরূপ এখানেও এক বিরলতর বয়ঃসন্ধির বর্ণনা। এখানে কৈশোর-যৌবনের মিলনের পরিবর্তে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মিলন দেখি। হররোষদগ্ধ মদনের মত এখানে যৌবনের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহার স্থূল মোহাবেশের পরিবর্তে ফুটিয়াছে অনন্ত গতি-প্রেরণা, আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বিশ্বচেতনার উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়ানুগত রূপপিপাসার পরিবর্তে তৃতীয় নয়নের প্রখর অধ্যাত্মদীপ্তি। এই তপঃপূত, অধ্যাত্মমন্ত্রদীক্ষিত, বিশ্বের চিরনবীন, বারে বারে প্রত্যাবৃত্ত প্রাণধারার উৎসের সহিত নিগূঢ়ঐক্যবিধৃত যৌবনলীলাই 'মহুয়া'র প্রধান মৌলিক প্রেরণা ও ইহার অপরূপ, ভাবানুসারী প্রকাশেই ইহার মহত্ত্ব।

(৩)

পঞ্চম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আবার নূতন দুঃসাহসিক পরীক্ষা লইয়া কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে আবার বিপর্যস্ত করিলেন। এই পর্বে পর্বে নববিকাশই রবীন্দ্রকাব্যের মূল বিস্ময়। শাজাহান সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ", তাহা তাঁহার নিজের কবি-জীবন সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি সর্বদা নিজ অতীত কীর্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমুৎসুক। করায়ত্ত সিদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া দুরূহতর অপরীক্ষিত সাধনার দিকেই তাঁহার অভিযান। যিনি ছন্দের রাজা ও কাব্যসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গীতিরসে যাঁহার কবিতার পাত্র কানায় কানায় উচ্ছ্বসিত, তিনি হঠাৎ ছন্দোহীন ও গদ্যছন্দে লেখা, রূপপ্রসাধনবর্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যরিক্ত কবিতা-

পঞ্চম পর্বে গদ্য-ছন্দের সৃষ্টি

রচনায় মন দিলেন।) প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকেরা যেমন কাব্যের প্রাণশক্তির উৎস-সন্ধানে সমস্ত বহিরঙ্গমূলক অলঙ্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ধ্বনিতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি কাব্যের মূল উপাদান-আবিষ্কারে ছন্দ-শব্দ-কল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য পরিহার করিয়া সর্বাভরণরিক্ত বিশুদ্ধ অনুভূতিকেই উহার প্রাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কবি তাঁহার এই পর্বের কাব্যগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, কবিতার সৌন্দর্যবর্ধন কোন উপায়-প্রয়োগ-ব্যতিরেকেই, সংগীতঝঙ্কারে কানের ও কল্পনা-সৌন্দর্যে মনের কোন মোহাবেশ সৃষ্টি না করিয়াই, শুধু অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায়ই কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করা যায় কি না। অর্থাৎ কবিতার আবেদনের মধ্যে উহার শিল্পরূপের ও ভাবরূপের পারস্পরিক গুরুত্ব কতখানি, তাহা নির্ণয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কোন একটি বিষয়ের প্রথম কাব্যানুভূতি ও ইহার পরিণত, সুষ্ঠু-আঙ্গিকবিন্যস্ত রূপশিল্পের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি না, ও থাকিলে কি বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা তাহা পূর্ণ করা যায়, কবিকৃতির এই নিগূঢ়রহস্যোদ্‌ভেদ-প্রয়াসই এই সমস্ত কবিতায় করা হইয়াছে।

অনেক সংবেদনশীল পাঠকের মনেই একটা কাব্যরসপ্রবণতা আছে; এই প্রবণতাই কবির শিল্পগুণান্বিত উদ্বর্তিত (Sublimated) রসপরিবেশনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। যেখানে এই পূর্ণ রসপরিণতি ও শিল্পায়ন ঘটে নাই, যেখানে কবি তাঁহার অর্ধপরিণত, মানস রসের ভিয়ানে আধ-পাক-করা ভাব-ভাবনাগুলি উপস্থাপিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, সেখানে আমরা পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকি। শ্রেষ্ঠ কাব্য শুধু অনুভূতি-সর্বস্ব নহে, অনুভূতির সু-সংস্কৃত, রস-সারগঠিত, সার্বভৌম আবেদনে প্রতিষ্ঠিত সত্তাশ্রয়ী। অবশ্য এমন হইতে পারে যে, কোন বিরল মুহূর্তে প্রথম অনুভূতি ও পরিণত রসরূপ যুগপৎ আবির্ভূত হয়, বা কোন অনুভূতির অসংস্কৃত বিকাশই কবিমানসের একটা বিশেষ ক্ষণ বা মেজাজের নিখুঁত অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায়।('ক্ষণিকা' ও 'কণিকা'র কবিতাগুলি এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে; কোন ঊর্ধ্বচারী কল্পনা বা সূক্ষ্ম কারুকার্যের আরোপ উহাদের প্রকৃতিবিরোধী হইত। এই পর্বের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কোন দার্শনিক তত্ত্ব, জীবন-বীক্ষণের কোন বিশেষ রকমের মৌলিকতা কাব্যসৌন্দর্যের মুখাপেক্ষী না হইয়াই নিজ ভাবগরিমার বলেই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে—উহাদের মধ্যে কাব্যকলার বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও উহাদের বিষয়-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তা সেই

পঞ্চম পর্বের গদ্য-কবিতার মূলসুর

অভাব পূরণ করিয়াছে। মোটামুটি, তাঁহার এই পরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থগুলি—'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৭)—সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যাইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে ছন্দোহীন কাব্যের সীমা কিছুটা প্রসারিত হইলেও, কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা কাব্যকলা-নিরপেক্ষ হইয়া কাব্যরসের আস্বাদন দিলেও, কোন নূতন, ব্যাপকভাবে অনুসরণ-যোগ্য কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নিরাভরণা, সহজ-সুন্দরী কাব্যানুভূতি বিরলক্ষেত্রে সম্ভব হইলেও উহাকে এই বেশে রসিক-রুচির স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত করা যায় না। অতি-প্রসাধিতা ও অ-প্রসাধিতা—উভয়প্রকার কবিতাই আমাদের মনোহরণে অক্ষম। তবে উৎকৃষ্ট কাব্যেও অলংকরণের পরিমাণ যে কমানো যায় ও ইহাকে প্রধানত ভাবসৌন্দর্যের উপর যে নির্ভরশীল করা সম্ভব, এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের রচনার মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে এরূপ দাবী করা যায়।

ষষ্ঠ বা শেষ পর্বের কাব্যধারায়—'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'সেঁজুতি' 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪১), 'আরোগ্য' (১৯৪১) ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১)—রবীন্দ্রকাব্য-মহিমার শেষ পরিচয়টি অস্তরশ্মির স্বর্ণকিরীটমণ্ডিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই কাব্যগুলির মধ্যে 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক' ও 'সানাই'-এ কবি-কল্পনার শিথিল, এলায়িত ভঙ্গী, ছোট ছোট ঘটনা ও অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের অন্তর্নিহিত রসবিন্দুটিকে ফুটাইয়া তোলার প্রবণতা ও গদ্যছন্দের স্মৃতিবাহী সহজ সরল ছন্দ-প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের অধিকাংশ কবিতাতেই কবি যেন গোড়া হইতে কাব্যমনোভাব লইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন নাই এই ধারণাই জন্মে। তিনি প্রথমে বস্তু-স্তূপ-জর্জরিত, স্থূল প্রতিবেশ-রচনায় মনোযোগী হইয়াছেন; তাহার পর অকস্মাৎ তাঁহার কাব্যানুভূতি এই বিপরীত প্রতিবেশে জাগিয়া উঠিয়া ইহার মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য-সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে। 'সানাই' কবিতাটিতে বিবাহবাড়ির ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি ও উপকরণ-বাহুল্য যেন সানাই-এর সুরে এক অমর্ত্য ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মাটির পাত্র যেন অমৃতরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 'নবজাতক'-এর 'এপারে-ওপারে' কবিতায় কবির শুষ্ক, আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদ ও তাঁহার প্রতিবেশীদের ছন্দোহীন, তুচ্ছ প্রয়োজনের চাপে বিকৃত জীবনযাত্রার মধ্যে যে ফাঁক তাহাই পূর্ণ করিয়া অকস্মাৎ প্রাণলীলার সর্বকলুষহর আনন্দনির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকগুলি

কবিতায় অস্পষ্ট অনুভূতি, ক্ষণিক ভাব, লঘু-রঙীন কল্পনাবিলাস, গানের হঠাৎ উচ্ছ্বসিত সুর, সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ সঞ্চয় হইতে হেলায় আহৃত উদ্বৃত্ত রসবিন্দু অনায়াস নৈপুণ্যের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন কবিতায় আগামী কালের বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত জীবনে কাব্যানুভূতিব কিরূপ স্ফুরণ সম্ভব, তাহা দেখানো হইয়াছে। এই কাব্যগুলির সামগ্রিক আলোচনা হইতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, আসন্ন মৃত্যুব সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কবি-চেতনা কিরূপ নূতন উপলব্ধির মধ্যে কল্পনা-লীলাব সহজ, অযত্নসিদ্ধ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মবণের উপকূলে দাঁড়াইয়াও কবি নূতন চিন্তা ও অনুভূতিকে আত্মসাৎ ও নূতন ছন্দে উহাদিগকে রূপায়িত কবিযাছেন।

ষষ্ঠ পর্বের কয়েকটি কবিতার মধ্যে লঘু কল্পনা-লীলা

'প্রান্তিক', 'বোগশয্যায়', 'আরোগ্য', ও 'জন্মদিনে' কবিপ্রতিভাব স্বর্ণ-প্রদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে এক নূতন, ঊর্ধ্বারোহী শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রোগজীর্ণ কবি তাঁহাব বোগযন্ত্রণাব মধ্য দিয়া জীবনকে এক দুঃখময়, বিকার-আবিল দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, জীবনেব মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট-চেতনা-কল্পিত ব্যর্থ সৃষ্টিপ্রয়াসেব প্রতিরূপ বিকলাঙ্গ বস্তুপিণ্ড প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন, রোগকক্ষেব জীবনবেগহীন, একদিকে উদ্বিগ্ন শুশ্রূষা অপর দিকে অলস কল্পনার সমবায়ে রচিত, বদ্ধ আবহাওয়া অনুভব কবিয়াছেন ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত অভিভব-উৎপীড়নেব উপর আত্মমহিমায় স্থিব মানবাত্মাব জয় ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যাধি-বিকারের এরূপ সূক্ষ্ম ও সত্য কাব্যরূপায়ণ, উহার বিভীষিকা, অসংলগ্ন চিন্তা, অসুস্থ মনের উদ্ভট, দুঃস্বপ্ন-ক্লিষ্ট অনুভূতির এরূপ আবেগময় ও শিল্প-সুমিত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী॥ ইহার সঙ্গে সঙ্গে বোগমুক্তিব স্বস্তি ও আনন্দোচ্ছ্বাস, জীবনের অতি-পরিচিত বিষয়ের মধ্যেও অপরূপত্বেব আবিষ্কার, সদ্যোনিরাময় কল্পনার ক্লান্ত-করুণ, স্বল্প-পরিসরে নিঃশেষিত. বিকাশ-প্রেরণা, দুর্বল মননের বাধা সত্ত্বেও কাব্যানুভূতির অল্প কয়েক পা হাঁটিবাব প্রয়াস কয়েকটি কবিতায় চমৎকার-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রোগ ও আবোগ্য উভয় অবস্থারই এরূপ স্পষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক ছাপ কাব্যসাহিত্যে আর কোথায়ও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ।

ষষ্ঠ পর্বের প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে মানবাত্মার জয়-ঘোষণা

কিন্তু এই পর্যায়ের কবিতাব বিশিষ্ট গৌরব ইহার জীবনমৃত্যুরহস্যের স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় অনুভূতি ও প্রকাশে, ইহার অধ্যাত্মবোধের স্থির দীপ্তিতে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আসন্ন বিদায়ের ছায়া দেহ-মনে অনুভব করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ

সম্বন্ধে এত দৃঢ় প্রত্যয়, এরূপ প্রত্যক্ষবৎ সুস্পষ্ট, সংশয়লেশহীন উপলব্ধি হয়ত আর কোন কবিরই নাই। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-পুষ্ট মন নিজের ক্ষেত্রেও সেই ঔপনিষদিক তত্ত্ব-প্রতীতিকে প্রয়োগ করিয়াছে ও উহাকে কবিচিত্তের গভীর রসবোধ ও অসীমের সহজ অনুভূতির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঋষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতন্ময়তাকে এক সঙ্গে মিলাইয়াছে। অধ্যাত্মসত্য কবির ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ রসপরিণতি ও অর্থনিগূঢ়তা লাভ করিয়াছে; কবি যেন এখানে উপনিষদের এক নূতন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যসমূহে এক প্রশান্ত, নিরাসক্ত মন লইয়া সমস্ত মোহবন্ধন ও মায়াবিভ্রম ছিন্ন করিয়া, তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ, এমন কি অহংবোধকে বিসর্জন দিয়া অস্তিত্বের পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; সমস্ত পরিচয়- ও বিশিষ্ট-চিহ্নবর্জিত এক চেতনাবিন্দুরূপে জ্যোতিঃসমুদ্রের মহাসঙ্গমতীর্থে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহনীয় ভাবচেতনার সঙ্গে কবি-কল্পনার উদাত্ত গাম্ভীর্য, নিবিড় সংহতি ও বিষয়গৌরব-শাসিত বাক্-সংযম মিশিয়া এই কবিতাগুলিকে কেবল কাব্যকৃতির ঊর্ধ্বে এক-একটি নিগূঢ় ধ্যানমন্ত্রের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবজীবনের সমগ্র বিচিত্র কর্মজাল ও বহুবিস্তৃত প্রয়াস যেমন মৃত্যুর আকর্ষণে একটিমাত্র পরিণামমুখী প্রবাহে সংহত হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমস্ত লীলাবৈচিত্র্য, তাঁহার কল্পনার নানাবর্ণরঞ্জিত উচ্ছ্বাস ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিচিত্রায়িত বিস্তার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হইয়া পরম-রহস্যাভিমুখী একটিমাত্র অনুভূতি-ধারার অচঞ্চলতায় আসিয়া মিশিয়াছে। বিচিত্ররূপিণীর অনুসরণে দূরাভিযানে বহির্গত, চিরপথিক কবি-আত্মা বৈচিত্র্যের অন্তরশায়ী একের সহিত একাত্মমিলনে নিজ চিরচঞ্চল গতিবেগে মহাবিরতির সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। মহাকবির কাব্যসাধনার ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর ও সার্থকতর পরিসমাপ্তি কল্পনাও করা যায় না।

এই পর্যায়ের বিশিষ্ট সুর অধ্যাত্মবোধের রস-পরিণতি

(৪)

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'জন্মদিনে' পর্যন্ত কবিমানসের জয়যাত্রার কি অপূর্ব ইতিহাস! বিষয়ের নানামুখীনতায়, রচনার বিষয়োপযোগী পরিবর্তনে, কাব্যের আঙ্গিকের বিচিত্র-রূপে, কল্পনা ও মনোভঙ্গীর নব নব প্রকাশে, মননসূত্রের দৃঢ়তায়, ভাব ও রূপের নিবিড় একাত্মতায় রবীন্দ্রকাব্য বিপুল, বিরাট, বিস্ময়কর ও বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। গীতিকবিতা, গান, আখ্যান-কাব্য, জীবন-ব্যাখ্যান ও অধ্যাত্ম-

অনুভূতি-মূলক কাব্য, নাট্যরস-প্রধান কাব্য, লঘু কল্পনা ও হাস্যরসিকতা-আশ্রয়ী কাব্য—ইত্যাদি কবিতার প্রায় সবরকম প্রকরণেই তিনি সমান কুশলী।) বিষয়ের দিক দিয়া প্রেম, প্রকৃতি, পৌরাণিক আখ্যান, অতীত কিংবদন্তী ও ইতিহাস, আধুনিক যুগের চিন্তা-মনন, ভগবৎ-উপলব্ধির সাধনা—এই সমস্তই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য। তাঁহার প্রেম-কবিতার ভাব ও সুর রূপবিহ্বলতার স্তর হইতে মনস্তাত্ত্বিক নানা বৈচিত্র্যের পর্যায় অতিক্রম করিয়া, ভোগ, অতৃপ্তি, বিরহাকুলতা, মানসজিজ্ঞাসার বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত চরম আধ্যাত্মিক পরিণতি, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্বর্তনে পৌঁছিয়াছে। তাঁহার ঋতুপর্যায়ের কবিতা শুধু প্রকৃতির রূপান্তরের চিত্রই আঁকে নাই, উহার অন্তর্নিহিত ভাবসাধনাটি ক্রমপর্যায়ে উদ্‌ঘাটিত করিয়া উহাকে নিখিলের নিয়মছন্দের সহিত গ্রথিত করিয়াছে;) নটরাজের নৃত্যলীলার ছন্দে ছন্দে প্রকৃতির এক-একটি রূপ ও অন্তরের আবেগ যেন এক নিগূঢ় অভিপ্রায়-সাধনের অঙ্গরূপে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যের বিচিত্র অভিমুখিতা

পুরাণের বিশেষ আখ্যানকে তিনি নির্বিশেষ ভাব-সত্য ও সার্বভৌম রূপ-ব্যঞ্জনার বাহনরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উর্বশী স্বর্গনারী হইতে মানবের অপরিতৃপ্ত রূপমোহ, অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তাকে ব্যক্তি-কামনার মদির আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিবার ব্যর্থ-করুণ প্রয়াসের বিভ্রমময় বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার মদনভস্ম ও রতিবিলাপ দেহাতীত ভাবের ন্যায় সমস্ত জীবন-প্রতিবেশে পরিব্যাপ্ত ও এক অনির্দেশ্য, অন্তর্গূঢ় রোদনগুঞ্জনরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা মহাভারতের বিশেষ নারী হইতে রূপ-ছলনা হইতে মুক্তিকামী ও নিজ প্রকৃতিস্বরূপের উপর দৃঢ়নির্ভরশীল এক মানবাত্মায় নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। অহল্যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাপ ও পাপমুক্তির উদাহরণ নহে, পাষাণরূপে সে যে নিখিলের প্রাণলীলাপ্রবাহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, তাহারই স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত ও তাহার মানবজীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চেতনাহীন। জীবন যদি জড়ে ফিরিয়া যায়, তবে তাহার অনুভূতির কয়েকটা গবাক্ষ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বচেতনার সিংহদ্বার যে তাহার নিকট অবারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকেই অপূর্ব কাব্যরূপ দিয়াছেন। মেঘদূত রবীন্দ্রকাব্যে শুধু স্বাধিকারপ্রমত্ত ও অভিশাপ-বারিত যক্ষের বিরহ-বেদনা নহে,

পুরাণ-কল্পনার নবীকরণ

ইহা আদর্শ ও বাস্তবের ব্যবধান-পীড়িত প্রত্যেক মানুষের এক সর্বজনীন ক্ষুব্ধ অনুভূতি। পুরাণ-কল্পনার এই রূপান্তর ও নবীকরণ রবীন্দ্র-কাব্যের এক অনন্যসাধারণ গৌরব।

রবীন্দ্রকাব্যে বহিরঙ্গ-সৌন্দর্য

(ফর্ম বা রূপেব দিক দিয়া ও প্রকাশভঙ্গীর বিষয়ানুরূপ বিশিষ্টতার মানদণ্ডেও রবীন্দ্রকাব্যেব বৈচিত্র্য বিস্ময়কব। গান, গীতিকবিতা, Ode বা ভাবসমুন্নতিময়, জটিলছন্দগ্রথিত, উদাত্তভঙ্গীব গীতোচ্ছ্বাস, গাথা-কবিতাব অলঙ্কার-ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দগতি, মনন ও তত্ত্বপ্রধান কবিতার নিরুচ্ছ্বাস, মুক্তছান্দিক বিসর্পিত চিন্তাপ্রবাহ, চতুর্দশপদী কবিতার গাঢ়বদ্ধ ভাব-পবিমিতি, গদ্যছন্দেব অবাধ বিস্তাবেব মধ্যে অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ, রোমাণ্টিক রীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিব অন্তবচারী কল্পনালীলা ও ক্ল্যাসিক্যাল বীতিব ভাবগাম্ভীর্যময, অর্থগৌরবসন্ধানী মিতভাষিতা—এই সমস্ত রকমেব রূপকলা ও প্রকাশ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ রবীন্দ্র-কবিতায় উদাহৃত হইয়াছে। তাঁহাব কিছু কিছু কবিতা হয়ত অতি-মুখরতায় ভারাক্রান্ত; হয়ত কোথাও কোথাও আবেগের আতিশয্য অতি-পল্লবিত বিস্তাবেব হেতু হইয়াছে। হয়ত ভবিষ্যৎ যুগে বাঙালীব জীবনছন্দ এমন মৃদুমন্দ গতিতে, এমন দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে, বিবোধী ভাব-ভাবনার চক্রঘূর্ণনে পাক খাইয়া অগ্রসর হইবে যে, ইহা রবীন্দ্রকাব্যের অবিরাম গতিশীলতা ও গভীরপ্রত্যয়সঞ্জাত ভাবপ্রেবণার সঙ্গে তাল মিলাইতে পাবিবে না। সেইজন্যই মনে হয, তাঁহাব অব্যবহিত পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শেব প্রভাব অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহার কাব্যেব বহিরঙ্গ-মূলক সৌন্দর্যেব প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব—তাঁহাব কবিচেতনার মূলে আমাদেব প্রবেশাধিকার থাকিবে না। তথাপি যেমন বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অনুসরণ না কবিয়াও আমবা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেব চিরন্তন সৌন্দর্য আস্বাদন করি, তেমনি রবীন্দ্রভাববিমুখ ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরাও তাঁহার কাব্যে একটা অফুরন্ত রসাবেদন পাইবে। মানুষেব ভবিষ্যৎ যদি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির পথ ধরিয়াই অগ্রসর হয়, তাঁহার কল্পনা ও আদর্শই যদি অনাগত যুগে মানবের বাস্তবজীবন-চর্চার রূপ পরিগ্রহ করে, তবে মহাকালের দীর্ঘদিন-বিলম্বিত রায়ে তিনি যে সর্বমানবের অন্তরতম অভীপ্সার মহাকবিরূপে স্বীকৃতিলাভ করিবেন, এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী নিতান্ত অবিবেচনা-প্রসূত হইবে না।)

খ—ছোটগল্প ও উপন্যাস

(৫)

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের প্রথম স্রষ্টা ও উপন্যাসের দিক্‌পরিবর্তনের প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও উপন্যাসে প্রায় এক সঙ্গেই হাত দেন—কাব্যে স্বকীয় প্রেরণায় ও উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে। তাঁহার 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৫) 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) ও 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) ও 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সমকালীন এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। পদ্যগীতিতে ও গদ্য-আখ্যানে একই রকমের অস্ফুট কল্পনাপ্রবণতা ও ভাববিলাস, বাস্তব জীবনের প্রতি একইরূপ ঝাপসা স্বপ্নকুহেলিকা-মাখা দৃষ্টি. ; ...নানুভূতিতে সেই একই আত্মমগ্ন অস্পষ্টতা। কবির সাহিত্যজীবনের সেই প্র... ...য়ে কবি এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্‌টিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিবেন, তাহা যেন স্থির করিতে না পারিয়া দোলায়মান চিত্তে উহাদের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তথাপি মনে হয় যে, উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁহার মনের অপেক্ষাকৃত পরিণত প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তরুণ কবি বাস্তব জীবনের সংস্পর্শহীন, অনির্দেশ্য আকৃতি-আবর্তের মধ্যেই পাক খাইতে থাকেন; তরুণ ঔপন্যাসিককে নিজ অন্তরের ভাবাবিষ্টতাকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের পথ খুঁজিয়া লইতে হয় ও জীবনের খানিকটা সত্য পরিচয়ের প্রমাণ দিতে হয়। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, বসন্ত রায়, গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি, জয়সিংহ, অপর্ণা প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টি ও উহাদের মধ্যে হৃদয়-সংঘাত, মূলত কবিকল্পনাপ্রসূত হইলেও, বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার কিছুটা পরিচয় বহন করে। এই চরিত্রগুলি যেন প্রত্যেকে এক-একটি মানস প্রবণতার মূর্ত প্রকাশ; বাস্তব জীবনে যে পরস্পর-বিরোধী জটিলভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে সে জটিলতার একান্ত অভাব। লেখক অবশ্য ইহাদিগের মধ্যে অনেককে ইতিহাস হইতে ও বাকিগুলিকে কল্পনার মায়ালোক হইতে আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু কবিকল্পনার একমুখীনতা, একটি বিদেহী ভাবকে রূপ দিবার উদ্দেশ্যে উহার জন্য রক্ত-মাংসের রূপক-রচনা এই চরিত্রসমূহের প্রাণস্পন্দনের মূল উৎস। প্রতাপাদিত্য জীবনের অহেতুক, যান্ত্রিক ক্রূরতা; বসন্ত রায় উহার বিপদতুষার-

বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষির চরিত্রসমূহ বিশুদ্ধ ভাব-কল্পনাজাত

পাতে জমাট-বাঁধা আনন্দ-নির্ঝর; গোবিন্দমাণিক্য উহার বাস্তব সংগ্রামবিমুখ অন্তরলোকে স্থির, আদর্শবাদ; রঘুপতি ব্রাহ্মণ্যসংস্কারান্ধ আচারনিষ্ঠা। জয়সিংহই একমাত্র ব্যক্তি, যে জীবনের উভয়দিক সম্বন্ধে সচেতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। সুতরাং এই নর-নারীগুলি সব বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের (Idea) অধিবাসী; ইতিহাস ইহাদের পাদপীঠ ও জীবন ইহাদেব নেপথ্যগৃহ। আসলে ইহারা ইতিহাসের সিঁড়ি বাহিয়া ভাবলোকের গুহা হইতে জীবনের আলোকে প্রকাশিত হইয়াছে, ও রহস্যের আঁধারের সহিত আলোক-চূর্ণের কল্পিত রশ্মি মাখিয়া জীবনের সহিত সাধর্ম্যের অভিনয় কবিয়াছে।

'রাজর্ষি'-র (১৮৮৫) পরে প্রায় দীর্ঘ সতর বৎসরকাল রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-বচনা হইতে বিরত ছিলেন। 'চোখের বালি' (১৯০২) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) তাঁহার পরবর্তী উপন্যাস। এই অন্তর্বর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ কাব্যপবিণতিব পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসব হইতেছিলেন ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহাব অনুভূতি ভাবেব প্রগাঢ়তা ও রূপের সুনির্দিষ্টতা লাভ করিতেছিল। এই সময়, ১৮৯১ খ্রীঃ অঃ, হইতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের একটি শাখা ছোটগল্পে হাত দেন ও প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ইহাব অনুশীলন করিয়া ইহাকে অপরূপ সৌন্দর্য-সুষমায় ও অনবদ্য শিল্পরূপে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। এই নূতন অভিজ্ঞতা ও জীবনের বিচিত্র রূপ-রসের সহিত পবিচয়ের ফলে তিনি যখন উপন্যাসক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার জীবনসমস্যাবিচারের শক্তি পরিপক্ক পরিণতির স্তরে পৌঁছিয়াছে।

জীবন-সমস্যামূলক উপন্যাস

'চোখের বালি' এক সম্পূর্ণ বাস্তব সংঘাতের চিত্র; ইহার মধ্যে যে কাব্যানুভূতি আছে, তাহা কোনরূপ অস্পষ্টতাব কুজ্ঝটিকা রচনা না করিয়া চবিত্র-পরিকল্পনাকে স্বচ্ছতর ও প্রাণরহস্যদ্যোতক করিয়াছে। এই কাহিনীর নরনারী-গুলি শুধু একটিমাত্র ভাবের বাহন নহে; তাহাদের অন্তর্লোক নানা জটিল আত্মবিরোধে নিজেদের কাছেও দুর্বোধ্য। বিনোদিনীর মন যে স্তরে মহেন্দ্রকে জয় করিতে চাহে, তাহারও গভীরতর স্তরে বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট ও সর্বনিম্ন স্তরে সে কাহাকেও না চাহিয়া প্রেমের আদর্শস্বপ্নেই পরিতৃপ্ত। রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি ঈর্ষ্যায় ও পুত্রের উপর পূর্বতন অধিকারবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভিতরে ভিতরে বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমলালসার প্রশ্রয়দাত্রী। অন্নপূর্ণা ও আশা তাহাদের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই উপন্যাসের দ্বন্দ্বকে জটিলতর করিয়াছে; তাহারা পরিবার-জীবনে নিজ নিজ অংশ যথার্থ-

চোখের বালি

ভাবে অভিনয় করিলে যে শূন্যতার সুযোগে আকর্ষণের বায়ুপ্রবাহ দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই নিরেট-নীরন্ধ্রভাবে পূর্ণ হইত। বিহারীর হিতৈষণা আশার সহিত তাহার সম্পর্কের পূর্ব ইতিহাস দ্বারাই বিড়ম্বিত হইয়া সঙ্কুচিত ও নিষ্ফল হইয়াছে; বিশেষত মহেন্দ্রেব ছায়া ও পরিপূরকরূপে তাহাব ব্যক্তিত্বই অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। সে গোরা সৈনিকের সহিত ঘুষি লড়িতে পারে, কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতিযোদ্ধারূপে নিজেকে কল্পনা করিতে পারে না। মহেন্দ্রের অস্থিরমতিত্ব ও আত্মবিলাস উপন্যাসের জীবনবোধের মর্যাদাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ কবিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন সত্যিকার গভীর উপলব্ধির উদ্ভব হইতে পাবে না। তাহার একমাত্র কাজ হইল বিনোদিনী-চিত্তেব উদ্বোধন, হাঁটুজলে ক্রীডাচ্ছলে সাঁতার দিতে দিতে বিনোদিনী স্রোতঃক্ষুব্ধতাব গভীরে আত্মনিমজ্জন কবিয়াছে। মহেন্দ্রের সত্য প্রয়োজন এইখানেই। সমস্ত উপন্যাসটিতে মোটেব উপর, বিশেষত বিনোদিনী-চরিত্রে, জীবনবোধের মহনীয়তা স্ফুরিত হইয়া ইহাকে মর্যাদা দিয়াছে।

'নৌকাডুবি'তে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাবই প্রাধান্য। মানুষের ভুল পরিচয় হইতেই ঘটনাবলীব সমস্ত গতি ও মনেব সমস্ত জটিল সম্পর্কবিরোধ উদ্ভূত হইয়াছে। যে ভুল এক মুহূর্তে ভাঙা উচিত ছিল, ববীন্দ্রনাথ তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে জীয়াইয়া রাখিয়া উপন্যাসেব সমস্যাকে রূপ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সাধারণ বাঙালী জীবন-ধারাব ও ঐ জীবন-সুলভ আদর্শনিষ্ঠাব নিকট (close)-

নৌকাডুবি

অনুসবণ করিয়াছেন। উমেশ ও চক্রবর্তী খুড়া এই জীবনের প্রতিনিধি ও নলিনাক্ষের প্রতি কমলাব সহজসংস্কারজাত আত্মনিবেদন বাঙালী নারীর সতীত্ব-আদর্শের জীবন-নিরপেক্ষ রূপ। লেখকের নিজের মনে নারীমহিমার যে ভাব-কল্পনা ছিল, হেমনলিনী তাহার প্রথম সার্থক মূর্ত বিকাশ; বাঙালীর ঈর্ষ্যা ও পরশ্রীকাতবতার প্রথম সজীব দৃষ্টান্ত অক্ষয়। অন্য কাহারও চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। উপন্যাসটিব যে মধুব মিলনে উপসংহার ঘটিয়াছে, তাহাতে জীবনের বাস্তব দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছনার উপর কবিমনের পেলব স্পর্শ অনুভব করা যায়। লেখক জীবনে অদৃষ্টের ফাঁস লইয়া খেলা করিয়াছেন; যদৃচ্ছাক্রমে ইহার বাঁধন শিথিল করিয়া দিয়া ইহাকে শ্বাসরোধকারী পরিণাম হইতে বাঁচাইয়াছেন; কমলাকে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত নলিনাক্ষের চরণে উপহার দিয়া, রমেশ ও হেমনলিনীর পূর্বতন প্রেমকে সার্থক হইবার সুযোগ দিয়াছেন। উপন্যাসের রূপকথায় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসে মহাকাব্যের স্বরূপ ও বিরাট পটভূমিকার প্রভাব লক্ষণীয়। স্বাজাত্যবোধ ও ধর্মবিবোধের প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তখন বাঙালী-জীবন আন্দোলিত ও উহার ব্যক্তিত্বের অভিনব স্ফুরণ। গোরা একদিকে মুক্তিকামী ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসুক ভারতীয় আত্মার প্রতীক, সমস্ত প্রতিবেশ-প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত যুগযুগান্তের সাধনার মূর্তরূপ। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়ের নীচে তাহার ব্যক্তিগত-অনুভবশীল, প্রেম ও বন্ধুত্বের প্রতি উন্মুখ আর একটি সত্তাও বর্তমান। এই দুই সত্তার মধ্যে বিবোধই উপন্যাসের কলেবর ও অন্তরলোককে গঠিত করিয়াছে। তাহার হিন্দুত্বের অভিমান, তাহার সুচরিতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও বিনয়ের প্রতি আবাল্য বন্ধুত্বকে প্রতিহত করিয়াছে। কিন্তু যখন তাহার সর্বাপেক্ষা দৃঢ়মূল সংস্কার অমূল তরুর ন্যায় ধূলিসাৎ হইয়াছে, তখনই তাহার ব্যক্তিসত্তা সহজ হৃদয়াবেগের স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত রসধারায় স্নাত হইয়া পরিপূর্ণ আত্মপরিচয়ে বিকশিত হইয়াছে। আনন্দময়ীর জীবন এই ঘরে-বাইরের নীরব দ্বন্দ্বে চির-কুণ্ঠিত; গোরাকে কোলে লইয়া তিনি বাঙালী ঘরের মুগ্ধা জননী হইতে বিশ্বের অন্তরালবর্তিনী জগন্মাতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। এই রূপান্তরের ফলে তিনি পারিবারিক জীবনের মর্যাদা হারাইয়া, শতধারে উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের অজস্রতাকে অন্তর-তলে নিরুদ্ধ করিয়া, নিজেকে কেবল নিষ্ক্রিয় সমবেদনা ও নির্লিপ্ত হিতৈষণায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারে তাঁহার অসাধারণ স্বচ্ছ ও উদার অনুভূতির কোন কার্যকারিতা নাই; তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু আদেশ করিবার অধিকার হারাইয়াছেন। স্বামী-পুত্রের সমস্ত ব্যাপারে তিনি উদাসীন দর্শক। শেষ পর্যন্ত যখন গোরার ভুল ভাঙিয়াছে, তখনই তিনি বিনয়কে আমন্ত্রণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় লক্ষকোটি সন্তানের সুখে-দুঃখে উদাসীন, নিজ শক্তিহীনতায় মর্মপীড়িত, বিস্রস্তাঞ্চল বসুন্ধরার যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারই মুখের আদল যেন আনন্দময়ীতে দেখা যায়।

গোরা

পরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সাধক গৃহী; তাঁহার পরিবার-জীবনের ব্যর্থ, বেদনাময় অভিজ্ঞতা তাঁহার ধর্মজীবনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর করিয়াছে। তিনি যতই বহির্জীবনে ব্যাহত হন, ততই অন্তরলোকে আপনাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত সমস্ত ধার্মিকই—তাঁহার গোবিন্দমাণিক্য ও পরেশবাবু—অন্তর্মুখিতার সাধক। তাঁহার হারাণ ও বরদাসুন্দরী একদিকে,

অপরদিকে হরিমোহিনী সঙ্কীর্ণ ও অতিশক্তিশালী ধর্মান্ধতার প্রতিমূর্তি—ধর্মের আত্মকেন্দ্রিকতা ও আঘাতশীলতার বাহন। সুচরিতা ও ললিতায় নবযুগের নারীর তেজস্বিতা, সুকুমার অন্তরানুভূতি ও দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মসংযম রূপ পাইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসে নারীত্বের এই দিকটাই নানা অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে আরও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বিনয় ও মহিম সাধারণ বাঙালীর দুইপ্রকার মানসপ্রবণতার প্রতিনিধি—তাহাদের সত্তা নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ক্রিয়াশীল। 'গোরা'-তে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত একটা সমগ্র সমাজের, দেশব্যাপী নানা ভাব-আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র আঁকিয়াছেন। চরিত্রগুলি এই উন্মথিত জীবন-প্রতিবেশ হইতেই তাহাদের ব্যক্তিসত্তার পুষ্টির জন্য রস আহরণ করিয়াছে। ব্যক্তিজীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনীতি ও ধর্মাদর্শের এমন নিবিড়, সুসমঞ্জস মিলন, ব্যক্তিমানসের শাখা-প্রশাখায় সমস্ত সমাজদেহে প্রবাহিত প্রাণধারার এরূপ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত 'গোরা'র পর বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গোরা উপন্যাস দেশের ভাব-আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি

(৬)

'গোরা'র পর বাঙালী-জীবনের কেন্দ্রচ্যুতি ও পরিধিসঙ্কোচের ধারা অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করিলেন, তাহাদের মধ্যে সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে আমরা খণ্ডচিত্র ও আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাই। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯৩০), 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসগুলি এক নূতন রীতি, শিল্পকৌশল ও জীবন-সমীক্ষা-অবলম্বনে লিখিত। লেখক এগুলিতে এক-একটি স্বল্পপরিধি, অথচ উত্তেজনাময় ও সংঘাত-তাড়িত প্রতিবেশে কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও শাণিত—সর্বদা যেন সঙ্গীন উঁচাইয়া শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণে উন্মুখ। তাঁহার কাহিনী-বিন্যাস ধারাবাহিক নহে, কয়েকটি সুনির্বাচিত বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি ; ইহাদের মধ্যে ফাঁকগুলি লেখক প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিবর্তে পরোক্ষ উল্লেখে ও আভাস-ইঙ্গিতে পূরণ করিতেছেন। চরিত্রগুলির বেশির ভাগই সমাজনিরপেক্ষ, অত্যুগ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাধারণ জীবন-

পরবর্তী উপন্যাস-গুলির বৈশিষ্ট্য

যাত্রার সহিত সংযোগহীন; তাহাদের মুখে চরিত্র ও অবস্থানুযায়ী সংলাপের পরিবর্তে epigram-কণ্টকিত তির্যক ভাষণ। কোন কোন চরিত্রে সুকুমার কাব্যানুভূতি প্রধানরূপে বর্তমান থাকিলেও মোটের উপর চরিত্র-পরিকল্পনায় ও জীবন-বিশ্লেষণে মনন-প্রাধান্য। মনে হয় যে, বাঙালীর জীবনে যে ছন্দপরিবর্তন ঘটিতেছিল, আধুনিক কবিতায় যে শুষ্ক, আবেগহীন বুদ্ধিবাদ তাহার অভ্যস্ত ভাবালুতার ব্যঙ্গাত্মক অস্বীকৃতিতে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই পূর্বসূচনা রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসে মিলে। আরও মনে হয় যে, জীবনের স্থির, নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা কবির স্বত-অনুভব ও সমালোচকের উদ্দেশ্যপরতন্ত্র, সচেষ্ট উপস্থাপনার উপরই তিনি প্রধানত নির্ভর করিতেছেন।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মত্ত উত্তেজনার, সাময়িক ফললাভের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহে সনাতন নীতির বিপর্যয়ের, পটভূমিকায় একটি দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। নিখিলেশ আদর্শবাদী, স্বামী ও স্ত্রীর স্বাধীন নির্বাচনে আস্থাশীল ও নিজের দাম্পত্যজীবনে তাহার পরীক্ষায় উৎসুক। সন্দীপ তাহার রাজনৈতিক কর্মপন্থায় ও ব্যক্তিগত কামনার পূরণে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যবাদী—তাহার আত্মসম্প্রসারণ কোন কল্যাণ-নীতির নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করে না। মাস্টারমহাশয় ও অমূল্য পার্শ্ব-চরিত্র, একজন আদর্শবাদের কক্ষপথে আবর্তনশীল নিখিল-গ্রহের উপগ্রহমাত্র, আর একজন বিমলার বিকার-তপ্ত উদ্‌ভ্রান্তির স্নিগ্ধ শান্তি-প্রলেপ। ইহাদের মধ্যে বিমলাই সম্পূর্ণ জীবন্ত সৃষ্টি, সে কোন মতবাদের প্রতীক নহে। তাহার বক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, মোহাচ্ছন্নতা ও সুস্থ দৃষ্টিলাভ উপন্যাসের প্রধান সমস্যা। সন্দীপও মতবাদের গ্রাস হইতে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধার করিয়াছে। সে বিপ্লবী নহে, প্রচণ্ডভাবে আত্মকেন্দ্রিক, তাহার বিপ্লবের সহিত যোগ তাহার উৎকট আত্মপ্রীতির চরিতার্থতার ছদ্ম উপায়মাত্র বলিয়াই মনে হয়। যে তত্ত্বপরীক্ষা উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের দ্বারা অভিভূত হইয়া গৌণ হইয়া গিয়াছে। বিমলা ও নিখিল কাহারও এই পরীক্ষার উপযোগী নিরাসক্ত মনোভাব ছিল না। পরীক্ষা-চক্রের প্রথম আবর্তনই বঞ্চিত হৃদয়ের হাহাকারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উপন্যাসটিতে বাঙলার সন্ত্রাসবাদের ও এই আন্দোলনের নাগপাশে জড়িত কয়েকটি ব্যথাদীর্ণ ব্যক্তি-হৃদয়ের, মননশীলতায় তীক্ষ্ণ ও আবেগবাষ্পে আবিল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

ঘরে বাইরে

'চার অধ্যায়'-এও এই বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র

সন্দীপের ন্যায় 'চার অধ্যায়'-এর এলা বিকারগ্রস্ত বিপ্লবী সমাজের মোহতিলক-চর্চিত হইয়া দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও প্রেমের সঙ্গে বিপ্লববাদের সংঘর্ষ। প্রেমই নর-নারীর সুস্থ বিকাশের প্রেরণা, সন্ত্রাসবাদ তাহাদের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিয়া তাহাদের যন্ত্রে পরিণত করে, ইহাই লেখকের অভিমত। এই মতবাদের সর্বজনগ্রাহ্যতা বিচারের বিষয় নহে; ইহাকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসে যে বেদনাময় পরিস্থিতি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই ইহার ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ। লেখক সর্বপ্রকার মোহের সহিত দেশপ্রেমের মোহ ও তজ্জনিত কৃত্রিম আদর্শবাদের ভাবস্ফীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে আমল দেন নাই, সেইজন্য সন্ত্রাসবাদের নীতি ও কর্মপন্থা তিনি কখনই পুরোপুরি অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

চার-অধ্যায়

'চতুরঙ্গ'-ও মতবাদ-প্রভাবিত উপন্যাস। এখানে শচীশের মানস বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য তাহার নাস্তিক, অথচ মানবমহিমায় বিশ্বাসী জ্যাঠা মহাশয়ের জীবনাদর্শ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বতন উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদের ন্যায় এখানে গুরুবাদের বিভ্রান্তিকর প্রভাব দামিনীর চরিত্রে উদাহৃত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসের মধ্যে যে দুর্বোধ্য ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, মুহূর্তে মুহূর্তে আলো-ছায়ার লুকোচুরি-খেলায় রহস্যময় সম্পর্ক-জটিলতা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মাঝে মধ্যে গভীর অর্থপূর্ণ মন্তব্য থাকিলেও, মোটের উপর একটি ক্রমান্বয়হীন, খেয়ালী কল্পনার যদৃচ্ছবিচরণের দ্বারা সৃষ্ট আবহাওয়া আমাদিগকে যতখানি মুগ্ধ করে, তাহার অপেক্ষা বেশি বিড়ম্বিত করে। কবির বিশেষ অধিকার উপন্যাসক্ষেত্রে যে সর্বদা প্রযোজ্য হয় না, উপন্যাসটি তাহারই নিদর্শন। মনে হয়, যেন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের বাস্তব-উপাদান-গঠিত ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলিত অবয়ব-বিন্যাস ও আলোচনারীতির উপর ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন।

চতুরঙ্গ

'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাসদ্বয়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাস্তববোধ ও ধ্যানতন্ময় আদর্শানুভূতির এক খেয়ালখুশি-মাফিক, বিসদৃশ সম্মিলন ঘটিয়াছে। অমিট্ রে ও কেটি মিত্রের সমাজ ও চরিত্র-চিত্রণে লেখক তাঁহার অসাধারণ শ্লেষদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; প্রতিটি উক্তি যেন শাণিত তীরের ন্যায় অভ্রান্ত লক্ষ্যে ইঙ্গ-বঙ্গসমাজের কৃত্রিম অনুকরণপ্রবণতা ও আন্তরিকতাহীন আদব-কায়দা-চালের মর্মমূল বিদ্ধ ও ইহাদিগকে উপহাসের চরম লাঞ্ছনায় নাস্তা-নাবুদ করিয়াছে। ইহারই পাশাপাশি লাবণ্য-চরিত্র ও লাবণ্য ও অমিতের পরস্পরের সম্পর্ক

প্রেমের পেলব অনুভূতি ও আদর্শ-কল্পনার অপার্থিব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্যের রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চটুল, ফ্যাশান-কিঙ্করী কেটি মিত্রেরও অদ্ভুত ও আকস্মিক রূপান্তর ঘটিয়াছে, সে অমিতকে হারাইবার ভয়ে একনিষ্ঠ প্রণয়িনীতে পরিবর্তিত হইয়াছে। উপন্যাসের শেষ পরিণতি সম্পূর্ণরূপে কাব্যলোকের নিয়মানুবর্তী হইয়াছে। অমিত ও লাবণ্য স্বল্পকালের জন্য প্রেমাকাশে দুইটি রঙীন মেঘের ন্যায় বিচরণ করিয়া হঠাৎ অনুভব করিয়াছে যে, প্রেমলোক হইতে ধরণীর ধূলায় তাহাদের অবতরণ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তাহাদের কল্পলোক-বিহারী প্রেমকে ধূলিস্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহারা কবিতার মাধ্যমে পরস্পরের নিকট বিদায়লিপি পাঠাইয়াছে। উপন্যাসে যাহার একেবারে আবির্ভাব হয় নাই ও যাহার সামান্যমাত্র উল্লেখ আছে, সেই শোভনলাল ও কেটি উহার নায়ক-নায়িকার অদৃষ্ট নিরূপণ করিয়াছে। লেখক যেন উপন্যাসের ভূমিকায় কাব্যের উপসংহার জুড়িয়া দিয়াছেন, উপন্যাসের সমতলভূমিতে কাব্যপ্লাবন বহাইয়া দিয়া উহার উঁচু-নীচুর ছোট-খাট পার্থক্য, উহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঈষৎ-স্ফুট ইঙ্গিতগুলি সেই প্লাবনের নীচে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার শেষ কথাটি বলিবার জন্য কবিতার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার ভিতরে কাব্যের টান যে কত প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শেষের কবিতা

'যোগাযোগ'-এ একদিকে মধুসূদনের প্রখর ও সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বাভিমান, অপর দিকে কুমুদিনীর ধ্যানে একাগ্র, সুকুমার অনুভূতির স্বপ্নসীমা-সংরক্ষিত বাস্তব-বিমুখতা; উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ যেন বায়ুর উপর লৌহমুষ্টির আঘাত। এই বিপরীত কোটিতে আসীন দম্পতির চারিদিকে যে মানবিক প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে, তাহা যতই প্রাণোচ্ছল হউক না কেন, নায়ক-নায়িকার উপর কোন প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ। এই প্রতিবেশ উহাদের মধ্যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধানকে পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু কোন সংযোগ-সেতু রচনা করে নাই। তথাপি মধুসূদন কুমুদিনীর চিত্ত জয় করিবার জন্য পর্যায়ক্রমে যে জোর-জবরদস্তি ও আদর-আপ্যায়ন-নতিস্বীকারের নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যথার্থ ও ঔপন্যাসিক রীতির অনুসারী। কুমুদিনীর মনে এই দ্বৈধনীতির বিহ্বল প্রতিক্রিয়াও মনস্তত্ত্বসম্মত। শ্যামার প্রতি প্রণয়িনীর মর্যাদার ক্ষণিক আরোপ মধুসূদনের আহত আত্মাভিমান-ব্যাধির উৎকট চিকিৎসা; উহা মধুসূদনের চরিত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। নবীন ও

যোগাযোগ

মতিব মাব উপন্যাসে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই—তাহারা কেবল মধুসূদনের আকাশচুম্বী শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মাপিবার গজ-ফিতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসাবলীর মধ্যে এই উপন্যাসটি সর্বাপেক্ষা বেশি ঔপন্যাসিক লক্ষণসম্পন্ন—ইহার ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাবিন্যাস অনেকটা ঔপন্যাসিক-আদর্শ-প্রভাবিত। দুঃখের বিষয়, লেখক ইহাকে তাড়াতাড়ি শেষ কবিয়া ও শেষের দিকে কিছু অবান্তর প্রসঙ্গ ও অনির্দিষ্ট পবিণতিব সংশয় সংযোজনা করিয়া ইহার উৎকর্ষ কতকটা খর্ব কবিয়াছেন। তিনি সুনিপুণভাবে জাল ফেলিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত সূত্র সংগ্রহ করিয়া জাল টানিয়া তুলিবাব ধৈয তাঁহার ছিল না।

মালঞ্চ ও দুই বোন

'দুইবোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাস ববীন্দ্রনাথ যেন কতকটা অবহেলার সহিতই লিখিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্ণ শক্তির প্রয়োগ ইহাদের মধ্যে নাই। 'দুইনারী'-তত্ত্ব কবি-কল্পনায় অনুভব-বেদ্য, উপন্যাসের সম্প্রসাবণে এই তত্ত্বের যথাযোগ্য রূপায়ণ হয় নাই। 'মালঞ্চ'-এর পিছনে কোন বৃহৎ জীবনবোধ নাই, আছে একটি ক্ষুদ্র ও তাৎপর্যহীন মনোবিকাবের সংক্ষিপ্ত কল্পনা; রবীন্দ্র-প্রতিভা-মহাদেশেব আশে-পাশে ছড়ানো দুই-একটা স্বল্পায়তন দ্বীপেব ন্যায় ইহারা মহাদেশের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্তও নহে, উহার পরিধি-বিস্তাবেও সহায়তা করে নাই।

(৭)

ছোটগল্প

। উপন্যাস-বচনায় রবীন্দ্রনাথেব উভচরত্বের লক্ষণ সুপরিস্ফুট।১ তিনি পায়ে হাঁটিয়া, তথ্য-পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দিয়া যাহার আরম্ভ করিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে কবি-কল্পনাব পুষ্পক-রথে উধাও হইয়া সুদূর আকাশ হইতে তাহার পরিণতিক্রমের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কোন একটি কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে তিনি কখন যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের হাতিয়ার পবিত্যাগ করিয়া হঠাৎ মন্ত্রপূত দিব্য ধনু ধারণ করিবেন, তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা দুঃসাধ্য। তাঁহার উপন্যাসে কোথাও মাটির রসের উচ্ছলতা, কোথাও বা আকাশ-নীলিমার জ্যোতির্ময়

উজ্জ্বলতা, কিন্তু এই আকাশ ও মৃত্তিকার যৌগিক সমন্বয় সাধিত হয় নাই! সেইজন্য মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিজ একক স্বাতন্ত্র্যে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ-ধারার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' ও সম্ভবত 'যোগাযোগ' ছাড়া আর কোনও উপন্যাসে কোন বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবন-সত্য, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের অনিবার্য পরিণতিরূপে দেখানো হয় নাই। এই উপন্যাসগুলিতেও বাস্তব জীবনচর্যার মধ্যে কাব্যলোকের সূক্ষ্মতর ঔচিত্যবোধ ও ভাবসঙ্গতি মাঝে মধ্যে আরোপিত হইয়াছে। গঠনের শিথিলতা ও ভাব-পরিবর্তনের আকস্মিকতাও প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না; উপন্যাসের গ্রন্থিচ্ছেদনের জন্য তিনি কেবলমাত্র কার্যকারণের মন্থর গতি ও অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যের উপর নির্ভরশীল না হইয়া তাঁহার কল্পনানুভূতির সহায়তাও অকৃপণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তাঁহার বাম হস্তের লেখা—এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের রচনারীতি শিথিল ও আকস্মিক

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যে তাঁহার সমগ্র মনের প্রকাশ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনা পরীক্ষা-মূলকভাবে ১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ আরম্ভ হইলেও, ইহার আসল সৃষ্টি-যুগের ব্যাপ্তি ১৮৯১ হইতে ১৯১৭-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই যুগের পর পূর্ণ আট বৎসরব্যাপী এক দীর্ঘ বিরতি ঘটে। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে গল্পলেখার ছিন্নসূত্র পুনর্যোজিত হইয়া নানা ফাঁসের মধ্য দিয়া ১৯৪০ পর্যন্ত তাহার জের টানিয়া চলে।

ছোটগল্পের রচনাসীমা

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ছোটগল্পের বিলম্বিত আবির্ভাব এইটুকু প্রমাণ করে যে, এই নূতন ধরনের শিল্পরূপ উদ্ভাবন করিতে রবীন্দ্রনাথকে পল্লীজীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ও উহার বিচিত্র রস-আস্বাদনের অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। কবির কাব্যকল্পনা যে উৎস হইতে উদ্ভূত, তাঁহার ছোটগল্প ঠিক সেই উৎস হইতে জন্মিবার প্রেরণা পায় নাই। তাঁহার কাব্যানুভূতি, নিবিড় প্রকৃতিপ্রীতি, ব্যঞ্জনাধর্মী জীবন-চিত্রণ, আভাস-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অপূর্ব জীবনরসের প্রকাশ প্রভৃতি কবিসুলভ গুণগুলি তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও ইহার অব্যবহিত উপলক্ষ্য আসিয়াছে বাঙলার গ্রাম্যজীবনে ছায়ারৌদ্রের খেলার চকিত উপলব্ধি হইতে। ছন্দরচিত কল্পনার আধারে যে কাব্যানুভূতি

ছোটগল্পের মূল প্রেরণা পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা

'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'-য় অতীন্দ্রিয় রহস্য ও প্রণয়াবেগের অধীর আকুলতার সন্ধান দিয়াছে, তাহাই পল্লীপরিবেশে বাস্তবজীবনের মৃৎপাত্রটিকে অনির্বচনীয় অমৃতরসে পূর্ণ করিয়াছে।) মৃত্তিকার প্রাণরস ও কবিকল্পনার ঊর্ধ্বগামী চেতনা এই ছোটগল্পগুলিতে এক অপূর্ব সমন্বয়ে সংমিশ্রিত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন ১৮৯১ খ্রীঃ-অব্দে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি-পরিদর্শনের ভার লইয়া উত্তরবঙ্গে গিয়াছেন ও পদ্মার চিরপ্রবহমান স্রোতোধারার সহিত নিজ মানবিক অনুভূতির ধারাকে মিশাইয়াছেন, ঠিক সেই বৎসর হইতেই তাঁহার ছোটগল্পের সৃষ্টিকার্য পূর্ণবেগে উৎসারিত হইয়াছে। তিনি পল্লীজীবনকে যে খুব কাছাকাছি হইতে দেখেন নাই, ইহার ছোটখাট ক্ষুদ্রতা ও মোহান্ধ সংস্কারকে তাঁহার অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, ইহাই তাঁহার ছোটগল্পের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। (তিনি কল্পনার অন্তরাল হইতে, কবিদৃষ্টির রোমান্টিক অনুরঞ্জনের মাধ্যমে, পল্লবঘন প্রগাঢ় শান্তির পটভূমিকায়, নদীর অন্তহীন বিস্তার ও অসীমের অভিমুখী প্রাণচাঞ্চল্যের সহিত মিশাইয়া এই সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার নিগূঢ় সত্তাটিকে অনুভব করিয়াছেন ও ইহার তুচ্ছ বস্তু-পরিবেশের অন্তর্নিহিত জীবনরসটি তাঁহার স্মিত কারুকার্যখচিত ছোটগল্পের পেয়ালায় আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন।)

ছোটগল্পের অফুরন্ত বিষয়বৈচিত্র্য

(জীবনের অফুরন্ত বৈচিত্র্য এই ছোট পাত্রটিকে কানায় কানায় রসোচ্ছল করিয়াছে। কিছু গল্প পল্লীজীবনের জীবনযাত্রার সাধারণ রূপ ও পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা ও অসাধারণত্ব অবলম্বনে রচিত। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'শাস্তি', 'দিদি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দান-প্রতিদান' প্রভৃতি গল্পগুলি এইজাতীয়।) বাঙালী পরিবারের বিশিষ্ট গঠন, পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, বংশগৌরব, জ্ঞাতিত্ব, প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্য-মনোমালিন্য ইহাদের উপজীব্য। এগুলিতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ ও পরিবারের প্রভাবই বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবনযাত্রার মধ্যে নানা কৌতুককর ও করুণ অসঙ্গতি, নানা অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের সহিত সংস্কার সংঘর্ষের বিবিধ রূপ অসাধারণ রসের সৃষ্টি করিয়াছে। ('খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,' 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'স্বর্ণমৃগ', 'গুপ্তধন', 'ঠাকুরদাদা', 'হালদার গোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে পল্লীজীবনের এই খেয়ালী, ব্যতিক্রমমূলক উপজাত ভাবের (by-product) দিকটা উদাহৃত হইয়াছে।) রাইচরণ তাহার নিজের ছেলেকে প্রভুর মৃতপুত্রের পুনর্জন্মের

প্রতীক বলিয়া বিশ্বাস করে; গুপ্তধনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধান বাঙালীর অলৌকিক বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন অস্থিমজ্জাগত সংস্কার, বংশগৌরবের বড়াই শুধু বাঙলা দেশে নয়, অভিজাততন্ত্র-শাসিত পৃথিবীর বহু দেশেই বর্তমান, কিন্তু বাঙলার ধ্বংসোন্মুখ জমিদার-গোষ্ঠীর মধ্যে ইহার করুণ অথচ নির্দোষ আত্ম-বঞ্চনার দিকটি বিশেষভাবে দেখা যায়; বংশের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ, বংশানুক্রমিক জীবননীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিদ্রোহ রক্ষণশীল বাঙলা-সমাজেই মর্মান্তিক রূপ ধারণ করে। (সমাজব্যবস্থার ফাটল হইতে নিঃসৃত এই রসধারা নাগরিক রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ধরা পড়িয়াছিল; ইহাতে তাঁহার প্রাচীন সমাজের মর্মের সহিত কত অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, তাহারই নিদর্শন মিলে।)

('মানভঞ্জন' ও 'প্রতিহিংসা' এই দুইটি গল্পে, একটি নাগরিক ও অপরটি গ্রাম্য পরিবেশে, অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই লেখকের প্রধান লক্ষ্য।) গিরিবালার উপেক্ষিত রূপ-যৌবন-প্রণয়তৃষা তাহার সুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধের প্রখর জাগরণ ঘটাইয়া তাহাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে ও এই উপায়ে সে ঘরের স্ত্রীকে ফেলিয়া রঙ্গালয়ের নটীর প্রতি মোহগ্রস্ত স্বামীর উপর এক নিগূঢ় প্রতিশোধ লইয়াছে। ইন্দ্রানীও তাহার সমস্ত অলঙ্কার মনিবের দুর্দিনে দান করিয়া অহঙ্কৃতা মনিবপত্নী জমিদার-গৃহিণীর অপমানের উপযুক্ত জবাব দিয়াছে। শমীগর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় জমিদার ও তাহার কর্মচারীর মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত আনুগত্য-মসৃণ, নির্বিচার আজ্ঞানুবর্তিতার শ্যাওলা-পড়া সম্পর্কে প্রখর আত্মসম্মানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—অথচ এই আগুন দাহ করে নাই, উজ্জ্বল করিয়াছে মাত্র। এরূপ অহঙ্কৃত বশ্যতা, এরূপ উদ্ধত প্রভুভক্তি, এরূপ জয়শ্রীদৃপ্ত পরাভব-স্বীকার জমিদারী প্রথারই একটা বিরল পরিণতি। (যে পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বকে অঙ্কুরেই দলিত করা হয়, সেখানে ব্যক্তিত্বের কি নীরব, অন্তর্গূঢ়, মহিমান্বিত প্রকাশ!)

বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা

(কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পে কাব্যানুভূতির সহিত মনস্তত্ত্বজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। এইগুলিতে মনস্তত্ত্ব-কোবিদের জীবন-পর্যবেক্ষণের সহিত কবির সূক্ষ্মতর ভাবসত্য-ব্যঞ্জনা এক অদ্বয় সত্তায় মিলিত হইয়াছে। 'মধ্যবর্তিনী', 'সমাপ্তি,' 'অতিথি', 'দৃষ্টিদান' এই শ্রেণীর গল্প। নিবারণ, হরসুন্দরী, শৈলবালা—এই মধ্যবিত্ত ও স্থূলরুচি পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, প্রৌঢ়া গৃহিণী হরসুন্দরীর আত্মত্যাগের

কাব্যানুভূতি ও মনস্তত্ত্বের সমন্বয়

উদারতার মধ্যে সপত্নীসুলভ ঈর্ষ্যার আকস্মিক স্ফুরণ, শৈলবালার অপরিমিত সোহাগের দাবী ও নিবারণের অতি-বিলম্বে উচ্ছ্বসিত প্রেমমুগ্ধতা—যে কোন তথ্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকেব চোখে পড়িত; কিন্তু অকালমৃতা শৈলবালাব স্মৃতি যে পুনর্মিলিত প্রৌঢ় দম্পতিব মধ্যে এক চিরন্তন ব্যবধান-বোধেব ন্যায় জাগিয়া রহিল, ইহাই কবির মর্মজ্ঞ চেতনার আবিষ্কাব। 'সমাপ্তি'তে মৃন্ময়ীর অর্ধস্ফুট প্রেমানুভূতি যে বিরহের বেদনায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, বন্য, দুরন্ত, খেলাধূলায় মত্ত গ্রাম্য বালিকা যে প্রণয়রহস্য-দীক্ষিত পরিণত নাবীপ্রকৃতিতে বিকশিত হইয়াছে, এই চিত্তস্ফুবণের ইতিহাসটির মালমসলা সাধাবণ জীবন হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহাব শেষ অধ্যায়টি কবিচেতনা-প্রসূত। 'অতিথি' গল্পে তারাপদ প্রকৃতির উদাব, নিরাসক্ত প্রাণচঞ্চলতার প্রতীক—এই তাপস-শিশুকে গার্হস্থ্য জীবনে বাঁধিবার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া একদিন সে তাহাব রক্তকণিকা-বাহিত এই প্রাকৃতিক জীবনাবেগের আহ্বানে জোয়াব-স্ফীত দুর্বার নদীব ন্যায়, বথযাত্রার গতিবেগ-চঞ্চল জগতের ন্যায়, এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় উধাও হইয়াছে। তাহাব মানবিক জীবনের বর্ণনা জীবন-রসিক ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি, তাহাব চরিত্রেব মধ্যে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব, তাহার সাংসারিক মায়া-মমতার মধ্যে উদাস পথিকমনের ইঙ্গিত কবিব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। 'দৃষ্টিদান' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের এক সহজ-অনুভূতি-লব্ধ, দিব্যচেতনাত্মক সূক্ষ্ম ভাবরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; অন্ধ নারীব মধ্যে অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই প্রদীপ জ্বলাই গল্পের আসল ফলশ্রুতি—ইহার সুবিন্যস্ত আখ্যান-অংশ এই প্রদীপ জ্বালাইবাব সমিধ-সংগ্রহ। ঔপন্যাসিকের বস্তু-সংযোজনা হইতে কবি ভাব-বস নিষ্কাশন করিয়াছেন। এই পর্যায়ের গল্পসমূহ শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

কাব্যরস ও উপন্যাস-বস্তুর মিলনে কাব্য-প্রাধান্য

আর কয়েকটি গল্পে কবি ও ঔপন্যাসিকের এই দুর্লভ ঐকান্তিক মিলন টুটিয়া গিয়া কবিরই একাধিপত্য প্রকটিত হইয়াছে। এগুলিতে মায়াবরণের অন্তরালে ব্রহ্মানুভূতির ন্যায়, উপন্যাসের উদ্যোগ-আয়োজন ও তথ্য-বিন্যাসের পিছনে একটি শাশ্বত ভাবসত্যের একক বিন্দু স্থির হইয়া আছে। 'পোস্টমাস্টার', গল্পের আধারে, অক্ষিসঞ্চিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায় একটি বেদনামথিত অস্বীকৃত হৃদয়াবেগের নির্যাস; 'কাবুলি-ওয়ালা'-য়ও অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এক শাশ্বত অপত্যস্নেহের সর্ব-অসমতা-নাশী বৃত্তির বিকাশ; পোস্টমাস্টার, রতন, কাবুলিওয়ালা, মিনি—সবই এক আলোক-

বিন্দুর বিচিত্ররূপী ছায়াদেহ। ‘একরাত্রি’—গল্পের অন্তরশায়ী গীতিমূর্ছনা; ‘শুভা’ ও ‘মহামায়া’ প্রকৃতির অন্তর-সত্তার মানবিক নাম ও পরিচয়-সংবলিত দীপ্তি-বিচ্ছুরণ। শুভা মূক, মৌন প্রকৃতির মানবিক রূপ, মহামায়া ইহার মেঘমন্দ্রিত, বিদ্যুৎ-বিলসিত, ম্লান জ্যোৎস্নার রহস্যমণ্ডিত, শ্রাবণ-নিশীথের দুর্নিরীক্ষ্য মহিমা। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের একক সংযোগ-বিন্দু ইহাদের মধ্যে ব্যঞ্জিত। ‘মেঘ ও রৌদ্র’-এর কাহিনী-বিস্তারের মধ্যে একটিমাত্র বঞ্চিত হৃদয়ের করুণ বেদনা গীতি-কবিতার সুরে উচ্ছ্বসিত। ‘দুরাশা’ গল্পে এক সংস্কার-বিড়ম্বিত, মিলন-বুভুক্ষু মানবাত্মার ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা-নিবিড়, পরিহাস-মর্মান্তিক কাহিনী রূপ পাইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাস কাহিনীর তটভূমি ছাপাইয়া একক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বদায়ুনের নবাব-পুত্রী, রাজপুত সৈনিক কেশরলাল ও গল্পের শ্রোতা লেখক সবই এই আবেগ-তরঙ্গ-তাড়িত বুদ্‌বুদমাত্র; গল্প শেষ হইলে আমরা নদীর কথাই ভাবি, বুদ্‌বুদসমূহ নদীপ্রবাহের অগ্রগতির সঙ্গে বিস্মৃতির তলে মিলাইয়া যায়। এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গীতিকবি; ঘটনা ও চরিত্র, ঔপন্যাসিক বস্তুবিন্যাস ও নরনারী-রূপায়ণ এই সুর ফুটাইবার অবলম্বন, কাব্য-নির্যাসের প্রস্তুতি ও আধারমাত্র। কথাবস্তু এখানে কাব্যরস-উৎসারণের নানাবিধ ছন্দের মধ্যে অন্যতম ছন্দ।

প্রকৃতির প্রাণলীলা যে সমস্ত নর-নারীর মধ্যে আংশিকভাবেও ছন্দায়িত হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃতের সীমান্তপ্রদেশে অধিষ্ঠিত, কেননা, প্রকৃতির মধ্যেই অতিপ্রাকৃতের বীজ নিহিত। প্রকৃতির রহস্য-অন্তঃপুরে আর একটু গভীরভাবে প্রবেশ করিলেই অতিপ্রাকৃতের দ্বার ঐ এক চাবিতেই খুলিয়া যাইবে। শুভা, মহামায়া তাহাদের আচরণে ও জীবনস্বরূপে মানবিকতার গণ্ডী অতিক্রম না করিয়াই অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিতে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ

অতিপ্রাকৃত রসসৃষ্টি

প্রেম-ও-সৌন্দর্যমোহ যখন অন্য সমস্ত বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া মানস বিভ্রান্তি ঘটায়, তখনই প্রেতলোকের অনুভূতি রূপ পরিগ্রহ করে। এই মানস বিভ্রান্তি ঘটাইতে মৃত্যু-ব্যবধান-জনিত অতৃপ্ত হৃদয়াবেগ ও প্রবলবেগে আলোড়িত কল্পনা সহায়তা করে। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এ অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম ও আত্যন্তিক রূপমোহ, এক অজ্ঞাত, রোমাঞ্চময় আশঙ্কার সূত্র অবলম্বন করিয়া, কল্পনাপ্রবণ, অবচেতন মনে প্রেমের রহস্যনিবিড় অনুভূতি-আস্বাদনে উন্মুখ, তরুণচিত্তে প্রত্যক্ষ-অভিনীত দৃশ্যবৎ প্রতিভাত হইয়াছে। ব্যাধি-বীজাণু-দুষ্ট গৃহের আবহাওয়ার ন্যায় মানবের সৌন্দর্য-পিপাসার এই বিকার-

গ্রস্ত আতিশয্য গৃহকক্ষের পাষাণভিত্তিতে এক অনপনেয় রেখায় মুদ্রিত হইয়াছে ও অধিবাসীব নিঃশ্বাস-বায়ুব সঙ্গে এই মোহাবেশ তাহাব অন্তব-সত্তায় সংক্রামিত হইয়াছে। এখানে ভৌতিক অনুভূতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে কোন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যে নহে, মনোবিকাবের বাস্তব-বিভ্রমকারী, দৃঢবদ্ধ প্রতীতি-সংস্কারেব মধ্য দিয়া। সুতবাং এখানে মনস্তত্ত্বেব সীমাবেখা লঙ্ঘিত হয় নাই। 'মণিহারা' ও 'নিশীথে' গল্প দুইটিতে গার্হস্থ্য প্রতিবেশেব মধ্যে ভৌতিক বোমাঞ্চ সঞ্চারিত হইয়াছে। 'মণিহাবা' গল্পটিব বিবক্তা (narrator) একজন তীক্ষ্ণধী, স্ত্রী ও পুরুষেব মনস্তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ও মৌলিক চিন্তাশীলতায় অতিমাত্রায় সচেতন পুরুষ। তাহাব মুখে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতাবণা আমাদিগকে ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় কবে। এখানেও সুন্দবী স্ত্রীর প্রতি অতিবিক্ত আসক্তি, রূপমোহের অন্ধ নিবিডতা যে আবেশঘন, প্রতীক্ষাস্তব্ধ প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাবই মধ্যে অলৌকিক আবির্ভাব প্রত্যাশিত ও কিছুটা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। দূব-শ্রুত যাত্রাগানেব সুব প্রিয়া-বিবহ-কাতর মনে যে কল্পচেতনাব উন্মেষ করিয়াছে, তাহাই বর্ষাবজনীব অবিবল বর্ষণধাবা ও ভেকের অশ্রান্ত কলরবে ঘনীভূত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিবজগতেব উপব এক মায়া-যবনিকা প্রক্ষেপ কবিয়াছে এবং ইহাবই পিছনে অশবীরী সত্তা, চেতনাব যে একটিমাত্র রন্ধ্রপথ খোলা ছিল, তাহাকেই অধিকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

'নিশীথে' গল্পে অচিবমৃতা প্রথমা পত্নীর প্রতি অবিচাববোধে আচ্ছন্ন চিত্ত তাহারই আর্ত, সংশয়তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাকে নিজ অবচেতন স্তবে ধবিয়া রাখিয়াছে ও নবপরিণীতা দ্বিতীয়া পত্নীব সহিত প্রেমালাপেব মধ্যে যে কোন স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার খোলার মুহূর্তে এই মগ্নচৈতন্যলীন ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়া আকাশ-বাতাসের শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ও অনুতপ্ত স্বামীকে ডাক্তারের নিকট নিজেব গোপন মনোবিকাব বিবৃত করিতে অনিবার্যভাবে প্রণোদিত কবিয়াছে। আবাব এই ঘোর কাটিয়া গেলে বক্তা নিজ সম্ভ্রমবোধ ও সংযমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রেতাবির্ভাব-রহস্য সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই গল্পগুলিতে লেখকেব কল্পনাসমৃদ্ধ ও কবিসুলভ অন্তরঙ্গ অনুভূতি তাঁহাকে প্রেতলোকের বাতাববণ-সৃজনে সহায়তা কবিয়াছে। তাঁহাব 'কঙ্কাল' ও 'জীবিত ও মৃত' এই দুইটি গল্প অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করিলেও ইহাদের মধ্যে

অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ও অলৌকিক তত্ত্ব

অলৌকিকত্বের হিমানী-শীতল স্পর্শটি নাই। প্রথমটিতে কঙ্কালে পরিণত, মৃত যুবতী নিজ অতীত জীবনেব প্রণয়লালসার ইতিহাস খুব চটুল ভাষায় ও নিতান্ত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছে, দ্বিতীয়টিতে শ্মশান-প্রত্যাগতা স্ত্রীলোক নিজে জীবিত কি মৃত স্থির করিতে না পারিয়া একপ্রকাব বিমূঢ়, বাস্তবেব সহিত শিথিল-সংপৃক্ত জীবন যাপন কবিতেছে। ইহার মধ্যে অনিশ্চয়েব গোধূলি কোন অশবীরী উপস্থিতিতে বহস্যময় হইয়া উঠে নাই।

'সবুজপত্র'-এর যুগে লেখা গল্পগুলিতে রসসৃষ্টি অপেক্ষা সমাজ-সমালোচনার উদ্দেশ্যই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'পয়লা নম্বব', 'পাত্র ও পাত্রী', 'নামঞ্জুব গল্প' প্রভৃতি গল্পে ববীন্দ্রনাথেব উগ্র সমাজ-চেতনা তাঁহার অপক্ষপাত রসদৃষ্টিকে অনেকটা আচ্ছন্ন কবিয়াছে। সমাজের দোষ-ত্রুটি-উদ্‌ঘাটন ও শ্লেষাত্মক আঘাতে উহাদেব সংশোধন-প্রয়াস শিল্পিমনের যে স্তব হইতে উদ্ভূত, উহা তাহাব গভীরতম চেতনার অন্তর্ভুক্ত নহে। স্রষ্টা-মন নিষ্ক্রিয় হইলে সমালোচক-মন জাগিয়া উঠে ও স্রষ্টা-পবিত্যক্ত তুলি ও রং লইয়া একপ্রকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যঙ্গ বা করুণ চিত্র আঁকিয়া সৃষ্টি-প্রেরণার একরূপ বিকৃত সার্থকতা অনুভব কবে। বৃহত্তব উপন্যাসে হয়ত সকলরকম মনোভাব-প্রকাশেব একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। কিন্তু ছোটগল্পেব পরিমিত আয়তনেব পাত্রে বস-সাঙ্কর্য ঠিক শোভন মনে হয় না। লাঠি খেলিতে হইলে যে প্রশস্ত অঙ্গনের প্রয়োজন, ছোটগল্পেব সুসজ্জিত কক্ষে তাহাব অনুরূপ স্থান নাই—হয়ত ইহাতে সমাজমনের ভূত ছাড়িতে পাবে, কিন্তু ঘবেব আসবাবপত্রও কিছু কিছু ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে। ছোটগল্পে সত্য জীবন-চিত্রণেব মধ্যে যে পবোক্ষ সমালোচনা ব্যঞ্জিত হয়, তাহাই যথেষ্ট। মহাভাবতেব যুদ্ধে যখন শ্রীকৃষ্ণকে রথচক্র হাতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তখন তাঁহার নিবপেক্ষতাব মর্যাদা নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। যদি ছোটগল্পের মাধ্যমে নিতান্তই সামাজিক দৃষ্টিবিকার সাবাইতে হয়, তবে ইহা যেন পদ্মমধুব স্নিগ্ধ প্রলেপেব অনুরূপ হয়, কোনরূপ উগ্রজ্বালাময় ভেষজের প্রক্ষেপ-জাতীয় না হয়। আমরা ইহাদের মধ্যে সব্যসাচীব শরসন্ধান-নৈপুণ্য, তাঁহার লিপিচাতুর্য উপভোগ কবি, কিন্তু এই অস্ত্রক্ষেপের পিছনে মানবমনেব কোন নিবিড় অনুভূতি আমাদিগকে রসাপ্লুত কবে না। রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্পসংগ্রহ 'তিনসঙ্গী'-তে লেখক অদ্ভুত ধরণের চরিত্রকে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া ও উহাদেব অসম্ভব দ্রুত গতিবেগ ও পরিবর্তনশীলতার চরকিবাজির

সমাজ-আলোচনা-মূলক গল্প

সহিত তাল রাখিয়া কথার খই ফুটাইয়া আমাদিগকে যে পরিমাণে বিস্মিত করিয়াছেন, সে পরিমাণে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার আরও দুই-একটি গল্প আছে, যেগুলি ঠিক কোন পর্যায়ভুক্ত নহে। 'নষ্টনীড়' যে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি বিবৃত করিয়াছে, তাহা এত দীর্ঘসময়সাপেক্ষ ও আমূল-পরিবর্তনাত্মক যে, উহাকে ছোটগল্পের পরিধিতে ধরিয়া রাখা যায় না। উহার পরিণত শিল্পকৌশল ও ইঙ্গিতময় আলোচনা-পদ্ধতির জন্যই উহার সঙ্গে ছোটগল্পের কতকটা সাধর্ম্য আছে। কিন্তু মূলতঃ উহার সমস্যা এত গভীর ও সর্বাত্মক যে, উহা উপন্যাসেরই সহিত অধিকতর সাদৃশ্যবিশিষ্ট। কতকগুলি গল্পকে লেখক পরবর্তী কালে নাট্যরূপ দিয়া উহাদের মধ্যে নাট্যরসের প্রাধান্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কর্মফল' ও 'শেষের রাত্রি'—ইহাদের নাট্যরূপের নাম 'শোধবোধ' ও 'গৃহপ্রবেশ'। প্রথম গল্পটির ঘটনা-সংঘাত ও ভাগ্য-পরিবর্তন ইহার নাটকোপযোগিতারই পরিচয় বহন করে—বিশেষতঃ ইহার সংলাপ-প্রাধান্য ইহার সহিত নাটকের আত্মীয়তাকেই পরিস্ফুট করে। দ্বিতীয় গল্পে যতীনের রোগতপ্ত মনের বিকার, উহার স্ত্রীর ভালবাসায় অগাধ বিশ্বাস ও বেদনাময় রূঢ় সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে মাসীমার অপার ধৈর্য ও মিথ্যা আশ্বাস দিবার অসাধারণ উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল আমাদের সমস্ত মনকে একটি ব্যথিত করুণার রেশে পরিপূর্ণ করে। মৃত্যুপথ-যাত্রীর একটি ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, রুগ্নমনের নানা অসুস্থ ও অবাস্তব কল্পনাজাল রোগকক্ষের ন্যায় সমস্ত নাটকটিকে একটি রুদ্ধ, ভারী গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ইহার সমস্ত বস্তুরূপ যেন একটি ভাবনির্যাসের আধার। এইরূপ এককেন্দ্রিক বিষয়ের সহিত যদি কোন নাটকের সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা সাঙ্কেতিক নাটক। 'রাজা' নাটকে অদৃশ্য রাজার মত এখানে অন্তরালবর্তিনী মণি তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে সমস্ত নাটকখানিকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

উপন্যাসধর্মী ও নাট্য-রস-প্রচ্ছন্ন গল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ফর্ম বা অঙ্গবিন্যাসের দিক দিয়াও আলোচ্য। ইহার প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, তাহার অনুশীলনও সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত

ছোটগল্পের আঙ্গিক

করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে এখনও সজীব আছে ও প্রতিভার স্বধর্ম-অনুযায়ী নব নব বিকাশের প্রেরণা যোগাইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ভবিষ্যৎ প্রভাবের দিক দিয়া অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে, আমাদের আধুনিক গল্প-লেখকেরা ছোটগল্পের অর্ঘ্য সাজাইয়াই রবীন্দ্র-পূজার অধিকারী হইয়াছেন, এ দাবী নিঃসংশয়ে করা চলে।

গ—নাটক

(৮)

রবীন্দ্র-প্রতিভায় নাটক-রচনা তাঁহার কাব্যোচ্ছ্বাসের সমুদ্রের একটা স্থলানুপ্রবিষ্ট শাখানদী। এই সীমাহীন সমুদ্রকে নির্দিষ্ট-সীমাবেষ্টিত নদীতে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে জহ্নু মুনির মত তরঙ্গবিক্ষোভের খানিকটা নাকানি-চোবানি খাইতে হইয়াছে—তিনি সব সময় ইহাকে সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মধ্যে আটকাইতে পারেন নাই। নাট্যকলা যে তাঁহার শিল্প-স্বধর্মরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার একই বিষয়ের উপর লেখা নাটকের মুহুর্মুহুঃ রূপ ও ভাবকেন্দ্রের পরিবর্তনে।' যিনি স্বভাব-নাট্যকার তাঁহারও অবশ্য শিক্ষানবীশির যুগ আছে, কোনও বিষয়ের মূলনাট্য-তাৎপর্য হয়ত গোড়া হইতেই তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠে না। কিন্তু আত্মস্থতা-লাভের পর কবিতার রূপের ন্যায় নাটকের আঙ্গিক ও অন্তঃপ্রকৃতি তাঁহার নিকট চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইয়া যায়—মূর্তি আঁকিয়া বা গড়িয়া উহাকে বার বার ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হয় না।

নাটকসৃষ্টিতে আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব ও মন্ময়তার প্রাচুর্য

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নাট্যকার-সত্তা ছিল, সে সর্বদাই পরীক্ষা-বিব্রত, শিল্পীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপসুষমার অনুসন্ধানে অস্থির। এমন কি যে রূপক-নাট্য তাঁহার কবিপ্রকৃতির সহিত সর্বাধিক একাত্ম, সেখানেও তিনি নূতন নূতন কল্পনার অঙ্কুশ-তাড়িত, নূতন ভাবকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত, নূতন ভাঙ্গা-গড়ার নেশায় রূপনির্মিতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত। তাঁহার মন্ময়তা এত প্রবল যে, তিনি নাটক লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই—তাঁহার নরনারী এক-একটি মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদেহী চেতনার এক-একটি অর্ধ-পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পর্যবসিত। অসম্পূর্ণ প্রয়াসের খণ্ডাংশ-বিকীর্ণ বাংলা নাটকের মন্দিরে রবীন্দ্র-

নাথও তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত, কিন্তু রূপের দিক দিয়া অসমাপ্ত খণ্ডমূর্তিগুলি স্থাপন কবিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাব নাট্যবচনাব মোটামুটি ছয়টি স্তব নির্দেশ কবা যায়। প্রথম স্তবে গান ও সুর-প্রধান নাটক—'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১), 'কাল-মৃগযা' (১৮৮২), 'মায়াব খেলা' (১৮৮৮), দ্বিতীয় স্তবে মনস্তত্ত্বানুবর্তী নাটক—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'বাজা ও বানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'শোধবোধ' (১৯২৬), তপতী (১৯২৯), তৃতীয় স্তরে কাব্যপ্রধান নাটক—'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), বিদায অভিশাপ' (১৮৯৩), 'গান্ধাবীব আবেদন' (১৮৯৭), 'সতী' (১৮৯৭), 'নবকবাস' (১৮৯৭), 'লক্ষ্মীব পবীক্ষা' (১৮৯৭), 'কর্ণ ও কুন্তী' (১৯০০), চতুর্থ স্তবে রূপক-নাটক—'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘব' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) ; 'গুরু' (১৯১৮), 'অরূপ রতন' (১৯২০), 'ঋণশোধ' ('শাবদোৎসব') (১৯২১), 'মুক্তধাবা' (১৯২৫), 'বক্তকববী' (১৯২৬), 'কালেব যাত্রা' (১৯৩২); পঞ্চম স্তরে নৃত্যকাব্য—'নটীব পূজা' (১৯২৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) ও 'তাসেব দেশ' (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য—'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮), 'শ্যামা' (১৯৩৯) ও ষষ্ঠ স্তবে প্রহসনজাতীয় কৌতুকবস-প্রধান কয়েকখানি নাটক —'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) (পববর্তী সংস্কবণ 'শেষবক্ষা' (১৯২৮), 'বৈকুণ্ঠেব খাতা' (১৮৯৭) ; 'শোধবোধ' (১৯২৬) ('কর্মফল'-এব নাট্যরূপ), 'প্রজাপতিব নির্বন্ধ'-এব (১৯০৮) নাট্যরূপ—'চিবকুমাবসভা' (১৯২৬)।

রবীন্দ্র-নাট্যাবলীর স্তর-বিভাগ

এই তালিকা ও স্তববিভাগ হইতে ববীন্দ্রনাথেব নাটকেব বীতি-বৈচিত্র্য ও বিবিধ রূপের আশ্রয়ে স্ফুরণ-প্রবণতাব একটা ধাবণা করা যায়। লক্ষ্য কবিবার বিষয় এই যে, দ্বিতীয় স্তরে মনস্তত্ত্বানুবর্তী নাটক ছাড়া অপব সকল প্রকারেব নাটক কোন না কোনরূপ নাটকাতিরিক্ত রচনাপ্রকবণ হইতে প্রেবণা আহরণ কবিয়াছে। এমন কি, দ্বিতীয় শ্রেণীব নাটকের কতকগুলি পূর্বলিখিত উপন্যাসেব নাট্য-রূপ ও অন্য বীতিতে গ্রথিত কাহিনীব মধ্যে নাট্য-সম্ভাবনার বিলম্বিত আবিষ্কারের ফল। যে রূপক-নাটকগুলি ববীন্দ্র-জীবনবোধেব বিশেষত্বমণ্ডিত, সেগুলিও প্রধানতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী ও জীবনেব প্রতি পবোক্ষদৃষ্টিসঞ্জাত। মনে হয়, যে দৃষ্টিতে জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাট্যসংঘাতেব রূপ পরিগ্রহ করে, ববীন্দ্রনাথের সে দৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথের নাটক-সৃষ্টির প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, বিবর্তিত

ছিল না; তাঁহার বিষয়গুলি অপর কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া নাটকাকারে দানা বাঁধিয়াছে; মনের অনেক কক্ষ ঘুরিয়া, চিন্তা ও জীবনচেতনার নানা বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাটকীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। তিনি ঠিক স্বভাব-নাট্যকার নহেন; কবি, ঔপন্যাসিক ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ হইতে ক্রমোত্তরণের ফলে, পূর্বসৃষ্ট রসকে নূতনভাবে চোলাই করিয়া, উহার মধ্যে আস্বাদন-বৈচিত্র্য-সঞ্চারের পরীক্ষামূলক প্রয়াসের ভিতর দিয়াই তিনি অবশেষে নাট্যকার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন শান্তিনিকেতনের নির্জন তপশ্চর্যার আশ্রম প্রথমতঃ ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পরে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণ ও মানবমনের বিচিত্র ভাব-বিনিময় ও আবেগ-সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎ, রূপবিলাসের জগৎ, তত্ত্বধ্যানের জগৎ, হৃদয়াবেগের ছন্দঃপ্রবাহময় জগৎ কোন কোন অংশে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া, নাটকীয় মূর্তিভাস্কর্যের স্থির রেখার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিজ স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেও প্রয়াস পাইয়াছে।

(৯)

গীত হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যলীলাস্ফুরণ হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' গীতনির্ঝরের অজস্র ধারার উপরই নাটকের ভাব-বিগলিত, রস-বিহ্বল ভিত্তি রচনা করিয়াছে। সংলাপ, ভাবের পরিবর্তন, চরিত্রের ঈষৎ আভাস, ঘটনার পরিণতি ইত্যাদি সকল দিকেই নাটক-তরণী গীত-প্রবাহের উপর দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। এখানে গান ও প্রেমই সর্বস্ব; ইহাদের মায়া-মুকুরে নাটকের ছায়ামাত্র আপনাকে প্রতিফলিত দেখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন নাট্যরস লেখকের অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রেমমুগ্ধ চিত্তের অস্থিরতা ও আত্মবিভ্রম। গানের জালে প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া নাটক-হরিণকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা এখানে দেখি।

প্রথম স্তরের নাটকের গীত-সর্বস্বতা

দ্বিতীয় স্তরে রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রচলিত আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া মানস দ্বন্দ্বের একটা রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর উদ্দেশ্য তত্ত্ব-প্রতিপাদন; ইহার চরিত্রগুলি সবই রূপকধর্মী, তত্ত্বসমস্যার বিভিন্ন উপাদানের প্রতিচ্ছবি। এখানে সমস্ত মায়াবন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী জীবনমমতা-রূপিণী বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অনুশোচনা-পীড়িত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি মানবিক; উহার রূপায়ণ-পদ্ধতি ঠিক নাট্যধর্মী না হইয়া অনেকটা আখ্যানধর্মী হইয়াছে। তথাপি তত্ত্ব-রূপকাশ্রিত

'প্রকৃতির প্রতিশোধে' মানবিক দ্বন্দ্ব

অন্তর-সংঘাতেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে; ইহা মানুষেরই কথা, তবে একটু তির্যক দৃষ্টিতে লক্ষিত ও একটু বাষ্পাবরণের ব্যবধান হইতে অনুভূত। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনসমস্যাকে নাট্যরূপ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত, তাহারই প্রমাণ মিলে।

'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক। এখানে নাটকের কয়েকটি অত্যাবশ্যক উপাদান দেখা যায়—দৃঢ়চরিত্র, সংকল্পে কঠোর নর ও নারী ও উহাদের মধ্যে প্রণয়ের অতৃপ্তি ও আদর্শের পার্থক্য লইয়া নিদারুণ সংঘাত। নাটকের পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসনপ্রণালী, রাজার যথেচ্ছাচার ও প্রজার দুঃখে নির্মম উপেক্ষা, রাজনৈতিক কূটনীতি ও ষড়যন্ত্র ও কতকগুলি পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশ। বিক্রম ও সুমিত্রার আদর্শ-সংঘাতক্ষুব্ধ ও একদিকে হিংস্র জিঘাংসায় ও অন্যদিকে অনমনীয় বিমুখতায় রূপান্তরিত প্রেমের বিপরীত—রূপে কুমার ও ইলার সমপ্রাণতা-মধুর কিন্তু অদৃষ্টবিড়ম্বিত প্রেম এবং নরেশ ও বিপাশার বাইরের বাগ্-বিতণ্ডার অন্তরালে পারস্পরিক আকর্ষণ দেখান হইয়াছে। কিন্তু যে বৈপরীত্য নাটকের প্রাণ হইতে পারিত, তাহা কেবল বহিরঙ্গমূলক সংযোজনায় পর্যবসিত হইয়াছে, ইহা পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ, নাটকীয় তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে নাই। কুমার ও ইলা, নরেশ ও বিপাশা বিক্রম-সুমিত্রার সম্পর্ককে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরূপেই প্রভাবিত করে নাই। আসল কথা, বিক্রমের কোন প্রতিনায়ক নাই; তাহার দুর্জয় অভিমান সুমিত্রার আত্মবিসর্জনে নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য কাহারও প্রভাবে ইহার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই। বিক্রমের অতিরঞ্জিত আত্মরতিকে নাটকীয় স্বাভাবিকতা দিতে গেলে উহার বিপরীতধর্মী কোন চরিত্রসৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। এইখানেই নাটকীয় সংঘাত খানিকটা কৃত্রিম ও মাত্রাহীন হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পরবর্তী পরিবর্তিত সংস্করণ 'তপতী' হইতে কুমার ও ইলার অংশ বাদ দিয়াছেন এবং অতিরিক্ত ভাববিলাসকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও নাটকীয় ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। আসল কথা, বিক্রমের ন্যায় দুর্ধর্ষ চরিত্রের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নাটকীয় রসসিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক; সুমিত্রার নীরব প্রতিরোধ ও নৈতিক আত্মবলিতে নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 'তপতী'তে সুমিত্রার দিব্যরূপটিকে প্রাধান্য দেওয়াতে এই পরিণতির সহিত নাটকের পূর্ববর্তী ঘটনাবিন্যাসের

'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী' নাটকে সংঘাতের কৃত্রিমতা

সংযোগ অনেকটা শিথিল হইয়াছে। 'রাজা ও রানী' আতিশয্য-বিড়ম্বিত নাটক; 'তপতী' অদ্বৈত ভাবের বাহনরূপে অনেকটা রূপক-লক্ষণান্বিত।

'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক—ইহা 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। 'রাজা ও রানী'তে প্রকৃত নাটকীয় সংঘর্ষের যে অভাব ছিল, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য সক্রিয়তার দিক দিয়া রঘুপতির সমতুল্য নহেন, কিন্তু তিনি যে ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক, তাহা কর্মে ব্যর্থ হইলেও সূক্ষ্মতর নীতিবিধানের মাধ্যমে রঘুপতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। এক অমোঘ ন্যায়-বিধির ফলে রঘুপতির নিজের অস্ত্র ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ ও রক্তপাতে উত্তেজনা গোবিন্দমাণিক্যের যতটা পরাভব ঘটাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রঘুপতির ক্ষেত্রে আরও মর্মভেদী পরাজয়ের হেতু হইয়াছে। নক্ষত্ররায় গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, রঘুপতিকেও নির্বাসনে পাঠাইয়াছে। জয়সিংহ রঘুপতিকে রাজরক্ত দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজের ও রঘুপতির বুকেই ছুরিকাঘাত করিয়াছে, অপর্ণার সম্বন্ধে উচ্চারিত সাবধান-বাণী তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রঘুপতির শোকোচ্ছ্বাস নাটকীয় তীব্রতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যদিও বর্ণনারীতি নাট্যধর্মী অপেক্ষা বেশী কাব্যধর্মী।

'বিসর্জন'-এর কাব্যধর্মিতা

'মালিনী' কোনও দিনই বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই—এক্ষেত্রে ট্রাজেডির যে প্রধান কারণ—হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্মবিরোধ—তাহা নাটকীয় সংহতি ও সংঘাততীব্রতা লাভ করে নাই। ক্ষেমঙ্কর, সুপ্রিয়, মালিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলি হয় দুর্বল, না হয় একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। রঘুপতির সহিত তুলনায় ক্ষেমঙ্করের প্রতিহিংসা আরও ভয়াবহ ও অ-মানবিক হইয়াছে। রঘুপতির ধর্মান্ধতার প্রতি কতকটা সহানুভূতি দেখান যায়; কিন্তু 'মালিনী' নাটকে ধর্মান্ধতা কোন সর্বজনীন নীতিমূলক নহে, ষোল আনা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত। মালিনীর শান্তিপ্রিয়তা ও আপোষ-মূলক মনোবৃত্তি ট্রাজিক সংঘর্ষ ঘটাইবার মত শক্তিশালী প্রভাবরূপে অনুভূত হয় না। এই নাটকের আপেক্ষিক অসাফল্যের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের গতি পরিবর্তিত করিলেন এবং প্রাচীন প্রথা পরিহার করিয়া নূতন নাটকীয় রীতি অবলম্বন করিলেন।

'মালিনী' জনপ্রিয় না হইবার কারণ

তৃতীয় স্তরে তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করিলেন, তাহা মূলতঃ কাব্যধর্মী

সংলাপ ও ইহার মধ্যে চরিত্রের ক্ষীণ আভাস দান। ইহাদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, তাহার প্রকাশ নাটকীয় নহে, তাহা কাব্যের দীর্ঘ-পল্লবিত সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাসের মধ্যে অভিব্যক্ত। 'চিত্রাঙ্গদা' মদন-দেবের নিকট রূপ ঋণ লইয়া যে অর্জুনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার জন্য তাহার মনে অনুতাপ ও আত্মধিক্কার জাগিয়াছে। অর্জুনেরও চিত্রাঙ্গদার প্রতি ভাব-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উপস্থাপনা হইয়াছে নাটকীয় রীতিতে নহে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণ ও প্রেম-নিবেদনের দ্বারা। মনস্তত্ত্ব ও হৃদয়-সংঘাতের ইঙ্গিত এই কাব্য-প্লাবনের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার বহিরঙ্গ নাটকের, কিন্তু অন্তরাত্মা কাব্যের।

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যাকারে কাব্য

'গান্ধারীর আবেদন'-এ আখ্যান এবং গম্ভীর ও সমুন্নত নীতি-প্রতিষ্ঠার প্রাধান্য, নাটকীয়তা এখানে গৌণ। চরিত্রের এখানে কোন পরিবর্তন নাই, কেননা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল। ইহাদের মধ্যে যে সংলাপ-বিনিময় ঘটিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের মতবাদের মন্থরগতি উপস্থাপনা ও পরস্পরের যুক্তিখণ্ডনের দীর্ঘসময়সাপেক্ষ আয়োজন আছে, কিন্তু কোথাও নাটকীয় উত্তেজনা ও অন্তর্ভেদী অস্ত্রক্ষেপের নিদর্শন নাই। ইহার মধ্যে কেবল ধৃতরাষ্ট্রই উভয় আদর্শের মধ্যে দোলায়মান ও অস্থিরমতি বলিয়া খানিকটা নাটকীয় লক্ষণান্বিত। গান্ধারীর শেষ অভিশাপে তীব্র আবেগ আছে, কিন্তু ইহা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণতি নহে, নিজের মনে যে সঞ্চিত উত্তাপ ছিল, অন্তরের আলোড়নে তাহারই বিস্ফোরক প্রকাশ।

'গান্ধারীর আবেদনে' নাটকীয়তা গৌণ

কাব্যধর্মী নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় পরিস্থিতি দেখা যায় 'কর্ণ ও কুন্তী'-তে। কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎ ও আলাপের উপলক্ষ্য নাট্য-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ও উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে একদিকে বিস্ময়বোধ, অন্যদিকে অপরাধের ক্ষালন-চেষ্টা ও অস্বীকৃত সন্তানের নিকট কুণ্ঠিত প্রসাদ-ভিক্ষা এক তীব্র নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত সংলাপের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন সুর—মাতার প্রতি পুত্রের অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুযোগ ও অপরাধিনী মাতার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াও পুত্রের প্রতি করুণ কাতর আবেদন—দুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘর্ষের আগ্নেয় পরিবেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। উভয়ের বক্তৃতাই অপরের আগ্রহাতিশয্যে, আবেগের অধীর অনিবার্যতায় সংক্ষিপ্ত

'কর্ণ ও কুন্তী' শ্রেষ্ঠ কাব্যধর্মী নাটক

ও খণ্ডিত হইয়াছে—ইহা যেন কাব্যের একটানা প্রবাহ নহে, নাট্য-বিরোধের দুই বিপরীতমুখী ছন্দ যেন ইহার ভাবস্রোতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে। কর্ণের উক্তিতে তীব্র শ্লেষ ঝলসিয়া উঠিয়াছে, কুন্তীর বাক্যে অসহায়ত্বের আক্ষেপ ধ্বনিত হইয়াছে। আবেগের এই দ্বিমুখী সংঘাতে অতীত স্মৃতি উথলিয়া উঠিয়াছে, আখ্যানের ধারাবাহিকতা কয়েকটি দ্রুত ভাবতরঙ্গের আনাগোনায় বিদীর্ণ হইয়া উহার অন্তর্নিহিত নাট্য-তাৎপর্যটি নূতন করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছে। আখ্যানের উপসংহারটিও শুধু অপরিবর্তনীয় পূর্বসিদ্ধান্তের পুনরুক্তি না হইয়া সংঘর্ষ হইতে সদ্যোজাত এক নূতন সঙ্কল্পকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—কর্ণ যাহা শেষ পর্যন্ত স্থির করিয়াছে তাহা তাহার মাতার সহিত বোঝাপড়াব ফল। সুতরাং এই পরিসমাপ্তিও নাট্য-গুণাঢ্য হইয়াছে। এই রচনাটিতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্যধর্মের সার্থকতম সমন্বয় ঘটিয়াছে।

. চতুর্থ স্তরের রূপক-নাটক-পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকলার স্বকীয়তা উদাহৃত হইয়াছে। অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও ঐশ স্পর্শের জন্য উন্মুখ কবি যখন এই বিষয় লইয়াই নাটক লিখিয়াছেন, তখনই উহা তাঁহার বিশিষ্ট অনুভূতির বাহন হইয়া উঠিয়াছে। স্থূল রক্তাক্ত সংঘাত, বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে, অন্তরের সূক্ষ্ম ভাব, অধ্যাত্ম-সাধনার ব্যাকুলতা হইতে উদ্ভূত বিভ্রান্তি ও আত্মদ্বন্দ্ব, গভীর, আত্মমগ্ন অনুভূতির ব্যঞ্জনা নাটকের বস্তুদেহ ও আন্তর প্রেরণা যোগাইয়াছে। ধর্মবোধ হইতে কবি ক্রমশঃ জাতিবৈর ও যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার মর্মমূলে যে আত্মঘাতী শক্তিমত্ততা ও শূন্যতাবোধ বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাও তাঁহার রূপক-কল্পনা ও নাট্যকলাব অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় নাটক যে ধর্মপ্রাণ ও সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন বাঙালীর ঐতিহ্য ও সহজ জীবনযাত্রার অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কারণে অলৌকিকরসপূর্ণ যাত্রা ও যাত্রাধর্মী নাটক বাঙালীর অধিক প্রিয়, অনেকটা সেই কারণেই রূপক-নাটকের অন্তর্মুখী ভাবাবেদন তাহার অধিকতর মর্মানুসারী। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'রাজা' ও উহার রূপান্তরিত সংস্করণ 'অরূপ রতন' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজার অন্তরালবর্তী, অথচ সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি, তাঁহার নিগূঢ় রহস্যময়, অথচ ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্নভাবে প্রতীয়মান সত্তা ও তাঁহার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী গুণের সমন্বয়, সুদর্শনার তাঁহাকে রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার আকুতি ও ইহার ব্যর্থতায় তাহার নানাবিধ মানস প্রতিক্রিয়া, কাঞ্চীরাজের তাঁহার সহিত শক্তি-প্রতিযোগিতার স্পর্ধা, ভগবান সম্বন্ধে সাধারণ;

শ্রেষ্ঠ রূপক-নাটক 'রাজা'

লোকেব নানা ভ্রান্ত ধারণা ও মেকি রাজার নিকট তাহাদেব আনুগত্য-স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভ্রান্তির নিরসনে, সমস্ত অভিমান-অহঙ্কারের অবসানে ভগবৎ-স্বরূপের প্রকৃত উপলব্ধি ও তাঁহাব উপর কোন দাবী-দাওয়া না রাখিয়া নিঃসর্ত আত্মনিবেদন—এই সমস্ত রূপকানুভূতিব সমাবেশে, মানস ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল, অথচ শান্তরস-পরিপ্লুত একখানি চমৎকার নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। গানের মধ্যেও সেই ব্যঞ্জনা, মানস অনুভূতির সেই আলোডন, প্রতীতির সেই সুর নাট্যক্রিয়ার সমর্থন ও পরিপূবণের কাজ করিয়াছে। হয়ত প্রাকৃত জনসাধারণের সংলাপ কিংবা প্রতিযোগী রাজাদেব ক্রিয়াকলাপ একটু মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু বাদ দিলে নাটকের বহির্ঘটনা ও চরিত্রকল্পনা উহার অন্তরের অধ্যাত্ম-সত্যের এক সার্থক ও জ্যোতির্ময় দেহাবরণ রচনা করিয়াছে।

'ডাকঘর'

এক মৃত্যুপথযাত্রী-বালকের মুক্তিপিপাসা, ভগবান-প্রেরিত চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চিকিৎসাব নানা বাধা-নিষেধ-মুক্ত, অবারিত স্বাধীনতায় তাহাব ভগবৎ-সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি 'ডাকঘর'-এর রূপক-আবরণ বচনা করিয়াছে। বালকের সরল বিশ্বাস, মুক্ত, বাধাহীন জীবন ও প্রকৃতির সুদূর আহ্বানের জন্য আকৃতি, চিঠি পাইবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ—এ সবই মানবের জীবন-আস্বাদ ও ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য অপ্রশমিত আবেগকে ব্যঞ্জিত কবে। এই রূপক-নাটকের নাটকীয়তা অমলের রুগ্ন মনের করুণ অভিলাষ, যাহা অপ্রাপনীয় তাহাব জন্য তাহার অশান্ত আক্ষেপের মধ্যে নিহিত। গীতি-মূর্ছনার একটি সুর যেন নাটকীয় আবেগের মধ্যে এখানে মূর্ত হইয়াছে।

'ঋণশোধ' বা 'শারদোৎসব'

'ঋণশোধ' বা 'শারদোৎসব'-এ শরতের দিগন্ত-প্রসারিত, আলোকোজ্জ্বল আনন্দ যেন গানে, সংলাপে, পাত্র-পাত্রীর আত্মহারা হর্ষচাঞ্চল্যে, গীতিকবিতার অপেক্ষা আরও নিবিড়, বস্তু-ও-ভাবময় রূপ পাইয়াছে। এখানে নাটকীয় সংঘাত সূক্ষ্মতম ও স্বল্পতম আয়তনে সঙ্কুচিত হইয়াছে। যেমন শরতের অম্লান আলোক বদ্ধ গুহায় ও তরু-লতাহীন গিরিশৃঙ্গে অনুপ্রবেশ করিয়া বিরোধী পদার্থের উপরও উহার জয়পতাকা উড়ায়, তেমনি এই নিখিলব্যাপ্ত আনন্দ কৃপণ ধনীর অন্ধকার কোষাগারে ও কর্তব্য-নিষ্ঠ বালকের পুঁথিপত্র-ঘেরা সাধনকক্ষেও উহার সর্বজয়ী হর্ষহিল্লোল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। লক্ষেশ্বর বা উপানন্দ সত্যই আনন্দ-বিমুখ শক্তির প্রতীক নহে, বরং ইহারা আনন্দরস-শোষণের তৃষ্ণার্ত পাত্র; ইহাদের মধ্যেই আনন্দের

চরম শক্তির বিকাশ হইয়াছে। রাজা, ঠাকুরদাদা, বালকগণ—ইহারা মানব নহে, আলোক-রস-মত্ত, বাতাসে গা-ভাসান, বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি। এই বিশুদ্ধ ভাব-রসপুষ্ট, আত্মার দ্যুতিতে জ্যোতির্ময় নাটকটি লঘুতম বস্তু-উপাদানে গঠিত।

'অচলায়তন'

এই পর্যায়ের নাটকসমূহের মধ্যে 'অচলায়তন' ব্যঙ্গাত্মক ও বিশিষ্ট-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এখানে অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুভূতি অপেক্ষা প্রাণহীন প্রথা ও আচারের ভারে ক্লিষ্ট ধর্মসাধনা-পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। রূপকের প্রয়োগ-কল্পনার বিস্তার ও ইঙ্গিতময়তার পরিবর্তে বস্তু-প্রতিবস্তূপমার মত একটা অতিনির্দিষ্ট আক্ষরিক সাদৃশ্যই এখানে প্রকট। ইহাতে নাটকীয় বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভগবৎস্বরূপ-উপলব্ধির সুস্পষ্ট আভাসের পরিবর্তে পাই প্রচলিত সাধনা-প্রক্রিয়া ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের ব্যর্থতা-প্রতিপাদন। আদিগুরুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা কোন নাটকীয় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে না। সঙ্কেতময় নাটকে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের প্রখরতা আবহাওয়ার সঙ্গতি-বিরোধী।

'ফাল্গুনী'

'ফাল্গুনী'-তে রবীন্দ্র-কাব্যে যে জীবন-দর্শন পুনঃ পুনঃ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, তাহারই নাট্যরূপ পাই। এই নাটকে যৌবন ও জরামৃত্যুজয়ী, নব নব জন্মে নূতনরূপে আবির্ভাবশীল মানবাত্মার জয়গান করা হইয়াছে। ইহাতে নাট্যবস্তুর বিশেষ কিছু নাই—কবির অনুভূত জীবন-সত্যকে কয়েকটি ভাব-বিগ্রহরূপী মানুষের গান ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই সত্যের বাহন হওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, রক্তমাংসময় অস্তিত্ব কিছু নাই। আনন্দ-নির্ঝর-প্রপাতেব শীকরবিন্দুগঠিত ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় তাহারা আমাদের চোখের সামনে একটা রঙীন উচ্ছ্বাসেব মত মুহূর্তের জন্য প্রতিভাত হয়। উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দ যেন নিজ আতিশয্যের বাষ্পেই মানবমূর্তি ধারণ করিয়াছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গীতি-নাট্যেরই পরিণত প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শনের গভীরতর প্রত্যয়সমন্বিত প্রত্যাবর্তন।

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' মানবজীবনের আধুনিক সমস্যা-কণ্টকিত, বিস্তৃততর ক্ষেত্রে রূপককল্পনার সম্প্রসারণ। ইহাতে সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। প্রথমতঃ ধর্মজীবনের সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিবর্তে আমরা এখানে সমসাময়িক বাস্তব জীবন-যাত্রার তীক্ষ্ণতর আবেদন-সম্পন্ন ছবি প্রত্যক্ষ করি। জাতি-বিদ্বেষ ও যন্ত্রসভ্যতা এই দুইটি অতিপরিচিত জীবনসত্য রূপকের কল্পনারঞ্জিত

ছদ্মবেশে আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়া আমাদের কৌতূহল ও রসগ্রাহিতাকে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করে। সুতরাং ইহাদের মানবিক আবেদন আরও বেশী হইবে—এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইজাতীয় বিষয়ের যে গুরুতর অসুবিধা তাহা এই যে, ইহাদের নানামুখী ও অতিপ্রত্যক্ষ বস্তুসত্তাকে রূপক-প্রয়োগের উপযোগী সূক্ষ্মতর ভাবরূপ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ভগবান অবাঙ্‌মনসো-গোচর হইলেও সুদীর্ঘ ধর্মসাধনার ফলে আমাদের তাঁহার সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট বোধ আছে; এবং এই বোধকে রূপকের ইঙ্গিতের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের রাজনীতি ও অর্থনীতি শতবাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে এরূপ আষ্টে-পৃষ্ঠে বেষ্টিত কবিয়াছে যে, ইহাদিগকে একটা কাল্পনিক ভাবসত্তায় সংহত করা যায় না। আবার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বস্বীকৃত ভাবসত্তা না পাইলে রূপক-কল্পনা প্রয়োগ করা অসম্ভব। বরং যন্ত্রসভ্যতায় পিষ্ট মানবাত্মার একটা শূন্যতাবোধক্লিষ্ট, অনির্দেশ্য-অতৃপ্তিবেদনাজড়িত পরিচয় আমাদের নিকট এক অখণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট, অতিবাস্তব সমস্যার সৃষ্টি কবে, তাহাকে সাঙ্কেতিকতার ভাবচ্ছটাময় পরিধিতে সুবিন্যস্ত করার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে। সেইজন্য 'মুক্তধারা'য় রূপকানুরঞ্জন অনেকটা ব্যর্থ। কুমার অভিজিৎ যে মন্ত্রে রুদ্ধ ঝরণার উৎসমুখ খুলিয়া দিলেন তাহার ভাবস্বরূপ ও গুরুতর ব্যঞ্জনা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। মহাকালের মন্দিরচূড়া ও যন্ত্ররাজ বিভূতির অস্তসূর্যরশ্মির রক্তিম-মদিরাপায়ী, গর্বোদ্ধত যন্ত্রদানব দুই বিপরীত প্রতীকরূপে কল্পিত হইলেও আমাদের মানস সংস্কারের নিকট অপরিচিত থাকিয়াই যায়। কবির সচেতন আলঙ্কারিক নির্মিতি আমাদের সহজ বোধের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ পায় না। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে একটা বিশেষ দেশের রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও কর্মপদ্ধতির ছায়াপাত হইয়া তাহার সার্বভৌম প্রতীকরূপকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ইহার আকাশ কোথাও বাস্তবের কোলাহলে মুখর, কোথাও সুলভ আদর্শবাদের প্রচুরোৎসারিত ধূমে আবিল, কোথাও বা সার্থক সংকেতের আভায় রঙ্গীন—সমস্ত মিলিয়া এক নিবিড় ভাবসংহতি গড়িয়া উঠে নাই।

'মুক্তধাবা'ব সহিত তুলনায় 'রক্তকরবী'র সাঙ্কেতিক তাৎপর্য অনেক স্পষ্টতর ভাবে অভিব্যঞ্জিত। এখানে অন্তত তিনটি চরিত্র আছে, যাহারা রূপক-প্রভায় ভাস্বর ও সার্বভৌম সত্তায় উন্নীত—লৌহজালের অন্তরালস্থ রাজা, নন্দিনী ও রঞ্জন। রাজা তাহার প্রচণ্ড শক্তির ব্যর্থ প্রয়োগে আত্মদ্বন্দ্বজর্জর—তাহার সৃষ্টি-

প্রতিভা শুধু বস্তুপুঞ্জসঞ্চয়ে বিড়ম্বিত। নন্দিনী প্রাণময় সত্তা—অতৃপ্তিপীড়িত সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ, সুস্থ-আত্মবিকাশবঞ্চিত জগতে সে আশা ও আনন্দের চকিত আভাস বহন করে। রাজার সঙ্গে তাহার কোথাও যেন একটা মিল আছে; দুর্বার শক্তির, আনন্দলোকে উত্তরণের প্রতি যে একটা সহজ প্রবণতা আছে তাহাই নন্দিনীর সহিত রাজার যোগসূত্র। এই পথে যে অনতিক্রম্য বাধা আছে তাহাই রাজাকে একটা দুর্বোধ্য আত্মপীড়নের চক্রে ঘূর্ণিত করিয়াছে। রঞ্জন ব্যক্তিসত্তাবর্জিত, বিশুদ্ধ আনন্দসার। তাহাব আসন্ন আবির্ভাব সমস্ত আকাশ-বাতাসে এক পুলক-প্রত্যাশার বসন্তবায়ুরূপে হিল্লোলিত হইয়াছে; রক্তকরবীর শিরোভূষণে তাহার আরক্ত সঙ্কেত। প্রাণসত্তা, নিখিলের মর্মকোষ-ক্ষরিত এই আনন্দরস হইতে, উহাব আত্মবিকাশের সমস্ত প্রেরণা, উহার অদম্য আশাবিকিরণের সমস্ত উৎসাব-শক্তি আহরণ কবে। রঞ্জন ছাড়া নন্দিনী অসম্পূর্ণ, সেইজন্য রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন-আভাসে সমস্ত নাটকটি পবিপূর্ণ। বাজা রঞ্জনকে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে এক আত্মঘাতী, মূঢ় বোষোচ্ছ্বাসে হত্যা করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আলোককে নির্বাপিত করিয়াছে, সমস্ত প্রাণচঞ্চল জীবনলীলার উপর সমাধির নিশ্চল স্তব্ধতার আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এই পযন্ত রূপককল্পনাব সার্থক, সাবলীল, সৃষ্টিরহস্যভেদী প্রসার। বাকী অংশ, কল-কারখানার মজুরশ্রেণীর জীবন ও তদুপযোগী প্রতিবেশসৃষ্টি কবিকল্পনা নহে, সচেতন মননশীলতার নির্মিতি। এখানে আমরা পাই বুদ্ধিগ্রাহ্য, নির্দিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ, তীক্ষ্ণবাচনভঙ্গী-গঠিত রূপক (allegory); সাঙ্কেতিকতার রহস্যময় দ্যুতি এখানে উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার ঘেরাটোপে আবৃত।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীর সাংকেতিক তাৎপর্যের তুলনা

নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে নৃত্যকলার সাহায্যে ভাব-পরিস্ফুটনের নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কাজেই সংলাপ-রচিত হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র এই জাতীয় নাটকে গৌণ স্থান অধিকার করে। গান ও অর্থনিবিড় নৃত্যভঙ্গীর মাধ্যমে নাট্যরস-পরিবেশনের আয়োজন নাটকের সাধারণ আঙ্গিকে অনেকটা ফাঁক রাখিয়াছে ও ঠিক সাহিত্যিক নাটকের মানদণ্ডে ইহাদের বিচার চলে না। এই নব পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের পরে আর বিশেষ অনুসৃত হয় নাই ও ইহাদের উপস্থাপনা যে বিশেষ দৃশ্যপট, আলোক-সজ্জা ও নৃত্যনৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল তাহার বিচার ও মূল্যায়ন অনেকটা সাহিত্যনিরপেক্ষ। সুতরাং এগুলির বিশেষ আলোচনা না করিয়া ইহাদিগকে

নৃত্যনাট্য সাহিত্য-বিচারের বহির্ভূত

রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করাই বিধেয়। নাটকের মধ্যে এক নূতন কলার প্রবর্তন যে নূতন প্রত্যাশা জাগায় ও নূতন তৃপ্তি প্রদান করে তাহার ওজন ঠিক সাহিত্যিক তুলাদণ্ডে নির্ণীত হইবার নহে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকময়, হাস্যরসপ্রধান নাটক বা প্রহসনগুলির আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার নাট্যসৃষ্টির সম্পূর্ণ মণ্ডলটি প্রদক্ষিণ করিব।

কৌতুকনাট্য

এই স্ফূর্তির হিল্লোলে ভরা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মনোরম, নানা ভ্রান্তি, কৌতুককর ঘটনা ও খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে অফুরন্ত হাসির নির্ঝর এই নাটকগুলি আমাদের মনে একটি অবিমিশ্র হর্ষলোকের সৃষ্টি করে। কবির কল্পনাগুণে কলিকাতা শহর যেন একটি প্রেম ও যৌবনোচ্ছ্বাসের মায়া-পুরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে প্রেমিক যুবক পথে পথে প্রেমিকার অনুসন্ধান করিয়া ফেরে, নানা ভুলচুকের ও হাস্যকর অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার সত্য পরিচয় লাভ করে ও গুরুজনের মনে নানা বিস্ময়-কৌতুকের ও সময় সময় বিরাগের সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার সহিত মিলিত হয়। এখানে চিরকৌমার্য-ব্রতের অসম্ভব প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত দুইটি তরুণ বন্ধু একটি তরুণীশ্যালিকা-পরিবৃত পরিবারে আমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই তরুণীর প্রেমে পড়িয়া যায় ও তাহাদের সমস্ত কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া রঙ্গীন যৌবনস্বপ্নে প্রেমের বিচিত্র কল্পনা-রোমন্থনে বিভোর হইয়া পড়ে। এখানে নারী পুরুষের ছদ্মবেশে দুশ্চর ব্রতে যোগ দিয়া পুরুষ ব্রতধারীদের সংকল্প শিথিল করে ও প্রেমের মধুর মায়ালোকে প্রবেশ-ব্যাপারে তাহাদের পথ-প্রদর্শিকা হয়। এখানে শকুন্তলার আশ্রমে সখীদের ন্যায় সকলেই স্ত্রী-পুরুষ ও যুবক-প্রৌঢ়-নির্বিশেষে প্রেমের দৌত্যকার্যে স্বয়ংবৃত হইয়া এই মন-নেওয়া-দেওয়ার খেলায় যোগদান করে ও ইহাকে বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে লইয়া যায়। আবার কোথায়ও কোথায়ও কোন কল্পনাপ্রবণ যুবক প্রেমের আদর্শস্বপ্নের অনুধ্যান করিতে করিতে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হয় ও খানিকটা যৌবনসুলভ হা-হুতাশ করিয়া, কল্পিত দুঃখে তাহার সমস্ত প্রতিবেশকে বিষাদমন্থর করিয়া তাহার ছদ্মবেশিনী স্ত্রীর নিকটই প্রেম নিবেদন করে ও পুনর্মিলনের লজ্জা-কুণ্ঠিত আনন্দে তাহার পূর্বকৃত অপরাধের ক্ষালন করে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় একজন সরল ও উদারহৃদয় বৃদ্ধের সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা, তাহার নিকট যে আসে তাহাকেই তাহার খাতা পড়িয়া শুনাইবার দুর্দম খেয়াল নানা কৌতুককর অবস্থার সহিত স্থানে স্থানে করুণ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করিয়াছে; এই প্রহসনে প্রেমের উপস্থিতি পরোক্ষ ও গৌণ। প্রভুভক্ত দুর্মুখ ভৃত্য ঈশান ও

অন্তরালবর্তিনী অশ্রুমুখী বিধবা কন্যা নীরা ইহার হাস্যরসের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত গভীর সুরের প্রবর্তন করিয়াছে। এই নাটকসমূহে চরিত্রের স্বকীয়তা অপেক্ষা ঘটনাসন্নিবেশই প্রধান; প্রত্যেকটি চরিত্র ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। বৈকুণ্ঠ বা চন্দ্রকান্তের ন্যায় যে দুই-একজনের একটু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারাও উদ্ভট খেয়ালপ্রবণতার জন্য হাস্যরসের স্রোতকে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের কথার জৌলুস, সংলাপের তীক্ষ্ণ, শাণিত রসিকতার অজস্র প্রবাহ আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করে যে, আমরা ঘটনার সম্ভাব্যতা ও চরিত্রসঙ্গতি সম্বন্ধে কোন গভীর চিন্তাকে মনে স্থান দিতেই সময় পাই না। \রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবন ও প্রথম প্রৌঢ় বয়সে উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশের ঠিক প্রারম্ভে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনীভূত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, বাঙালীর মনে যে ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য আসিয়াছিল, জীবনকে সর্বসমস্যামুক্ত ও হাস্যকৌতুকে অনুরঞ্জিত করিয়া উহার পরিপূর্ণ রসোপভোগের যে ক্ষণিক প্রেরণা জাগিয়াছিল, সেই দক্ষিণপবন-বীজিত, প্রসন্নহাস্য-উদ্ভাসিত, মধুরকল্পনানন্দিত শুভলগ্নটি রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলির মধ্যে শিশিরোৎফুল্ল পুষ্পের পেলব সৌন্দর্যে চির-বিধৃত হইয়া রহিল।

ঘ—গদ্যরচনা

(১)

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার উপরও সেই অপরিমেয় বৈচিত্র্যের ছাপ আছে। তাঁহার প্রবন্ধগুচ্ছ, পত্রাবলী, ভ্রমণ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সংগ্রহের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের পরিচয় নিহিত। তাঁহার গদ্যরচনা ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে 'রামমোহন রায়' হইতে আরম্ভ; 'চিঠি-পত্র-এ'র প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭তে ও সমালোচনার প্রথম আবির্ভাব ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে। তাঁহার প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' দুইখণ্ডে ১৮৯১ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর মাঝে মধ্যে স্বল্প বিরতির পর এই গদ্য তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'স্বদেশী-সমাজ' (১৯০৪), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি সমালোচনাগ্রন্থ (সবই ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে রচিত), ১৪ খণ্ডে লেখা 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধসমষ্টি, 'জীবন-

গদ্যরচনার পরিধি

স্মৃতি' (১৯১২), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২), 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯২৯), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'জাপানে-পারস্যে' (১৯৩৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'পত্রধারা' (১৯৩৮), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১)—এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতে তাঁহার পরিধি-বিস্তার সহজেই অনুমান করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই তাঁহার গদ্যরচনার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। এই নানাবিষয়ক প্রবন্ধসম্ভারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতা, উচ্ছ্বসিত আবেগ, কল্পনাদীপ্তি ও ভাষা-প্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় মিলে। সাধারণতঃ তথ্যপ্রধান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিধর্মী, তীক্ষ্ণ ও স্মরণীয় বাক্যসন্নিবেশে তৎপর, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ও আলোচনার দীর্ঘ বিস্তার ও নিঃশেষ সমাপ্তির প্রতি আগ্রহশীল। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে লঘুস্পর্শ বা কল্পনার ক্রীড়াশীলতা বিশেষ দেখা যায় না—লেখকের অতিরিক্ত গুরুত্ববোধ (seriousness) ও উদ্দেশ্যের অতন্দ্র অনুবর্তন সময় সময় ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ-গুলিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগধর্মী ব্যাখ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও প্রগাঢ়তর অধ্যাত্ম-অনুভব ইহাদিগকে উচ্চতর সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ঐশ স্পর্শলাভের জন্য লেখকের আবেগময় আকূতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূলধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যময় প্রকাশ-রীতি ইহাদিগকে একাধারে সাহিত্যরসিক ও ধর্মপিপাসু উভয় শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উদার মানস মুক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা এবং বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির যান্ত্রিকতা ও অন্যান্য প্রকারের অপূর্ণতা যতটা ধরা পড়িয়াছে, গঠনমূলক পরিকল্পনার ততটা পরিচয় নাই। কবি তাঁহার বিশ্বভারতী-তে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত মাঝে মধ্যে পাওয়া গেলেও ইহার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগ-সফলতার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। মনে হয় যে, লেখক এইজাতীয় প্রবন্ধে জাতীয় মনের সাধারণ অসন্তোষকেই তাঁহার নিজস্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও পূর্ণতাকামী কবি-মনের গূঢ় অতৃপ্তিবোধের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্যার রূপ যতটা পরিস্ফুট করিয়াছেন সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই।

প্রবন্ধসাহিত্য

তাঁহার ভ্রমণকাহিনীগুলিতে তাঁহার মানস পরিণতি ও সূক্ষ্মদর্শিতার ক্রমবিকাশ সুপরিস্ফুট। তাঁহার প্রথম রচনা 'যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' অনেকটা সুখপাঠ্য তথ্যবিবৃতি; অপরিচিত জীবনযাত্রার বাহ্য অভিনবত্বই প্রধানত তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সমাজমনের গভীরে তিনি এখনও প্রবেশ করেন নাই। তার পর 'জাপানযাত্রী', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানে-পারস্যে' প্রভৃতি পরিণত বয়সের ভ্রমণ-কাহিনীতে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমুদ্রের অসীম রহস্যের অপরূপ অনুভূতি, অপর দিকে বিচিত্র প্রথাআচার-কর্মোদ্যম-আতিথেয়তা-শিষ্টাচার প্রভৃতির ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও জীবননিষ্ঠার মর্মোদ্ঘাটন—কাব্যময় ও সমাজতাত্ত্বিক উভয়বিধ দৃষ্টিভঙ্গীই একযোগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারস্যের প্রণয়-গুঞ্জন-মুখর ও সৌজন্যরস-পবিপ্লুত কাব্যকুঞ্জে কবিরূপে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিল; কাজেই এখানে তিনি রাজনৈতিক শাসন-প্রথার কথা বিশেষ কিছু না বলিয়া দেশের কাব্যপরিবেশেই নিজ কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। জাপানের সঙ্গে তাঁহার ধর্মাদর্শের দিক দিয়া সহানুভূতি ও রাজনৈতিক আচরণের দিক দিয়া অ-সমর্থন ছিল। উহার শান্তি ও অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত সংস্কৃতি, উহার শিল্পসৌন্দর্যবোধ, কলাছন্দে নিয়মিত জীবনযাত্রার বর্ণনা ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-রহস্য-প্রণোদিত গভীর দার্শনিক মনন 'জাপান যাত্রী'তে অনবদ্য রসরূপ ও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যধর্মী গদ্যরচনার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি পূর্ব হইতে কোন অনুকূল ধারণা লইয়া যান নাই; রুশ বিপ্লবের রক্তাক্ত নির্মমতার কাহিনী, উহার ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পূর্ণ উন্মূলনের প্রচলিত ধারণা, উহার ধর্মহীনতা ও জড়বাদপ্রবণতা অন্যান্য অনেকের ন্যায় তাঁহার মনেও যে একটা সংশয়জাল বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে গিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি আহরণ করিলেন তাহার সাক্ষ্যকে যথাযোগ্য মূল্য দিবার মত তাঁহার উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার বিপুল কর্মোদ্যমের প্রাণচাঞ্চল্য ও সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠা ও আপ্রাণ প্রয়াস—জীবনের এই দুইটি বিকাশকেই তাঁহার আন্তরিক ও অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাহারা যে আলোকিত-শীর্ষ পিলসুজের ঠিক নীচেই অন্ধকারকে প্রশ্রয় না দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে ও এই সংকল্পসিদ্ধির পথে আশ্চর্যরূপে অগ্রসর হইয়াছে, ভারতীয় সামাজিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত এই চিত্র সংস্কারকামী লেখককে মুগ্ধ ও প্রশংসামুখর করিয়াছে।

ভ্রমণকাহিনী

রাশিয়ার চিত্রে আমরা লেখকের কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্তে পাই অপক্ষপাত, সংস্কারমুক্ত ন্যায়বোধ—যে গাছে এমন আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য ফল ফলিয়াছে তাহার মূল না খুঁড়িয়াই ও তাহার রসগ্রহণের ভূমিগর্ভস্থ আয়োজনের খবর না লইয়াই তাহার সতেজ জীবনীশক্তি ও পত্রপল্লববহুল ছায়ানিবিড়তাকেই লেখক প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির ভোগলোলুপতা, আধিপত্যস্পৃহা ও শোষণবৃত্তিকে, বিশেষত ভারতে ইংরেজশাসনের কলঙ্কিত অধ্যায়কে তিনি বরাবরই ধিক্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে, অন্তিমশ্বাসগ্রহণের সহিত তিনি 'সভ্যতার সঙ্কট' নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষিব ন্যায় তিনি আপাত-সমৃদ্ধ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মৃত্যুজীর্ণ এই দস্যুসভ্যতার প্রতি চরম অভিশাপ উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখ দিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ ও জীবননীতি এই শক্তিমত্ত ও ব্যাভিচারবিকৃত সভ্যতার উপর নিজ ধ্যানলব্ধ পূর্বানুভূতিব বলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছে।

(১০)

ইহাব পর আসে সমালোচনা-সাহিত্য। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' এই গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথেব সাহিত্যের মূলতত্ত্ববিশ্লেষণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যে ঐ মূলনীতির সার্থক প্রয়োগ পর্যন্ত সাহিত্যবিচারের সব কয়টি স্তরই উদাহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-বিচাব পূর্বসূরীদের সূত্র অনুসরণ করিলেও নিজ মৌলিক গূঢ়সঞ্চারী অনুভূতির আলোকে সমুজ্জ্বল। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির মূলে, সর্বজনের মনে সঞ্চরণশীল ভাবের কবি কর্তৃক স্বীকরণ ও নিজ অনুভূতির সাহায্যে উহাকে রূপান্তরিত করিয়া নবসৃষ্টিরূপে বিশ্বমানসের নিকট পুনঃ উপস্থাপন এই উভয়বিধ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন।

সমালোচনা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

আবার সাহিত্যের মূল প্রেরণা প্রয়োজনাতিরিক্ত, খণ্ডিত দৃষ্টির দ্বারা অ-ব্যবচ্ছিন্ন আনন্দরসে নিহিত ইহাই তাঁহার অভিমত। উপনিষদ-প্রোক্ত যে আনন্দ হইতে নিখিল বিশ্বের উদ্ভব, সেই আনন্দই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের আদর্শলোক-সৃষ্টিরও মূল কারণ। তিনিই বোধ হয় শেষ সমালোচক, যিনি বস্তুজগতের সর্বগ্রাসী অভিভবের অব্যবহিত পূর্বে, আদর্শকল্পনা ও আনন্দানুভূতি হইতে জাত কাব্য-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়াছেন। অতি-আধুনিক কাব্যের বস্তুভার-পরিকীর্ণ, তথ্যনিষ্ঠার অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে সৌন্দর্যবিমুখ রূপকৃতিকে তিনি তাঁহার

সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিয়া খানিকটা বিহ্বলতার বেদনা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু যে সত্য তাঁহার সমগ্র জীবনানুভূতি ও শিল্পবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার মূল তত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সমালোচনা-তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ শুধু বিচার-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না হইয়া নূতন সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব—প্রতিবেশটি তিনি তাদাত্ম্যমূলক কল্পনাবলে একবারে নূতন করিয়া অনুভব ও গঠন করিয়াছেন। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও কাদম্বরীর রসাস্বাদন-ব্যাপারে তিনি যে কেবল উহাদের কাব্যসৌন্দর্যের মূলপ্রস্রবণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা নহে, যে জীবনদর্শনের গভীর চেতনাশ্রয়ী, অটল ভিত্তির উপর এই কাব্যকলা প্রতিষ্ঠিত তাহারও প্রাসঙ্গিক প্রভাবটি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কালিদাসের প্রকৃত মাহাত্ম্য যে তাঁহার যৌবনসুলভ, ভোগাসক্ত প্রেমের বর্ণাঢ্য চিত্রণে নহে, পরন্তু তপশ্চর্যাপূত, আত্মসংযমে মহীয়ান, কল্যাণধর্মী প্রেমের শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস পরিণতিতে—এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ উক্ত কাব্যদ্বয় হইতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে আধুনিক বিচারবুদ্ধি প্রাচীন কাব্যে যে অমীমাংসিত সমস্যার দ্বারা পীড়িত হয় তাহারও সন্ধান তিনি দিয়াছেন। \ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে তিনি উর্মিলার প্রতি কবিগুরুর উপেক্ষার কাহিনী বিবৃত করিয়া, বাণভট্টের হাতে পত্রলেখার আতপ্ত যৌবনের অবমাননা অনুভব করিয়া আমাদের কল্পনা ও সহানুভূতিকে এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার অসপত্ন মর্যাদা ও নীতির একচ্ছত্র আধিপত্যরক্ষার জন্য সমস্ত পার্শ্ব-চরিত্রকে নির্বিচারে বলি দেওয়া প্রাচীন কাব্যের একটা চিরানুসৃত রীতি ছিল। সীতার সহিত উর্মিলার, কাদম্বরীর সহিত পত্রলেখার গণতান্ত্রিক অধিকার-সমতা রক্ষা করিতে গেলে রামায়ণের নাম পরিবর্তন করিয়া রঘুবংশ রাখিতে হইত ও কাদম্বরীরও অনুরূপ নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত। মহাকাব্য ও অভিজাত আখ্যান-কাব্য গণতান্ত্রিক সহানুভূতি দেখাইবার ক্ষেত্র নহে, কিন্তু ব্যক্তিমর্যাদার যুগে ব্যথিত সমালোচক এই উপেক্ষিত পাত্রীদের জন্য একটা সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন ও আমাদের ভাববিলাসপুষ্ট মনে আহাদের জন্য করুণ বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' পড়িলে বিস্ময় জাগে যে, যে কবি পরিণত ও অভ্রান্ত শিল্পবোধের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—তিনি কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে শিল্পরূপহীন, নিরর্থক ছন্দ-কাকলীমুখর ও বিচ্ছিন্নচিত্র-পরম্পরা-সমন্বিত 'ছেলে ভুলান ছড়া'-র

অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রেরণার মূল ও আবেগ-প্রবাহের গোপন যোগসূত্রটি এমন সুষ্ঠুভাবে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে মানবশৈশবের আদিম, অস্ফুট-বাক্ কল্পনাস্ফুরণ হইতে তাহার পরিণততম কাব্যপ্রেরণা পর্যন্ত সব কয়টি স্তরেরই সহাবস্থান ছিল—তাই তিনি শিশুর অশ্রান্ত ও অসংবদ্ধ সুরগুঞ্জন ও ছবির প্রতি অহেতুক আকর্ষণ, তাহার 'ছবি ও গান'-প্রবণতা হইতে শ্রেষ্ঠ মনন-সংস্কৃতির গভীর আবেদন পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশদক্ষতার সমান পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবের বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত, কল্পনার বাষ্পপরিবেশ ও আবেগেব ছন্দদোলাব মধ্যে বিধৃত হইয়া, শিশুর মনে যে মায়ালোক সৃষ্টি করে, ছেলে-ভুলান ছড়াগুলি নৈঃশব্দ্য-রহস্যেব গভীর তলদেশ হইতে উত্থিত তাহাবই বাণী-বুদ্‌বুদ। শিশুর মাতাই আদিম ছড়া-রচয়িত্রী, শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়া, স্নেহের সোনার চাবিতে শিশুব মনোরহস্যের দুয়ার খুলিয়া তিনি তাহার পরিবেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েব বিস্ময়বোধ, তাহার বিকাশোন্মুখ, নির্দিষ্ট সত্তায় অপরিণত চেতনার রূপক্ষুধা ও ছন্দোলালসাটিকে এই ছড়াগুলির মধ্যে এক স্বপ্নাবিষ্ট বাণীরূপ দান করেন। শিশুর জগতের ন্যায় শিশুর ছড়াও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গানের সুর ও রূপের ঝলক: প্রৌঢ় জগতের নিয়মকানুনবদ্ধ, অর্থসীমিত অন্তঃ-সঙ্গতি যেমন শিশুর মনেও নাই, তেমনি তাহাব ছড়াতেও নাই। এই ছড়াগুলির মধ্যে সময় সময় এমন সমস্ত ঘটনাব ছায়ারূপ দেখা যায় যাহাদের হয়ত এককালে সুসংবদ্ধ কায়া ছিল, যাহাদের এককালীন সুস্পষ্ট অর্থ এখন মুছিয়া ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, যাহারা বস্তু হইতে সঙ্কেতমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 'শিশুমহলে সুপরিচিত 'আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে' শীর্ষক ছড়াটি এই ইতিহাসের রূপকথায় পরিবর্তনের স্মারক। এ যেন মহাদেশ-প্রান্ত-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের সমুদ্র-বেষ্টিত, নিঃসঙ্গ দ্বীপে রূপান্তরিত হওয়ার মত ব্যাপার। এই দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, ছড়াগুলির জন্ম কেবল প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগে নয়, বিলুপ্ত ইতিহাসের খণ্ডস্মৃতি-সমাকীর্ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বটে। \ইহাদের মধ্যে ভাষার যে রূপময় ,চমক দেখা যায় ও পরিণত সমাজজীবনের—যথা বিবাহ, শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা, সাজসজ্জা প্রভৃতির—যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাদের পিছনে যে বহুযুগের সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক বিবর্তনের প্রচ্ছন্ন পরিচয় আছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়।) আদিমতার যে ছাপ ইহাদের উপর মুদ্রিত তাহা সব সময় অকৃত্রিম নহে; যেন মনে হয় অনুশীলিত শিল্পবোধ স্বেচ্ছায় পিছু হটিয়া এক কল্পনাসৃষ্ট আদিমতার

লোকসাহিত্য

রূপছন্দের অনুকরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' সাহিত্যসীমা-বহির্ভূত, লোকচিত্তের খেয়ালখুশিনির্ভর কল্পনার বাঙ্ময় প্রকাশ সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

'আধুনিক সাহিত্য'-এর প্রবন্ধগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসোপভোগের প্রায় একই প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে 'প্রাচীন সাহিত্য' এ তাঁহার সমালোচনা যতটা সৃষ্টিধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, 'আধুনিক সাহিত্য'-এ ততখানি হয় নাই। তাহার একটা কারণ এই যে, আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগের সহিত তুলনায় আবও অজস্র, বিশৃঙ্খল. কেন্দ্রসংহতিহীন ও নানা বিচিত্র ধারায় প্রসারিত ; ইহার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বোঝা যায়, কিন্তু ইহার একক সত্তাপ্রতিষ্ঠা দুরূহতর। কালিদাস, বাণভট্ট যে অর্থে প্রাচীন যুগের প্রতিনিধি, সে অর্থে আধুনিক যুগের কোন সর্বসম্মত প্রতিনিধি-নির্বাচন সম্ভব নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দুইটিতে সমালোচকেব সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শনের অভাব নাই ; তথাপি মনে হয় যে, ইহাবা যেন বহিরঙ্গমূলক, কবির ব্যক্তিপরিচয়ের, ব্যক্তিগত অনুভূতিরই মুখ্য প্রকাশ। প্রতিভা-বিশ্লেষণ যতটুকু আছে তাহা নিশ্চয়ই বোধশক্তিব সহায়ক ; কিন্তু মনে হয়, সমালোচক খুব গভীরে অনুপ্রবেশ করেন নাই। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'-এর সমালোচনা খুব উচ্চস্তরের। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধু-সম্বন্ধীয় সমালোচনার সহিত তুলনায় ইহাকে অনুপ্রবেশ-গভীরতায় কিছুটা ন্যূন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের আত্ম-সমালোচনা কিন্তু কবিহৃদয়রহস্যকে আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—তাঁহাকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা দুর্লভ। বিশেষত তাঁহার চিন্তাধাবার পবিবর্তন, নব নব প্রেরণার স্বীকরণ, তাঁহার রহস্যময় ভাবানুভূতিব স্বরূপনির্ণয় ও সীমানির্দেশ-বিষয়ে তাঁহার আত্মসমালোচনার মূল্য অপবিসীম।

আধুনিক সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য তাঁহার ভ্রমণসাহিত্যের সহিত মিশিয়া গিয়া উহার প্রকৃত মূল্যনির্ধারণে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। উহাদের পত্রসাহিত্য বা ভ্রমণসাহিত্য কোন আদর্শে বিচার করা উচিত সে বিষয়ে কিছু সংশয় জাগে। পত্রসাহিত্যের আদর্শ হইল একটি সহজ, অন্তরঙ্গ সুর, লেখকের পরিবারস্থ ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহার মনের এমন একটি অকপট প্রকাশ, তাঁহার রুচি, অভ্যাস, আত্মীয়মণ্ডলীর প্রতি প্রীতি-ভালবাসা-কৌতুকরসের, এক কথায় তাঁহার লৌকিক জীবনের, এমন একটি স্বচ্ছ প্রতিফলন

পত্রসাহিত্য

যাহা অন্য কোনরূপ সাহিত্যিক ভঙ্গীতে অ-লভ্য। পত্রসাহিত্যে লেখকের অন্যান্য পরিচয়, তাঁহার কবি-খ্যাতি, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, দার্শনিক গূঢ়তত্ত্বের আলোচনা, তাঁহার জীবনাদর্শের বিশিষ্ট মতবাদ যতটা চাপা থাকে ততই ভাল। এখানে আমরা তাঁহার রাজবেশ অপেক্ষা রাখালবেশদর্শনেরই অধিকতর প্রত্যাশী। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে প্রকৃতি-লীলার যে অপরূপ কবিত্বময় বর্ণনা, অসীমের অনুভূতি, জীবন সম্বন্ধে গভীর মন্তব্য, তাঁহার নিজ কাব্যবিষয়ে আলোচনা আছে, তাহা আমাদের গদ্যসাহিত্যের পরম সম্পদ্; কিন্তু পত্রসাহিত্যের রসের সহিত এই সমস্ত গুরু-গম্ভীর বিষয় ও উচ্চচিন্তামূলক মনোভাব যে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ তাহা সন্দেহস্থল। অনেকেই জানেন না যে, বার্কের ফরাসী বিপ্লবের উপর যে বিপুলকায় রচনা, তাহার পত্র-সম্বোধনে আরম্ভ, কিন্তু এই আকৃতি-সাদৃশ্য সত্ত্বেও কেহই ইহাকে পত্রের পর্যায়ে ফেলিবেন না। তেমনি রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে চিঠিপত্রের অন্তরঙ্গ আত্ম-উদ্ঘাটন ও ক্ষুদ্র, খুঁটি-নাটি খবরের ভিতর দিয়া একটা ঘরোয়া আবহাওয়াসৃষ্টি কতদূর সাধিত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য। শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকই যে শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। ববং প্রতিভাশালী কবিব আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁহাব পত্র-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতালাভের বিরোধী হইতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে হোরেশ ওয়ালপোল, লেডি মেরি ওয়ার্টলি মণ্টাগু, কুপার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ও ল্যাম্বের মত খেয়ালী মেজাজের লোকই শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের মত কবি সে সম্মান হইতে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-এ যে ব্যক্তিগত অংশ-টুকু ছেঁড়া গিয়াছে, হয়ত সেইটুকুর মধ্যেই আসল পত্ররস নিহিত ছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তুইটি ছোট মেয়েকে লেখা 'ভানুসিংহেব পত্রাবলী' এবং ছাপার উদ্দেশ্যে লেখা নয় এমন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট লেখা পত্র-সমূহই হয়ত তাঁহার ঘরোয়া রূপটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলে। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবন এমন অসাধারণ ছিল যে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। তাঁহার ব্যক্তিজীবন তাঁহার কাব্যজীবনের দিব্য-জ্যোতিতে এতটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, ঘরোয়া কথা অপেক্ষা কাব্যরহস্যমূলক অসীমতত্ত্ব—জিজ্ঞাসাই তাঁহার জীবনের সত্যতর পরিচয় বহন করে। তাঁহার 'আত্ম-জীবনী' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের বহির্ঘটনা অপেক্ষা তাঁহার অন্তররহস্যলীলা-দ্যোতনার প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, অন্তর্লোকের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই বাহিরের ঘটনাগুলির যত-কিছু তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ-এ' সংগৃহীত এমন কতকগুলি রচনা আছে, যথা 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা' 'শ্রাবণসন্ধ্যা,' 'পাগল' প্রভৃতি—যেগুলিতে যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যান-দৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাতুর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই রচনাগুলি সম্পূর্ণরূপে মন্ময় ও আবেগধর্মী। ইহাদের ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তেমনি 'লিপিকা' (১৯২২) ও 'পত্রপুট'-এ (১৯৩৬) ও 'বনবাণী'-র গদ্যভূমিকায় আবেগ ও মননের যে মিশ্রিতরূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গদ্য বা কাব্য কাহার পরিমাণ বেশী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গদ্যরীতি একেবারে সম্পূর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত না হইয়া, কাব্যেব ছন্দ-প্রবাহ, উচ্ছ্বসিত প্রকাশভঙ্গী ও কল্পনা-লীলার সংযোগে যে কাব্যধর্মিতার একেবাবে শেষসীমা স্পর্শ করিতে পাবে ও কাব্যের সম্পূর্ণ সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব-বাহনরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এই জাতীয় রচনা তাহারই নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কবি-পবিচয়ই প্রধান হইলেও, গদ্যশিল্পিরূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় তুল্যমূল্য স্থানের অধিকারী। এই দ্বিবিধ মুকুট আর কোন সাহিত্যিকের শিরে সমান মর্যাদাব সহিত পরান যায় কি না সন্দেহ।

আবেগমূলক গদ্য রচনা

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও তাঁহার তিরোধানের পর বাংলা কাব্যের বিকাশ-ধারায় মোটামুটি তিনটি শাখা লক্ষ্য করা যায়—(ক) রবীন্দ্রানুসারী কাব্য; (খ) রবীন্দ্রপ্রভাবনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কাব্য; (গ) বিশেষ উদ্দেশ্য ও রচনারীতিসমন্বিত অতি-আধুনিক কাব্য। বর্তমান অধ্যায়ে এই তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে ও জীবিত কবিসম্প্রদায়কে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পরলোকগত কবিদের রচনা-অবলম্বনেই কাব্যের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ-নির্ধারণের চেষ্টা করা হইবে।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের তিনটি শাখা

ক—রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী

(১)

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫); যতীন্দ্র-মোহন বাগচি (১৮৭৭-১৯৪৮)—পরলোকগত কবিদের মধ্যে ইঁহাদের দুইজনকেই স্থান দেওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ নহে, যদিও রবীন্দ্র-আনুগত্য বিশেষ ভাবে প্রকট। ইঁহাদের কাহারও রবীন্দ্র-কল্পনার গভীরতা ও বিস্তার, রবীন্দ্র-মননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও সর্বগামিত্ব ও রবীন্দ্র-শিল্পের অনবদ্য চারুতা দেখা যায় না। তথাপি মোটের উপর রবীন্দ্র-কাব্যের গাঢ় আবেশ, নিবিড় কল্পনানুভূতি অনেকটা ফিকে হইয়া ইঁহাদের মানসলোক ও ছন্দপ্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের বিরাট ক্ষেত্র ইঁহাদের রচনায় সঙ্কুচিত হইয়া গার্হস্থ্য জীবনের শান্তরসাস্পদ বর্ণনা ও হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যগৌরব-প্রচারণায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে। কল্পনায় যে প্রকার আন্তরিকতা আছে, সে প্রকার মহিমা নাই; সাধারণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহা কচিৎ অসাধারণত্বের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। আবেগ প্রায়শই মৃদু ও শান্ত, কোথাও অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও উদ্দাম গতিবেগে উধাও হয় নাই। ইহা ভক্তিতে মধুর, প্রেমে নিরুচ্ছ্বাস, আত্মনিবেদনে অকৃত্রিম, বাঙালীর সাধারণ জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। যেখানে ভাবোচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,

করুণানিধান ও যতীন্দ্র বাগচির রবীন্দ্রানুগত্য

সেখানে কল্পনা-সমুন্নতির মধ্যে সচেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনের লক্ষণ পরিস্ফুট। ছন্দ রবীন্দ্রানুকারী, কিন্তু ভাবের অনুবর্তনে স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত নহে। ইঁহারা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ঐতিহ্যানুগত মনোভাব ও পারিবারিক জীবনরসকে রবীন্দ্রকল্পনার দিব্যানুরঞ্জনের সুদূর অনুসরণে নূতনভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধতা, স্বপ্নাবিষ্টতা, ভগবদ্-ভক্তি ও শান্ত-সংযত, আচারনিষ্ঠ, আদর্শপরায়ণ ও মমতাস্নিগ্ধ জীবনযাত্রার প্রতি একটা নিবিড় প্রীতি ইঁহাদের রচনার মূলসুর ও কবিধর্মের সার্থক বিকাশক্ষেত্র। ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবণতা রবীন্দ্রপ্রভাবজাত হইলেও ইহাতেই ইঁহাদের মৌলিক অনুভূতি ও প্রগাঢ় আবেগ রূপ পাইয়াছে। ভাষাভঙ্গীর অসমতা, সুন্দরের সঙ্গে সাধারণ ও সময় সময় উদ্ভটের মিলন এইজাতীয় কল্পনা-শক্তির ক্ষীণপ্রাণতা ও দৃঢ়তার অভাবের পরিচয়।

করুণানিধান

করুণানিধানের কবিতার মধ্যে কালিদাস রায় স্বপ্নমাধুরী ও মোহিতলাল রূপোল্লাসের অনুভব করিয়াছেন। উভয় উপাদানই তাঁহার কবিতায় বর্তমান, কিন্তু ইহাদের ভাব-নিবিড়তা ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য সব সময়ে যে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের উপর তাঁহার কল্পনা যে মায়াবরণ নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার বুনন খুব জমাট নহে; উহার শিথিল বয়নের ফাঁকে ফাঁকে ছদ্মবেশী যুক্তিশৃঙ্খলা ও বাস্তব জগতের স্থূল পরিবেশ লক্ষ্যগোচর হয়। এই দিকে স্বপ্নরসে চোখের উপর বাস্তব-বিস্মৃতির নিবিড় আবেশ নামিয়া আসে না, জাগ্রত চৈতন্য একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে না। তাঁহার রূপের সূক্ষ্ম কারুকার্য সচেতন ইন্দ্রিয়বোধের নিদর্শন; কিন্তু এই রূপানুভূতি যেন কবির একটা বিচ্ছিন্ন কল্পনাবিলাস, ইহা একটা সর্বব্যাপী জীবনদর্শনের মর্যাদা লাভ করে নাই। মাঝে মধ্যে রেখায় ও রংয়ে অঙ্কিত ছায়াভরা ছবি আছে, কিন্তু এই চিত্রধর্মিতা কোন উন্নততর তাৎপর্যের বাহন হয় নাই। কখনও কখনও ছন্দের ঐশ্বর্যলীলার মধ্যে তাঁহার রূপোল্লাসের সঞ্চরণধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু এখানেও একটা স্থির ও অভ্রান্ত শিল্পকুশলতার অভাব উল্লাসের অনিয়মিত মাত্রাহীনতাই সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় লঘু কল্পনা ও ছন্দ-চটুলতাও মাঝে মাঝে তাঁহাকে এক খেয়ালী, অবাস্তব সৌন্দর্যের প্রতি উন্মুখ করিয়াছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দ হইতে ভাব অনুমিত হয়, ভাবের অনিবার্য প্রকাশরূপে ছন্দ প্রতিভাত হয় না। তাঁহার কাব্য-কুম্ভ তাঁহার হৃদয়-যমুনার নীরেই যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা মনে হয় না; বরং তিনি যে নানাতীর্থের জলধারা

ইহাতে সংগ্রহ করিয়াছেন এই ধারণাই বলবৎ হয়। তাঁহার মনে কবির অনুভূতি আছে প্রচুর; শিল্পবোধ ও সিদ্ধি সে অনুপাতে কম।

যতীন্দ্রমোহন বাগচির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুগত্যের সঙ্গে তাঁহার কবিস্বভাবের একটি সহজ মিল ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহার কবিতা নানামুখী প্রয়োগের বিভিন্ন পথে উৎক্ষিপ্ত না হইয়া একই ভাবকেন্দ্রে স্থির-সংহত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের বহু কবিতার মধ্যে ববীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও তাঁহার রচনাভঙ্গীর মধ্যে একটি দৃঢ় নিজস্বতা ছিল, সুতরাং তাঁহার কল্পনায় উর্ধ্বগামিতার দুঃসাহস না থাকিলেও এবং ইহা পরিচিত পবিবেশের মধ্যে সীমিত হইলেও ব্যর্থ অনুকরণেব অসাফল্য ও শূন্যগর্ভ স্ফীতি তাঁহার কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। তাঁহার বিষয় সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিসমূহকেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রকাশরীতির ঋজুতা ও ভাবসন্নিবেশেব সুসঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। আমরা সব সময় কবিদের নিকট মননের স্বকীয়তা, জীবনের মৌলিক অনুভূতির প্রত্যাশা করিতে পারি না। এক এক যুগের আবহে প্রতিভাবান কবির রচনা হইতে বিচ্ছুরিত এক সাধারণ ভাব-সমবায় পরিব্যাপ্ত থাকে ও প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী এই ভাবগুলিকে রূপ দেন। সুতরাং ভাবে মৌলিকতার অভাব, সাধারণ ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহশীলতা কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নহে। ভাবস্বীকরণের মধ্যে সঙ্গতি ও প্রকাশসুষমা ও অনুভূতির অকৃত্রিমতা থাকিলে সে কাব্য প্রথম শ্রেণীর না হইলেও আদরণীয় হইবে। যতীন্দ্রমোহনের প্রেম ও নারীসৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাসমূহে যুগোচিত ভাবোচ্ছ্বাস থাকিলেও স্বাভাবিক পরিমিতিবোধ ও অকৃত্রিম অনুভবের অভাব নাই—ইহাদের মধ্যে ভাবমত্ততার পদস্খলন ও মুখরভাষণ বিশেষ শ্রুত হয় না। তাঁহার পল্লীজীবন ও গার্হস্থ্য রসের কবিতাগুলিতেও অনুরূপ সংযম ও মিতভাষিতা দেখা যায়। এমন কি তাঁহার 'সাকি ও সরাব'-এ হাফিজের ভাবানুবর্তনের মধ্যেও ঋজু ও বলিষ্ঠ অনুভূতির পরিচয় মিলে। তাঁহার শেষ কাব্য 'মহাভারতী'-র (১৯৩৬) উপর রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র প্রভাব সহজে লক্ষ্যগোচর হইলেও ইহাদের কবিতাগুলির মধ্যে—যথা 'কর্ণ,' 'দুর্যোধন,' বিশেষত 'শবরীর প্রতীক্ষা'-য় চরিত্রসৃষ্টি ও সুকুমার ভাব-স্ফুরণের যে সার্থক নিদর্শন মিলে তাহা তাঁহার কল্পনা-স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, কিন্তু পদক্ষেপের ছন্দটি তাঁহার নিজস্ব।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২—) ও কালিদাস রায় (১৮৮৯—) এই কাব্যধারার শেষ দুই প্রতিনিধি। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় পল্লীপ্রীতি, বৈষ্ণবরসভাবুকতা ও নিরাভরণ ও সময় সময় নিরাবরণ কাব্যভাষাপ্রয়োগে সরল নীতিতত্ত্বপ্রবণতা এবং কালিদাসের কাব্যে প্রাচীন ভাবাদর্শের মর্মোৎসাবিত সার্বভৌম মানবিক রসের উদ্বোধন ও সময় সময় শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত, অলঙ্কারবহুল ভাষায় অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মুখ্য স্বরূপে অনুভূত হয়। তাঁহাদের কাব্য ভক্তিরসাপ্লুত, পূর্বস্মৃতিরোমন্থনাকুল পল্লীসংস্কৃতির শেষ আশ্রয়স্থলরূপে কাব্যাবেদনের অতিরিক্ত এক করুণ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া থাকিবে।

কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়

খ—রবীন্দ্রানুরাগী, অথচ কল্পনাস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট কবিগোষ্ঠী

(২)

এই শ্রেণীর কবির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদাব (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৩), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—) প্রভৃতি কবিব নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সমস্ত কবিই ববীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেব নিজের কবিতায় তাঁহারা রবীন্দ্র-প্রভাবিত না হইয়া স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবেরই প্রাধান্য—তিনি আবেগ ও ভাবালুতার চির-বিরোধী ও তীক্ষ্ণ মননশীল শ্লেষের কশাঘাতে বাংলাকাব্যে প্রচলিত রসার্দ্রতার উপহাস্য দিকটারই উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এমন কি সাহিত্যিক সহযোগিতা যতই ঘনিষ্ঠ হউক, রুচি ও কল্পনার দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রমথ চৌধুরী বিশেষ গীতি-কবিতা লেখেন নাই; তিনি সনেট রচয়িতারূপেই বাংলা কাব্যে স্থান পাইয়াছেন। এই সনেট এক ব্যঙ্গকবিতা ছাড়া অন্যান্য-জাতীয় কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মননধর্মী; ইহার আঁট-সাট গড়ন, উচ্ছ্বাসাধিক্যের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও স্বল্প পরিসরে ভাব-পরিণতির সম্পাদন সমস্তই সদা-সক্রিয় মননশীলতায় মুদ্রাঙ্কিত। প্রমথ চৌধুরী আমাদের মুগ্ধ বা ভাববিহ্বল করিতে চাহেন না, করিতে চাহেন তীক্ষ্ণ ভাষণে ও অপ্রত্যাশিত ভাবসন্নিবেশে চমকিত। তাঁহার

প্রমথ চৌধুরী

মনোঘুড়ি কবি-কল্পনার লাটাই-এ দৃঢ়বদ্ধ থাকিয়া কবির হস্তধৃত সূত্রের আকর্ষণে উচ্চতর ভাবাকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্বাধীনতা হইতে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে ও কল্পনার অতিরিক্ত আবেশে বুঁদ হইবার কোন সুযোগ পায় নাই। সুতরাং তাঁহার 'সনেট-পঞ্চাশৎ' রবীন্দ্রকল্পলোক হইতে স্বতন্ত্র ও উহারই পরিপূরক এক নূতন মনোরাজ্যের সন্ধান দেয়। বরং ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্র-বিরোধী ও কাব্যে অস্পষ্টতার প্রতিবাদকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁহাব খানিকটা মিল আছে, যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু হাস্যচপলতার সহিত তুলনায় তাঁহার পরিহাসের মধ্যে গভীরতর মননিষ্ঠতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বৈপরীত্যমূলক মৌলিকতার ছাপ পরিস্ফুট।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে গভীর রবীন্দ্রপ্রীতির সহিত বিবিধ নূতন পরীক্ষারত মানস কৌতূহলের বিরল সমন্বয় দেখা যায়। তাঁহার এই নানা প্রকারের কাব্য-কৃতির সংযোগবিন্দু ছিল ছন্দ-আবেগেব সর্বাতিশায়ী মোহ। অনেক সময় মনে হয় যে ছন্দ তাঁহাব কবি-কল্পনাকে অনুসরণ না করিয়া, কবিকল্পনাই ছন্দের দোলাব বশবর্তী হইয়াছে। 'পালকীর গান', 'ঝরণার গান', 'চরকার গান' প্রভৃতি লৌকিক ও প্রাকৃতিক জীবনের নানা স্বতঃউদ্ভূত ও অভ্যস্ত ছন্দ তাঁহার কাব্য-বীণায় ধৃত হইয়া তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতিকে উত্তেজিত করিয়াছে, একটা ক্ষীণ সঙ্গীতবেশেব সূত্রে বিবিধ রূপকল্প, জীবনের নানা ক্ষণ-চিত্র আকৃষ্ট হইয়া এক বিমিশ্র সত্তায় মূর্ত হইয়াছে। 'পালকীর গান' ও 'দূরের পাল্লা' কবিতায় কবি ছন্দের যাদুশক্তিতে এক সূক্ষ্ম-অনুভূতি-গম্য, স্বপ্নমায়ামণ্ডিত রূপজগতের যবনিকা তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমরা যেন পরিচিত জগৎ ও কাব্যলোক হইতে বহুদূরে এক আদিম শৈশব-কল্পনার রাজ্যে, রূপকথার এক রহস্যপুরীর মধ্যে নীত হইয়াছি। এই গোধূলিছায়াচ্ছন্ন, রূপের চমকে মুহুর্মুহু চকিত, স্বপ্নাবিষ্ট প্রদেশই সত্যেন্দ্র-কল্পনা-বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল প্রতিবেশ।

সত্যেন্দ্রকাব্যে কল্পনার লঘুলীলা

কবিকল্পনার যে দুইটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাদিগকে Fancy ও Imagination বলে ও যাহাদিগকে কল্পনা-বিলাস ও কল্পনা-নিষ্ঠা এই দুই বাংলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে Fancy বা কল্পনার লঘু-লীলাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছড়ার ঝোঁকে, ছন্দের নৃত্যহিল্লোলে, অনভিজাত ও বিদেশ হইতে আহরিত চটুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির লঘু টানে, সৌন্দর্যের অনায়াসসিদ্ধ চিত্রাঙ্কনে, সর্বোপরি মানস উল্লাস ও

উত্তেজনার উপচাইয়া-পড়া উচ্ছলতায় তিনি তাঁহার কবিতায় এই কল্পনালীলাকে মনোহর, সহজ-অনুভব-বেদ্য রূপ দিয়াছেন। অলংকৃত, মন্থরগতি, অভিজাত ভাষণ ও গভীরতর কল্পনার অতন্দ্র নিয়ন্ত্রণ হইতে কবিতাকে মুক্তি দিয়া তিনি ইহাকে চলমান জীবনস্রোত, প্রাণের সহজ গতিবেগের সহিত এক ছন্দে গাঁথিয়াছেন—সৌন্দর্যের গন্ধমন্থর কুঞ্জবন হইতে বাহির করিয়া বাস্তব জীবনের ছুটিয়া-চলা, হোঁচট-খাওয়া, মৃত্তিকাস্পর্শে অশালীন উদ্দামতার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার হাতে কবিতার উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধির মান কিছুটা হ্রাস পাইলেও, কাব্যপরিধি যে অনেক বাড়িয়াছে, জীবনের সহিত কাব্যের সংসক্তি যে আরও বহুমুখী ও নিবিড় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের রুচিবৈচিত্র্য ও তীব্রতর জীবন-কৌতূহলের দাবী মিটাইতে যে এই কবিতা আরও অধিক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য। শিশুচিত্তের অবাধ, তরল প্রবহমানতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র আবেদনের প্রতি ইহার নিবিড় মোহের সঙ্গে যদি কবিত্বশক্তির অতি-সহজে উত্তেজিত, উল্লাস-উন্মুখতার যোগ হয়, তবে সেই যোগফল কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্চতর কল্পনানিষ্ঠার (imagination) খুব বেশী সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় না। কল্পনার উচ্চ শৃঙ্গে তিনি অস্খলিত পদচারণা করিতে পারিতেন না—উচ্চগ্রামে সুর চড়াইতে গিয়া তাঁহার বারে বারেই ভাবের পদস্খলন ও ভাষার কৃত্রিম স্ফীতি ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার একদা-বহু-প্রশংসিত 'মহাসরস্বতী'-র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের যে কোন ভাবসমুন্নতিমূলক কবিতার তুলনা করিলে ইহার কষ্টকল্পনা, উল্লেখের (allusion) আতিশয্য, মননের পরিচ্ছন্ন ঋজুতার অভাব, এমন কি তাঁহার ছন্দেরও পারুষ্য ও সূক্ষ্ম অনুরণনের অপ্রাচুর্য সুস্পষ্ট হইবে। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্র, বংশীরবে উৎকর্ণ, নৃত্যপর হরিণকে দিয়া ভাবমহিমার রাজরথ টানাইলে হরিণের সঞ্চরণ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রথের মসৃণ অগ্রগতি দুইই যে কতকটা ব্যাহত হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

সত্যেন্দ্রকাব্যে কল্পনা-সমুন্নতির অভাব

সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সমস্ত কৃতিত্বের জন্য কবি-সভায় তাঁহার সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হইত, বর্তমান কালে উহাদের অনেকটা মূল্যহ্রাস হইয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক কবিতা, সাময়িক ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত কবিতা, তাঁহার অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্য-পরীক্ষামূলক কবিতা, তাঁহার মনন-প্রধান কবিতা এবং সর্বোপরি তাঁহার বিভিন্ন তীর্থের পূতবারিপূর্ণ কলসের ন্যায়

অনুবাদ-কবিতার সমকালীন প্রতিষ্ঠা এখন অনেকটা ম্লানরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে সাময়িকতার মধ্যে চিরন্তনতাকে আবিষ্কার করা সম্ভব, সদ্যোঢালা সোডার বোতলের ফেনা-স্ফীতির মধ্যে বিলম্বলব্ধ, স্থায়ীগুণবিশিষ্ট, রুচিকর স্বাদ অনুভব করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের সেই গভীর-অনুপ্রবেশী কল্পনা ছিল না। যেমন গজে গজে মৌক্তিক নাই, তেমনি প্রতি বিষয়ে কাব্যসম্ভাবনা আশা করা যায় না। প্রথম কামড়ে কাঁচা ফলের যে অংশ রসাল বলিয়া মনে হয়, পূর্ণ পরিপক্কতায় পরিণত মিষ্টতা সব সময় সে অংশে নিহিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় প্রথম কামড়ের; সদ্য-উচ্ছ্বসিত কাব্য-কোলাহলের ও ভাব-তারল্যের কবি; 'অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান'—সেখান পর্যন্ত তাঁহার কবিদৃষ্টি পৌঁছে নাই। তাঁহার দেশপ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে উচ্ছ্বাস যতটা, প্রজ্ঞার স্থিরতা ও বিচারের যাথার্থ্য ততটা নাই। দেশের অতীত গৌরবের প্রশস্তিরচনার মধ্যে সাম্প্রতিক অধঃপতনের কি সান্ত্বনা আছে তাহা বোঝা যায় না। আজকাল মানব-সমস্যার গভীরতর উপলব্ধির ফলে দেশপ্রেমের সমস্ত কবিতার মধ্যেই একটা তরল উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, তরুণসুলভ ভাববিলাস ও সার্বভৌম নৈতিক ভিত্তির অভাব অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত, ইংলণ্ডের Rule Britannia ও ফ্রান্সের বিপ্লব-প্রশস্তি এখন যেন কৈশোর-স্বপ্নের একটা বর্ণাঢ্য ভাব-মরীচিকার মতই মনে হয়; এ যেন সুদূর অতীতের একটা ছেলে-ভোলানো গান, যাহার শব্দ ও সুরের অজস্রতার মধ্যে অর্থ-দ্যোতনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে! সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই তাৎপর্যরিক্ততা যেন আরও প্রকট হইয়াছে। যে যুগে ব্রাউনিং-এরও মননশীলতা অস্বীকৃত, সে যুগে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানবিজ্ঞানমন্যতা যে বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে না তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহার অনুবাদ-কবিতার মধ্যেও মূলের ভাবানুসরণ যে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, মূলকবিতার সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা ও আবহ-সৃষ্টি ভাষান্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া যে অক্ষুণ্ণ থাকে না, তাহা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃত কবিতা অনুবাদযোগ্য নহে, প্লেটোর এই নন্দন-তত্ত্বের উক্তি ক্রমশই অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। তথাপি এই সমস্ত বিষয়ে প্রথম পথিকৃতের প্রশংসা তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য; তিনি বাংলা কবিতার অবিমিশ্র সৌন্দর্যচর্চাক্লিষ্ট শিল্পশালার বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সচল বায়ুপ্রবাহ-প্রবেশের জন্য যে নূতন নূতন জানালা খুলিয়া দিয়াছেন, সেই জানালাগুলির কারুকার্য খুব উন্নত রীতির না হইলেও, তাহাই তাঁহার স্থায়ী কীর্তিরূপে গণ্য হইবে।

সত্যেন্দ্র-কাব্যের মূল্য বিচার

সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবি হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নহেন, বাংলা কাব্যে একটা বিশিষ্ট প্রভাবরূপেও তিনি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-কাব্য হইতে অতি-আধুনিক যুগের কাব্যের যে স্বরূপবিবর্তন, তাহার মূলে অনেকটা তাঁহারই প্রভাব। কাব্যে চল্‌তি ভাষা ও কথ্য ভঙ্গী, হাল্‌কা সুর, দেশ-বিদেশ হইতে আহরিত নানা অপরিচিত শব্দের সুষ্ঠু ও নির্ভীক প্রয়োগ, নূতন নূতন ছন্দরীতির মাধ্যমে ভাবের সাবলীল, উল্লসিত প্রকাশ, জীবনেব বহু নূতন বিভাগে, অনুভূতির বহু নূতন ক্ষেত্রে কাব্যসীমাব প্রসার—আধুনিক কাব্যের এই সমস্ত প্রবণতা বহুলাংশে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তপ্রভাবিত। তাঁহার প্রকৃতি ও ঋতু-বিষয়ক কবিতার মধ্যে কোন বিশিষ্ট দর্শনের অনুভব-গভীরতা অপেক্ষা বর্ণধ্বনিময় জগতেব প্রতি অতি-উন্মুখ রূপাকুলতা ও কল্পনা-বিলাসের রমণীয় লীলা বেশী দেখা যায়। এদিকেও সমকালীন কবিতা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সত্যেন্দ্রনাথেরই অধিক অনুগামী হইয়াছে। আধুনিক কবিতার যে প্রধান লক্ষণ ভাবগভীরতার পরিবর্তে কৌতূহল-বিস্তৃতি, কাব্যানুরঞ্জনের স্থলে জীবনবসের আস্বাদনবৈচিত্র্য, স্তব্ধ ধ্যানতন্ময়তাব স্থলে গতিবেগের উন্মাদনা, প্রথাগত কাব্যরীতিব পবিবর্তে সংলাপভঙ্গীব দ্রুতসঞ্চারী ভাবানুগামিতা—তাহা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপরীক্ষা হইতেই প্রধানত উদ্ভূত। সুতরাং তাঁহার নিজের কবিতার যে শাশ্বত মূল্য তাহা ছাড়াও ভবিষ্যৎ কাব্যের রুচি ও মেজাজের প্রথম প্রবর্তকরূপেও বাংলা কাব্যে তাঁহার একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান থাকিবে।

সত্যেন্দ্রনাথে ভাবী বাংলা কবিতার আভাস

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও ব্যতিক্রমধর্মী কবি। তাঁহার ব্যতিক্রম সমসাময়িক রীতি ও ভাবাদর্শের এত সুস্পষ্ট ও নিঃসঙ্কোচ অস্বীকৃতি যে তাঁহার একক স্বাতন্ত্র্য কোন সমধর্মী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ ও কবিদৃষ্টি এতই নিজস্ব ও অসাধারণ যে, ইহার অনুকারকরূপে বিশেষ কাহাকেও দেখা যায় না। কাব্যের বহুপ্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তিনি সাধারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও নিপুণ যুক্তিশৃঙ্খলার সাহায্যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়াছেন। যে ভগবানের মঙ্গল-ময়তার উপর কবির উপজীব্য বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে তিনি বন্ধু বলিয়া ছদ্ম-অন্তরঙ্গতাপূর্ণ সম্বোধন করিয়া তাঁহার তথাকথিত ন্যায়নিষ্ঠা ও নীতি-নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি ক্ষুব্ধ অভিমান ও অনুযোগে নিজ অন্তরের অনির্বাণ জ্বালাকে মুক্তি দিয়াছেন। জীবনের আনন্দ, প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুষমা, মানবের স্বাধীন

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দ্বৈতমনোধর্মী কবি

মর্যাদা, তথাকথিত কোমল হৃদয়বৃত্তিসমূহের অকৃত্রিমতা—এক কথায় মানবজীবনে যাহা কিছু আদর্শস্থানীয় ও কাম্য, সমস্তই তাঁহার ব্যঙ্গের বিস্ফোরক আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের তিনখানি কাব্যের—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) ও 'মরুমায়া'র (১৯৩০) মধ্য দিয়া যেন মরুবালুকার তীক্ষ্ণ সূচিসমাকীর্ণ, উত্তপ্ত, সর্বধ্বংসী বায়ুপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দুঃখবাদ ও নাস্তিকতার সর্বরিক্ত, অগ্নিবর্ষী রৌদ্রদহনের মধ্যেও যেন আমরা কবির অন্তরশায়ী গোপন ছায়াকুঞ্জের পরোক্ষ সন্ধান পাই। তাঁহার প্রতিবাদের মুখর অতিভাষণের মধ্যেই যেন আনুগত্য ও অনুরাগের একটা অস্বীকৃত নিদর্শন মিলে। যে কবি ভগবানকে সত্যসত্যই নস্যাৎ করিতে চাহে, সে তাহার সহিত এত কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে বসে না। নিন্দার আতিশয্য যে প্রণয়েরই ছদ্মবেশী রূপ, বিরাগ যে অনুরাগেরই উল্টা পিঠ, ঐকান্তিক মিলনাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাই যে রূঢ়তম প্রত্যাখ্যানের ছলনা আশ্রয় করে—এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য যতীন্দ্রনাথের কবিতায় উদাহৃত হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণবসাধনার রসলীলাকে আপাতত প্রত্যাখ্যান করিলেও উহার অভিমান-তত্ত্বটি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আদি-রচনার মরুমত্ততা যে আসলে বাঙলার অন্তর-লোকের চিরন্তন শ্যামলিমাকে আহ্বানের একটা কৌশলমাত্র, ইহা প্রথম প্রথম বোঝা না গেলেও পরে স্ফটিক-স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোধর্ম ও কবিধর্ম উভয়ত্রই এই দ্বৈতভাব পরিস্ফুট।

সাধারণত যে সমস্ত কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চতর কাব্য-কল্পনা ও সৌন্দর্যানুরাগের অভাব দেখা যায়। ইংরেজী কাব্যে ড্রাইডেন, পোপ ও বাংলা কাব্যে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা হাস্য-পরিহাসে, আঘাত-প্রত্যাঘাতে যতটা নিপুণ ছিলেন, সূক্ষ্ম ভাবের উদ্বোধনে ও আদর্শ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ততটা প্রবণতা দেখান নাই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই সাধারণ কাব্যনিয়মের ব্যতিক্রম। শ্লেষাত্মক মন্তব্য ও যুক্তিপরম্পরা-সন্নিবেশেও তিনি এমন অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যপিপাসী মনের পরিচয় দেন যে, সৌন্দর্যানুভূতির অভাবই যে তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিরূপতার দিকে পরিচালিত করিয়াছে এরূপ ধারণা আমাদের জন্মে না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছাই-চাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে ছড়াইতেই তিনি আমাদের সম্মুখে রূপানুরাগের রংমশাল প্রজ্বালিত করিয়াছেন। যাঁহার শ্লেষাভিঘাত হইতে

চেরাপুঞ্জীর থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

অথবা

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু-মদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

অথবা

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙীন বারাঙ্গনা

ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন পংক্তির কল্পনারাগরঞ্জিত মণিদীপ্তি বিকীর্ণ হয়, তিনি যে রূপান্ধতার ও আদর্শবিমুখ মনোভাবের জন্য ব্যঙ্গের উগ্র ঝাঁঝকে বরণ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। আবার সৌন্দর্যের ছবি আঁকিতে আঁকিতে, ভাবোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া, হঠাৎ এক তুলির টানে, বিপরীত এক সুরের রেশে কবি সমস্ত কবিতারই আবেদন বদলাইয়া দিয়াছেন—রূপ-মুগ্ধতায় যাহার আরম্ভ হইয়াছিল তির্যক ব্যঞ্জনার বক্র হাসিতে তাহা অতর্কিত কৌতুকরসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সৌন্দর্যের খোলসে ব্যঙ্গের শাঁস অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক অভিনব মিশ্ররস উৎপন্ন হইয়াছে। এ সমস্তই প্রমাণ করে যে, যে কোন কারণেই হউক—সম্ভবত বিদ্রোহের উগ্র নেশায়, প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণাব অত্যুৎসাহে, নিজ বিদ্রূপদক্ষতা-প্রকাশের তীব্র প্রেরণায়, হয়ত বা কোন বিরূপ অভিজ্ঞতার অন্তর্গূঢ় প্রভাবে—যতীন্দ্রনাথের সহজাত সৌন্দর্যানুরাগ ও আদর্শপ্রীতি জীবন-অস্বীকৃতি ও নেতিবাদের জ্বালাময় বিরাগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই মরুচাবণার মধ্যেও যে তিনি সময় সময় শ্যামলের স্বপ্ন দেখিতেন তাহারও ইঙ্গিত একেবারে অপ্রাপ্য নহে। তাঁহাব প্রখররৌদ্রদগ্ধ জীবন-দিগন্তে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ মেঘমায়ার ক্ষণিক আবির্ভাব অনুভব করা যায়। জীবনে আদর্শানুভূতির দুই প্রধান উৎসকেই—প্রেম ও প্রকৃতিসৌন্দর্য—তিনি তাঁহার সমস্ত বোধশক্তি দিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যাখানের মধ্যে এমন একটা আবেগের আতিশয্য আছে, ব্যঙ্গের সুরের মধ্যে এমন এক উচ্চকণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ উদ্ঘোষিত প্রত্যয়-দৃঢ়তা অনুভূত হয়, যাহাতে কবির অন্তরের আত্মদ্বন্দ্বের আভাস মিলে। এ যেন শুধু ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নহে, কবি মনে-প্রাণে যাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন, সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও অনলোদ্গার। অনুরাগ অভিমানের মধ্যস্থতায় বিরাগে রূপান্তরিত না হইলে প্রতিবাদের ভাষা এত তীক্ষ্ণ ও মুখর হইয়া উঠে না।

যতীন্দ্রনাথের আত্মদ্বন্দ্ব

প্রথম পর্বের রচনায় যাহা অস্ফুট আভাসরূপে বর্তমান ছিল, দ্বিতীয় পর্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। 'সায়ম্' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) ও 'নিশান্তিকা'-য়

(১৯৫৭) যতীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় এমন একটা বিপরীতমুখী রূপান্তর ঘটিয়াছে যাহা সকলের নিকটই দিবালোকের মত পরিষ্কার। অভিমানের ঘন মেঘ সরিয়া গিয়া ঈষৎ অনুতাপ-ম্লান বিশ্বাসের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা কবিচিত্তকে সজল মায়ায় অভিষিক্ত করিয়াছে। যে প্রেম ও যৌবনাবেশকে কবি প্রথম জীবনে সরাসরি অস্বীকার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকে ঘিরিয়াই কত মধুর পূর্বস্মৃতিরোমন্থন, কি অপরূপ কল্পনাবিলাস, অনুশোচনা ও ভ্রান্তিস্বীকারের কি করুণ গুঞ্জন, ফিরিয়া পাইবার কি ব্যাকুল আকুতি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে! যে বন্ধুকে তিনি তীক্ষ্ণ ও অবিরাম শ্লেষে জর্জরিত করিয়াছিলেন, দুরন্ত অভিমানে তিনি যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়াছিলেন, এখন তাহার সহিত অন্তরঙ্গতা লাভ করিতে কি প্রাণ-ঢালা আগ্রহ, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধিতে কি কুণ্ঠিত আনন্দ!

যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের কবিতা রোমান্টিকধর্মী

শেষের এই তিনখানি কাব্যে তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়ার অপগত যৌবন ও তিরোহিত দেহ-সৌন্দর্যের জন্য কি মর্মান্তিক আক্ষেপ প্রায় প্রতি কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তাঁহার পূর্বজীবনের বিরক্তি ও বিশ্ববিধানের প্রতি অনাস্থার প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। প্রেম ও যৌবনের প্রতি অতি-অনুরাগই তাঁহাকে তাহাদের ক্ষণিকতার জন্য এরূপ নেতিবাদী করিয়া তুলিয়াছিল। এই অনুভূতিই নানা রূপে, নানা ছন্দে, রোমন্থনের নানা ভঙ্গীতে তাঁহার শেষের কাব্যগুলিকে এক সর্বব্যাপী বিলাপ ও হাহাকারের গুঞ্জনে অনুরণিত করিয়াছে। এইগুলিতেই তাঁহার সমস্ত ছদ্মবেশ দূর হইয়া তাঁহার কবিস্বরূপ ও ব্যক্তিস্বরূপ উন্মোচিত হইয়াছে। বিলাপের অশ্রুবাষ্প কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় বিচিত্র বর্ণে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। 'বকুলতলীর ঘাটে', 'মনোরমা,' 'প্রত্যাবর্তন,' 'শপথভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় কবির যে পরিচয় ফুটিয়াছে তাহা একান্ত রোমান্টিকধর্মী ও রূপবিহ্বল। তাঁহার অতৃপ্ত রূপপিপাসা এই কবিতাগুলিতে মুদিত পদ্মের নিকট ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় একই প্রশ্নেরই অশ্রান্ত পুনরাবৃত্তিতে, একই আক্ষেপের বিচিত্র কল্পনাময় রূপান্তরে ধ্বনিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'বকুলতলীর ঘাটে' কবিতায় কবি প্রেমের যে স্মৃতিসমাকুল, অনায়ত্ত সাধনার রূপক-কল্পনাকে রূপ দিয়াছেন তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রেমানুভূতির সমগোত্রীয়। এখানে তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবিরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন; কেবল তাঁহার পূর্বতন সংশয়ের জন্য যে খেদ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বিলম্বিত উপলব্ধির জন্য আঁকড়াইয়া ধরিবার যে আকুলতা, ভ্রান্তি-

নিরসনের অনুষঙ্গী যে আত্মধিক্কার, তাহাই রবীন্দ্রনাথের স্থির দার্শনিক প্রত্যয়ের সহিত তুলনায় তাঁহার এই জাতীয় কবিতাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ এক দিক দিয়া মোহিতলালের সমধর্মী; উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র যৌবন-ভোগলালসা মোহিতলালের ন্যায় তাঁহার কবিতারও একটি মূল সুর। অবশ্য কাব্যকলার ইঙ্গিতধর্মী প্রয়োগে, স্মৃতিচারণা ও বিরহদুঃখের ভাবতন্ময়তার জন্য যতীন্দ্রনাথের কাব্যের এই স্থূল উপাদানটি অনেকটা সূক্ষ্মতর রূপে উদ্বর্তিত হইলেও ইহার মৌলিক প্রকৃতিটি সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয় নাই। তাঁহার অবরুদ্ধ প্রেমাবেগ ও যৌবন-কামনা যে কত তীব্র ও নিঃসঙ্কোচ ছিল তাহা তাঁহার শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির শতধারে উৎসারিত খেদোচ্ছ্বাসের মধ্যেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কবিতায় ফিরিয়া ফিরিয়া দেহসৌন্দর্যের স্তব-স্তুতি উদ্গীত হইয়াছে; যৌবন-লালসাব অতৃপ্তি আদর্শ-কল্পনার সমস্ত স্তোক-সান্ত্বনাকে বিদীর্ণ করিয়া গিরিনদীর দুর্বাব বেগে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহাব উপমার আতিশয্য-স্ফীতি, যৌবনাতিক্রান্ত দেহের বাস্তব জীর্ণতাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কল্পনা ও মোহের নিবিড় জালবয়ন, যৌবনকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অশ্রুবিহ্বল আহ্বান ও শেষ পর্যন্ত পুত্র-কন্যার যৌবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এই নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতিতে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভের করুণ প্রয়াস—সবই নিঃসংশয়িতভাবে তাঁহার কবি-মানসের দেহাকুলতার পরিচয় বহন করে। মোহিতলালের কবিতায় যে দেহবোধ একটি দার্শনিক প্রত্যয়ের স্থির, নিরুচ্ছ্বাস সূত্র-সংক্ষিপ্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যতীন্দ্রনাথে তাহাই সমগ্র প্রকৃতিমথিত এক ভূমিকম্পের বিপর্যয়ে, কল্পনা ও আবেগের এক দুরন্ত, অথচ শিল্পশাসিত উচ্ছ্বাসে, বুকফাটা হাহাকারের এক ছন্দসুষমাগ্রথিত ধ্বনিদেহে রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ হয়ত যতীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা। মোহিতলালে যাহা জীবনের স্বরূপতত্ত্ব, আত্মিক চেতন-অভিমানের চিরন্তন আধাররূপ অমৃতকলস, যতীন্দ্রনাথে তাহাই উপেক্ষিত, অনাদৃত সত্যের অতি-বিলম্বিত আবিষ্কার, মূঢ় অন্ধতা ও অভিমানের ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্ত। মোহিতলালের নিকট যাহা রূপময়, মূর্তিদেউলে অধিষ্ঠিত, পৃথিবীর বাস্তব ও কবিচেতনাসমর্থিত সত্য, যাহাকে তিনি চোখ মেলিয়া ও সহজ অনুভূতির বলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ তাহাকেই দেখিয়াছেন অনুতাপ-আবিল দৃষ্টিতে, অশ্রু-পারাবারের সমস্ত অশান্ত আলোড়নের ব্যবধান-বাধা কাটাইয়া।

যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের দেহাত্মবাদের তুলনা

উপমার মুকুরে কবিমানসের এই আবেগমত্ততা অতিরিক্ত বর্ণোচ্ছলতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রিয়ার যৌবনলালিত্যচ্যুত তনু তাঁহাকে স্মৃতিময় কানুহীন বৃন্দাবনের উপমা স্মরণ করাইয়াছে। যে বৃন্দাবন বৈষ্ণবরসলীলার দিব্য আধার, যাহার অধ্যাত্মসত্তা সমস্ত ভৌগোলিক সীমার উর্ধ্বে বিশুদ্ধ ভাবলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রিয়ার রূপহীন, জরালুলিত দেহের উপমানরূপে প্রয়োগ—প্রমাণ করে যে পার্থিব প্রেম ও প্রেয়সীর অঙ্গকান্তি তাঁহাব অনুভূতিতে কি অসাধারণ মূল্য-গরিমায় প্রতিভাত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কল্পনার উর্ধ্বায়নের, বস্তুর ভাবরূপে উন্নয়ন ব্যতীতই দৈহিক রূপযৌবন কবির চক্ষে কি অধ্যাত্মকল্প মোহাঞ্জন লেপন করিয়াছে! 'মনোরমা' কবিতায় কবি অধীর আগ্রহে বার্ধক্যের ত্রিবলী-অংকিত, লোলচর্ম প্রিয়াদেহে কেবল যে শাশ্বত প্রেয়সীর বিদেহী ভাবসত্তা আবিষ্কাব করিতে উন্মুখ তাহা নহে, তাহার লুপ্ত যৌবনলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিতেও সমভাবে ব্যগ্র। বস্তুত আদর্শানুভব এখানে গৌণ; পলায়িত যৌবনের রূপের ঝলকই তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে ও উদগ্রভাবে কাম্য। উহার অপ্রাপনীয়তাই তাঁহাকে আদর্শৈষণার ছলনার আশ্রয়গ্রহণে প্রণোদিত করিয়াছে। এখানে আদর্শ কোন উচ্চতর ভাব-প্রেরণা নহে, ইন্দ্রিয়স্পর্শবঞ্চিত কামনার স্মৃতি-অনুধ্যান। 'সায়ম্' কাব্যের 'মন্ত্রহীন' কবিতায় কবি ভাবাতিরেকের চরম সীমায় পৌছিয়াছেন। এখানে তিনি প্রিয়াকে মন্ত্রগুরুর আসনে বসাইয়া তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠতম জীবন-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিরহ-খিন্না রাধিকার মদনের প্রতি অনুযোগ, হরভ্রমে তাহার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ না করিবার আবেদন যে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানতন্ত্রে দীক্ষিত, সংশয়বাদে শ্লেষতীক্ষ্ণ কবির কণ্ঠে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা ভাবোন্মত্ততার আর কি প্রকৃষ্টতর পরিচয় কল্পনা করা যাইতে পারে? বৈষ্ণবভাবতন্ময় চণ্ডীদাসের কণ্ঠে রামীর প্রতি যে অপরূপ স্তব—"তুমি বেদমাতা গায়ত্রী" ধ্বনিত হইয়াছিল, প্রতিবেশ-আনুকূল্য-রহিত, ধর্মসাধনার অমোঘ প্রত্যয়হীন আধুনিক কবির রচনায় তাহারই প্রতিধ্বনি এক অভিনব তান্ত্রিক সহজিয়াবাদের প্রবর্তন, এক অভাবনীয় অধ্যাত্ম-আবেগের মুক্তি বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং যতীন্দ্রনাথের শ্লেষাত্মক সংশয়বাদ যে তাঁহার সুকোমল-অনুভূতি-আর্দ্র অন্তরের নির্মোক মাত্র, তরণী সেনের কাটা মুণ্ডের রামনাম বলার মত তাঁহার যৌবনোত্তীর্ণ অনুভব-কোষ যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রেম-যৌবনের মহিমাকীর্তনে বিভোর তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত। সংশয়বাদী, ছদ্মাভিনয়নিপুণ কবির

যতীন্দ্রনাথের শ্লেষ ও সংশয়বাদের অন্তরালে প্রেম ও ভোগবাদের ফল্গুধারা

সম্বন্ধে অন্তত একটা সংশয়-নিরসন ঘটিলেও তাঁহার কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার সুবিধা হইবে।

(৩)

মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সাহিত্য-সমালোচক এই উভয়রূপেই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। 'স্বপন-পসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬) 'হেমন্তগোধূলি' (১৯৪১) ও 'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৯৫১) এই কয়খানি কাব্যগ্রন্থে তাঁহার প্রায় সমুদয় কবিতাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাব কবিতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প, কিন্তু এই সংখ্যাল্পতা প্রেরণাধারার ক্ষীণতা সম্বন্ধে যে সংশয় জাগায়, তাহা তাঁহার পরিণত শিল্প-কৌশল, রচনারীতির ব্যক্তিময় বৈশিষ্ট্য ও মননের প্রসার ও গভীরতার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয়। তিনি শেষজীবনে কাব্য অপেক্ষা সমালোচনার প্রতিই অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। মনে হয় যে, কাব্যে তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ উৎকর্ষের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁহার অতিরিক্ত ব্যক্তিকতা ও বিশিষ্ট জীবনবাদের জন্য ইহা বাংলা কাব্যের উপর স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার সমালোচনা, তাঁহার রুচি ও অনুরাগ-বিরাগের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হইলেও এবং নৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের প্রতি অতি-সচেতনতার জন্য তাঁহার গ্রহণশীলতার উদারতাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিলেও, চিরন্তন মূল্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য-বিচারের ভবিষ্যৎ মানদণ্ড ও নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিবে এই অভিমতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই।

কবি অপেক্ষা সমালোচক মোহিত-লালের শ্রেষ্ঠত্ব

মোহিতলালের কাব্যে দেহবাদ-প্রবণতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যতীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পার্থক্যনির্ণয়প্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইয়াছে। তিনিই বোধ হয় আধুনিক বাংলা কাব্যে ক্লাসিকাল বা শ্রেষ্ঠ-ঐতিহ্যপন্থী ও নির্মাণকুশলী রীতির প্রধান উদাহরণ। তাঁহার কবিতায় শিথিলতা বা অনিয়ন্ত্রিত ভাবোৎসারের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। প্রতিটি পংক্তির বিন্যাস ও স্তবক-সমাবেশে অতিযত্ন-শীল শিল্পীর অখণ্ড মনোযোগ সর্বত্র পরিস্ফুট—কবিতা-নির্মিতির মধ্যে ভাস্কর্যরীতির দৃঢ়তা ও সংহতি সুস্পষ্ট। মনে হয় যেন প্রতিটি পংক্তি তরল কালিতে কলম ডুবাইয়া, দ্রুত হস্তে, সহজস্ফূর্ত প্রেরণার বশে লেখা নহে, বাটালির দ্বারা পাথর

মোহিতলালে ক্লাসিকাল-ভঙ্গী ও রোমাণ্টিক ভাবের সমন্বয়

কুঁদিয়া বর্ণমালার অক্ষরের ন্যায় একক স্বাতন্ত্র্যে ক্ষোদিত। লেখকের শিল্পসাধনার বিপুল প্রয়াসের সঙ্গে পাঠকের ভাবতাৎপর্য-গ্রহণের জন্য মস্তিষ্ক-চালনার পরিমাণ প্রায় সমমাত্রিক। অথচ এই আয়াস-সাধ্য রচনার মধ্যে ভাবের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, ছন্দের ধীর-মন্থর পদবিন্যাস, কবির অন্তরানুভূতির শৃঙ্খলাবদ্ধ গভীরতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রোমান্টিক ভাবের অভিনবত্ব ও মৃদু উত্তেজনার সহিত ক্লাসিকাল প্রকাশরীতিব সংযম ও অর্থবহতার সার্থক সমন্বয় মোহিতলালের কাব্যে উদাহৃত হইয়াছে।

মোহিতলালের কবিতায় লঘু কল্পনাবিলাসের বিশেষ নিদর্শন নাই। তাঁহাব মনোভঙ্গী এমনই অটুট গাম্ভীর্য ও গভীর মনন-কল্পনার বর্মাবৃত যে, সত্যেন্দ্রনাথ বা করুণানিধানের ন্যায় লঘু বা চটুল স্বর ঠিক তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বধর্ম নহে। মাঝে মধ্যে 'সিউলির বিয়ে' বা 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' প্রভৃতি কবিতায় তিনি খানিকটা হাল্‌কা চাল ও খেয়ালখুশি-মাফিক মুসলমানী শব্দ-সম্ভারের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ফল সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক হয় নাই। তাঁহাব মত সদাজাগ্রত কবিমানস স্বপ্নাবেশের ক্ষণবিস্মৃতিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারে না। তাঁহার এই জাতীয় প্রচেষ্টা আমাদিগকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেব আক্ষরিক অর্থের কথা স্মরণ করাই দেয়। তাঁহার ক্লাসিকাল সংযম ও বাহুল্যবর্জন-চেষ্টা সত্ত্বেও সময় সময় তিনি অতি-ভাষণের দোষ এড়াইতে পারেন নাই। শোপেনহওয়ারের উদ্দেশ্যে লিখিত 'পান্থ' প্রভৃতি অতিমননশীল কবিতা উহাদের অর্থগাঢ়ত্ব ও অতি-পল্লবিত বিস্তারের জন্য মাঝে মধ্যে ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। তাঁহার ছন্দোগ্রথিত গাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দপরম্পরা ও সুদীর্ঘ স্তবকশ্রেণী আমাদিগকে প্রাচীন রাজন্যবর্গেব হস্তিযূথসমন্বিত, বর্ণবহুল-ধ্বজদণ্ডশোভিত বিরাট শোভাযাত্রা-সমারোহের মন্থর গতির কথা মনে পড়ায়। এখানে শক্তির অবিসংবাদিত পরিচয় আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমত্তার অতিসচেতন শ্রেষ্ঠত্ববোধও আমাদের মনে কিছুটা অস্বস্তি জাগায়; কবির প্রতি সম্ভ্রমবোধ তাঁহার সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতাস্থাপনের অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাঁহার শব্দাড়ম্বরপীড়িত ভাবধারা উপলব্যাহতগতি শীর্ণ নদীর ন্যায় ধীরে ধীরে বহিয়া যায়, অনুকূল স্রোতোবেগে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। আমরা তাঁহার শঙ্খধ্বনিবৎ গভীর ছন্দ-স্বননে অভিভূত হই, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহার কবিতার যাদুর নিকট আপনাদিগকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না।

মোহিতলালে নিবিড় মনন-কল্পনার প্রগাঢ় গাম্ভীর্য

মোহিতলালের বলিষ্ঠ মনন ও ভাস্কর্যোপম আঙ্গিকগঠন এক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী সার্থক হইয়াছে—তাহা সনেট-রচনার ক্ষেত্র। এই সনেটের পদ-বিন্যাসে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। গীতিকবিতাতে যে মননভারক্লিষ্ট মন্থরতা পীড়া দেয়, সনেটে তাহাই স্বাভাবিক ভাবছন্দরূপে পাঠকের অবিমিশ্র প্রশংসা ও রসোপভোগের অভিনন্দন লাভ করে। বস্তুত মোহিতলালের ক্লাসিকাল গঠনশিল্প, সুবিন্যস্ত ভাবসজ্জা, জীবন-সত্যপ্রকাশের বলিষ্ঠ ভঙ্গী ও ছন্দের ভাবনা-নিয়ন্ত্রিত, অলক্ষ্যপ্রায় প্রবাহ এই যুগের অন্যান্য কবির আঙ্গিকশিথিলতা, ভাবের অজস্র উৎসার ও ছন্দোবিলাসের আতিশয্যের একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম ও মননদৃপ্ত প্রতিবাদ। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাতেই হীরকের উপাদান-দৃঢ়তা ও দ্যুতি উভয় গুণই বর্তমান। জনপ্রিয়তার মোহে, সমকালীন রুচির অনুবর্তনে, রাজনৈতিক উত্তেজনায়, কবি-সুলভ ভাবানুরঞ্জনের সুলভ প্রয়োগে, ছন্দের আবেশময় ঝংকারে জীবনপ্রজ্ঞার নিমজ্জনে, শ্লেষাত্মক আক্রমণের উগ্র ঝাঁঝে আমাদের বঞ্চিত ক্ষোভের তৃপ্তিসাধনে তিনি কাব্যের যথার্থ আদর্শ, নিরপেক্ষ জীবনানুভূতি ও সৌন্দর্যসৃষ্টি হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই আক্রমণাত্মক উগ্রতা তাঁহার সমালোচনায় আছে, কিন্তু কবিতায় নাই। তাঁহার প্রকৃত সমধর্মিতা ইংরেজ কবিদের মধ্যে ম্যাথিউ আর্নল্ডের সঙ্গে; সুইনবার্নের সহিত দেহবাদের মহিমা-খ্যাপনে খানিকটা ভাবগত মিল থাকিলেও, কাব্যরীতির দিক দিয়া কোন মিল নাই। মোহিতলালের কবিতার সহিত তাঁহার বিশিষ্ট জীবনবাদ ও গভীর মননপুষ্ট মানস গঠনের, অভিজাত-চিত্তের অতি-দুর্লভ রসরুচি-সমর্থনের এত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে তাঁহার প্রভাব-স্বীকরণ ভবিষ্যৎ কবির পক্ষে মোটেই সুসাধ্য নহে। তাঁহার ভঙ্গীর অনুকরণ হয়ত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সামগ্রিক মানস সংস্থা অননুকরণীয়।

মোহিতলালের সনেটের শ্রেষ্ঠত্ব

মোহিতলালের সমালোচনার মধ্যেও এই মানস আভিজাত্য, সহানুভূতির কঠোর-বেড়া-দেওয়া স্বল্পপরিসরতা ও অনুকূল ক্ষেত্রে নিগূঢ় মর্মানুপ্রবেশের ছাপ সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে যাঁহারা নব-জাগরণের প্রতীক, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নূতন ভাব-ধারাকে আত্মসাৎ করিয়া নবযুগের কবিতার স্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত, মোহিতলালের রসবিচার ও মূল্যায়ন প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলিত হইয়াছে। তাঁহার মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সমালোচনা এই দুইজন যুগন্ধর সাহিত্যিকের ভাবপ্রেরণার

সমালোচক মোহিত-লালের মধুসূদন ও বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য

উপর যুগমানসের প্রতিফলনের অভিনব আবিষ্কারমূলক আলোকপাত করিয়াছে। তাঁহার কৌতূহল প্রধানতঃ আরোপিত হইয়াছে রচনাশিল্পের উপর নহে, যে মানস অনুভূতি এই শিল্পরূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে তাহারই উপর। রচনার শিল্পোৎকর্ষ-বিচারে নহে, ভাবের নিগূঢ় উৎস-অনুসন্ধানেই তাঁহার মুখ্য আগ্রহ। রাবণ ও মেঘনাদ-চরিত্র-পরিকল্পনায় মধুসূদনের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা, যুগপ্রতিবেশ-প্রভাবিত আত্মভাবের উৎক্ষেপ কিরূপ ক্রিয়াশীল, রাবণের ও সাধারণত রাক্ষসগোষ্ঠীব প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার নিয়তিবাদের কিরূপ পরোক্ষ পরিচয় উদ্ঘাটিত, তাহাই তাঁহার বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয়। রাবণ মধুসূদনেব ব্যক্তিসত্তারই প্রতিচ্ছবি, তাঁহার আত্মারই দ্বিতীয় প্রকাশ। রাবণ শিশুর ন্যায় সরল, ঋজুপ্রকৃতি, শিশুর ন্যায়ই পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে উদাসীন, শিশুর ন্যায়ই হাত বাড়াইয়া সমস্ত ভোগ্য বস্তকে লাভ করিতে চাহে; কামনা পূর্ণ না হইলে শিশুর মতই নির্বিচারে অভিমানপ্রবণ ও ক্রন্দনশীল। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মানুসন্ধান যাহাকে নিয়তির নিষ্করুণ আঘাতের জন্য প্রস্তুত করে নাই, তাহার উপর সেই আঘাত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই যে কত মর্মান্তিক তাহা রাবণের চবিত্রে উদাহৃত। মধুসূদন ও রাবণ উভয়েই সমপ্রকৃতি, উভয়েই ভাগ্যের অবিচ্ছিন্ন দাক্ষিণ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভবশীল, উভয়েই অদৃষ্টের বিরূপতার জন্য একেবারে অপ্রস্তুত। যখন জীবনব্যাপী আশাবাদকে চূর্ণ করিয়া দৈবের নিদারুণ আঘাত আসিয়া পড়ে, তখন উভয়েই প্রায় এক সুরে কাঁদে; মধুসূদন বলেন "আশার ছলনে ভুলি" আর রাবণ বলে "কি পাপে, দারুণ বিধি, লিখিলা এ দুঃখ তুমি রাবণের ভালে।" মহাকাব্যের বিশাল নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে ব্যক্তিচিত্তের এই নিগূঢ় ক্রন্দন, পৌরাণিক শোকসমুদ্রে কবির নিজের চোখের দুইফোঁটা অশ্রুজল-সংযোজনার রহস্য মোহিতলাল অনাবৃত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও তাঁহার জিজ্ঞাসা একই প্রকারের। তাঁহার উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসে, তাঁহার পাত্র-পাত্রীর আচরণে ও চরিত্র-বিকাশে বঙ্কিমমানস কোন্ জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছিল, নারী-পুরুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সনাতন পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর-নির্ভর রহস্যলীলার কোন অধ্যায় আভাসিত—এই নিগূঢ় জীবন-জিজ্ঞাসাই সমালোচকের বিশেষভাবে কাম্য। বঙ্কিমের উপন্যাসের বহিরবয়বের পিছনে তাঁহার অন্তরপ্রেরণার এক সূক্ষ্ম মানচিত্র-অঙ্কনই মোহিত-লালের উদ্দেশ্য। ইহাতে সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে কিছু বিপদও মিশ্রিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটা দার্শনিক জীবনবোধ আরোপ করিয়া সেই মানদণ্ডে

তাঁহার সমস্ত উপন্যাসাবলীর উৎকর্ষ-অপকর্ষের মূল্যায়ন হয়ত উপন্যাসগুলির গুণবিচারের নির্ভুল পন্থা না হইতেও পারে। লেখকের মনোরহস্য যে এমন সম্পূর্ণভাবে সমালোচনের নিকট ধরা দিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও হয়ত অতিমাত্রিক দুঃসাহসিকতা। মধুসূদনের ক্ষেত্রে যে অনুমান ঠিক, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য না হইতেও পারে।

মোহিতলালের সমালোচনা-পরিধি ও বৈশিষ্ট্য

মোহিতলাল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রায় সমস্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের তাঁহার সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি নজরুল ইসলামের প্রথম দিককার রচনা-সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য পরিচয় মিলে। অবশ্য কোন কোন স্থানে পরবর্তী সমালোচনা তাঁহার অভিমতকে সমর্থন করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের ক্লাসিকাল মহিমা বা করুণানিধানের "অমোঘ সৌষ্ঠব", "নির্মাণকৌশল" প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা বন্ধুবৎসলতা বা সহধর্মী কবির প্রতি সহানুভূতির আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুল সম্বন্ধে তাঁহার প্রাথমিক প্রশংসা পরে তীব্র বিমুখতায় পরিণত হইয়াছিল—তাঁহার সুরুচি ও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আদর্শনিষ্ঠা নজরুলের আবেগ-আবিল, দুর্বার বন্যার ন্যায় অজস্র-উৎসারিত, সূক্ষ্মশিল্পবোধহীন রচনাকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার সহানুভূতি অতি-আধুনিক যুগের সীমান্তে পৌঁছিয়াই নিঃশেষিত হইয়াছে—তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর নৈরাশ্যপীড়িত, নানাবিধ হেঁয়ালিপূর্ণ, বৈদেশিক ভাব ও ভাষার প্রয়োগে দুর্বোধ্য, বাঙালী-ঐতিহ্যবিচ্যুত ও আন্তর্জাতিকতার দুরাশায় অভিভূত রচনার সহিত তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়াছেন; তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্ভাবনাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্যবিচারের অবিচল মানদণ্ড নবযুগের নূতন কাব্যানুভূতিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। তাঁহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সমালোচকের উদার আতিথেয়তা, শাশ্বত মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন আবির্ভাবের অভিনন্দন-প্রবণতা নীতিবিদ ও সমাজকল্যাণকামীর অত্যুৎসাহের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। বাঙালী-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অবলুপ্তির ভয়ে তিনি এরূপ বিচলিত হইয়াছেন যে নূতন পরীক্ষার প্রতি তাঁহার গ্রহণশীলতা ও ঔৎসুক্যই

ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার নিকট শেষ খাঁটি বাঙালী কবি; এবং বঙ্কিমের প্রতি আধুনিক যুগের অনাস্থা তাঁহার চক্ষে বাঙালী-সংস্কৃতি ও স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসহীনতারূপে গণ্য হইয়াছে। তিনি যেন অনাগতদর্শী প্রাচীন হিব্রু ঋষিদের ন্যায় বা উনবিংশ শতকের ইংরাজ সাহিত্যিক কার্লাইলের ন্যায় এই বিধর্মী, ঐতিহ্যভ্রষ্ট সাহিত্যকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া উহার প্রতি জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনমনীয় প্রতিকূলতার যে কোন কারণ ছিল না তাহা বলিতেছি না; কিন্তু ইহা আর যাহাই হউক, আদর্শ সমালোচক-কৃত্য নহে। ইহা ছাড়া, মোহিতলাল সাহিত্যবিচারের কতকগুলি মূলসূত্র—যথা ফর্ম বা রূপবন্ধ, স্টাইলের সংজ্ঞা ও উহার মধ্যে ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন প্রভৃতি সম্বন্ধে মননশীল ও গভীর সাহিত্যবোধপূর্ণ আলোচনা করিয়া আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বাংলা সমালোচনাকে উৎকর্ষের যে উন্নত পর্যায়ে পৌছাইয়া দিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ সমালোচক-গোষ্ঠী পুরাতন সাহিত্যের মূল্যনির্ণয় ও নূতন সাহিত্যের রস-আস্বাদনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে।

(৪)

নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯) যদিও এখনও জীবিত, তথাপি তাঁহার কাব্য-পরমায়ু বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে যে গভীর ও বহুমুখী প্রত্যাশা জাগিয়াছিল, দৈবচক্রান্তে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহার কাব্যচক্রের আবর্তন মধ্য-পথে স্থির হইয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটি সমগ্র বৃত্তমণ্ডল রচনা করিয়াছে। আজ কাব্যকৃতির দিক দিয়াই তাঁহার একটি সামগ্রিক পরিচয়েব সমাপ্তিরেখা টানা সমালোচকের বেদনাক্ষুব্ধ, অথচ অপরিহার্য কর্তব্যরূপেই দেখা দিয়াছে।

প্রাক্-নজরুল কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্র-নাথের রাজনৈতিক কাব্যের স্বরূপ

বাংলার কাব্যজগতে নজরুলের অতর্কিত আবির্ভাব যেন একটা ধূমকেতু বা ঝঞ্ঝার মতই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর্যায়ভুক্ত। কাব্যের পদ্মশোভিত, নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত স্থির সরোবরের বুকে তাঁহার কবিতা যেন একটা দুর্বার, আবিল নদীস্রোতের মতই শক্তির উচ্ছ্বাস ও ফেনিল উন্মত্ততার কলরোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সৌন্দর্য-তট-ভূমিতে সুরক্ষিত, শান্ত-নিয়ন্ত্রিত ছন্দপ্রবাহে মৃদুসঞ্চারী, পরিস্রুত জীবনাবেগবাহী কাব্যদেহের উপর যেন একটা প্রলয়প্লাবন বহিয়া

গিয়াছে। নজরুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিকবোধ ও সমাজচেতনার উত্তাপ ক্রমশ উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল ইহা সত্য। সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের রূপপিপাসার পান-পাত্রে সাময়িক উত্তেজনার আসব মিশাইয়া, সৌন্দর্যাবেশকে উগ্রতর নেশায় রূপান্তরিত করিয়া সমস্যার তীক্ষ্ণ কণ্টকবেধ কতকটা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা মুখ্যতঃ কবি ও গৌণভাবে পরিবেশস্পর্শাতুর; তাঁহাদের কবিধর্মের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া, কাব্যানুভূতির আতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের তাপমাত্রা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখিয়াই, তাঁহারা সুর চড়াইয়াছিলেন বা উত্তেজনামুখর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রণাঙ্গনে যদি অবতীর্ণ হইয়াই থাকেন তবে তাহা অর্ধ-শৌখীন অভিনেতারূপে; গোপবালক শ্রীদামচন্দ্রের ন্যায় মাথায় রঙীন পাগড়ি বাঁধিয়াও তাঁহারা গোচারণভূমির আসল কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

নজরুলের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিজ্বালাই তাঁহার প্রধান, এমন কি সর্বগ্রাসী অনুভূতি; তাঁহার রক্তে, তাঁহার গভীরতম চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রিক্ত বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় একাত্মতাবোধ বজ্রাগ্নির মত অসহনীয় উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূলকারণ। তিনি প্রথমে সৈনিক, পরে কবি; তাঁহার চরম ও সর্বস্বপণ দেশপ্রেম ও শোষণবিরোধিতার সহিত কবিত্ব-শক্তির সংযোগ বাংলা সাহিত্যের একটা আকস্মিক সৌভাগ্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্থূল প্রহরণের সহিত কাব্য-প্রতিভার দিব্য অস্ত্র যুক্ত হইয়া রণোন্মাদকে আরও দীপ্ত ও বহুমুখী করিয়াছে। যুদ্ধের এই উগ্র উন্মাদনার মধ্যেই তিনি আপনার কবিস্বরূপকে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন। আবেগের অসংবরণীয় আতিশয্যে যেমন সাধারণ লোক অঙ্গসঞ্চালন করে, তিনিও সেইরূপ তাঁহার শব্দছন্দ-কল্পনার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ-শক্তিকে বদ্ধমুষ্টির ন্যায় উঁচাইয়া ধরিয়াছেন, চাবুকের ন্যায় বায়ুস্তরে আছড়াইয়াছেন, অস্ত্রের ন্যায় রক্তলোলুপ অভিপ্রায়ের সহিত নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি স্বভাব-কবি বলিয়াই এই সমস্ত মারাত্মক প্রচেষ্টা কাব্যনিয়মের বশবর্তী হইয়া উন্মত্ততার মধ্যেও সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছে। যেখানে তাহা হয় নাই, সেখানেও তাঁহার কাব্যবিবেক তাঁহাকে কোনও রূপ পীড়া দেয় নাই; তাঁহার অস্ত্রে শত্রুর চর্মভেদ হইলেই তিনি কৃত-কৃতার্থ, পাঠকের মর্মভেদ না করিলেও তিনি

নজরুল প্রথমে সৈনিক তারপর কবি

বিশেষ অনুতপ্ত হন নাই। নিয়াগ্রার জলপ্রপাতের পাহাড় চূর্ণ করার দিকেই প্রধান লক্ষ্য, উহার পতনবেগের মধ্যে জ্যামিতিক সৌষম্য না থাকিলেও উহার বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

নজরুল এই যজ্ঞকুণ্ড-উত্থিত-সহজাত—কবচকুণ্ডলধারী দিব্য আবির্ভাব। আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা-উৎসারের ন্যায় তিনি তাঁহার অন্তঃসঞ্চিত জ্বালাকে, যে ভাষা তাঁহার মুখে আসিয়াছে, যে ছন্দ তাঁহার উত্তপ্ত আবেগেব স্বাভাবিক ধ্বনিচিত্র, কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তাহারই মাধ্যমে মুক্তি দিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দ যে সত্যই উচ্চাঙ্গের কবিতা হইয়াছে, ইহা কবির শিল্পবোধের জন্য নহে, তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভার জন্য। তাঁহার এই প্রতিভার উন্মেষ-রহস্য বিস্ময়কর ও ব্যাখ্যার অতীত। কৈশোরে নেটো গান ও যৌবনে মেসোপটেমিয়া-রণাঙ্গনেব বাস্তব অভিজ্ঞতা—এই দুইএর বাসায়নিক সংযোগে কেমন করিয়া যে তাঁহার প্রতিভার যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হইল, পরীক্ষাগারের কোন বিশ্লেষণপদ্ধতির দ্বারা তাহার রহস্য ভেদ করা যায় না। এই দুই প্রান্তিক ঘটনার ব্যবধানটি যে কেমন করিয়া একদিকে আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ও অন্যদিকে অসন্তোষের তীব্র বিস্ফোরক বারুদ-সঞ্চয়ে পূর্ণ হইল তাহারও কোন পূর্বাভাস মিলে না। কিন্তু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ (১৯২২) যখন প্রকাশিত হইল, তখন নজরুলের এই দ্বৈতশক্তির অজস্র প্রাচুর্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিল না। উন্মত্ত, আত্মহারা হৃদয়াবেগের এরূপ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস বাংলা কাব্যে আর দেখা যায় নাই। কাব্যে প্রথানিষ্ঠ সৌন্দর্যানুস্মৃতির যত প্রাদুর্ভাব হয়, জীবনের প্রত্যক্ষতা সেই পরিমাণে হ্রাস পায় এবং কাব্যসৌন্দর্যের সহিত জীবনানুভূতির ব্যবধান বৃদ্ধির ফলে উহার আবেদনশক্তিও কমিয়া যায়। নজরুল কাব্যের স্থির, ক্ষীণজীবনস্পন্দিত, স্বপ্নময় সৌন্দর্যলোকে জীবনের আবিল স্রোতের দুর্বার গতি ও আকৃতি প্রবাহিত করিয়া ইহার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিলেন। মানুষের বাঁচিবার দুরন্ত ক্ষুধা, তাহার সহজ অসংস্কৃত প্রবৃত্তির অবারিত আত্ম-প্রসারণের অভিলাষ সর্বপ্রথম কাব্যের ছন্দসুন্দর ও শিল্প-শান্ত প্রতিবেশে অভিব্যক্তি লাভ করিল। কাব্যপ্রাসাদের ঝাড়-লণ্ঠনের স্নিগ্ধ দ্যুতির মধ্যে কোষমুক্ত তরবারির প্রখর দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল; উহার মৃদু আবেগ ও আত্মমগ্ন ছন্দগুঞ্জরণের মধ্যে জনতার দৃপ্ত দাবী, উচ্চকণ্ঠ অধিকার-ঘোষণা বজ্রনিনাদে

উন্মত্ত আত্মহারা প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের কবি নজরুল

ধ্বনিত হইল। তাঁহার প্রকাশের রূঢ়তা অনেক সময়ই কাব্যানুমোদিত হয় নাই, ইহা ঠিক; কিন্তু তাঁহার সত্যভাষণের আন্তরিকতা, কাব্যরীতি উপেক্ষা করিয়া প্রাণের কথা চীৎকার করিয়া ঘোষণা করার অশালীন সাহসিকতা শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিধি ও জীবনশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। জীবনের অকর্ষিত ক্ষেত্র, অমার্জিত আবেগ, নব-উদ্বুদ্ধ চেতনা ও স্বভাববোধকে কাব্যকর্ষণার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত না কবিতে পারিলে কাব্য ক্রমশঃ জীবনবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; জীবনের প্রধান ধারা কাব্যের শাখা-নদীকে একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইবে। নজরুলের শক্তিমত্তা যদিও এ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুসৃত হয় নাই, তথাপি ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার বীজ নিহিত আছে।

নজরুলের শব্দভাণ্ডার

বাংলা কাব্যে শব্দভাণ্ডারও নজরুল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন; যে সমস্ত আরবী বা উর্দু শব্দ তিনি কবিতায় প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে নৈসর্গিক ঔচিত্যবোধ সেগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বাংলা কাব্যভাষার মধ্যে স্থায়িভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তিনি যখন 'ফরমান' বা 'আরজ' শব্দ প্রয়োগ করেন তখন তাহাদের ভাব-প্রকাশিকা ব্যঞ্জনাশক্তি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠে। হয়ত কিছু কিছু আতিশয্য ও অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু মনে হয়, তাঁহার কাব্যপরিণতির পথে অপ্রত্যাশিত বাধা না আসিলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানী শব্দপ্রয়োগের সুষ্ঠু নীতিটি চিরকালের জন্য নির্ধারণ করিয়া যাইতেন। প্রতিভাবান লেখকের প্রয়োগই এই ক্ষেত্রে ঔচিত্যের চরম মানদণ্ড।

নজরুলের স্বল্পায়তন কাব্যজীবনে বিবর্তনের একটি স্তর সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। প্রথম জীবনে তাঁহার বিদ্রোহীসত্তা যে কবিসত্তাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাঁহার বিদ্রোহী মনোভাব অগ্ন্যুদ্‌গিরণ করিয়া কিছুটা শান্ত হইলেই তাহা আবার স্বচ্ছন্দ-বিকশিত এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে। এই পরিবর্তন-রেখার একদিকে তাঁহার 'অগ্নিবীণা', 'ফণিমনসা' (১৩৩৪), 'সর্বহারা' (১৩৩৩) প্রভৃতি উগ্র প্রচারধর্মী কাব্য, অপর দিকে 'দোলন চাঁপা' (১৩৩০), 'ছায়ানট' (১৩৩২), 'সিন্ধুহিন্দোল' (১৩৩৪) প্রভৃতি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যপ্রাণ রচনা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে তাঁহার অজস্র গীতিস্তবকও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নজরুলের সকলদায়মুক্ত, রূপোল্লাসহিল্লোলিত ও সূক্ষ্ম

অনুভূতিসম্পন্ন কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। তাঁহার প্রথম পর্যায়ের কবিতাতেও বিদ্রোহের অপ্রকৃতিস্থ অত্যুচ্ছ্বাস হইতে অপেক্ষাকৃত শান্ত, সংযত, আত্মশক্তিতে আস্থাশীল, আতিশয্যবর্জিত মনোভাবে পরিবর্তনের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়। 'বিদ্রোহী'তে যে আবেগ বে-সামাল, 'সাম্যবাদ'-এ তাহা তীক্ষ্ণ যুক্তি-বাদ ও আক্রমণদক্ষতার বহিঃপ্রয়োজনে কতকটা নিয়ন্ত্রিত, 'ফরিয়াদ'-এ তাহা বিষণ্ণ-গম্ভীর, মর্যাদাপূর্ণ অভিযোগ-উপস্থাপনে স্থির ও ভগবানের প্রতি অভিমানে করুণ। 'দারিদ্র্য' কবিতাতে পৌঁছিয়া কবি নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশাকেও আন্দোলন-কারীর দৃষ্টিতে না দেখিয়া কবির শান্ত-সুন্দর মনোভঙ্গীতে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার কবিদৃষ্টিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া, কোন অভিযোগে আবিল না করিয়া উহাকে অন্তরের মধ্যে সংহৃত করিয়াছেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠ অনুভূতি উহার ভালমন্দ দুই দিকই সমদর্শিতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে; বঞ্চিত কবিসত্তার করুণ, বস্তু হইতে ভাবরূপে উদ্বর্তিত ক্রন্দন যেন সমস্ত কবিতাটিকে দেবদূতের অশ্রুপাতের (angel's tears) অমৃতনির্যাসে স্নিগ্ধ করিয়াছে।

নজরুলের কাব্য-জীবনের বিবর্তন

নজরুলের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিতে যে রূপমুগ্ধতা ও সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতির পরিচয় মিলে তাহা পরিণত প্রজ্ঞা ও আবেগের গভীরতার সহিত যুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ কবিতায় উন্নীত হয় নাই। নজরুলের আবেগের মধ্যে তরুণের স্বপ্নাবেশ, ভাবাতিরঞ্জনের স্পর্শ প্রচুর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অপরিণতির কিছু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি ও প্রেমবিষয়ক কবিতার মধ্যে রূপবিহ্বলতা আছে, কিন্তু কোন গভীর সুর নাই। মনে হয় যে, এই জাতীয় কবিতায় তিনি ইন্দ্রিয়ানু-ভূতিবেদ্য রূপাস্বাদন অপেক্ষা গভীরতর কোন স্তরে অবতরণ করেন নাই। যে সুলভ কল্পনাবিলাসের নিকট মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম একই সাধারণ লক্ষণে চিহ্নিত, একইরূপ আবেগতরলতায় বিগলিত, বিশিষ্টসত্তাহীন ভাবনির্যাসের সংমিশ্রণে একীভূত, কবি-চেতনা সেই স্তরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাঁহার আবেশে স্বপ্নমন্থরতা ও বর্ণাঢ্যতা আছে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা নাই; চিত্রকল্পতা আছে, হৃৎস্পন্দনের বলিষ্ঠ ধ্বনি ও গতিবেগ নাই; সঙ্গীতের কল্পলোক আছে, জীবনরসের স্বাদবৈচিত্র্য নাই। তাই তাঁহার মন শীতের রৌদ্রমধুর প্রভাতে প্রজাপতির ন্যায় তিসির ক্ষেতে ঘুরিয়া বেড়ায়; নদীতীরের কাশবনের মন্দান্দোলনের সহিত দোল খায়। তাই গুবাকতরুর শাখাপত্র তাঁহাকে নিতান্ত অকারণেই

নজরুলকাব্যে গভীর জীবনরসের স্বল্পতা

প্রিয়ার দেহলাবণ্যের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই চঞ্চল রূপানুরাগ, এই অলস স্মৃতি-রোমন্থন, এই সামান্য যোগসূত্র ধরিয়া প্রসঙ্গ হইতে অনুরূপ প্রসঙ্গে লঘু সঞ্চরণ, কবির সমস্ত ভাবাকাশ যে তাঁহার যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন তাহারই পরিচয় বহন করে। মানবজীবনের জটিল সমস্যা, প্রৌঢ় পরিণতির বহুমুখী জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁহার অন্তরকে একেবারেই আলোড়িত করে নাই। তিনি শেকস-পীয়রের নাটকের এরিয়েলের মত যে মোহন সঙ্গীত-নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা মানব-কর্ণে সুধাবর্ষণ করিলেও মানব-অনুভূতিতে কোন গভীর রেখাপাত করে না। তাঁহার সমস্ত কবিতা যেন তাঁহার একসুরো গানেরই বৃহত্তর সংস্করণ। তাই নজরুলের কবি-জীবনের অতর্কিত পরিসমাপ্তি এক বিরাট সম্ভাবনাকে অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া দিয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্যকল্পনার সহিত পরিণত জীবন-অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতির যে আশ্চর্য সংশ্লেষপ্রবণতা দেখা গিয়াছিল, পরিণত বয়সের কাব্যসাধনার মধ্যে তাহার সুষ্ঠুতর অনুশীলন হইলে বাংলা কাব্যে এপর্যন্ত অলিখিত এক অধ্যায় সংযোজিত হইত।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) অকালে ঝরা, সৌরভ-নিবিড় কবি-পুষ্পের আর একটি দৃষ্টান্ত। তাঁহাকে ইংরেজ কবি স্পেন্সারের মত 'কবির কবি'-আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা প্রভাবই ব্যাপকতর। তাঁহার নিজস্ব সুরটি তাঁহার আপন রচনায় যতখানি শিল্পপরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা তাঁহার সমকালীন কবিগোষ্ঠীর মনে, আকাঙ্ক্ষিত, অথচ অনধিগম্য, অতি-সূক্ষ্ম বেদনাময় একটি ভাবাকৃতিরূপে বেশী অনুরণিত হইয়াছে। সমস্ত অতি-আধুনিক যুগের মনে যে লক্ষ্যহীন উদ্ভ্রান্তি, যে অনির্দেশ্য হৃদয়-বিক্ষোভ নানা রূপে ও বিচিত্র সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই জীবনানন্দের আত্মমগ্ন অনুভূতিতে একটি জ্বালাহীন, বস্তুভারমুক্ত, মননের মুন্সিয়ানাবর্জিত, করুণ-সুন্দর রূপতন্ময়তার শিশির-বিন্দুতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মেজাজ ও রুচির দিক দিয়া তিনি সমকালীন কবিগোষ্ঠীর মধ্যে এক একক আত্মা। যুক্তিতর্কের ব্যূহরচনা, আঘাত-প্রতিঘাত-কুশলতা, বিদ্রোহের উত্তপ্ত ধূম্র-উদ্গিরণ, অবাঞ্ছিত প্রতিবেশের বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা সংঘর্ষ—তাঁহার সমস্ত কবি-প্রকৃতি এইজাতীয় সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ, ভারসাম্যচ্যুত মনোভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। তিনি এই রূঢ়, দ্বন্দ্ব-কর্কশ প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া নিজ সৌন্দর্যধ্যানমগ্ন আত্মার গভীরে আশ্রয় লইয়াছেন। অনন্ত কাল, অসীম

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় একক বৈশিষ্ট্য

বিশ্বব্যাপ্তি, গ্রহ-নক্ষত্রের কল্পনাতীত দূর-প্রসার সমস্তই যেন তাঁহার অনুভূতিতে একবিন্দু স্নিগ্ধ-সজল শিশির-স্পর্শের মত ঘনীভূত হইয়াছে, তাঁহার মোহাবেশকে নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র তন্ময়তায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। অসীম নভোবিহারের পর শ্রান্ত পাখীর ন্যায় তিনিও সুদূর অতীত যুগে বিচরণের পর, শ্রাবস্তী-বিদিশার অবলুপ্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার হইতে কিছু বিহ্বল, প্রত্যক্ষ-ভোলান স্মৃতিসার সঞ্চয় করিয়া নিজ কল্পনা-বিভোর অন্তর-নীড়-নিভৃতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সমস্ত রূপগন্ধ-শব্দস্পর্শময় জগৎ তাঁহার জ্যোতির্ময় কল্পলোকনির্মাণে প্রতীকধর্মী ইঙ্গিতরশ্মি প্রেরণ করিয়াছে; সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি উহাদের পারস্পরিক সীমারেখা হারাইয়া এক দ্রবীভূত ভাবরূপকের সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। (প্রকৃতি-তন্ময়তার দিক্ দিয়া একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার তুলনা চলে। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমগ্নতা এক উর্ধ্বতর দিব্য অনুভূতির অনুগামী—বিশ্বরহস্য-উপলব্ধির সহায়ক, লোক-লোকান্তরে প্রসারিত, সদাগতিশীল চেতনার ইঙ্গিতবাহী।) জীবনানন্দের এরূপ কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় নাই; তিনি রূপসাগরে অবগাহন করিয়াছেন কোন অরূপরতনের আশায় নয়, ইহার অতলস্পর্শ গভীরতায়, ইহার সাঙ্কেতিক বোধের গহনতায় নিজ বাস্তব-বিস্মৃত ভাবমুগ্ধতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, নিজ কল্পলোকাশ্রয়ী কল্পনার রক্ষাকবচস্বরূপ এক সৌন্দর্যঘন অন্তরাল-রচনার উদ্দেশ্যে। জীবনানন্দের এই মনোভাবের পিছনে যদি কোন তত্ত্বাভিপ্রায় ছিল, তাহা অপরিস্ফুটই রহিয়া গিয়াছে।

জীবনানন্দের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

অবশ্য তাঁহার সমস্ত রচনায় যে এই রূপবিহ্বলতা সার্থক ও অনিবার্য কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহা তাঁহার রুচি ও মানস প্রবণতার নির্দেশক, সর্বত্র তাঁহার কবিশিল্পের নিদর্শন নহে। যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও অভ্রান্ত শিল্পবোধ থাকিলে কবিমনের অনির্দেশ্য আকূতি, ইহার শিথিল স্বপ্নাবেশ সার্থক রূপসৃষ্টির সুস্পষ্টতায় প্রতিভাত ও পাঠকের গ্রহণশীল মনে অখণ্ড প্রতিবিম্বাকারে মুদ্রিত হয়, তাহা সব সময় এই আত্মভোলা, অব্যবস্থিতচিত্ত কবির আয়ত্তাধীন ছিল না। কবির রূপকল্পনায় আলোকের সঙ্গে যে অনেক পরিমাণে কুহেলিকা মিশ্রিত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার 'বনলতা সেন', 'সোনালি ডানার চিল', 'রূপসিরি নদী' ইত্যাদি রূপকণিকাগুলি তাঁহার নিজের মনের আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়াছিল; কিন্তু ইহাদের রূপকচ্ছটা সার্বভৌম রসিক-চিত্তে মাঝে মধ্যে চমক লাগাইলেও স্থির জ্যোতিষ্কদীপ্তিতে চিরভাস্বরতা লাভ করে নাই। কুয়াশার

ভিতর দিয়া দেখা নক্ষত্রের ন্যায় কবির আবেগ-কম্পিত, অথচ পরিণত শিল্পের পরমপ্রকাশবঞ্চিত কল্পনা যেন গোধূলিরহস্যভরা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতই আমাদিগকে উন্মনা করে, কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। জীবনানন্দের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁহার কবি-কৃতিতে ততটা নয়, যতটা এই সৌন্দর্যবিমুখ, সংশয়কণ্টাকিত যুগে তাঁহার আবির্ভাব-রহস্যের মধ্যেই নিহিত। জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার যে আধুনিক বাঙলায়ও সম্পূর্ণ অপচিত হয় নাই, জীবনানন্দের কবিতা সেই আশ্বাসের বাণীই বহন করে।

বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিকা

দশম-দ্বাদশ শতক

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়

পঞ্চদশ শতক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	:	বড়ু চণ্ডীদাস
রামায়ণ	:	কৃত্তিবাস ওঝা
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	:	মালাধর বসু
মনসামঙ্গল	:	বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস
পদাবলী	:	বিদ্যাপতি ঠাকুর

ষোড়শ শতক

মহাভারত	:	কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী
চৈতন্যভাগবত	:	বৃন্দাবন দাস
চৈতন্যমঙ্গল	:	লোচন দাস
চৈতন্যচরিতামৃত	:	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
পদাবলী	:	মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস
চণ্ডীমঙ্গল	:	দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

সপ্তদশ শতক

মহাভারত	:	কাশীরাম দাস
রামায়ণ	:	অদ্ভুতাচার্য
মনসামঙ্গল	:	বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ
ধর্মমঙ্গল	:	রূপরাম, রামদাস আদক
শিবমঙ্গল (মৃগলুব্ধ)	:	রতিদেব
পদ্মাবতী	:	আলাওল

অষ্টাদশ শতক

ধর্মমঙ্গল	:	ঘনরাম
গোরক্ষবিজয়	:	শ্যামাদাস সেন, ফয়জুল্লা
ময়নামতীর গান	:	সুকুর মামুদ
শিবায়ন	:	রামেশ্বর চক্রবর্তী
অন্নদামঙ্গল	:	ভারতচন্দ্র
কালিকামঙ্গল	:	রামপ্রসাদ সেন
মহারাষ্ট্র পুরাণ	:	গঙ্গারাম

ঊনবিংশ শতক ঃ প্রথমার্ধ

লোক ও জন-সাহিত্য : [কবি পাঁচালী, যাত্রা, তর্জা, আখড়াই, টপ্পা, ঢপ ইত্যাদি] হরু ঠাকুর, এণ্টনী ফিরিঙ্গি, রাম বসু, দাশরথি রায়, রসিক রায়, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, মধুসূদন কিন্নর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি।

গদ্য নিবন্ধ : রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, উইলিয়ম কেরী, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত।

সাময়িক পত্রিকা : মার্শম্যান, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত।

ঊনবিংশ শতক ঃ দ্বিতীয়ার্ধ

কাব্যপ্রয়াস : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি।

গদ্যপ্রচেষ্টা ঃ তারাশংকর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মীর মশারফ হোসেন প্রভৃতি।

উপন্যাসরচনা: প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদাব, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নাট্যনিবন্ধ: যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তাবাচরণ সিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি।

বিংশ শতক ঃ প্রথম পাদ

কাব্যপ্রয়াস: রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রিয়ম্বদা দেবী, সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়. যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চিত্তরঞ্জন দাশ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কিরণচাঁদ দরবেশ, মোহিতলাল মজুমদাব, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

গদ্যপ্রচেষ্টা: রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রামপ্রাণ গুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার. ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ চৌধুরী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

গল্প-উপন্যাস রচনা: রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা

ঘোষ জায়া, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, মাণিক ভট্টাচার্য, নরেশ সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি।

নাট্যনিবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন রায়, অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

[কালানুক্রমিকাটি স্থূলরেখায় টানা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া কাব্য-প্রয়াস ও নাট্যনিবন্ধাদিতে কাহারো নাম দ্বিরুক্ত হয় নাই। অনেকেই একসঙ্গে গল্প, কবিতা, নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখ্য পরিচয় অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। বিংশশতকের প্রথম চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করা হয় নাই এবং ইহার মধ্যেও সকলের নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।]

কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ

১১৯৯—বঙ্গে তুর্কী আক্রমণ

১৪৮৬—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

১৫৩৩—শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ

১৮০০—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৮০১—প্রতাপাদিত্যচরিত্র—রামরাম বসু

১৮১৫—বেদান্তসার—রামমোহন রায়

১৮১৭—হিন্দু কলেজ স্থাপন

১৮১৮—সমাচার দর্পণ—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

১৮২১—সম্বাদকৌমুদী—রামমোহন রায়

১৮৩১—সংবাদপ্রভাকর—ঈশ্বর গুপ্ত

১৮৪৮—বাঙ্গালার ইতিহাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮৫৬—বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন

১৮৫৭—সিপাহীবিদ্রোহ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

১৮৫৮—আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ

১৮৬০—নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র

১৮৬১—মেঘনাদ বধ—মধুসূদন

১৮৬২—হুতোম প্যাঁচার নক্সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৮৬৫—দুর্গেশনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৮—হিন্দুমেলা

১৮৭২—বঙ্গদর্শন

১৮৭২—স্বর্ণলতা—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৭৫—বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭৬—কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৯—সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী

১৮৮২—আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৩—ইলবার্ট বিল আন্দোলন

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

১৮৮৭—রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন

১৮৮৯—প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৯৩—কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন

১৮৯৪—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রতিষ্ঠা

১৮৯৬—প্রভাস—নবীনচন্দ্র সেন

১৯০৪—সন্ধ্যা (সংবাদপত্র)—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন : সুরেন্দ্রনাথ

১৯০৬—যুগান্তর (সংবাদপত্র) : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯০৭—বাংলায় বিপ্লববাদের আবির্ভাব : অরবিন্দ ও বিপিন পাল

১৯০৮—ক্ষুদিরামের ফাঁসি

১৯০৯—গোরা—রবীন্দ্রনাথ

১৯১০—গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ

১৯১১—দুই বঙ্গের মিলন এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি : ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত

১৯১২—সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৯১৩—রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ

১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ ও ভারতে জাতীয় জাগরণ

১৯১৪—সবুজপত্র (সাময়িকী)—প্রমথ চৌধুরী

১৯২১—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

১৯২২—অগ্নিবীণা—নজরুল ইসলাম

১৯২৪—কল্লোল (সাময়িকী)—দীনেশরঞ্জন দাশ

১৯২৬—পথের দাবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৩০—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন : আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩৯—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ

১৯৪২—আগস্ট বিপ্লব : আজাদ হিন্দ্ ফৌজ : নেতাজী সুভাষচন্দ্র :

১৯৪৩—পঞ্চাশের মন্বন্তর

১৯৪৬—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৪৭—ভারতবিভাগ ও স্বাধীনতালাভ

শব্দসূচী

[গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত ব্যক্তি, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, স্থান ইত্যাদির নাম ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শব্দের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকা]

ক

খ

গ

ছ

জ

ধ

ন

প

ফ

ব